স ম্পা দ না □ প্র কা শ দা স

এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

# RAMKINKAR

A Book on the life and creativity of the internationally reputed Post-independent Indian Sculptor and Painter Ramkinkar Veij.

Edited and Compiled by PRAKASH DAS.

FIRST PUBLISHED
JANUARY 1989.

প্রকাশক

স্বকাল। পানাগড়। পানাগড় বাজার। বর্ধমান (৭১৩১৪৮)

পরিবেশক

এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ

মাঘ ১৩৯৫

মুদ্রক

পৃথ্বীশ সাহা। অমি প্রেস, ৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ রূপায়ণ ও অলংকরণ

কমল সাহা

## উৎসর্গ

---

অতুলকৃষ্ণ দাস □ রেণুকা দাস **শ্রীচরণেষু** বাবা ও মা

## সূচীপত্র

ভূমিকা

**রামকিঙ্করের রচনা**

আমার কথা ১৭
মাস্টারমশাই ২২
একটি ছদ্মবেশী কুহেলিকা ২৫
ভাস্কর্য বিষয়ে কয়েক পংক্তি ২৬

**সাক্ষাৎকার**

আমার শিল্পের প্রথম ইস্কুল বাড়ীর পাশের কুমোরপাড়া ২৭
জীবনের সবক্ষেত্রেই আর্ট রয়েছে ৩২
যাঁরা প্রতিভাশালী তাঁদের কেউ লুকিয়ে রাখতে পারবে না ৪৩
শুধু শিল্পের জন্যই যা কিছু এই আমার শেষ কথা ৪৮
আমি বিশ্বাস করি আর্ট বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয় ৫৮

**শিল্প ও নিজের সম্পর্কে সংকলিত রামকিংকরের উক্তি**

মশাইরা আমি চাক্ষিক, রূপকার মাত্র, শাব্দিক নই ৭০

**বাঁকুড়া থেকে শান্তিনিকেতন : নিকটজনদের চোখে রামকিঙ্কর**

আমার কাকা রামকিঙ্কর □ দিবাকর বেইজ ৭৭
বাল্যবন্ধুদের চোখে রামকিঙ্কর □ বাসুদেব চন্দ্র ৮৮
আমার সহপাঠী রামকিঙ্কর □ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৪
সৃষ্টিমগ্ন রামকিঙ্কর □ ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণ ১০০
সাধক শিল্পী রামকিঙ্কর □ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১০৩
শিল্পী বাউল □ দিনকর কৌশিক ১০৫
কিঙ্করদার কিছুটা সময় □ কুণালকান্তি সাহা ১১৫
আমার প্রতিবেশী রামকিঙ্কর □ হৃষিকেশ চন্দ ১২০
চোখে দেখতে পাচ্ছি কিঙ্করবাবু এখনও আছেন □ বাগাল রায় ১৩২
আমি তোমার পাশে পাশে আছি □ রাধারাণী দাসী ১৪২

রামকিঙ্কর

**রামকিঙ্কর ও তাঁর শিল্পকাজ : নির্বাচিত প্রবন্ধ**

রামকিঙ্করবাবুর কথা □ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৬৭
কিঙ্করদাকে যেমন দেখেছি □ শঙ্খ চৌধুরী ১৭৪
শিল্পী-মানুষ রামকিঙ্কর □ জয়া আপ্পাস্বামী ১৮৬
রামকিঙ্কর ও তাঁর শিল্পকাজ □ কে. জি. সুব্রামনিয়াম ১৯২
রামকিঙ্কর ও ছাপচিত্র □ নির্মলেন্দু দাস ২০৩
রামকিঙ্কর ও রেখা □ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১১
রামকিঙ্করের জলরঙের ছবি □ আর. শিবকুমার ২১৮
পরিবেশীয় ভাস্কর্যের একটি ইতিহাস ও রামকিঙ্কর বেইজ □
জনকঝঙ্কার নারজারি ২২২
মঞ্চশিল্পী রামকিঙ্কর □ সুখেন গাঙ্গুলী ২৩২
নাটকপ্রেমী রামকিঙ্কর □ অমিতাভ চৌধুরী,
শুচিব্রত দেব, বিশ্বজিৎ রায় ২৩৬
শিক্ষক রামকিঙ্কর □ প্রভাস সেন ২৪১
রামকিঙ্করের শেষ পর্যায়ের কিছু ছবি □ রবি পাল ২৪৪
পরম্পরা, আধুনিকতা ও রামকিঙ্কর □ অরুণ পাল ২৫৭
শিল্প, শিল্পী, সমাজ ও রামকিঙ্কর □ অমিত মুখোপাধ্যায় ২৬০

**এসময়ের চিত্রী ও ভাস্করদের চোখে রামকিঙ্কর**

সত্যজিৎ রায়। চিন্তামণি কর। রথীন মৈত্র। সোমনাথ হোর। গণেশ হালুই। ঈশা মহম্মদ। প্রকাশ কর্মকার। রবীন মণ্ডল। শর্বরী রায়-চৌধুরী। শুভাপ্রসন্ন। যোগেন চৌধুরী ২৬৯

**রামকিঙ্করের লেখা কিছু চিঠি**

ইতি রামকিঙ্কর □ প্রকাশ দাস ২৮৮

**অন্যান্য রচনা**

রামকিঙ্করের বিদেশ যাত্রা সংক্রান্ত একটি আবেদনপত্র □ প্রকাশ দাস ২৩৬
রামকিঙ্কর □ প্রকাশ দাস ২৯৯ রামকিঙ্কর বিষয়ক
রচনাপঞ্জী □ প্রকাশ দাস ৩২৫ ভাস্কর্য ও চিত্রপঞ্জী □
জে. জে. নারজারি। আর. শিবকুমার ৩৪১ পরিশিষ্ট □ ৩৫৭

বাঁকুড়ার যুগীপাড়াব এই সেই বাড়ী যেখানে জন্মেছিলেন রামকিঙ্কর
বাড়ীর দাওয়ায বসে প্রতিকৃতি আঁকছেন তিনি

## চিত্রসূচী

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪১), সিমেন্ট, ৬৮ সে মি
২. রেমিনিস্‌ন্‌স্ (১৯৪৯), এচিং
৩. ডাণ্ডি মার্চ (১৯৪৮), ব্রোঞ্জ, ৪৮ সে মি
৪. মাই পেট অ্যানিম্‌ল্ (১৯৬৮', স্কেচ, ১২×১৭ সে মি সৌজন্য : কে. কে. জালান
ক. ঘরের পথে ১৯৭৮), রামকিঙ্করের আঁকা শেষ জলরঙের ছবি, ৩৩×২৩ সে মি সৌজন্য : দিবাকর বেইজ
খ—১. ১৫ পৃষ্ঠা : নিজস্ব প্রতিকৃতি, স্কেচ, ২৪×২৩ সে মি সৌজন্য : কে. কে. জালান
খ—২. ১৫ পৃষ্ঠা : রামকিঙ্করের পাণ্ডুলিপির অংশ
৫. ২৬ পৃষ্ঠা : কার্তিক (১৯৭৭), স্কেচ ১৪.২×২১ সে মি সৌজন্য : দিবাকর বেইজ
৬. ৭৬ পৃষ্ঠা : মিথুন (১৯৫৩), কোনারক স্কেচ, ১১×২১ সে মি সৌজন্য : সতীন্দ্র ভৌমিক
গ. ১৫১ পৃষ্ঠা : ন্যুড স্টাডি—১ (১৯৫১), স্কেচ ৩২×১২ সে মি
ঘ. ১৫৪ পৃষ্ঠা : ন্যুড স্টাডি—২ (১৯৫১), স্কেচ ৯.৫×৩১ সে মি
ঙ. ১৫৯ পৃষ্ঠা : ন্যুড স্টাডি—৩ (১৯৫১), স্কেচ ১৯×৩২ সে মি
চ. ১৬৬ পৃষ্ঠা : এ স্ট্যাণ্ডিং লেডি স্কেচ, ১৭×২১ সে মি
৮. ম্যান এ্যাণ্ড হর্স (১৯৬০), প্লাস্টার, ৩৩ সে মি সংগ্রহ : ন্যাশনাল গ্যালারী, দিল্লী
৯. ফেস্টিভ ঈভ্ (১৯৬৬), তৈলচিত্র ( ক্যানভাস ), ৮৭×৭১ সে মি সংগ্রহ : ন্যাশনাল গ্যালারী, দিল্লী
১০. রানিং বাফেলো (১৯৪৮), জলরঙ, ২৩×৩৩ সে মি সংগ্রহ ঃ ন্যাশনাল গ্যালারী, দিল্লী
১১. কম্পোজিশন্ ( ১৯৬৮ ? ), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ : ন্যাশনাল গ্যালারী, দিল্লী
১২. কলের বাঁশি—১ (১৯৫৫ ?), খসড়া স্কেচ, ১৯×১৪ সে মি
১৩. কলের বাঁশি—২ (১৯৫৫ ?), খসড়া স্কেচ, ১৫×১৩.৮ সে মি
১৪. কলের বাঁশি—৩ (১৯৫৫—৬৬), ডাইরেক্ট কংক্রীট
১৫. লালন ফকির ( ১৯৬৫ ), নাট্যঘরের সিমেন্ট রিলিফ 'লালন ফকির'-এর জন্য করা খসড়া স্কেচ, ১৪×১৯ সে মি
১৬. পোয়েটস্ হেড (১৯৩৮), প্লাস্টার
১৭. হার্ভেস্টিং ( ৫০-এর দশক ), এচিং, ১০×১৪.৫ সেমি

## আলোকচিত্র

১. সৃষ্টিমগ্ন রামকিংকর। ফটো : অজ্ঞাত সৌজন্য : শিবপ্রসাদ বেইজ
২. জন্মভিটে ও রামকিংকর। ফটো : রণজিৎ মিশ্র সৌজন্য : বাসুদেব চন্দ্র
৩. দিবাকর বেইজ ( পৃষ্ঠা : ৭৭ ), ফটো : আর. শিবকুমার
৪. উনিশ বছরের রামকিংকর ও তাঁর দুই বাল্যবন্ধু ( পৃষ্ঠা : ৮৯ )। ফটো : অজ্ঞাত, সৌজন্য : শ্বেতবরণী নন্দী
৫. পরিণত বয়সে রামকিংকর ও তাঁর দুই বাল্যবন্ধু ( পৃষ্ঠা : ৯০)। ফটো : অজ্ঞাত, সৌজন্য : বাসুদেব চন্দ্র
৬. সহকারী বাগাল রায় ( পৃষ্ঠা : ১৩২ )। ফটো : প্রভাস দাস
৭. রামকিংকর কৃত ভাস্কর্য হাতে সঙ্গীণি রাধারাণী ( পৃষ্ঠা : ১৪৬ )। ফটো : প্রভাস দাস
৮. সম্পাদকের মুখোমুখি রাধারাণী ( পৃষ্ঠা : ১৪৬ )। ফটো : প্রভাস দাস
৯. রামকিংকর ( পৃষ্ঠা : ২৯৯ )। ফটো : অজ্ঞাত সৌজন্য : শিবপ্রসাদ বেইজ

# ভূ মি কা

'স্বকাল' নামের একটি ছোট কাগজের শিল্পসংখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একবার। ঐ সংখ্যায় রামকিঙ্কর বেইজের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশের তাড়নায় ১৯৭৭ সালের অক্টোবরের এক হিমমাখা সকালে হঠাৎই পৌঁছাই তৎকালীন তাঁর শান্তিনিকেতনের এন্ড্রুজপল্লীর ২০ নাম্বারের বাসায়। রামকিঙ্করের সঙ্গে আমার মুখোমুখি সাক্ষাৎ সেই প্রথম। একজন বড় মাপের বুক খোলা মানুষ ও শিল্পীকে দেখার লোভে যদিও বারকয়েক গেছি এরপর। তখন সে বড় সুখের সময় ছিল না তাঁর। নানান রোগভোগে ক্লান্তি আর অবসাদ এসে চেটেপুটে খাচ্ছিল তাঁকে। সেই সময়ে তাঁর সেই বুক কাঁপানো ঝরনার মতো উচ্ছল হাঃ...হাঃ...হাসি শুনতে পাইনি। ১৯৭৭ সালের অক্টোবরের ১১ তারিখে দেখে এসেছিলাম বাঁধনছেঁড়া এই মানুষটি বন্দী হয়ে আছেন ইঁটের তৈরী হলুদ রঙের একটি খাঁচায়। সেই খাঁচার চারপাশে একটাও ছবি বা মূর্তি দেখতে পাইনি। ছারপোকা বিছানো মলিন চাদরে ঢাকা অতি সাধারণ চারপেয়ে তক্তাপোশের উপর শুয়ে-বসে থাকতে দেখেছিলাম তাঁকে। চারপাশে ছড়ানো অজস্র বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, থুতু-কফ আর তক্তার নীচে অসমাপ্ত তাঁর সেই অমৃতসুধার বোতল। চারিদিকে অজস্র মলিনতার ভেতর কেবল জেগে ছিল ঈশ্বরের মতো অসম্ভব উজ্জ্বল দুটি চোখ। যে চোখ আজও আমার ভেতরে এসে হানা দেয় মাঝে-মাঝে। সাক্ষাৎকার নেবার ফাঁকে-ফাঁকে 'আমি চঞ্চল হে / আমি সুদূরের পিয়াসী' কিংবা 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই...' এইসব রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতে শোনাতে কিংবা শুনতে শুনতে সেই ঈশ্বরপ্রতিম চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে দেখেছি জল।

১৯৮০ সাল। পরিণত বয়সেও দেবতা হতে না পারা রামকিঙ্কর নামের একজন চলে গেলেন এখান থেকে। ১৯৮৫ সালে তাঁর ৭০—৮০টি ছবির প্রদর্শনী এবং একটি আলোচনা সভার আয়োজন করি সুদূর মফঃস্বল পানাগড়ে। রামকিঙ্কর ও তাঁর ছবিকে ভালোবেসে এসময়ের ৮/৯ জন প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী এবং বহু শিল্পরসিকেরা এসে হাজির হয়েছিলেন এখানে। আজকের এই প্রচারসর্বস্ব সময়ে প্রচারের অভাবে সুদূর মফঃস্বল পানাগড়ের মতো একটি জায়গায় এই ধরনের প্রচেষ্টা অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছিল অনেকেরই।

পাঠক ভুল বুঝবেন না। রামকিঙ্করের আলোকে নিজেকে আলোকিত করতে চাইছি না মোটেই। 'রামকিঙ্কর' নামের এই বইটি প্রকাশে একটা যে দীর্ঘ যোগ ছিল এটাই বোঝাতে চেয়েছি। কিন্তু কেনইবা তাঁকে নিয়েই এই বই? আপাদমস্তক শিল্পের দিকে ধাবিত টানটান মেরুদণ্ডের নিঃশঙ্ক এই শিল্পী-মানুষের জীবনবোধ ও শিল্পবোধই আমার মতো একজন অতিসাধারণ শিল্পপ্রেমীকে হাজারো আর্থিক অনটনের মধ্যেও অন্ধকারের ভেতর দেখিয়েছে আলো। কারণ এই একজনই

'রাম' ছিলেন যিনি 'কিঙ্কর' হয়ে যাননি কখনোই। 'কিঙ্কর' হয়ে যাননি কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঃ চাহিদার যোগানদারী করেন না সত্যিকারের শিল্পী নামের কোন একজন। কারো আজ্ঞাবহ দাসও নন তিনি। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত নন কোন শিল্পী। কারণ চলার পথের দিকে চেয়েই শ্রমসাধ্য *দীর্ঘপথ হেঁটে চলেছেন অবিরাম। থেমে না থাকা এই শিল্পীর দীর্ঘদিনের চাঁচিত জীবন তথা শিল্পবোধ থেকে শিল্পীর চিরকালীন স্বাধীনতার কথাই প্রতিধ্বনি* নিয়ে উঠে এসেছে বারংবার। তাঁর এই চাঁচিত জীবন যা আরো অনেক বেশী করে নিয়ে যায় তাঁর শিল্পসৃষ্টির কাছে। যেখানে তাঁর সৃষ্টির সামনে দাঁড়ালে তারাই বলে দেয় শিল্পী মানুষটি কেমন। যেখানে ব্যক্তিজীবন আর শিল্পীজীবন মিলেমিশে একাকার হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠতে হয়। আমাদের চেনা শিল্পীমহলে এমন সাযুজ্য বড়ই দুর্লভ।

ভারতবর্ষ তথা এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় শিল্পীর উপর যেহেতু এই বই সেহেতু অনেকেই সাহায্য করবেন একাজে—এই ভেবে বইটির কাজ গোড়ায় যে উৎসাহ উদ্দীপনায় আরম্ভ করা গেছিল—কাজ কিছুদূর এগোবার পর সেই অমল অভিজ্ঞতা ক্রমশ পাল্টে যেতে থাকে। বুঝতে পারি তত সহজসাধ্য নয় একাজ। প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাব একটা বিরাট বাধা তো বটেই, সুদূর মফঃস্বল পানা-গড়ের মতো জায়গায় বসে একাজ করা কষ্টসাধ্য তো বটেই, সেইসঙ্গে যোগ্য-যোগ্যতর মানুষদের কাছে লেখা চেয়ে বার-বার চিঠি লিখে, নিরাশ হয়ে শারীরিক-আর্থিক ক্লেশ সহ্য করে ছুটে গেছি কখনো বাঁকুড়া, কখনো শান্তিনিকেতন, কখনোবা কলকাতায়। নিরাশ হয়েই ফিরে এসেছি বারংবার। এভাবেই কাজ এগিয়েছে। গতি মন্থর হয়েছে। কিন্তু থেমে যায়নি।

কোনরকম আর্থিক লাভক্ষতির কথা মাথায় না এনেই যে রামকিঙ্কর চেয়ে-ছিলেন তাঁর অমূল্য শিল্পসৃষ্টিগুলি কোন শৌখীন শিল্পরসিকের দামী শো-কেসে বন্দী স্ট্যাটাস সিম্বল না হয়েশান্তিনিকেতনের খোলা মাঠে—হাওয়ায়—নীল আকাশের নীচে এই মর্তোরই ধুলোমাটি মাখা মানুষের সঙ্গী হয়ে—বন্ধু হয়ে ছুটে চলুক তাদের সাথে। রামকিঙ্করের সারাজীবনের সাধনার তীর্থস্থান শান্তিনিকেতনেই তাঁর তৈরী এই শতাব্দীর অন্যতম ভাস্কর্যগুলির আসল চরিত্রকে না বুঝেই, অন্য কোনভাবে এগুলিকে সংরক্ষণ করা যায় কিনা সেকথা না ভেবেই তড়িঘড়ি এগুলির মাথায় ছাদ তুলে দিয়ে ভাস্কর্যগুলির জীবন থেকে ছেটে ফেলা হয়েছে নীল আকাশের প্রশান্তি। আর সাধারণের থেকে দূরত্ব রচনা করে তারের তৈরী খাঁচায় বেঁধে, মেরে ফেলা হয়েছে সমস্ত মলিনতার বিরুদ্ধে ছুটে চলা ঐ অনুপম ভাস্কর্যগুলির উদ্দাম জীবনের গতি। কলাভবনের খুব কাছে-পিঠেই কালোবাড়ী বা ব্ল্যাক হাউস নামক বিখ্যাত মাটির বাড়ীটির দেয়ালে করা রামকিঙ্করের একেবারে প্রথম যৌবনের বিশিষ্ট ভাস্কর্যগুলির অন্যতম মাদল বাজানো সাঁওতাল পুরুষটির মাথা আজ যে কোথায় হারিয়ে গেছে বলতে পারেন না এখানকার কেউই। রামকিঙ্করের বহুদিনের আর বহু সাধের বাসগৃহ রতনপল্লীর তাঁর সেই মাটির বাড়ীর আঙিনায় করা কংক্রীটের

'স্পীড এ্যাণ্ড গ্রাভিটি' নামক বিখ্যাত ভাস্কর্যটিও আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। শ্যাওলা আর ফাটলে সারা শরীর ভরে গেছে 'হার্ভেস্টার' বা 'ধানঝাড়া' নামের ভাস্কর্যটির। বস্তুত শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠে, খোলা আকাশের নীচে করা রামকিঙ্করের তৈরী সমস্ত ভাস্কর্যগুলিই আজ নিদারুণ উদাসীনতার স্বীকার। এই উদাসীনতার কাছে লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে আসে আমাদের। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর হাতে তৈরী কলাভবন ভারতবর্ষের সৃষ্টিশীল শিল্পকলার পথ প্রদর্শক হয়ে উঠুক। চেয়েছিলেন এই উপগ্রহের শিল্পমনস্ক মানুষেরা এসে শিল্পসৃষ্টির উত্তাপ গ্রহণ করুক এখান থেকে। চেয়েছিলেন রামকিঙ্করের হাতে তৈরী ভাস্কর্যমালায় ভরে উঠুক এখানকার বুক খোলা মাঠগুলি। এই কলাভবন থেকেই অল্প কয়েক হাত দূরে 'কলের বাঁশী' নামক রামকিঙ্করের তৈরী এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যটিও ভেঙে-ফেটে চৌচির হয়ে কয়েক টুকরো বাঁশের আগায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। এই ভেঙে-ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া ভাস্কর্যটির নাকের ডগায় চলছে শিল্পকলার পঠনপাঠন।

মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে বাঁধা সড়কের বিপরীতে মাথা উঁচু করে হেঁটে যাওয়া যে রামকিঙ্কর শিল্পসৃষ্টির উচ্চণ্ড দহনেই পুড়েছেন সারাজীবন আর অগ্নির মতো সমস্ত কিছুকেই দহন করেছেন, শিল্পসৃষ্টি ছাড়া আর সমস্তকিছুই যাঁর কাছে ছিল মিথ্যা, সেই রামকিঙ্কর ব্যবসায়িক স্বার্থে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেন ভাবতে লজ্জা হয় আমাদের। হায়! রামকিঙ্কর, আপনি ভারতবর্ষ নামক এমন একটি পোড়াদেশে জন্মেছিলেন যেখানে আপনার জীবনের সৃষ্টিশীল উদ্দাম সময়টুকু অবহেলা ও অবজ্ঞায় কেটে যাবার পর ব্যবসার কাটতি কাঁচামালে পরিণত হয়েছেন আজ। কিন্তু এই ব্যবসার বিরুদ্ধেই সারাজীবনের স্ব-ঘোষিত যুদ্ধ ছিল আপনার। কারণ 'আর্ট বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়'—বলেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন আজীবন।

বাঁকুড়া থেকে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত মানুষ ও শিল্পী রামকিঙ্করের বেড়ে ওঠার মূল স্রোতটিকে তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। যেখান থেকে রামকিঙ্করের সামগ্রিক একটা পরিচয় পরিষ্কার হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

এই গ্রন্থের সমস্ত লেখাই পরিকল্পনামাফিক। সুতরাং লেখকের বয়সের থেকে বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েকটি লেখা পুনর্মুদ্রিত। এগুলির কয়েকটি 'রামকিঙ্কর বিষয়ক রচনাপঞ্জী' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরও কয়েকটি লেখা উল্লেখ করা হল। যেমন 'আমার কথা' এবং 'মাস্টারমশাই' নামক রামকিঙ্করের রচনা দুটির প্রথমটি 'মনে পড়ে' এবং দ্বিতীয়টি ঐ একই শিরোনামেই 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। 'একটি ছদ্মবেশী কুহেলিকা' নামক রামকিঙ্করের রচনার মূল পাণ্ডুলিপিটি সৌম্যেন অধিকারীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। পাঁচটি সাক্ষাৎকার যথাক্রমে 'সপ্তাহ' (১৯৭৪), অন্যমনে (১৯৭২), সুন্দরম (১৯৬২) আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯৭৫), অমৃত (১৯৭৯) পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। সমস্ত

হয়েছে। 'অন্যমনে' পত্রিকার সাক্ষাৎকারটি কে নিয়েছিলেন তার কোন খোঁজ পাওয়া না যাওয়ায় এ গ্রন্থে উল্লেখ করা সম্ভব হল না। শিল্প ও নিজের সম্পর্কে রামকিঙ্করের নানান মূল্যবান মন্তব্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ইংরাজী-বাংলা নানান পত্রপত্রিকায়। সেগুলিকে একত্র করে তৈরী হয়েছে 'শিল্প ও নিজের সম্পর্কে আরো কিছু' নামক রামকিঙ্করের সংকলিত উক্তিগুলি।

রামকিঙ্করের বাঁকুড়ার শৈশব ও কৈশোর জীবনের লিখিত কোন নথি পাওয়া যায় না আদৌ। সম্পাদকের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ, রামকিঙ্করের প্রায় সমসাময়িক কয়েক-জনের সঙ্গে কথোপকথন এবং '৮৪ সালে 'বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি' পত্রিকায় প্রকাশিত শৈলেন দাস-এর লেখা 'বাল্য ও কৈশোর জীবনে রামকিঙ্কর' নামক প্রবন্ধটির অল্প কিছু সাহায্য নিয়েই তৈরী হয়েছে 'রামকিঙ্কর' শিরোনামে তাঁর বাঁকুড়া পর্যায়ের (১৯০৬—'২৪) জীবনী ও জীবনবিষয়ক রচনাটি। সব মিলিয়ে এখান থেকে রামকিঙ্করের বাঁকুড়ার শৈশব ও কৈশোর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় ও কাজের মূল-স্রোতটি সামগ্রিক উঠে আসবে আশা করা যায়।

কলাভবনের পুরানো নথিপত্র, সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, ছাত্র-শিক্ষক ও রাম-কিঙ্কর অনুরাগীদের সাহায্য নিয়ে রামকিঙ্করের শান্তিনিকেতন পর্বের জীবনপঞ্জীটি সম্পূর্ণ হয়েছে। অল্প ঘটনা দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। 'রামকিঙ্কর বিষয়ক রচনাপঞ্জী'টিতেও কোন লেখা তালিকার বাইরে থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অনেকের সাহায্য নিয়েই গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব হল। খ্যাতনামা শিল্পী গণেশ হালুই, অধ্যাপক আর. শিবকুমার, রামকিঙ্করের ভাইপো দিবাকর বেইজ, অগ্রজ কবি মৃণাল দত্ত, সৌম্যেন অধিকারী, তরুণ শিল্পী কমল সাহা নানান সমস্যার সমাধানে বার-বার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এঁদের সকলের প্রতি শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানানো ধৃষ্টতা মাত্র। তরুণ কবি ও শিল্পী বন্ধু শ্যামলবরণ সাহা, মলয়চন্দন সাহা, অবাল্য বন্ধু রথীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ দত্ত, আমার অগ্রজ মনোজ দাস, বিকাশ দাস এবং আরো অনেকেরই সহযোগিতা ও উদ্দীপনাকে শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানানো যায় না।

সম্পাদকের বাসস্থান থেকে দেড়'শ কিলোমিটারেরও বেশী দূরে দীর্ঘ এক বছরেরও অধিককাল এই গ্রন্থ মুদ্রণের কাজ চলেও শেষ পর্যন্ত কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এই গ্রন্থ থেকে যদি একজনও রামকিঙ্কর ও তাঁর শিল্পসম্পর্কে আগ্রহী হন তাহলে ধরে নেব আমার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম কিছুটা সার্থক হয়েছে।

| | |
|---|---|
| পানাগড় | **প্রকাশ দাস** |
| বর্ধমান | ২০।২।৮৯ |

# রামকিঙ্করের রচনা

## আমার কথা

পাড়ার একজন বয়সে বড় কলেজে পড়তেন। সংগৃহীত একটি র‍্যাফেলের ম্যাডোনার ছবি এনে বলেছিলেন, 'এটা কপি কর, কিছু শিখতে পারবে।' আমি নিয়েছিলুম। এই সময়টাতে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় বাবাকে রামায়ণ পড়ে শোনাতে হত। বনবাস অধ্যায়ে সীতার দুঃখ মনে ভীষণভাবে ধাক্কা দিল। র‍্যাফেলের ম্যাডোনার ছবি না এঁকে সীতার কোলে লব ও কুশের ছবি আঁকলেম। সীতার পরনে গেরুয়া রংয়ের কাপড়। ভদ্রলোকটি দেখতে চাইলেন—আমি বললাম, 'ম্যাডোনা না করে আপাততঃ সীতার বনবাসের ছবি করলেম। ম্যাডোনা পরে করব—দেখুন।' তিনি মূল্য বুঝলেন না। ক্ষুব্ধ হলেন—বললেন, 'আমি ম্যাডোনা আঁকতে বলেছিলাম—এটা আবার কী! দাও দাও।' ছবিটি ফেরত নিয়ে গেলেন। সীতার ছবিখানা একজন বন্ধু ভারতবর্ষে ছাপিয়েছিলেন। কিছু অর্থও পেয়েছিলাম, ছবিটি তাঁরই হাতে রয়ে গেল।

তারপর নন-কোঅপারেশনের পালা—স্কুল কলেজ সব বন্ধ হল। একজন হিতৈষী প্রফেসর ধরে নিয়ে গিয়ে ন্যাশনাল স্কুলে নাম লেখালেন এবং কংগ্রেসের কাজও শুরু হল। কংগ্রেসের পরিচালক ছিলেন অনিলবরণ রায় মহাশয়। তিনি আমাকে চরখা বিতরণে কাজ না দিয়ে লেখাজোখা এবং প্রসেশনের জন্য লিডারদের ছবি আঁকার কাজ দিতেন। সেগুলি তেলের রং দিয়ে আঁকতেম বড় ক্যানভাসে।

এই সময়ে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু বাঁকুড়ায় গেছলেন। আমার একজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদেরই পাড়ার মানুষ। বহুদিন তিনি বাঁকুড়ায় যান নাই। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ হয় নাই। আমার ছবিগুলি দেখলেন। বললেন, 'তুমি শান্তিনিকেতনে চলে এসো। লিখে জানাব।' চিঠি পেয়েই রওনা হলাম। ১৯২৫ সালে আচার্য নন্দ বসু মহাশয় তখন কলাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি আমার তেলের এবং অন্যান্য ছবিগুলি দেখলেন—বললেন, 'এই ত হয়ে গেছে। আর কেন?' পরে ভেবে বললেন, 'আচ্ছা ২/৩ বছর থাকো।'

আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত ক্ষীণ, এই ক্ষেত্রে নন্দবাবু আমাকে বাঁচিয়ে-ছিলেন। শ্রদ্ধেয় জগদানন্দ রায় মহাশয়ের রচনা—ছেলেদের জন্য বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক লিখতেন—তার জন্য Illustration গুলি এখানেই করা হত। কিছু

কিছু Illustration-এর ভার থাকতো মণিভূষণ গুপ্তের উপর। তিনি আমাকেও কিছু অলংকরণের ভার দিলেন। সেইটেই আমার পক্ষে সেই মাসের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল। সেই বৎসরই আমি কিছু ছবি এঁকেছিলাম এবং বিক্রীও হয়েছিল। তখন আচার্য অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে আর্ট সোসাইটি নামে একটি কলেজ করা হয়েছিল। সেখানে গভঃ আর্ট একাডেমির মত বিলাতী ফ্যাশানের শিক্ষা হত না। ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার করার প্রয়াসে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল অন্য রাস্তায়। সোসাইটি থেকে প্রদর্শনীতে ছবি যেতো—আমারও বিক্রী হতো।

হ্যাভেলের অধ্যক্ষতার সময়ে নন্দবাবু ছিলেন। থার্ড ইয়ারে পড়তেন। হ্যাভেল বাতিল মূর্তি ও ছবিগুলি পুকুরে ফেলে দিতেন—রাজেন মল্লিক সেগুলি সংগ্রহ করে একটা মিউজিয়াম গড়ে তুলেছেন।

একটা গল্প—সিঁড়ির দুধারে ভারতীয় মূর্তি সাজানো থাকতো। একদিন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন। আর একটা ছেলে নামছিল। তিনি লক্ষ করলেন, ছেলেটি একটি মূর্তির মাথা ভেঙে পকেটে পুরলো। ছেলেটি নেমে আসছে। তিনি খপ করে ছেলেটির হাত ধরে বললেন, 'কি নিলে দেখি'—বেরিয়ে পড়লো পকেট থেকে সেই মূর্তির মাথা। তাকে উপরে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'তুমি বললে আমি দিয়ে দিতাম কিন্তু ভাঙলে কেন?' ছেলেটিকে কলেজ থেকে একসপেল করা হয়েছিল।

আচার্য নন্দলাল বসু মহাশয় কলকাতার আর্ট সোসাইটিতেই ছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে একরকম বিশেষ অনুরোধ করেই শান্তিনিকেতনে আনার ব্যবস্থা করেন।

এখানে প্রাচ্য প্রথায় জল রংয়ের ব্যবহার ছিল। আমিও শুরু করি—অনেকগুলি এঁকেছিলাম এবং এক্জিবিশনে বিক্রীও হয়েছিল—কে কিনেছিলেন কোন পাত্তা নাই। ২/৩ বছর পর পুরানো অভ্যাসটি ফিরে এলো; তেলের রংয়ের কাজ এখনো চলেছে।

এই সময়টাতে সোমা যোশী, স্বপ্নময়ী এবং অন্যান্য প্রতিকৃতি জাতীয় Model. আবার একটা পুরানো অভ্যাসের অবতারণা—মাটির কাজ শুরু—প্রথমে বিনোদবাবুর প্রতিকৃতি, তারপর সৈয়দ মুজতাবা, কৃষ্ণকৃপালনী, ওস্তাদ আলাউদ্দিন—এই কাজটি বর্তমানেও দেখা যায় সঙ্গীত একাডেমি দিল্লীতে রক্ষিত। এ সময়টাতে আমার স্টুডিও বলতে পুরানো লাইব্রেরীর তোরণ নামে ছোট দোতালাটির ওপরতালায়। তখনকার প্রথম মূর্তি শিল্প শেখার জন্য একজন ছেলে, নাম ছিল বুদ্রাপ্পা হাল্জি, তাঁর কীর্তি অনেক ছিল। কালো হোস্টেলের ভিতরের বারাণ্ডায় শিবের বিয়ের প্যানেলগুলি গরমের ছুটিতে মূর্তি শিল্পের ছাত্র যারা তাদের দিয়ে করা হয়েছিল। বুদ্রাপ্পা বুদ্ধ মূর্তি করেছিলেন একেবারে নীচু ৪ ইঞ্চি। উঁচু ৫ ফুট গোবর মাটি আলকাতরা মিশানো মাটি দিয়ে তৈরী।

বাইরে রাখার কাজ গোবর মাটি দিয়ে ছেলেমানুষি। হাসলেম। আমার ইচ্ছা

হল সিমেন্ট মরামের কাজ করার। আচার্যদেব প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে ব্যবস্থা করলেন। তখন আমার জীবন্ত মানুষের নেশা। জয়া নামে একটি সুন্দরী model নিয়ে ৮/৯ ফুট একটি ছাত্রী-হাতে আসন। পরে আচার্যদেব মাথায় একটি বাটি বসিয়ে দিয়ে সুজাতা নাম দেওয়া হল। সামনেই রুদ্রাপ্পার বুদ্ধ দেবের মূর্তিটি পায়সান্নের জন্য প্রতীক্ষায়। এই গল্প আর কি।

তখনো বিশ্বভারতী আমার ভাতের কোন ব্যবস্থা করে নাই। অবৈতনিক আচার্যদেব ১০০ টাকা পেতেন শুনেছিলাম। আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, একটা কোন চাকুরীর প্রয়োজন। একটা খবর পেলাম দিল্লীতে Modern School-এ, বন্ধু বনবিহারীর নামে। দেখলাম বন্ধু অন্য ভাল কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সেই বিকেলেই দিল্লী রওনা হয়ে গেলাম। Modern Schoolটি High School—দিল্লীর কাজটি ৬ মাসের জন্য। কাজ ত নিলাম। আমি ত এ কাজের মানুষ নই। তখন ওদের নোতুন স্কুল-বাড়ী তৈরী হচ্ছিল। চুন ভাল, সুরকিও ভাল দেখে আমার ইচ্ছা সময়টা কাটাবার ভাল উপায় চাই। প্রিন্সিপালও খুব খুশি—একটি সরস্বতীর মূর্তি শুরু করে দিলেম—প্যানেলটি ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি উঁচু। তখনো ৬ মাস শেষ হয় নাই, ছুটি নিলেম। ১০০ টাকা বকশিস দিয়েছিলেন। বাড়ী ফেরবার টাকার জোগাড় হয়ে গেল। একেবারে সোজা শান্তিনিকেতনের টিকিট।

দিল্লীতে আমি দেড়শ টাকা পেয়েচি দেখে আচার্য মহাশয় খুব খুশি। বিনায়ক মাসোজী তখন শ্রীনিকেতনে কাজ করতেন ৭৫ টাকা মাসোহারায়। আমেদাবাদে সারাভাইদের একটি কমিশনে কাজ পেয়ে শ্রীনিকেতনের কাজে ইস্তফা দিলেন। বিনোদবাবু লাইব্রেরীর জন্য কিছু অর্থ পেতেন। শ্রীনিকেতন হতে মাসোজীর দরুণ ৭৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা ভাগ করে দুজনের ব্যবস্থা করা হয়। সেইদিন হতে আমিও একজন বেতনভোগী বিশ্বভারতীর ভৃত্যভুক্ত হলেম।

তিনটি বড় জানলা দেওয়া একটি স্টুডিও করার কাজ চলেছিল—সেখানেই আমার কাজের জায়গা ঠিক হল।

প্রথমেই আমার চোখে পড়লো দিল্লী যাবার আগে তোরণের স্টুডিওতে কাজ করার সময় একটি সাঁওতাল দম্পতির ২২ ইঞ্চি মতন মাটি দিয়ে মূর্তি করেছিলাম। খাবার অভাবের দিনে সব ভুলেই গেছলেম। আচার্য মহাশয় সেটি যত্ন করে রেখেচেন, ভাঙ্গা পড়েছিল—সুতা দিয়ে বেঁধে বেঁধে। দেখে আমার অপার আনন্দ হল—সেইটিকে বড় করে করার ইচ্ছা হল। আচার্যদেব সবরকম আয়োজনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

মূর্তিটির ১৩/১৪ ফুট উচ্চতা হবে। সামনে একটা তাঁবু খাটানো হয়েছিল—কাশীনাথ আর বাগাল দুজন মসলার কাজে থাকতো।

স্কুলের কাজ শেষ হলে পর আচার্যদেব, বিনোদবাবু, আমি তিনজন বসে লাল চা, মানে দুধবিহীন নেবু কাটা—পান করা হত। আচার্য একদিন বলেছিলেন—মূর্তি

হচ্ছে একটি স্রোতের ধারে ঘূর্ণির মতন—ঘুরে আর ঘুরে শেষ হচ্চেই না, দেখতে দেখতে আর একটা বড় স্রোত এসে পুরানো ঘূর্ণি ভেঙে আর একটা ঘূর্ণি সুরু করে। এমনি সব গল্প হত।

আমি বলেছিলাম, তিনি সবই জানেন। অজন্তার ছবিতে শারীরিক সূক্ষ্ম চেতনার স্বাদ কোত্থেকে এল যদি না জীবন্ত মানুষের স্বাদ পাওয়া যায়। তাঁরই ছবিতে সাঁওতালের নাচের যেমন সাঁওতাল মেয়েটির অবয়ব পুরুষের তুলনায় অনেক সত্য কেন ?

অজন্তা বাঘ ফ্রেস্কোর সঙ্গে ভারতীয় অনার্য জাতির শৈলীর বহু মিল আছে, সেগুলি তাদের কাজের ধারা দেখলে কিছু বোঝা যায়। অজন্তার পদ্মপানি বুদ্ধ ও বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গ—তাতে বলিষ্ঠ গঠন। বুদ্ধগয়ার সহজাসনের বুদ্ধ আর যাই হোক গান্ধার বুদ্ধ মূর্তি নয়।

বাঘের হস্তির আকৃতি এবং নারী মূর্তির গঠন অজন্তার সঙ্গে এবং আওরঙ্গাবাদের মূর্তির।

আর্য-পূর্ব অনার্যদের শিল্প দেশীয় ষাঁড় হরপ্পার অন্যান্য জানোয়ার……।

একদিন আচার্য হাসতে হাসতে আমাকে বললেন—'দেখ কি ফ্যাসাদ তুমি করেচ।' বললেম, 'কি ব্যাপার?' 'একজন মেমসাহেব এসেছিলেন, তাঁকে নিয়ে ঘুরতে হল। ঘুরে ঘুরে তিনি এসে তোমার সাঁওতাল মূর্তির সামনে দাঁড়াচ্চেন আর নড়তে চাইচেন না। আমি খালি চলে যাবার চেষ্টা করচি। ব্যাপার হল, কাশী কিম্বা এদের মধ্যে কেউ সাঁওতালীর পেটের নীচে Vagina করে রেখেচে যাবার আগে। এইটাই ব্যাপার।'

লোকে বলে, সাঁওতাল কি আর আর্ট বোঝে ? কথাটা ঠিক নয়। একদিনের কথা বলি। একজন মাঝি দেখি, খুব মন দিয়ে দেখচে। কখনো বহু দূরে চলে যাচ্চে, আবার কাছে আসচে। চারদিক ঘুরচে যেটা সকলে সাধারণত করে না। আমি ভারাতে কাজ করছিলাম। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী করচিস বাবু ?' আমি বললেম, 'এই তোদের মতন একটি মাঝি করার চেষ্টা করচি।'—'লোকটি হেসে বলল, 'হাঁ, খেতাবটা মাঝি বটে কিন্তু হইচে দেবতা।' এ মন্তব্যটি আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছিল।

এই সময়টাতে রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ নাটকটির প্রথম মহড়া চলছিল।

একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। আচার্য বসু মহাশয়ের উপদেশ ছিল : কলাভবনে ছবির বইয়ের অনেকগুলি আলমারী থাকতো, সে সব ভালো করে দেখতে বলতেন—তাছাড়া হ্যাভেলের লেখা বইগুলি পড়বার জন্য নিয়মিতভাবে ইংরাজীর প্রফেসর জাহাঙ্গীর বকিল সাহেবের কাছে পড়তে বলতেন—সে হত সন্ধ্যের সময়। তাছাড়া বড় লাইব্রেরীতে আমার নিজের পছন্দ মতন পড়তেম, ইংরাজী ছাড়া

রুসিয়ার ইংরাজী অনুবাদ।

ইংরাজীর মধ্যে তখনকার সময় বারনার্ড শ'র বইগুলি আমার বেশী পছন্দ হত। Preface সহ Parents and Children, Man and Superman পকেটে Dictionaryটি নিয়ে বৈতালিকের আগে বিনয় ভবনের ওখানে শালবনে নাটকীয়-ভাবে চিৎকার করে পড়ার ব্যাপার চলতো। কোন লোক একদিন সুরুল রাস্তা হতে শুনে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন—বুঝি আমি কারও সঙ্গে ঝগড়া করচি। নাটকীয়ভাবে কিনা।

ফিরে গিয়ে খাবার খেয়ে Class-এর কাজ শুরু করতাম। এ অভ্যাসটি বহুদিন করেছিলাম—সেজন্যই পরে নাটক করার বাই গড়ে উঠেছিল এবং গুরুদেবের রক্তকরবী পর্যন্ত অনেকগুলি নাটকের অভিনয়ের রিহার্স করেছিলাম। প্রথম নাটক 'মুক্তধারা' হতে শেষ 'রক্তকরবী'তে নিজেরও Part ছিল। ইংরাজী নাটক Poetasters of Isphan এটি চারবার অভিনীত হয়েছে।

## মাস্টারমশাই*

তখন নন্-কোঅপারেশনের সময়—ইংরেজি ১৯২৫ সাল। গভর্নমেন্টের ইস্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। খোলা হয়েছে ন্যাশনাল ইস্কুল। বড়ো বড়ো অধ্যাপকরা সেখানে পড়ান। আমিও সেরকম একটি ইস্কুলের ছাত্র ছিলাম, ঘরে ঘরে চরকা বিতরণের দায়িত্ব আমার ছিল না। আমার যত না ছিল পড়াশুনা তার চাইতে মিছিলের নেতাদের বড়ো করে ছবি আঁকার কাজই বেশী ছিল। কখনোবা উল্লেখ-যোগ্য উদ্ধৃতি ভালো করে লিখে কংগ্রেস অফিসের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিতাম। স্কুলের পত্রিকাতে রঙীন ছবি দেওয়া আমার অন্যতম কাজ ছিল। সেইসময় প্রায় সমস্ত বড়ো নেতারাই বাঁকুড়া গিয়েছিলেন,—বিপিন পাল, সি. আর, দাশ থেকে শুরু করে গান্ধীজি পর্যন্ত।

একজন আমার সহপাঠী বললেন, 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এসেছেন—চলো দেখা করে আসি'। দেখা হল এবং কাজ কিছু দেখলেন। পরের দিন দেখি আমার কুঁড়ে ঘরে স্বয়ং এসে আমাকে ডাকছেন, 'কী করছো দেখি?'—আমি তখনকার কাজ দেখালাম। পরে বললেন, 'আমি আজ চলে যাচ্ছি, তোমাকে চিঠি লিখব—তুমি চলো এসো'। তাঁব এই একটি বিশেষ গুণ ছিল—খুঁজে খুঁজে মানুষকে টেনে বের করে আনা।

এর দু-একদিন পরেই একটি চিঠি পেলাম—কোন রাস্তা এবং কী ট্রেন, ঠিকানা ইত্যাদি। চলে এলেম। এটা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। আমি অবাক! আমি চেয়েছিলাম কলকাতার শিল্পবিদ্যালয়ে যেতে। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে এসে কি হবে? আমার কি কৌপিন পরার পর্বটা এখনও শেষ হয় নি? যাই হোক, তিনি সকালেই আমাকে জেনারেল লাইব্রেরির উপরতলার কলাভবনে নিয়ে গেলেন এবং আচার্য নন্দলালবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন নন্দলালবাবুর শিল্প সম্বন্ধে আমার ধারণা বেশি কিছু ছিল না। যা কিছু প্রবাসীর অ্যালবামে দেখেছি। তাও বেশি নয়। তাছাড়া আমার আসক্তি তখনও ছিল প্রাকৃতিক বাস্তবতামূলক শিল্পের প্রতি। ভারতীয় শিল্প ভালো লাগতো না তা নয়—কিন্তু বাস্তবতার ভিতর দিয়ে না গেলে সেটা সার্থক হবে না এটাই ছিল মূল ধারণা। যার ফলে পরবর্তীকালে

* নন্দলাল বসু

শান্তিনিকেতনে প্রাকৃতিক বাস্তবতার সূচনা হয়েছে। এখনও চলেছে। ছাত্রদের anatomy ও muscle সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

যাই হোক, আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরনে ধুতি। আমার ছবি দেখতে চাইলেন। দেখালাম। বললেন—'তুমি সবই জানো, আবার এখানে কেন ?' একটু ভেবে বললেন, 'আচ্ছা, দু তিন বছর থাকো তো।'

সেই দু-তিন বছর আমার এখনো শেষ হল না, তিনি অন্তর্ধান—আমার ধ্যান এখনো সেই রাস্তায় চলেছে,—রূপের ভিতর অরূপের সন্ধানে।

আমরা যে ক-জন ছাত্র ছিলাম—কম সন্দেহবাদী ছিলাম না আমরা। কিন্তু তাঁর সাহচর্যে এসে দেখলাম, কি অদ্ভুত শিল্পী! আমাদের শ্রদ্ধা ক্রমশই বেড়ে চলল। আমাদের কাজে আমরা অনেক ভেঙেছি গড়েছি, কিন্তু তাঁর কথা বারবার মনে পড়েছে। তাঁর বিচিত্র অবদানের ভিতর দেখেছি শিল্পস্রোত নানাভাবে নানারূপে এসেছে তীব্রভাবে, কিন্তু কখনো স্বাদবিহীন নয়। প্রাচ্য ও ভারতীয় ঐতিহ্য-শিল্পের ভাব যেন তার মজ্জাগত ছিল।

তখন তিনি বরোদার কীর্তি-মন্দিরের জন্য একটি বিরাট মুরাল পেইনটিঙের খসড়া করছিলেন। তাঁর মাথায় ঘুরছিল কোনারকের মহাকালের মূর্তিটি। সেই মূর্তির ভাব, ইঙ্গিত, আকৃতি—সব তাঁকে এত অভিভূত করেছিল যে, নতুন কিছু না করে সেই আকৃতিটিই এঁকে দিয়েছেন। সে সময় আমাকে বলেছিলেন, 'পরের জন্মে আবার যদি শিল্পী হয়েই জন্মাই তবে ভাস্কর্য করব।' কারণ প্রাচ্য-শিল্পের সব কিছু তাঁর কাছে অপূর্বরূপে ধরা পড়েছিল, এবং তাঁর সাধনা ছিল সেই রূপকে সর্বাঙ্গভাবে ধরে রাখার। সেইজন্য অনেক মহলে তাঁর বদনাম ছিল, এখনো আছে। আধুনিকতার আওতায় তাঁকে কখনো অবসাদগ্রস্ত হতে দেখি নি। তখন সেজানের পরবর্তী যুগ চলছে।

শিক্ষক হিসাবে তিনি স্বাধীন চিন্তায় কখনো বাধা সৃষ্টি করতেন না। যেটা যার অভিরুচি, সেটার উৎসাহই দিতেন এবং সেইভাবে নিজেকে ভাবিয়ে তার গলদ, কোথায় স্বাদের অভাব ঘটেছে সেটাই বোঝাতেন। তর্কবিতর্ক অনেক হত। আবার পরমুহূর্তে বন্ধুর মতো ব্যবহার থাকত। সেজন্য আমরা বারবার ঠকেছি তাঁর কাছে।

তখন আমাদের সমস্ত ছবি কলকাতার ওরিয়েণ্টাল সোসাইটিতে প্রদর্শিত হত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার অধিনায়ক ছিলেন। একবার মনে পড়ছে, আমার দু-খানা বড়ো ছবি ছিল, একটি তেল-আঁকা, অন্যটি জলে-আঁকা। আচার্য ছবিগুলি দেখে প্রদর্শনীতে পাঠানো উচিত হবে কিনা সেই সমস্যায় বিচলিত। আধঘণ্টা পরে এসে বললেন, 'ঐগুলিই প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দাও।' তাই হল। অবনীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছিলেন, সুতরাং তাঁর মনে আর কোনো দ্বন্দ্ব রইল না।

আমার কাজে cubism এর প্রভাব এসেছিল। আচার্যদেব প্রথমে বিরূপ

হয়েছিলেন। কিন্তু তর্কাবিতর্কের পর তিনি আর বাধার সৃষ্টি করেন নি। পরে abstraotion. ততদিনে আমার কাজের প্রতি তাঁর একটা আস্থা দেখা দিয়েছিল। এমনকি আমার ছবির সমালোচকদের কাছে আমাকে defend করার চেষ্টা করতেন। তার নিদর্শন শান্তিনিকেতন মন্দিরের কাছে মূর্তিটি।

মণ্ডশিল্পে তাঁর অভিনবত্ব দেখে একদিন আমি অবাক হয়েছিলাম। যুঁই ফুলের কুঁড়ির মালা দিয়ে সমস্ত মঞ্চের আঙ্গিক করা, ভিতর দিয়ে সবকিছু দেখা যায়। তাঁর পরিকল্পিত রবীন্দ্রনাথের নাটকের সমস্ত মঞ্চ ও সাজসজ্জা আমার মনে অদ্ভুত একটি সৌন্দর্যবোধের বেদনা জাগিয়েছে।

মণ্ডনশিল্পের দেশীয় অপূর্বধারা—যেটি অবলুপ্ত ছিল—মাস্টারমশাই, সেটি আবার জাগিয়ে তুলেছেন। আজও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা সেই আদর্শেই চলেছেন।

এই অবহেলিত শিল্প-ঐতিহ্যগুলিকে সংগ্রহ করে আমাদের কলাভবনে একটি ছোটখাটো মিউজিয়ম তিনি স্থাপন করেছেন। গ্রামীণ শিল্পীদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় স্নেহ ও মমতা ছিল।

এই স্বভাবশিল্পী সৌন্দর্যসাধনার ভিতর দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের এমনই প্রকাশ ঘটিয়েছেন যা সকল মানুষকে আকৃষ্ট করত। যে জন্যে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি এঁরা তাঁকে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর হাতে ভার দিয়ে শান্তি পেতেন। গান্ধীজি কংগ্রেস প্রদর্শনীর সমস্ত দায়িত্ব তাঁর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন।

আচার্যদেব শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল তাঁর উপর—তিনি তাঁর কর্তব্য যথাযথ পালন করে গেছেন।

আজ সারা ভারতবর্ষে, এমনকি বিদেশেও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলছেন।

আমাদের আচার্যদেব ছিলেন বিশ্বকর্মার বরপুত্র। তাঁর কাজের ভিতর সত্য ও সুন্দর প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমরা পরম ধন্য হয়েছি।

# একটি ছদ্মবেশী কুহেলিকা

বন্ধুগণ,

আমি একজন, অতি সংকীর্ণ অথচ বিরাট পথের শিল্পী পথিক। সাধনা ছাড়া এ শিল্পের পথে চলা অসম্ভব।

প্রায় সকল সাধনার পথ একই যদিও সাধনার পথই বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ—একটি ছদ্মবেশী কুহেলিকা স্বাধীন মানসিকতাকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে। তাঁদের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় একটি নিরন্তর দুর্ভাবনা থাকে।

আপনারাও দেখছি আমার সঙ্গী—আমি একা নই।

এই পূজাটি যুগে যুগে চলেছে।

মানবতার একটি পাগল উৎকর্ষতা। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

ছেলেবেলা থেকে আমার একটা ইচ্ছা ছিল যেখান দিয়ে যাব রাস্তার ধারে ধারে মূর্ত্তি রচনা করে চলব।

সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, বর্ষণাতুর আকাশের তলায় বড় মূর্ত্তি দেখতে ভালো লাগে।

তার সূচনা শান্তিনিকেতন থেকে সুরু হয়েছে। সামান্য কাজ হয়েছে—এই ব্রতটি রয়ে গেল। মৃত্যু পর্যন্ত আশা করি থাকবে। গরীবের শিল্পী ছেলের কল্পনা। একটা পথ খোলা রয়েছে সংসারের মধ্যে না ঢোকা। বিবাহ ইত্যাদি বিষার্পণ, মা, বাবার প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিলাম না অবশ্য। খালি এক জায়গায়, বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারটায় আমি 'ব্যাড বয়' হয়ে রয়ে গেলাম।

লীলায়িত প্রাণ উৎসের পাশে ছন্দবন্দ কাঠামোর জন্ম মৃত্যুর খেলা কী সুন্দর। দেখতে দাও। কী আঁকব? মূর্ত্তের কী কী গড়বে? তবু ছাড়বে না পাগলের প্রলাপের মতন।

আকাশের তলায় মূর্ত্তি রচনা। কার মূর্ত্তী কিসের মূর্ত্তী তার নির্দেশ, প্রকৃতির এবং শিল্পীর নিজের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেই ধরা পড়ে। অহেতুক রচনা একটি বিরাট খরচের প্রশ্ন। শিল্পীরা স্বভাবতই গরীব হয়ে থাকেন কারণ অহেতুক কাজের তাড়নাই তাদের গরীব করে রাখে। সেইজন্য রসিক বিদ্যৎ জনের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। তা হোক দুজনের বোঝাপড়ার মধ্যেই হয়ে যায়। তাই হয়ে চলেছে। শান্তিনিকেতনেই একজন মহা অহেতুক সাধনার সাধকের দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম।

আমার নির্বাক নিশ্চল মূর্ত্তিগুলোকেও সঙ্গীতসুধা পান করিয়ে সঞ্জীবিত করে দিয়েছিলেন নিজেও নির্বাক সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। ৬/৮/৭৬

## ভাস্কর্য বিষয়ে কয়েক পংক্তি

শ্রীমান কুণাল[১]
তুমি আমার কাছ হতে
ভাস্কর্য বিষয়ে কিছু লেখতে এবং
জানতে চেয়েচ।

ভাস্কর্য সম্বন্ধে বলার কিছু নাই,
খালি করার কথা।
ভালো মাটি জোগাড় করতে হবে
আর জল সে ত তোমার কাছেই রয়েচে.
তোমার যা ইচ্ছা করে যেও,
কারোর উপদেশের অপেক্ষা না করে।

প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট রূপের সন্ধান রয়েচে
সেটিই শিক্ষার আবেষ্টনি. তার
থেকেই আহরণ এবং
শিক্ষা নিয়েই কারবার হবে।
প্রথমে মাটিতে করার পর শক্ত রকমের
আধার ( মিডিয়াম ) নিয়ে
কাজ করা যায়। যেমন কাঠ, পাথর
ধাতু ইত্যাদি।

করে যাওয়াটাই কৃতিত্ব, তার জন্য
চাই আদম্য শক্তি এবং আনন্দ।

শান্তিনিকেতন
১১।৪।৭৩

১. কুণাল সাহা, ৬৩-৬৪ সালে কলাভবনের ভাস্কর্যের ছাত্র।

(রামকিঙ্করের স্বরচিত রচনাগুলিতে লেখকের নিজস্ব বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সঃ)

নির্বাচিত ৫টি সাক্ষাৎকার

এবং

শিল্প ও নিজের সম্পর্কে সংকলিত রামকিঙ্কর-এর উক্তি

## আমার প্রথম শিল্পের ইস্কুল বাড়ীর পাশের কুমোরপাড়া

শিল্প নিয়ে কথা বলতে কোনদিনই আমার খুব ইচ্ছে করতো না। আজকাল একেবারেই করে না। যতটুকু পারি কাজ করেছি, কাজই করতে চাই।

যতদূর মনে পড়ে শৈশবেই আমার চোখে পড়তো আমাদের বাড়ির ঘরের চারদিকের দেয়ালে নানা দেবদেবীর ছবি, ছবি আমার তখনই ভালো লাগতো, ছোটবেলাতে আমি সেইসব দেখতাম আর কপি করতাম। সব ছবির মধ্যে একটা ছবি আমায় ঐ সময়েই প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল। সেটা হলো ওঁ-এর ভেতরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। ঐ ছবিটাই বারবার আঁকতুম। বলতে পারো 'ভিউসিয়াল আর্ট-এ আমার প্রথম বর্ণ পরিচয় ঐ ওঁ-এর রাধা-কৃষ্ণ দিয়ে। আবার মজা কি জানো—অনেক পরে রবীন্দ্রনাথের একটা গানে 'মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে'—পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে। দেখেছো আমার প্রথম শিক্ষার সঙ্গে গুরুদেবের গানের এই লাইনের কী অদ্ভুত মিল। এই যে সামঞ্জস্য এটাও আমার আবিষ্কার। আর যখন ছবির সঙ্গে এই গানের মিলটা পেলাম তখন একটা অদ্ভুত আনন্দ অনুভূতির সঞ্চার হলো।

আমাদের আশ-পাশের শাক-সবজি, ধান, ঘাস-এর সবুজ রঙ আমাকে ভয়ানক টানতো। লাল মাটি এবং মশলা হিসাবে যে হলুদ ব্যবহার করি—সে সব যা চারপাশে রয়েছে সেগুলো আমার ছবিতে লাগাতাম।

মূর্তি গড়ার ইতিহাসও খুব মজার। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা লাল মোরামে ঢাকা ছিল। একদিন হঠাৎ বৃষ্টির পরে দেখি মোরাম ধুয়ে নীল রঙের মাটি বেরিয়ে পড়েছে। চোখে পড়া মাত্র সেই মাটি খাবলে তুলে নিয়ে নানারকম পুতুল তৈরী করতে লাগলাম। এখানে বলে রাখা ভালো যে আমার প্রথম শিল্পের ইস্কুল বাড়ির পাশের কুমোর পাড়া। ছেলেবেলা থেকেই অনেকক্ষণ ধরে কুমোরদের মূর্তি গড়া ও অন্যান্য কাজ দেখার বেশ অভ্যেস ছিল। সুযোগ পেলেই মাটিতে হাত লাগিয়ে ছানাছানি করতাম। রাস্তায় বেরিয়ে পড়া সেই নীল মাটি দিয়ে পুতুল ও মূর্তি গড়ার পর থেকে প্রায়ই নদী থেকে মাটি এনে নানারকম পুতুল ও মূর্তি তৈরী করতে শুরু করলাম। সেগুলো নিয়ে পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা খুব খুশি হতো। পাঠশালায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁকার কাজও চালিয়ে যেতাম। এ ব্যাপারে আমার সৌভাগ্য যে মাষ্টারমশাইরা আমাকে বকতেন না। বরং উৎসাহই দিতেন।

নাটক এবং অভিনয় ছোটবেলা থেকেই আমাকে টানতো। থিয়েটারের সীন আঁকা, স্টেজ করা, রিহার্সাল দেওয়ানো, আবার অভিনয়ের লোক কম পড়লে তখন অভিনয় করা—এসব খুব করতুম। একবার শিশির ভাদুড়ীর নাম শুনে তাঁর নাটক দেখতে কলকাতায় গিয়েছিলাম। তাঁর 'ষোড়শী' ও 'সীতা' ভীষণ ভালো লেগেছিল।

আমি শান্তিনিকেতনে আসার বছর চারেক আগে নন্দলালমশাই কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। ছাত্রদের সঙ্গে ও'র ব্যবহার খুব সুন্দর ছিল। সকলকেই খুব সাহায্য করতেন। তবে তিনি তো ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রবর্তক। ওয়েস্টার্ন আর্টের প্রচলন তখনও হয়নি। উনি পছন্দও করতেন না। আমরা এখানে সবরকম শিল্পচর্চা করেছি। দাভিঞ্চি, মাইকেলএঞ্জেলো. র‍ঁদা—এদের কাজ দেখা, পড়াশুনা করা, কপি করা—সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমাদের কাজেও ঢুকে পড়েছে। এখানে মূর্তি অবশ্য শুধু আমিই করতাম। নন্দলালবাবু আমাদের খুব সাহায্য করেছেন। তবে তাঁর সঙ্গে প্রথম দিকে মূর্তি গড়া নিয়ে গোলমালও বেঁধে যেতো। সাধারণতঃ আমি মূর্তি গড়তে চাইলে নন্দলালবাবু বিশেষ করে খরচের কথা ভেবে আপত্তি করতেন। সঙ্গীত ভবনের কাছে 'সুজাতা' সেইটেই আমার প্রথম বাইরের মূর্তি। গুরুদেবের তো ভোরবেলা উঠে আশ্রমে ঘুরে বেড়াবার অভ্যেস ছিল। একদিন বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ওখানে হাজির হয়ে মূর্তিটা দেখতে পান। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে করেছে?' যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেই তখন পরস্পর পরস্পরের দিকে কি উত্তর দেবেন ভেবে তাকাচ্ছেন। একজন ভয়ে ভয়ে আমতা আমতা করে নাম বললেন। আমার নাম শুনে বললেন, 'ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' একথা শুনে মাষ্টারমশাই পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন—আমাকে বকুনি খেতে হবে ভেবে। আমিও সভয়ে দেখা করতে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, 'মূর্তিটা তুই গড়েছিস?' ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ালাম। তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমস্ত আশ্রম এর চেয়েও বড় বড় মূর্তি গড়ে ভরে দিতে পারবি? সব আশ্রম ভরে দে।' তখন আর আমার আনন্দ দেখে কে? তারপর আর কোন বাঁধাকেই বাঁধা বলে মনে করিনি। ঢালাও লাইসেন্স পেয়ে গেলাম। এবং একটার পর একটা গড়ে যেতে লাগলাম।

আমার শিল্পচর্চায় রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাব ছিল, আবার ছিলও না। ঐ যে আগের 'সুজাতা'র গল্পটা বললুম, প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না বলাই ভাল। তিনি নিজে কখনও কারুর কাজে ইণ্টারফেয়ার করতেন না। অন্যদের করাটাও পছন্দ করতেন না। এমন কি নন্দলালবাবুকেও বলতেন, 'সকলকে নিজের মতন করে কাজ করতে দিও। আশ্রমটা তো ওদেরই। এখানে ওরা স্বাধীনভাবে কাজ করবে, আনন্দ পাবে।' আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে বড় প্রভাব।

**আপনাকে অনেকেই ভাস্কর্যে 'মডার্নিস্ট' বলে। বলে আপনি ফর্মকে ভাঙচুর করেছেন। সে সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?**

তারা মডার্ন বলতে কি বোঝাতে চায় জানি না। যদি শুধু সময়ের অর্থে বলে, বলতে পারে। ফর্ম ভাঙা? গণেশ দেখেছো? গণেশটা কি? মডার্ন? হাঃ হাঃ। রাবণের দশটা মাথা? পিকাসো মুখের উপর মুখ চাপান। রাবণ মডার্ন? জানি না। ফর্ম ভেঙেছি, ভাঙার দরকার হয়। কি দেখছি, কি দেখতে চাই তারই ওপরে ফর্ম ভাঙা, না ভাঙা নির্ভর করে। ধান ঝাড়াই করার সময় শরীরে যে গঠন আসে সেটুকুকে ধরতে অ্যাবস্ট্রাক্ট করেছি। সাঁওতাল কুলি পরিবারের চলে যাওয়া হুবহু রেখেছি। আবার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে চোখের বদলে বলের ব্যবহার করেছি। সবই গড়া, আবার ভাঙাও।

**আপনার কাজে খেটে খাওয়া মানুষের ছবি প্রাধান্য পায়—এর বিশেষ কারণ কি?**

'একাডেমিক' আর্টিস্টরা আগে মডেল স্থির বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকতেন বা মূর্তি গড়তেন। আমরাও কখনো কখনো করেছি। যেমন ধরো দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। পোট্রেট নিয়েই তাঁর কারবার ছিল। সরকারি লোকের অর্ডার নিয়ে তাঁদের নির্দেশ মতো নেতাদের ও বড়ো বড়ো লোকদের মূর্তি করেছেন। ওঁরা প্রধানতঃ অর্ডারের ওপরে বেশী নির্ভর করতেন। আর আমার কাজ হচ্ছে স্বেচ্ছায় করা। চলমান কর্মরত মানুষ আমাকে খুব টানতো। সাঁওতাল বা অন্যান্য সরল গরীব মানুষই তো আমাদের দেশের কাজের মানুষ। তাই তাঁরাই আমার মডেল। আর কি জানো যাঁদের খেটে খাওয়া মানুষ বলছো, তাঁদের মনের সরলতা, সহজ জীবন, শিক্ষা, নাচ, গান আমাকে দারুণ উদ্দীপনা দিতো, এখনও দেয়। ওঁরা এতো অল্পে তুষ্ট যে বিস্ময় লাগে। সেই বিস্ময়ের আনন্দেই আমি ওঁদের ছবি করি। মূর্তি গড়ি। যেন মনে হয় আমি ওঁদের চিনি। ওঁরাও বোধ হয় আমাকে চেনে।

**শিল্প ও সমাজের সম্পর্ক কি ধরনের বলে আপনার মনে হয়?**

এ তো বড় কঠিন প্রশ্ন। কিই বা বলি এ সম্বন্ধে। শিল্পীরা তো সমাজেরই লোক। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর ও শিল্পের পরিবর্তন তো ঘটেই। না ঘটে পারে না। আবার শিল্পীর কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের রুচি বদল হয়। সমাজেরও পরিবর্তন হয়। কোনো কোনো সামাজিক অন্যায় বা অপরাধকে শিল্পী তাঁর তুলির সাহায্যে এমনভাবে ফোটাতে পারে যা প্রতিরোধেরই কাজ করে। করছেও। সমাজ পরিবর্তনে শিল্পীর ভূমিকা আছে। এবং থাকা উচিত। কোনো কোনো সময় শিল্পীকে অগ্রণী ভূমিকাও নিতে হয়। এর অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সে আর একদিন আলোচনা করা যাবে।

**দেশে-বিদেশে যে সব শিল্পী কাজ করেছেন বা করছেন তাঁদের মধ্যে আপনার বিশেষ পছন্দ কোনগুলি?**

শিল্পের ক্ষেত্রে এভাবে বলা মুস্কিল। ভুলও। কত শিল্পী আছেন তাঁদের কতো বিচিত্র শিল্পকর্ম। সব শিল্পেরই বৈশিষ্ট্য আছে। সৌন্দর্য আছে। ধরো

অবনীন্দ্রনাথ, তিনি মোগল শিল্পের ধারায় প্রধানতঃ কাজ করে ফাঁদে পড়ে গেলেন। অর্থাৎ আটকে গেলেন। নন্দলাল বোস এসব দিক থেকে মুক্ত ছিলেন। দেশীয়দের মধ্যে নন্দলাল বোসেরটা বিশিষ্ট। যামিনী রায়ের যেমন পটের প্রভাব প্রধান, তারও বৈশিষ্ট্য আছে, সৌন্দর্য তো আছেই। আমার নিজের কাজের মধ্যে একদিকে ঐ সাঁওতাল কুলি পরিবার। আবার একেবারে অন্যরকম রবীন্দ্রনাথের চোখের বদলে বল ব্যবহার করে যে মূর্তি গড়েছি সেটাও খুব নাড়া দেয়।

বিদেশের শিল্পীদের মধ্যে দার্ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রঁদা খুব ভালো লাগে। আধুনিকদের মধ্যে পিকাসো বিশেষ করে ভালো লাগে। মাতিস, সাগ্যাল অরও অনেকের কাজই ভালো লাগে। আমাদের দেশে মহেঞ্জোদড়োর ষাঁড় দেখেছো? ওটা দারুণ কাজ। আমাদের প্রথমদিকে মহেঞ্জোদড়োর অনেকগুলো কাজ আমরা কপি করেছি। এসব কাজ ঠিক এভাবে বলা যায় না। এভাবে বললে মনে হতে পারে যাঁদের নাম বললাম বা উল্লেখ করলাম তাঁদের ছাড়া বাকীদের কাজ খারাপ লাগে, সে কথা ঠিক নয়। আর তাছাড়া কোনো শিল্পকেই আলাদা করে খারাপ বা ভালো বলা যায় না।

**রবীন্দ্রনাথের ছবি আপনার কেমন মনে হয়?**

ওঁকে তো আমরা চিরকাল সাহিত্যচর্চা করতে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম। তাই হঠাৎ যখন বুড়ো বয়সে ছবি আঁকতে শুরু করলেন তখন আমরা আড়ালে হাসাহাসি করতাম। এটাকে তাঁর একটা হাল্কা খেলা বা পাগলামী বলে মনে হতো প্রথম। পরে অবশ্য বুঝেছি যে কবিতা, প্রবন্ধ বা অন্য কোনো লিখিত শিল্প মাধ্যমে ওঁর অনেক কিছু প্রকাশ বাকী থেকে যাচ্ছে। এবং সে জন্যেই এতো তাড়ায় ছবি আঁকছেন। আমি অনেকসময় দাঁড়িয়ে ওঁর ছবি আঁকা দেখতুম।

**শিল্পী বা শিল্পকার্যের উন্নতির জন্য দেশের সরকারের কি কিছু করণীয় আছে বলে মনে করেন?**

আছে বৈকি। সরকারের উচিত শুধু সরকারি নেতাদের বা তাঁদের পছন্দমতো ছবি করানোর জন্য টাকা ব্যয় না করে শিল্পীরা যাতে স্বাধীনভাবে, নিজেদের আনন্দে কাজ চালিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা। আর্থিক, মানসিক ও জিনিষ-পত্র দিয়ে সাহায্য করা। উৎসাহ দেওয়া।

**তরুণ শিল্পীদের উদ্দেশে আপনার কিছু উপদেশ আছে কি?**

ওরে বাবা! আজকাল কি কেউ কাউকে উপদেশ দিতে পারে? না কেউ সেই উপদেশ শোনে? উপদেশ আমি নিজেও শুনতে বা দিতে পছন্দ করি না।

একটা কথাই বোধ হয় বলা যায়, 'কাজ করে যাও, নিজের স্বাধীন রুচিমতো কাজ করে যাও।'

তোমার তো অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলাম, এবার একটা মজার গল্প দিয়ে শেষ

করি। আমি যখন রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে তাঁর প্রতিকৃতি করার প্রস্তাব দিই তখন উনি বলেছিলেন, 'দেখ, ওদেশে মূর্তি গড়তে গেলেই খাড়া বসিয়ে নানারকম যন্ত্রপাতি এনে নাক, মুখ মেপে ভয়ানক অস্বস্তি দেয়। আমার বড় কষ্ট হয়।' আমি তখন আশ্বাস দিই, 'আমার কিছু মাপার দরকার নেই, আপনি নিজের কাজ করবেন, আমি পাশ থেকে আমার কাজ করে যাবো।' উনি খুব খুশী হয়ে বললেন, 'পারবি? তাহলে তাই কর।' কাজ করে যাচ্ছি একদিন হঠাৎ বললেন, 'আমাকে একতাল মাটি দিতে পারিস? আমার খুব ইচ্ছে করে বেশ হাত দিয়ে টিপে টিপে একটা করি।' তাকিয়ে দেখি প্রতিমা বৌঠান কটমট করে তাকিয়ে আমাকে নিষেধ করছেন। পরে ডেকে বললেন, 'কখনও মাটিতে হাত দিতে দিও না। শরীর খারাপ, ঠাণ্ডা লেগে বিপত্তি হবে।' আজ দুটো দুঃখ মনে বিঁধে আছে। একটা হয়তো সংস্কার—সেই মূর্তি গড়ার পরেই ওঁর মহাপ্রয়াণ হলো। আর একটা হচ্ছে—যদি সাহস করে ওঁকে খানিকটা মাটি দিতাম ওঁর হাতের একটা কাজ হয়তো আমাদের ভাস্করদের পাথেয় হয়ে থাকতো।

বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

## জীবনের সবক্ষেত্রেই আর্ট রয়েছে

বাঁকুড়ার যুগীপাড়াতে আমার জন্ম। ১৯০৬ সালের ২৫শে মে। বাবার নাম চণ্ডীচরণ বেইজ। মা-র নাম সম্পূর্ণা। 'বেইজ' টাইটেল বেশ অদ্ভুত। এটা এসেছে 'বৈদ্য' থেকে। 'বৈজ' হয়ে পরে 'বেইজ' হয়েছে। আমি অবশ্য এতোসব জানতাম না। পরে আমাকে ক্ষিতিমোহন সেন মশাই বলেছিলেন। তবে এ 'বৈদ্য' কিন্তু 'সেন বৈদ্য' নয়। আমাদের জাতিগত বৃত্তি ছিল অন্য।

ছোটবেলাতে আমি যেখানে থাকতাম তার চারধারে ছিল ক্রাফটম্যানদের বসতি। অর্থাৎ ছুতোর, কর্মকার ইত্যাদি। পরের দিকে এদের কাজকর্ম আমাকে হয়তো ইনফ্লুয়েন্স করতে;পারে। কিন্তু ছোটবেলাতেই আমার টেনডেনসি ছিল ছবি আঁকার। কেউ কিন্তু কিছু শেখায় নি। নিজেই দেখে দেখে শিখেছি। ছোটবেলাতে বাবা অ, আ লিখতে বসালেন, আমিও শ্লেট নিয়ে ঘরের দেওয়ালে যেসব ছবি টাঙানো তাই আঁকতে চেষ্টা করতাম। দেওয়ালে টাঙানো ছবি বেশীরভাগই ছিল দেবদেবী, রাধাকৃষ্ণ। সব বটতলার ছাপা। বাবা তাই নিয়ে সবাইকে দেখাতেন। সব ছবির মধ্যে অবার ওঁ-কারের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের ছবি সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করতো। গাছের পাতা থেকে সবুজ রঙ করতাম। আলতা দিয়ে লাল। হলুদ দিয়ে হলদে। ছবি বেশীরভাগই ছিল দেবদেবীর।

লেখাপড়াও খানিকটা করতে হয়েছে বৈকি মারধোর খেয়ে। ছোটবেলাতে পড়াশোনা ভালো লাগতো না। ঐ যে বললাম, বাবা লিখতে দিলে আঁকতে শুরু করতাম। বাঁকুড়াতে ঠেলাঠেলি করে ম্যাট্রিক পর্যন্ত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে এসে পড়েছি। কিন্তু তা একাডেমিক নয়। ইচ্ছে মতো পড়তাম।

শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম ১৯২৫ সালে। বছর দুয়েক নিজে নিজে কাজ করবার পরে আমিই শেখাতে শুরু করি। আমি আর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় একই দিনে কাজ শেখাতে শুরু করেছিলাম।

প্রথম দিকে আমি শুধু মডেলিং শেখাতাম। কারো স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত কাজকে বাধা দিতাম না। রবি ঠাকুরের এ-ব্যাপারে উদার মত ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'সবাইকে নিজে-নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করতে দাও। কখনো বাধা দিও না।' আমি নিজেও কাউকে বাধা দিইনি। বাধা পাইও নি। নাহলে আমার অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজ বা অয়েল পেন্টিং নন্দবাবুর পছন্দ না হলেও আমাকে বাধা দেন নি বিন্দুমাত্র।

*অয়েল পেণ্টিং তখন শান্তিনিকেতনে কেউ করতেন না। আমিই প্রথম শুরু করি।* অয়েল পেণ্টিং কিভাবে শিখলাম জানেন তো? দোকানে গিয়ে বললাম, 'অয়েল পেণ্টিং করবো, কি রঙ আছে, কিভাবে করতে হয় দেখান?' তা দোকানদার দেখালো, 'এই তুলি, এই টিউবে রঙ আর এই পাত্রে তেল আছে, এবার ডুবিয়ে নিয়ে রঙ করুন।' ব্যাস, অয়েল পেণ্টিং শেখা হয়ে গেল। ভালো কাজ করেছিলাম অয়েলে যতদূর মনে হচ্ছে 'গার্ল' এ্যাণ্ড দ্য ডগ।' নন্দবাবু কিন্তু একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অয়েলে করেছিলাম বলে। তবে বাধাও দেন নি। আর রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া ছিল দারুণ মডার্ন। উনি আমাদের কাজ দেখতেন আর বলতেন, 'খালি করে যাও, নতুন নতুন কাজ করো। ওদেশে কতো ভালো ভালো কাজ হচ্ছে। তোমরাও করো।' খুব উৎসাহ দিতেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তো ইচ্ছে মতো কাজ করতে পারতাম না। কারণ টাকা। প্রিন্সিপাল সুরেন কর মশাইকে বললাম, 'গান্ধীজির মূর্তি করবো।' উনি বললেন, 'তাই তো, টাকা নেই হে।' সুতরাং হল না। অবশ্য সুরেন কর খুব চেষ্টা করতেন। শেষে রিটায়ার করবার সময় বললেন, 'টাকা কিছু পাওয়া গিয়েছে। এবার শুরু করো।' তখন সেই সাঁওতালদের মূর্তিগুলো হলো কিছু।

আমার মূর্তি করার টেকনিক বা গ্রামার সব চুলায় গেছে। কাজ করতে করতে হয়েছে যা হওয়ার। যাদের ইনটুইশান থাকে তারা ধরে নেয়। কেতা-দুরস্ত সিটিং নিয়ে পোর্ট্রেটও করেছি। অবনী ঠাকুর উপাচার্য হয়ে এলে ওঁর পোর্ট্রেট করেছিলাম দিনে পনেরো মিনিট করে তিনদিন সিটিং নিয়ে। দেখে দেখে যখন মনে হয় স্ট্রাইকিং তখন সেটা করি। যেমন 'সুজাতা' মূর্তিটা। ওটা জয়া আপ্পাস্বামীর। মুখটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নয়, মডেল করে তৈরী। জয়া বেশ লম্বা দেখতে, স্ট্রাইকিং—তা করলাম বুদ্রাপ্পার তৈরী মাটির বুদ্ধ মূর্তির সামনে। নন্দবাবু দেখে বললেন, 'আরে বাবা! এটা কি করেছো হে, লম্বা গাছের মতোন?' আবার দেখে বললেন, 'তা বেশ করেছো কিন্তু। বুদ্ধ মূর্তির সামনে যখন তখন মাথায় পরমান্নের পাত্র করে দাও। 'সুজাতা' হয়ে যাবে।' তাই করে দিলাম। নন্দবাবু খুব খুশী। বললেন, 'এটার চারপাশে লম্বা লম্বা ইউক্যালিপ্টাস গাছ লাগিয়ে দাও তবে মানাবে।' এখন ইউক্যালিপ্টাস গাছের মধ্যে 'সুজাতা' দেখলে নন্দবাবুর রসিক মনটা সহজেই বুঝবেন। ঐ যে মাটির বুদ্ধ মূর্তির কথা বললাম, ওটা এখন নেই। অনেক বছর আগেই এখানকার একটি ছাত্র 'কান্তেশ' হাইজাম্প দিতে গিয়ে, না কি করতে গিয়ে ওটার মুণ্ডু ভেঙে ফ্যালে। তারপর এখনকার কংক্রিটের বুদ্ধ মূর্তি করা হয়।

হাতে কলমে শেখানো বা ফর্মাল কোনো ইনস্ট্রাকশন নন্দবাবু দিতেন না। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশই ছিল—'কাউকে বেশী কিছু শেখাবে না।' তখন যা করতাম তার ধারাটা ঐ মিথোলজীটজী এইসব ছিল আর কি। ছেলেও তো খুব কম আসতো। আমরা ছিলাম ১০/১২ জন। হবো কিনা সন্দেহ, ধরুন ৮/৯ জন

ছিলাম। তার মধ্যে ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মাসোজী, হরিহরণ। মেয়েদের মধ্যে সুকুমারী দেবী, নন্দবাবুর মেয়ে গৌরী—এ'রা সব ছিলেন। আরো কিছু নাম মনে পড়ছে না এখুনি।

আমরা কাজ করতাম নিজেদের ইচ্ছে মতোন। যখন যা ইচ্ছে হতো তাই করতাম। নন্দবাবু নিজের কাজ করতেন। একবার করে ঘুরে যেতেন। বিশেষ কিছু ইনস্ট্রাকশন দিতেন না। ঐ শুধু দেখে যাওয়াটাই। মাঝে মাঝে বলতেন। কিন্তু চেঞ্জটেঞ্জ বিশেষ কিছু করতেন না। সাজেস্টও করতেন না, সেরকম কিছু দেখাতেন টেকাতেন বলে তো মনে পড়ছে না। তবে হ্যাঁ, একটু আধটু যা না বললেই না তা কি আর বলতেন না? কিন্তু নিজে কিছু ইমপোজ করতেন না। পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

**নন্দলাল বা অবনঠাকুরের ছবি আঁকার স্টাইল, টেকনিক আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করেনি—সচেতনভাবে কি তা এড়িয়ে গিয়েছেন—না, এমনিই প্রভাবিত হননি?**

না, তার কোনো ইয়ে নেই, মানে ওঁদের অঙ্কনরীতি আর আমার অঙ্কনরীতি সেরকম কোনো বিচার করে ধরা হয় না। তবে এমনিই চলে আসে বৈকি। এসে যায়। মূর্তিটারই উপরে আমার ঝোঁক। মূর্তিটাই আমার বিশেষত্ব একটা। এটা আমার নিজস্ব। ওখানে নন্দবাবু নেই। নন্দবাবুর সাজেশন থাকতে পারে। কিন্তু নন্দবাবুর মূর্তিশিল্প তখন বেশী ছিল না এখানে। আর আমিতো ছেলেবেলা থেকেই, এখানে আসবার অনেক আগে থেকেই ঐ মূর্তি করি। ছবিও করি। দুটোই করি। নাঃ, প্রভাব বলতে যা, সে ধরনের কিছু নেই। ইচ্ছাকৃত কিছু নয় ঠিক, তবু তফাৎ হয়ে যাচ্ছে বৈকি। আমার মূর্তিই ধরুন, অ্যাবস্ট্রাক্ট করেছি। আবার সাধারণ মূর্তিও করেছি। নন্দবাবু অ্যাবস্ট্রাক্ট না করলেও রিয়ালিস্টিক মূর্তি করেছেন। তাও তো রয়েছে। ওখানেও তফাৎটা বোঝা যাবে।

**নন্দলাল বা অবনঠাকুরের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এড়িয়ে ওয়েস্টার্ণ টেকনিকে ঝুঁকলেন কি করে?**

হ্যাঁ, আমি কিউবিক ছবি করি। অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিও করি। ঐ এসে যায় আর কি। যেমন ধরুন একটা ধারা বদল হয়তো। সবসময় তথাকথিত 'কপি' করে যাওয়া উচিত হবে না। ও বদলে যাবেই। প্রথম দিকে খুব বেশী বদল হয় নাই। তখন আমরা পৌরাণিক বিষয়ের ছবি আঁকছি। ওয়াশ-এ। এখন বললে বুঝি, তখন কিন্তু পরিবর্তনটাই হয়েছে আস্তে।

অনেকেই ওয়েস্টার্ণ ইনফ্লুয়েন্সের কথা বলেন। কিন্তু ওয়েস্টার্ণ ইনফ্লুয়েন্স বলতে একটা ভয়ানক গোলমাল হয়ে যাবে। আমাদের এটা ভুল কিন্তু একদিক দিয়ে। যেমন ধরুন, আমাদের শিবলিঙ্গ। এটা কি ওয়েস্টার্ণ? না নিশ্চয়ই। তবে? তাহলে কি করে হল এটা? বলুন—উঁ?

ইউরোপেও তো আজকাল কতো চেঞ্জ হচ্ছে। অ্যাবস্ট্রাকট আর্ট হয়েছে।

পিকাসোই তো অনেক চেঞ্জ করেছেন। ব্রাক, পিকাসো দুজনেই। তবে পিকাসো একেবারে নিছক অ্যাবস্ট্রাকট নয়। ওদেশে পরে সবাই আরো বেশী করে অ্যাবস্ট্রাকট হয়েছে। পিকাসো বাদে।

**আপনার ছবিতে যেমন বিভিন্ন প্লেন-এ ছবিটাকে ভেঙে ভেঙে দেখবার কিউবিক আর্ট ফর্ম—সেটা কি আগে এদেশে ছিল ?**

ছিল বৈকি। যেমন ধরুন, আপনি যদি স্টোনকার্ভিং করেন তাহলে একটা কিউবিকে যেতেই হবে। আপনাকে সোজা লাইন ধরে কাটতে হবে। কেটে কেটে তারপরে তো ডিটেল্‌স্‌-এ আসবেন। ছবির মধ্যেও সেইটাই এসেছে। স্টোনকার্ভিং আমার নিজস্ব। ছবির মধ্যেও সেইটাই আসছে যে, ডিটেল্‌স্‌ করবার আগে প্যাটার্ণ যেটা, সেটা তো স্ট্রেট লাইন দিয়েই হচ্ছে। তাহলে তফাৎটা কোনখানে হচ্ছে ? এখন সেখানেই যদি স্টপ করেন আপনি, বলেন যে ডিটেল্‌স্‌টা করব না। তবে ? তাহলে যে সেখানটাই থেকে গেল। কিউবিজম হয়ে গেল না ? কি ?

কিউবিক থেকেই ডিটেল্‌স্‌ আসছে। তা ডিটেল্‌স্‌টা মুছে দিন তাহলে কিউবিকটাই রয়ে গেল। ধরুন, হাত করছেন—স্ট্রেইট লাইন করলেন, কিন্তু তাতে যদি হাতের ডিটেল্‌স্‌গুলো না দেন, থাকে শুধু সোজা সোজা লাইনগুলো, তাহলেই কিউবিক হয়ে গেল। এটা আমার মধ্যে আসছে মূর্তি করবার ঝোঁকটা থেকেই। হ্যাঁ। কিউবিকটা আবার অন্যভাবেও বোঝানো যায়। কোন জিনিসের, ধরুন এই বইটার, তিনটে সাইড দেখা যাচ্ছে। তার এধারটা এরকম, ওধারটা অন্যরকম, আবার আরেকধার আরেকরকম। বইটা আঁকতে গেলে তিনটে ধারের সেপ কিরকম হবে তাহলে ভাবুন। এইরকম দৃষ্টিভঙ্গীতেও কিউবিজম এসে যাচ্ছে। আমার কনটেম্পোরারী যাঁরা তাঁরা কেউই বিশেষ মূর্তিটুর্তি করেন নি বলেই কিনা জানি না, কিউবিজমের দিকে বিশেষ যান নি। আসলে তাঁরা হয়তো এটা স্বীকারই করেন না। কিন্তু আমি স্বীকার করছি এটা। স্বাভাবিক বলে জানি। তবে কিউবিজিমই থেমে থাকা যাচ্ছে না। তাতেও পরিবর্তন আসছে। কিউবিক রেখেও কিরকমভাবে বোঝানো যায় বা ফোটানো যায় জিনিসটা সেটা ক্রমশই বদলাচ্ছে। সেইজন্য দেখবেন কিউবিজমের মধ্যেও আবার একটু ভাঙ্গন। আবার দু-তিনটে জিনিস, স্ফীয়ার এবং কিছু লাইন বা টোনের কম্বিনেশন-পারমুটেশন। একটু অন্য-রকম যাতে হয় তাই আর কি ? তখন নিছক কিউবিকটা উড়ে গেল। একেবারে বন্ধ। পিওর কিউবিক বলতে কিছুই রইল না। অ্যাবস্ট্রাকট হয়ে গেল। কিউবিজমটাই একটু এদিক-ওদিক বদলে নিয়ে অ্যাবস্ট্রাকট হল। তা এই অ্যাব-স্ট্রাকট আবার কি জিনিস ? একটা ঘটনা মনে পড়ল। তখন পুরনো গেস্ট হাউসের সামনে মূর্তিটা করছি। একদিন আমি কাজ করছি, নন্দবাবুও এসেছেন। আমাদের এখানে একজন পণ্ডিতমশাই ছিলেন। তিনি এসে জিজ্ঞেস করছেন, 'আরে মশাই এটা কি ?' নন্দবাবু একটা তালগাছের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'এটা কি বলুন

তো ?' নন্দবাবু গম্ভীর হয়ে পণ্ডিতমশাইকেই প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে ওটা কি ? এ্যাঁ। এটা যদি অ্যাবস্ট্রাকট হয় তাহলে তালগাছটা কি ? তাহলে কোনটা অ্যাবস্ট্রাকট ? অ্যাবস্ট্রাকট মানেই বা কি ?' পণ্ডিতমশাই পালিয়ে গেলেন। ভাবলেন, এরা সব ক্ষেপে গেছে। তাই তো বলি, কিছু বলা মহামুশকিল আছে।

পাশ্চাত্য ছবি অনেক দেখেছি। সেজানকেও ভালো লাগে। কিন্তু সম্প্রতি একটি পত্রিকাতে[১] দেখলাম যে আমি নাকি বলেছি—সেজানকেই ভালো লাগে। তা কিন্তু না। নট নেসেসারিলি। তবে সেজান কিউবিজমটাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। পিকাসো আমার চিরদিনই ভালো লাগে। শান্তিনিকেতনে এইসব ওয়েস্টার্ণ মাস্টার-দের ছবি দেখার কোনো অসুবিধা ছিল না। খুব ভালো প্রিণ্ট ছিল এখানে। বইও ছিল কতো। এই যে পিকাসোর কথা বলছেন, ওঁরাতো একেবারেই একাডেমিক্যাল স্টুডেণ্ট হিসাবে নাম করেছিলেন। ভালো হাত ছিল। তার থেকেই ভ্যারী করেছে।

**ওয়েস্টার্ণ কিউবিজমের বৈশিষ্ট্য কি ? নিছক একটা ফর্ম শুধু ?**

না, তা নয়। সাধারণ ফর্ম যেটা, এই চোখে যা দেখি বা ফটোগ্রাফ, তার ভিতরে গেলে সেই বিশেষ জিনিষটি পাবেন। যখন একটা মূর্তি করি তখন যেমন পাথর কাটি লাইন দিয়ে দিয়ে, একটা স্ফীয়ার ঠিক করে, তারপরে চেঞ্জ করে একটা ফর্ম আনা হল। ফর্ম তো আগেই ছিল। কিন্তু যেটা হল সেটা ভিস্যুয়াল ফর্ম। ভিস্যুয়াল ফর্ম থেকে একটা নতুন জিনিষ পাওয়া গেল 'বাই দি প্রসেস অফ এলিমিনেশন।' কিন্তু ওখানেও থাকবেন কিনা তাও দেখতে হবে। পিকাসো প্রথমে যে অ্যাবস্ট্রাক্ট করতেন পরে তা উড়ে গেল, আবার ফর্ম এল। ফর্মাল হল। পিওর ফর্ম কোনটা ? যেটা ভিস্যুয়াল সেটা একরকম। কিন্তু তার ডিটেল্‌স্‌গুলো মুছে দিলেই একটা ফর্ম এলো। তাই না ? এইটাকেই পিওর ফর্ম বলতে পারেন।

**শান্তিনিকেতনে অ্যাবস্ট্রাক্ট বা অয়েলপেণ্টিং তো আপনি প্রথম শুরু করেছিলেন। তাই না ?**

হ্যাঁ। সেটা তা বটে। বলতে পারেন। কিন্তু এটা গর্ব করবার কিছু নয়। তবে মনে রাখবেন অ্যাবস্ট্রাক্টকে ওরিয়েণ্টালই বলতে হবে। 'নটরাজ' কি অ্যাবস্ট্রাক্ট নয় ? তাহলে চারটে হাত কেন ?' 'রাবণ' কি অ্যাবস্ট্রাক্ট নয় ? যাকে বলেন 'শিবলিঙ্গ', সেটা কি ? ওটা কি আপনি ওয়েস্টার্ন বলবেন ? মহেঞ্জোদড়োর আমল থেকেই শিবলিঙ্গ প্রচলিত। আমাদের মীথোলজিতেও আছে। ওটা অ্যাবস্ট্রাক্ট তো। কোনো রূপ নেই। ভেবে নিতে হয়। দেখতে পাচ্ছেন না কিছু। ওটাকেই যদি একটু আধটু রূপ দেওয়া যায় ব্যস ফর্ম এসে গেল। ভিস্যুয়াল ফর্ম।

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই ধরনের ছবি আঁকেন কেন ? হ্যাঁ,

১. **Hindusthan Standard—Diwali 1972**

একটু ডিভিয়েশন এসে গিয়েছে বটে ভিসুয়াল ফর্মাল থেকে। সেটাই অ্যাবস্ট্রাক্ট বলতে চাইছেন সবাই। এটা কেন হচ্ছে বলা মুশকিল। ইচ্ছে হলো। হুইমস থেকে বলতে পারেন। নতুন কিছু করবার ইচ্ছে। কিন্তু এও থাকে না। বদলে যায়। তবে এটা ঠিকই যে নন্ ফিগারেটিভ অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট, যাতে কিছু রঙ-রেখাই মাত্র আছে, তার টোটাল এফেক্ট সবার কাছে সমান হয় না। কমিউনিকেশন প্রব্লেম থেকেই যায়। আসলে আপনি কখনো জেনেরালাইজ করতে পারবেন না। প্রব্লেম থাকছেই। সবাইকেই চিরকালই এটা ফেস করতে হয়েছে। দেখতে দেখতেও অভ্যস্ত হয়ে যায়। আমি কোনো জায়গায় লাল রঙ দিয়েছি বা সবুজ দিয়েছি, আপনার প্রথমে বিরক্ত লাগলো কিন্তু দেখতে দেখতে সয়ে যাচ্ছে। এও হয়। দর্শকের কাছ থেকে রেসপন্স চাইছি কিন্তু সেটা পাবো বলে জোর করে বলতে পারি না। আপনার যেটা ইচ্ছে আপনি করে দিলেন কিন্তু দর্শক সেটা কিভাবে নিচ্ছে, না নিচ্ছে তা বলতে পারেন না। আপনি খালি এঁকে দিলেন কিন্তু তার জন্যে আপনিও দায়ী নন, আপনার দর্শকও দায়ী নন। তার যেমন যা এফেক্ট হয়—একটা ছবি দেখতে গিয়ে আপনি হয়তো পালিয়ে গেলেন ধ্যুৎ কিছু হয় নি। কিন্তু আবার ঘুরে ফিরে সেখানেই আসছেন, দেখি তো ব্যাপারটা, এও হতে দেখেছি। লোকে চায় আর্টিস্ট যে পয়েন্টে ছবি করেছে সেই পয়েন্টের কাছে আসবার।

পুরানো গেস্ট হাউসের সামনে যে কম্পোজিশনটা আছে সেটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন। ওটার মধ্যে দু-তিনটে সাবজেক্ট মিলেমিশে রয়েছে, নয় কি ? সেইজন্যে দু-তিনটে প্রসেস এসে গিয়েছে। তার থেকে কিছু কিছু এলিমিনেট হয়েছে। কিছু কিছু এ্যাড হয়েছে। যে দু-তিনটে অবজেক্ট সেগুলো রিয়ালিস্টিক করতে গেলে সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে যেতো। কিন্তু যেভাবে রয়েছে সেভাবে কম্বিনেশন করাতে সংহত একটা ভাব, বেশ নতুন জিনিষ আসছে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, এক ফটোগ্রাফার এসেছেন ফিল্ম করতে—তখন অবনীন্দ্রনাথ আচার্য। ফটোগ্রাফারটি বললেন, 'হ্যাঁ মশাই, ও একটা কি দেখছি ? আমি ওদিকে গিয়ে দেখলাম। এদিকে এসে দেখলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না।' অবনঠাকুর হেসে বললেন, 'ঐ তো গো, ও যে ঘোরাবে ফেরাবে আর দেখাবে—ঐ হচ্ছে রামকিঙ্কর।' ঐ কম্পোজিশনটা সম্পর্কে যা বলছিলাম, ওটার মধ্যেকার কাজগুলো ভাগ করা যায়। একটা দেখবেন নারী মূর্তি, চুম্বনরতা। তারপরে দেখবেন পাখি আছে, কোর্টিং বাউস। নারীমূর্তি এক পাশে দেখা যাবে এবং সেই নারীমূর্তির সবটা নেই। কিন্তু সবটা না থাকলেও বোঝা যায়। এইরকমভাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট করলে কতকগুলো ফ্রীডম আসছে, যেগুলো সাধারণ কাজে নেই। এই ফ্রীডম ঠিকঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে একটা অন্য ফর্ম আসছে। যেন চেনা যাচ্ছে না অথচ চেনাচেনা লাগছে। নতুন ডাইমেনশন এসে যায়। মিস্টিক ভাব আসে। অহেতুক ভাবটা বাড়ছে।

আমার 'সাঁওতাল দম্পতি' ইত্যাদি মূর্তিগুলো সিমেন্ট কংক্রীটে করা-কেন তা

নিয়েও অনেকে প্রশ্ন করেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, 'কেন ব্রোঞ্জে করেন নি?' আমি বলি, 'কেন আবার—পয়সা! পয়সা তো চাই কাজ করবার জন্যে। অত বড় কাজগুলো স্টোনে করতে গেলে কতটাকা খরচ হবে ভাবুন? তাতে সিমেন্ট কংক্রীটের যে এফেক্ট হয়েছে তা হয়তো হতো না কিন্তু অন্য এফেক্ট হতো। এখন যে এফেক্টটা আসে তা হচ্ছে পেবলস্ দিয়ে করার জন্যে। এটাই যদি কার্ভ-এ করা যেত তাহলেই এরকম হতো না। কার্ভিং-এর অন্যরকম টেক্সচার হবে। ওগুলো সিমেন্টে করবো বলে ভেবে করি নি। আসলে পেয়েছিলাম চার ব্যাগ সিমেন্ট আর কিছু লোহার রড। তাতে তো অন্য কিছু করাই মুশকিল। তখন এখানে যা টাকাকড়ির অবস্থা তাতে ঐ সিমেন্ট কংক্রীটে কাজ না করলে কিছু করাই হতো না। বড়ো জোর ক্লে মডেলিং-এর মতো ছোট ছোট মূর্তি হতো। এগুলোও অবশ্য ১৮-ইঞ্চি কাজ থেকেই আমি এনলার্জ করেছি মাপ নিয়ে। পরে কংক্রীটে ডাইরেক্ট কাজও করেছি। সিমেন্ট কংক্রীটের লাইফ কিছু আছে বটে কিন্তু নষ্ট হয়েও যায়। সিলিকন পেন্ট না করলে টেঁকে না। এখানেও তা করা হয় না।

দিল্লীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে 'যক্ষ-যক্ষী'। এটা পাথরের। এই মূর্তির মোটামুটি আইডিয়া জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যে এটা ব্যাঙ্কিং-এর ব্যাপার। সিম্বলটা তাই অর্থের এবং কৃষির। এগ্রিকালচারটা 'যক্ষী'র দিকে। তাতে আছে ফ্লাওয়ার, এগ্রিকালচার ও ডানহাতে কর্ণ। যক্ষের হাতে যা আছে তা আমার স্বকপোল-কল্পিত। যক্ষের একহাতে রয়েছে পেনিয়ান—ইণ্ডাস্ট্রীর প্রতীক। আর একটা হাতে মানিব্যাগ। যক্ষের ব্যাপারটা ভেবে নিতেই হয়েছে নইলে যক্ষের যত মূর্তি পাওয়া যায় তাদের কারোই হাত নেই। কলকাতার মিউজিয়ামে যে যক্ষমূর্তি এটা তারই ধাঁচে তৈরী। কলকাতার মূর্তি মথুরা থেকে পার্শি ব্রাউনের সময় সংগৃহীত। আমার কাজটার নাম 'যক্ষ-যক্ষী'। অনেকে ভুল করেন 'যক্ষীণি' ভেবে, তা কিন্তু নয়। আসলে পৌরাণিক বাস্তবে এরা ভাই-বোন। কখনোই স্বামী-স্ত্রী নয়। তাই যক্ষীণিও নয়।

যা বলছিলাম—ওটা ছিল বিশাল কাজ। অনেক মুশকিলের ব্যাপার ছিল ওটাতে। পাথর সিলেক্ট করেছি কুলু ভ্যালীর কাছে বৈজনাথ বলে এক জায়গায়। কিন্তু ওখানকার রেল যে মিটার গেজ তা খেয়াল ছিল না। ২৫ ফুটের এক একটা স্ল্যাব রেলে আনা গেল না। তাই পাথর টুকরো করা হলো চারভাগে। দিল্লীতে এনে জোড়া হয়। আসল প্ল্যান ছিলো একটা মাত্র পাথর কেটে মনোলিথ কাজ করবার। লেবার ইত্যাদিতে খরচ এবং টাইম যে কি ভীষণ বেশী লেগে গেল তা আর বলবার নয়।

রবীন্দ্রনাথের বাস্ট করেছি যে বছর সেই বছরই উনি মারা যান। সংস্কার আছে যে কারো ছবি আঁকলে বা মূর্তি করলে সে নাকি বাঁচে না। এখন মনে হয় কেন করলাম তখন। রবি ঠাকুরের বাস্ট সিটিং নিয়ে করা। মূর্তিটা খুব

কাছ থেকে বোঝা যাবে না। একটু দূর থেকে ভালো বোঝা যাবে। উনি বললেন, 'মাপজোক নিও না কিন্তু। এপস্টাইন কি রকম জ্বালাতন করেছে আমায়, সমস্ত সময় ক্যালিপাস নাকের কাছে ধরা আছে, ওসব কি পোষায় ?' তখন আমি পোর্ট্রেট করছি খুব। সাহস ছিল। অল্প বয়েস। আমি বললাম, 'আচ্ছা বেশ, আপনি বসে বসে কাজ করে যান। আমি কোন ডিস্টার্ব করবো না।' উনি ঝুঁকে বসে লিখতেন, আমার কাজটাও সেইরকম, চুল দাড়ি অল্প। সে বছরই কাটা হয়েছিল তো। প্রথমে ভেবেছিলাম পুরোটাই করবো। ওঁকে পোশাক ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করাতে বললেন, 'পোশাক দিয়ে কেন মানুষটাকে ফোটাবে, তার চরিত্র, তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলো। তবেই বুঝবো তুমি কেমন আর্টিস্ট।' আমিও আর চেষ্টা করিনি।

রবীন্দ্রনাথের একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মূর্তিও করেছিলাম। এটা সিটিং নিয়ে নয়। মন থেকে গড়া। উনি শুনেছিলেন এটার কথা। কেউ ওঁকে গিয়ে বলেছিল, 'ওটা যে কি করেছে, চোখে বল দেওয়া, চেনা যায় না।' রসিক লোক তো, বলেছিলেন, 'ঐটেই ঠিক করেছে।' মূর্তিটার চোখটা বল দেওয়া, নাকটা প্রায় ঠিকই, দাড়ি সিঁড়ির মতো। এই মূর্তিটাতে কয়েকটা প্লেট আছে, তাতে লেখা আছে—অসীম, সুন্দর, বিরহ, বেদনা, আনন্দ। এক একটা প্লেটে এক একটা কথা লেখা। এটা দিল্লীতে সাহিত্য একাডেমীতে আছে। ওরা কাস্ট নিয়ে মেটালে করেছে। একবার বেশ মজা হয়েছিল। একজন, ছেলে ভর্তি করাতে এসেছে বাঁকুড়া থেকে। তা ছেলে 'বলছে—'এটা রবীন্দ্রনাথ।' বাবা ধমকে বলছে—'ওটা আবার রবীন্দ্রনাথ কোথায় ?' ছেলেটা খুব ক্লেভার। পাকা।

দুটি মেয়ের ছবি এঁকেছিলাম লাইফ সাইজ। এখানকারই ছাত্রী। অদ্ভুত রঙ তাতে। জীবন্ত মনে হয়। মুখের ডিসটরসন এসে গিয়েছে। ইচ্ছাকৃত নয়। কিছু কিছু ডিসটরসন, যেমন ধরুন গলাটা খুব বেশী লম্বা, এইরকম আর কি, না থাকলে সমস্ত জিনিসটা পয়েন্টলেস হয়ে যায় না কি ? ছবিটা তুলি দিয়ে আঁকা নয়, স্প্যাচুলা দিয়ে করা। তাতেও এইরকম বিকৃতির ছাপ পড়ে। প্যালেট নাইফ দিয়ে আঁকলেও তা হয়।

ওয়াটার কালারে, অল্প রঙে বেশী এফেক্ট এনেছি 'খোয়াই' ধরনের ছবিতে। এরকম ছবি অনেক আছে। ওয়াটার কালারে কিছু চীনা প্রভাব আছে বলে মনে হয়। দেখতে দেখতে প্রভাব এসে যায় বৈকি। তা বলে কপি করা নয়। 'খোয়াই' ইত্যাদি ছবি নেচার থেকে দেখে আঁকা।

আমার ছবিতে ডাইমেনশানের একটা ব্যাপার আছে যা অনেক বলেন, অনেক শিল্পীর মধ্যে থাকে না। আসলে ডাইমেনশান এসে যায়। সেটা মিডিয়ামের জন্যেও বটে খানিকটা। যেটা ছবিতে আঁকা হয় সেটাই যখন মূর্তিতে করা হয় তখন ডাইমেনশান এসে যাচ্ছে। কেননা ছবিতে আপনি একটা সাইড থেকে দেখছেন। মূর্তি তো তা নয়, চারধার থেকেই দেখছেন। তাতে ডাইমেনশানাল এপ্রোচ বেড়ে

যাচ্ছে। নয় কি ?

একটা দুর্বার আবেগ অনেকে আমার ছবিতে দেখেছেন। আপনারা যেমন 'ধান রোয়া' ছবিটার কথা বলছেন। এই ব্যাপারটা অর্থাৎ ডাইনামিজম নির্ভর করছে ফীলিং-এর উপর। যে করছে তারও ফীলিং, যে দেখছে তারও ফীলিং। নাঃ, এই দুটো কথা ডাইমেনশান আর ডাইনামিজম, এই দুটো কথা বড্ড গুলিয়ে ফেলছি। বয়স হচ্ছে তো, হ্যাঁ যা বলছিলাম, মূর্তির দিকে ঝোঁক থাকার জন্যেই আমার মধ্যে ডাইমেনশান ব্যাপারটা এতো স্পষ্ট। মূর্তি যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে এই জিনিসটা আসে। আসা উচিত অন্ততঃ। কারণ হেভীনেসটা আসছে তো। মেটারিয়াল হেভীনেস ছবির মধ্যেও এসে যায়। ফলে ডাইমেনশানটা বেড়ে যাচ্ছে এখানেই। রঙের তফাতেও ডাইমেনশান বেড়ে যায়। কাছের, মাঝের আর দূরের এই তিন পর্যায়ে তিনরকম রঙ হওয়া উচিত। থ্রি ডাইমেনশান। আকাশটা যে দূরের সেটা বোঝাতে হবে। ডাইমেনশান মানেই হচ্ছে, সামনে যেটা দেখছি তার পিছনটাও যে আছে সেই পিছনদিকের ফীলিংটা ফোটানো। কিউবিজম ব্যাপারটারও মূল এইখানেই নয় কি ? কিউবিক ছবিতে দেখবেন দুরকমভাবে মুখ আঁকা। এটা অবশ্য আধুনিক কালের সৃষ্টি এই কিউবিজম-এ শুধু নয়। চিরকালের কথা। অজন্তাতে দেখবেন আয়নাতে চুল আঁচড়াচ্ছে মেয়ে। তিনটে ফীগার। তার পা-টা উল্টে দিয়েছে, তলার পা দেখা যাচ্ছে। তা এটাতো সেকালের জিনিস। আজকাল করলে বলা হতো খুব মডার্ণ হয়েছে, কিউবিক হয়েছে। কিন্তু তাতো নয়। ওখানে সবদিকের ডাইমেনশান একসঙ্গে ধরতে হয়েছে। কিউবিজমেও এটা করা হয়। পিকাসোর ছবিতে দেখুন, তিনটে চোখ, কোথাও নাকটা সোজা এনে পাশে চালিয়ে দিয়েছে। চোখ বা নাকের ট্রুথফুলনেসটা আছে কিন্তু। সবদিকের দেখাটাকে একসঙ্গে ধরে রাখাটাই কৃতিত্ব। এতে টোটাল এফেক্ট কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যায়।

আমার আরো কিছু ছবি নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন, ঐ যেখানে এক একটা কিউব-এর মধ্যে একেকরকম কালার দিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট করা হয়েছে। আসলে ঐ কম্বিনেশন না করলে ভ্যারিয়েশন আসে না তো। একটা গাছে কত রঙ দেখবেন, কোনটা হয়তো ছায়াতে, কোনোটা উজ্জ্বল রোদের আলোতে, আবার কোনো কোনোটা হলুদ বিবর্ণ। এই পার্থক্য আনবার জন্যেই ছবির মধ্যে কালার চেঞ্জ করে দিয়েছি। একসঙ্গে সব রঙ মিশিয়ে দিলে রঙটা ডার্টি হয়ে যায়। সেইজন্যেই তফাৎ করে দেওয়া। দুটো রঙের পাশে একটা সাদা লাইন, ক্যানভাসের বা কাগজের অংশ, থাকে। নাহলে সব মিলে একটা থার্ড কালার হবে যেটা জবরজং হয়। এখন তো আরো সংক্ষেপ হচ্ছে। নেচার, ভল্যুম, স্পেস সব বিভিন্ন শেড-এ কালার করে পরে কলমের টানে কিছু ডিটেলস্ করা হয়।

**একজন খ্যাতনামা ভাস্কর বলেছেন যে, শান্তিনিকেতনে ম্যাড স্টাডি করতে দেওয়া হয় না, তাতে ওখানকার কাজে এ্যানাটমীর গোলমাল থাকে, মডেলের শরীরে মাংসের**

তলাতে যে হাড় থাকে তা মনেই হয় না। আপনার মন্তব্য জানাবেন ?

এগুলো বদনাম দেওয়া। এ্যানাটমী শেখানো হয় স্কেলিটন থেকে। হাড় আগে শিখতে হয়। ফিগার শেখানো হয় মডেল বসিয়ে। মডেলতো থাকে, সব আর্ট স্কুলেই মডেল দেওয়া হয়। আমার পোর্ট্রেটগুলো সব সিটিং নিয়ে করা। তবে হ্যাঁ, ন্যুড স্টাডি যদি বলেন, আরে ন্যুডতো দেখাই যাচ্ছে, সব সময়েই দেখা যায়। তাই নয় কি ? এই প্রশ্নটা জেনেরালাইজ করা উচিত নয়। কেউ ন্যুড স্টাডি করে, কেউ করে না। সেটা নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের প্রশ্ন। আমি তো করেছি। আরো কেউ কেউ করেছেন। আর সাঁওতালদের বুকে একটু কাপড় থাকে তাতে অসুবিধা হয় কি স্টাডি করতে ? তাহলে একটা গল্প বলি ঃ অবনী ঠাকুরের এক ছাত্র ( নাম বলবো না—এখন বিখ্যাত ভাস্কর ) একটি মেয়ের ছবি করে ওঁকে দেখাতে এনেছেন, তাতে স্তনটি এঁকেছে গোল। ঠিক গাড়ীর চাকার মতো। উনি ছাত্রটিকে বললেন, 'যাও আগে গিয়ে দেখে এসো কি রকম দেখতে তারপরে এঁকো।' স্তনতো গোল নয়। হেভীনেস আছে বলে একটু টিলট থাকে সামনে। কিন্তু বুঝুন ব্যাপারটা ! এতোখানি ডেয়ারিং ভাবা যায় কি ?

রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে বিশেষ কোনো রিঅ্যাকশন হয়নি এখানে। এখানকার লোকে আর ভালো মন্দ কি বলবে। শুনেছে প্যারিসে ভালো বলেছে আর খারাপ বলে কি করে! ওঁর ছবিগুলো বেশ মজার, নানারকমের, হুইমসিক্যালতো। পেলিক্যান্ বা অন্য কোন কোম্পানী যেন অনেকগুলো রঙের বোতল ওঁকে দিয়েছিল। উনি তাতে তুলি ডোবাতেন আর আঁকতেন। রঙগুলো ল্যাকার মেশানো ছিল। তাই দেখবেন ছবিগুলো কেমন ঝকঝক করে। ট্রেস্ করতেনও কখনো সখনো। নানা ধরনের ফিগার এঁকেছেন। রঙও বিচিত্র। তবে দু'একটা জিনিস স্টিরিও টাইপ হয়ে গিয়েছে। যেমন নাক। সেটা কখনো বদলান নি। একই-বকম রয়ে গিয়েছে সব ছবিতে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙের ব্যবহার দারুণ। ন্যাচারাল কালার আনবার চেষ্টা করেছেন। মহুয়ার কভারের ছবির রঙ দেখবেন, ঠিক যেন মৌ ফুলের রঙ। খুব কড়া অবজারভেশন ছিল কিন্তু। রিয়ালিস্টিক ছবিও কোথাও কোথাও আছে। টুরিস্ট লজে একটা ছবি দেখলাম—নাচের ছবি। বেশ রিয়ালিস্টিক। নিজের ছবি অর্থাৎ সেলফ পোর্ট্রেটও সুন্দর। সব মিলিয়ে বেশ অদ্ভুত রস। কুমারস্বামী রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে দু-লাইন লিখেছিলেন—ওঁর ছবিগুলো 'নট চাইল্ডিস বাট চাইল্ড লাইক'। তাছাড়া রস না থাকলে এতদিন ধরে যে ছবি আঁকলেন, প্রায় দশ বছর, তা কি সম্ভব হতো !

আমি এখন কোনো কাজ করছি না। অসুখের জন্য স্টপ করেছিলাম, এখন আবার শুরু করবো। কাজ করতে ইচ্ছে করে, ভীষণ ইচ্ছে করে। সেই কবে ছেলেবেলা থেকে শুরু করেছিলাম। চিরদিনই করতে চাই। এখন যাঁরা কাজ করছেন, মূর্তি বা ছবি দুটোতেই দেখি মজা হচ্ছে খুব। সব গিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে

ঢুকেছে। এ এক মহামুশকিল। আমার একটি ছাত্র লণ্ডনে গিয়েছে একটা এক্‌জিবিশনে, গিয়ে দ্যাখে শুধু একটা চৌকাঠ। আর কিছু নেই। সবটা ফাঁকা। এই নাকি আর্ট! তাজ্জব ব্যাপার! এ্যাঁ? সারা পৃথিবীতেই এই হচ্ছে। অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট হজম করা মুশকিল। করাটা সোজা। কিন্তু বুঝে করা সহজ নয়। তাই ভীষণ বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এখন মনে হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ছেড়ে দেওয়ার সময় এসেছে। কমার্শিয়াল আর্টে এখনো কিন্তু ফিগারিটিভের রাজত্ব চলছে। অ্যাবস্ট্রাক্ট নেই বললেই চলে। খ্যাতনামা শিল্পীদের মধ্যে হুসেন খুব ভালো কাজ করেছেন। ওঁর কালার ও কম্পোজিশন দুটোই সুন্দর। হেব্বার বা অন্য অনেকের মধ্যেই অমৃত শেরগীলের প্রভাব রয়েছে। অমৃত শেরগীল আধুনিক জীবনের পোট্রেটে ওরিয়েণ্টাল স্টাইল আনবার সার্থক প্রচেষ্টা করেছিলেন। হ্যাঁ, ঐ যে অ্যাবস্ট্রাক্টের বাড়াবাড়ির কথা বলছিলাম তাতে মনে পড়ল। এখানে এক ছাত্র একটা মূর্তি করেছে তার মাথাটা এতোটুকু ছোট্ট। কিন্তু কিছু বলা যাবে না। তাহলেই বলবে, 'কেন স্যার, আপনার ঐ কাজেও তো এরকমই ছিল।' বললে কি শুনবে যে মেপে দ্যাখ বাবা, কতটার অনুপাতে কতটা মাথা করেছিস।

চিরদিনই সবাই বলেন যে, আর্টের একটা সোস্যাল পারপাস আছে। জীবনের সব ক্ষেত্রেই আর্ট রয়েছে, বাড়ীঘর, জামাকাপড়, বাসনকোসন সবই তো আর্টিস্টিক। আবার চলনবলন, কথাবার্তা, ভদ্রতা সবই তো আর্ট। আমার কাছে কিন্তু আর্ট হচ্ছে অহেতুক। যার কোনো হেতু নেই, শুধুই সৌন্দর্য, শুধুই আনন্দ। যাকে পয়সা দেওয়া যায় না। আর তাই হয়তো শিল্পীরা এতো বোহেমিয়ান। এ্যাঁ? বলুন না মশাই পয়সাও নেই, খাওয়া নেই, তাই বোহেমিয়ান বৈকি! ভারী মজা কিন্তু।

সূর্য তখন অনেকখানি আকাশ পরিক্রমা শেষ করে ঠিক মাথার উপরে। প্রায় নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন বেলায় শিল্পীর বাড়ীর খড়ের চালে দু-একটা ব্যস্ত চড়াই-এর আনাগোনা। আর দূরে সাঁওতাল গ্রামের পথে গোরুর গাড়ীর চাকার চিক্কন আওয়াজ। অনেক কথা আর উচ্চকিত হাসির পরে হঠাৎ এই চুপ করে যাওয়ায় নির্জনতা তীব্র মনে হয়। 'অনেক কথা হল, গল্প হল, তোমরা আসায় সময়টা বেশ কাটলো। আর কি, এই গুছিয়ে যা হোক লিখে দিও।' রামকিঙ্কর তাকিয়ে ছিলেন সামনের উঠোন পেরিয়ে দূর আকাশের দিকে। কলম এগিয়ে দিলাম, 'একটা স্কেচ করবেন?' অন্যমনস্কভাবে সাদা কাগজে কালো আঁচড় দিলেন কয়েকটা। একটা সূর্যমুখী।

## যাঁরা প্রতিভাশালী তাঁদের কেউ লুকিয়ে রাখতে পারবে না

শাওনের সকাল। সোজা গিয়ে উঠলাম কিঙ্করদার বাড়ীতে। বাড়ীতে উঠে দেখি একটা তক্তাপোষকে খাড়া করে ইজেল বানিয়ে তার উপর বড় এক ফালি চটকে ক্যানভাস বানিয়ে, এ'টে, অতি সাধারণ গুঁড়ো লাল, গুঁড়ো সাদা ও হলুদ রঙ দিয়ে ছবি এ'কেছেন। দেখলাম তেল দিয়ে গুঁড়ো রঙগুলো মিশিয়ে নিয়ে অয়েলের টেকনিকে কাজ করেছেন। খানিকটা রঙ ছড়ানো টেবিলের উপর। মনে হল কিঙ্করদা বোধহয় কাজ করতে করতে উঠে গেছেন। দোকানের কেনা স্বল্প পরিসর প্যালেটে না পোষানোর দরুণ টেবিলটাই হয়েছে 'প্যালেট'। আর তক্তাপোষ হয়েছে 'ইজেল'। দরজা থেকে হাঁক পাড়লাম, 'কিঙ্করদা আছেন?' বেশ ভরাট গলায় উত্তর এলো, 'হ্যাঁ। এসো।' ভেতরে ঢুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নমস্কার জানালাম। বললেন, 'বসো। কি খবর? কেমন আছো?' বললাম, 'ভালই, 'সুন্দরম্' থেকে তাগিদ এসেছে আপনার সম্বন্ধে লেখা ও স্কেচগুলো[১] তাড়াতাড়ি পাঠাতে হবে। তাই স্কেচ-গুলো শেষ করব। আর জীবনের কথা কিছু শুনবো। কতকগুলো প্রশ্ন আছে সেগুলিরও সমাধান করবো।' উত্তরে বললেন, 'আচ্ছা করো।' একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম—

**আচ্ছা কিঙ্করদা, আপনার শিল্পসৃষ্টির ভেতর প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এ দুটো জিনিসের সমন্বয় হয়েছে?**

'না-না-না—সে সব কিছু না! ঠিক তা নয়। 'ইস্ট' 'ওয়েস্ট' বলতে যা 'মিন্' করো, ঠিক সেটা নয়। প্রকৃতিকে যা দেখছো, প্রকৃতি বলতে কি? তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা, নৈসর্গিক সচেতনতা, সৌন্দর্য অনুভূতি, শিক্ষা এবং 'পারম্পরিক' শিল্পের অভিজ্ঞতা। 'পারম্পরিক' মানে 'ট্র্যাডিশনাল'। অর্থাৎ মহেঞ্জোদড়ো থেকে শুরু করে, মানে তিন হাজার বি, সি সেখান থেকে শুরু করে আজ আমরা এসেছি বিংশ শতাব্দীতে। মহেঞ্জোদড়ো শিল্পে যে মূর্তি গঠন হয়েছিল আজও পর্যন্ত তার মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সেটার অর্থ কি? ভারতবর্ষের শিল্পের ধারা আজও সমানভাবে বজায় রয়েছে। সেই মূর্তিটির নাম বলতে পারো? সেটি হল 'শিবলিঙ্গের মূর্তি'। কোন একজন বিখ্যাত শিল্পী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 'আমি 'আধুনিক' মূর্তির

১. সাক্ষাৎকারটির সঙ্গে পঙ্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা রামকিঙ্করের চারটি প্রতিকৃতি স্কেচ ছাপা হয়

কপি করি?' উত্তরে আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, 'শিবলিঙ্গের মূর্তি কোন 'প্যারিসিয়ান' শিল্পী তৈরী করেছিলেন—উত্তর দিন?' আমরা প্রকৃতির মধ্যে যা দেখি, আমাদের অভিজ্ঞতা, এস্থেটিক ট্রেনিং, আবেগ, অনুভূতি, নৈসর্গিক সচেতনতা ইত্যাদির মিশ্রণে যা হয় সেখানে 'ওয়েস্টার্ন' বা 'ইস্টার্নের' কোন তফাৎ নেই। কিন্তু আমরা সোজাসুজি প্রকৃতির ভেতর যাচ্ছি। তারপর যা হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের কাজ।

**আচ্ছা, নৈসর্গিক সচেতনতা বলতে আপনি কি 'মিন' করেন?**

নৈসর্গিক সচেতনতা, কসমিক রিয়েলিটি, বলতে সূর্য দেখছো, চন্দ্র দেখছো, তারকারাজি? তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার মোটামুটি ধারণা। তাদের নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি অনুভব করেছো? সেটা যে কি ব্যাপার তার সম্বন্ধে তোমার অনুভূতি আছে কি? সেই কথাটাই একটি ফুল, একটি গাছ, মানুষ এবং সকল জীবের মধ্যে বিরাজমান।

**আচ্ছা কিঙ্করদা, আপনার ভাস্কর্যের ভেতর অনেকটা রিয়ালিস্টিক বস্তুর সঙ্গে মিল রয়েছে। কিন্তু পেন্টিং-এর ভেতর সাধারণতঃ তা দেখা যায় না। অন্যান্য অনেকেই এ প্রশ্নও আমাকে করে থাকেন।**

উত্তরে কিঙ্করদা আমাকে একখানা 'অয়েল পেন্টিং' দেখিয়ে বললেন—'দেখ দেখি এই ছবিখানা, মিল রয়েছে কিনা?' দেখলাম প্রকৃতির সঙ্গে অদ্ভুত মিল। তবে তার বৈশিষ্ট্যটুকুও সমানভাবে বিদ্যমান। মূর্তিতে যেমন ছবিতেও তেমনি। কিন্তু 'গায়কি'র, স্টাইল, তফাৎ আছে। আর সেটা থাকবেও। থ্রিলটা থাকতে হবে। আবার উনি বললেন, 'উপায় নেই, কারণ আমি তো আর ক্যামেরা নই।'

**আচ্ছা আপনার কাজের মধ্যে, পেন্টিং-এর মাধ্যমে বেশী তৃপ্তি পান, না মূর্তির মাধ্যমে বেশী তৃপ্তি পান?**

হ্যাঁ, বেশ প্রশ্ন করেছো। মোক্ষম প্রশ্ন। তবে কি জানো, দুটোতে দুরকমের টান আছে। যখন নৈসর্গিক পরিস্থিতির মধ্যে কিছু দেখি, তখন পেন্টিং হয়ে যায়। তখন রঙ আসে। ফ্ল্যাট ক্যানভাস আসে। আর মূর্তির বেলায় সেটাই আরো 'সংহত' হয়ে একটি রঙবিহীন মাধ্যমে এসে পৌঁছোচ্ছে। যেমন অন্ধকারে একটা বাচ্চার গায়ে হাত বুলোই। চারদিক থেকে তাকে অনুভব করছি।

**আচ্ছা, প্রকৃতি নিজেই হচ্ছেন সেরা শিল্পী এবং আমরা সব কিছুই তার কাছ থেকে পাচ্ছি তো?**

তোমার প্রশ্নের উত্তর তোমার কথার মধ্যেই হয়ে গেছে। তার কারণ, প্রকৃতির যে 'ডিজাইন', তার ভেতরে 'স্বতঃ-প্রসূত প্রকাশ', ক্রিয়েটিভিটি আছে। 'ইঞ্জিনিয়ারিং', 'ডিসকভারি', 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' শব্দ তার থেকেই। আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি। কি যে হবে কে জানে? আমরা সবাই অনুপ্রাণিত।

**আচ্ছা পৃথিবীতে যতগুলো মাধ্যম আছে, মানুষ যতরকম 'মাধ্যম'-এর ভেতর চলেছে**

**আমি দেখলাম সব 'মাধ্যমে'র মধ্যে 'আর্ট'ই একমাত্র মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে মানুষ সহজে একমাত্র সেই 'বিশ্বস্রষ্টা'কে চিনতে পারে। তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। তাকে জানতে পারে এবং তার কাছে পৌঁছে নিজেও চরম আনন্দ ও শান্তি লাভ করতে পারে। তবে আমি নিজে শিল্পী বলে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব করছি না। এটা আমার প্রাণের কথা।**

হ্যাঁ, বেশ দামী প্রশ্ন। আবার সেই অনুভূতি, জীবনের অভিজ্ঞতা, নৈসর্গিক সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ, শব্দের অনুভূতি—এসব মিলিয়ে একটি 'অহৈতুকী'র প্রকাশ। যে জন্যে আইনস্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিকও বেহালা বাজাতেন। দা-ভিঞ্চির মতো ম্যাথেম্যাটিশিয়ান, বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ার ছবি আঁকতেন। রবীন্দ্রনাথের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম।

**আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন, ছবিতে কথা বলবে কি?**

কথা বলে চোখের জলের মধ্যে। ধর তোমার মা, বাবার ছবি আঁকলাম, কি কথা বলছে? বুঝবে কি?

**আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকেই এই এক মনোভাব পোষণ করেন যে, ছবি এঁকে কি হবে? ওতে কি পেট ভরবে?**

মানুষ বেঁচে থাকে পেট এবং মন নিয়ে। কিন্তু পেটের কথাই খালি যদি ভাবো, তবে মনের কথাটা বাদ পড়ে যাবে। মানুষ আর মানুষ থাকবে না, পশু হয়ে যাবে। কিন্তু শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ তাঁরা কিন্তু থামবে না। আমাদের উপস্থিত পরিস্থিতি অনুযায়ী শিল্পী হিসাবেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ভার নিতে হবে। সামাজিক উন্নয়নের সহায়তায় সাহায্য করতেই হবে। যেটা আমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন। সেই কাজেই আমরা লেগে আছি। দানাপানি কিছু কিছু মিলছে। সেটা কি কম কাজ? তা নয়। উপরন্তু এই 'অহৈতুকী' কাজটা করছি। এর যে কী মূল্য আছে জানি না।

**আজকাল আমাদের প্রায় প্রত্যেক শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রে 'নন্‌-ম্যাট্রিক' ছাত্রদের পক্ষে শিল্প-শিক্ষার সুযোগের অভাব। এতে সত্যিকারের শিল্প-প্রতিভা যাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে, তাদের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে কি ন্যায্য হচ্ছে?**

তোমার শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্রের কথা আমি জানি না। যাঁরা প্রতিভাশালী তাঁদের কেউ লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তবে লেখাপড়ার দরকার আছে। রবীন্দ্রনাথ নন্‌-ম্যাট্রিক। তিনি এতো লিটারেচার, এতো শিল্প, সঙ্গীত সৃষ্টি করলেন কি করে? তার কারণ হচ্ছে তাঁর ভেতরের অগ্নি।

**আমাদের আগেকার শিক্ষকদের উপদেশ ছিল 'অয়েল কালার' নিষিদ্ধ। কিন্তু আপনি দেখছি 'অয়েলে'র মাধ্যমে ছবি আঁকছেন?**

'অয়েল' যেটা বলছো সেটা ছোট 'তিসি'র তেল। আর আমাদের ভারতবর্ষে জন্মায়। এবং আমাদের কলুরা সেটা তৈরী করে। এই তেলটির একটা বিরাট বন্ধনী শক্তি আছে। সহজেই শুকিয়ে যায়। এবং স্থায়ী হয়। সেইজন্য আমি

আমার ছবিগুলো আঁকি সেই মাধ্যমে। এবং ধুলোতে ফেলে দিই। প্রদর্শনীর সময় সেগুলো টেনে এনে জল দিয়ে ধুয়ে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু জলরঙে কি হবে? কে তার যত্ন নেবে? এখন কথা হচ্ছে, কি ধরণের কাজ করতে চাও? ভারতীয় শৈলী হিসাবে করবে, না, পাশ্চাত্য শৈলী হিসাবে করবে, সেটা তোমার দায়িত্ব।

**পরিপ্রেক্ষিত জিনিসটা কি? এবং সেটার সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? ছবির ভেতর পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্ব কতটা?**

পরিপ্রেক্ষিত মানে আমি যা বুঝি, দূর এবং কাছের যে বিশদ প্রকাশের উপায়, সেটাই হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত পদ্ধতি। ধরো, সূর্য বহু দূরে, চন্দ্র বহু দূরে। কিন্তু তোমাকে আমি দেখছি তিনফিটের মধ্যে, এর যে ব্যবধানের রঙ এবং আকৃতি তার যে বিভিন্নতার পদ্ধতি সেটা আমাদের করতে হচ্ছে। ওতো গেল সূর্যচন্দ্রের ব্যাপার। কিন্তু তুমি তিনফিটে আছো আর একজন দশফিটে কি দুফিটে আছে, তার যে রঙের এবং আকৃতির বৈচিত্র্য তারও ধারণা আমাদের করতে হয়। তা না হলে ছবির ভেতর তোমার ঐ নৈসর্গিক প্রকাশ হবে না।

**আচ্ছা, যদি তাই হবে তবে মিশরীয় (ইজিপ্সিয়ান পেন্টিং-এর) পরিপ্রেক্ষিতের কোন প্রভাব দেখছি না কেন? তাব সম্বন্ধে কি বলেন?**

সেই পরিপ্রেক্ষিত আলাদা, সেখানে একটা জমিনের, ফ্ল্যাট সারফেস, উপর ওখানে কাজ হয়েছে। সেখানকার পরিপ্রেক্ষিত পদ্ধতি ওটা ব্যঞ্জনা ব্যাপক, সিম্ব-লিস্টিক। তার মানে ধরো, ডানাওয়ালা পরী করলে—ওর পরিপ্রেক্ষিত কোথায় যাচ্ছে? তার ধারণা কি? সেটা হচ্ছে চতুর্থ সপ্তকের মা পা-তে যাচ্ছে। পরি-প্রক্ষিতের চাক্ষুষ যেটা সেটা চলে যাচ্ছে অন্য জায়গায়। সেইখানে তার ঐ নৈসর্গিক পরিপ্রেক্ষিতের আর একটা দিক।

**আপনি দেখছি 'ওযাটার কালার' ও 'অয়েল কালার' এদুটো সমানভাবে করেন? কিন্তু তেল ও জলরঙ এ দুটোর ভেতর কোনটায় বেশী মজা পান?**

জলরঙ ও তেলরঙে তফাৎ বিশেষ কিছু নেই। আছে লাইনে এবং তার আকৃতিতে, ডিসপ্লে

**আচ্ছা ঋত্বিকদা, একটা প্রশ্ন আমার প্রায়ই মনে জাগে। সেটা হল, 'হোয়াট ইজ টু বি ক্রিয়েটেড দ্যাট ইউ অলরেডি ক্রিয়েটেড বাই হিম (গড)। উই আর অন্‌লি টু রিক্রিয়েট দোজ থিংস।' বিশ্বে যা সৃষ্টি হবার হয়ে গিয়েছে এবং হচ্ছে। আবার কেন?**

বাঃ, বেশ মোক্ষম প্রশ্ন। তবে সেটা হচ্ছে কি জানো? সেটা হচ্ছে আমাদের বায়ুরোগ। আমরা যা দেখলাম প্রকৃতির মধ্যে সুখে, দুঃখে, সৌন্দর্যে, অনুভূতিতে তারই একটা অন্য মাধ্যমে প্রকাশ করার ব্যর্থ চেষ্টা এবং ব্যাকুল ক্রন্দন। কিছু করতেই হবে, উপায় নেই। যেমন একটা শিশু কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর স্বপ্ন দেখে। আমাদের কাজও হোল সেই স্বপ্নের অভিব্যক্তি। সেখানে তখন

সেই ব্যাকুল ক্রন্দনের চোখের জল আর থাকে না। শিল্পী-শিশু কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে, স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের ভিতর 'সুন্দরে'র আবির্ভাব হয়। আনন্দাশ্রু বইতে থাকে। তুলি, কলম, লেখা সব কাজ শুরু হয়ে যায়। নৃত্য শুরু হয়। শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সঙ্গীতে, নৃত্যে কাজ শুরু হয়ে যায়। সেটাই শিল্পের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি।

পঙ্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

## শুধু শিল্পের জন্যই যা কিছু এই আমার শেষ কথা

কয়েক বছর আগে কলকাতার গা থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে বিদেশী নায়কদের মূর্তি। কয়েক বছরে মধ্যে অনেক নতুন মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে কলকাতার এপ্রান্তে ওপ্রান্তে। তবুও মন যেন ভরেনি। মূর্তি পাচ্ছি। মানুষটাকে পাচ্ছি না। এ শুধু সাধারণ মানুষেরই বুকের ব্যথা নয়। যাঁরা শিল্পী তাঁদেরও।

তাহলে কলকাতার আধুনিক ভাস্কর্যের চেহারাটা কী রকম? একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ভাস্করের চোখ দিয়ে বিষয়টাকে খতিয়ে দেখলেই বা কেমন হয়? এই প্রস্তাবকে শিরোধার্য করে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সবিনয় নিবেদন জানালেন শান্তিনিকেতনের প্রসিদ্ধ ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ-কে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ষোলআনা সম্ভাবনাকে মনে রেখেই। কিন্তু আমাদের সব আশঙ্কাকে এক ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি সাড়া দিলেন এক ডাকেই। হয়তো এর সবচেয়ে বড় কারণ, জ্বলন্ত জ্যৈষ্ঠ। শিল্পীর জন্ম মাস। আকাশ থেকে আগুন ঝরার এই দিনগুলোতেই সৃষ্টির নেশায় মাতাল হয়ে ওঠেন তিনি।

দুদিনের জন্যে শান্তিনিকেতন ছেড়ে তিনি চলে এলেন কলকাতায়। আমরা পেশ করলাম আমাদের নির্ধারিত প্রস্তাব। যখন শুনলেন, তাঁর মন্তব্য ছাপা হবে কাগজে, ঘাড় বাঁকালেন, 'না, আমি কাউকে ছোট করতে চাই না।' আমরা প্রত্যুত্তরে জানালাম, 'আমরাও তা করিয়ে নিয়ে ছোট করতে চাই না আপনাকে। আমরা শুধু আপনার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে বুঝে নিতে চাই ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কলকাতা ছোট হয়ে আছে কিনা।'

শহরে ছড়ানো মোট ২১টি মূর্তি। প্রতিটি মূর্তিকেই তিনি দেখেছেন চারপাশ থেকে ঘুরে, নিবিষ্ট ভঙ্গীতে। বার বার গাড়ী থেকে নেমেছেন, উঠেছেন, ঘামে শরীর ভিজে গেছে। বার বার জর্জরিত হয়েছেন আমাদের অবিরল প্রশ্নে, তবু বিরক্ত নন। তবুও ভাঁটা পড়েনি উৎসাহে। আচরণ দেখে মনে হয়নি তিনি এখন ৭০ বছরের বয়স্ক বৃদ্ধ। যেন আঠারোর চিরযুবা। মুখে থৈ থৈ হাসি। কথার ফাঁকে ফাঁকে হাঃ-হাঃ হাঃ

---

**যাঁদের দেখেছি**

**গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্র সদন, একাডেমি অব ফাইন আর্টস, রবীন্দ্রভারতী), আউটরাম, নেতাজী (রেড রোড ও শ্যামবাজার), টিলক, দেশবন্ধু, ক্ষুদিরাম, গিরিশ ঘোষ, স্বামীজি (হেদুয়া, গোলপার্ক), বাঘা যতীন, বিদ্যাসাগর, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সূর্য সেন, আশুতোষ মুখার্জী, সুরেন ব্যানার্জী, যতীন দাস, লেনিন।**

---

আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থান পার্ক স্ট্রীট। দেবীপ্রসাদের গান্ধীজি। ঘেরা রেলিংয়ের দরজা ঠেলে লাল মোরাম মাড়িয়ে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন ঐ বিশালাকায় মূর্তিটির পাদদেশে।

**কেমন লাগছে ?**

হাঁটছেন না তো! মনে হচ্ছে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। স্টেপিং আছে। তবু হাঁটছেন না। সেই স্মার্ট লোকটাকে দেখছি না। আঃ, কত স্মার্ট লোক ছিলেন, ছুটে ছুটে যান। ওঁর ট্রেন এসে না দাঁড়াতেই বেরিয়ে গিয়ে ছুট একদম। গোল হয়ে ভীড়ের লোক ভলানটিয়ারদের বলছে, 'কে গান্ধীজি, কই গান্ধীজি,' পালিয়ে গিয়েছেন তার আগেই, হয়নি। কী যেন হয়নি।

**গান্ধীজির একটা মোটামুটি পরিচয় আমরা এখানে পাচ্ছি কি ?**

তা আছে। কিছুটা চলা আছে। কিন্তু চাদরটা উড়ে উড়ে পড়ছে কেন ?

**আচ্ছা চাদরটা কি স্বাভাবিক ? না জাস্ট একটা সাপোর্ট দেওয়ার জন্যে ?**

সে যাই হোক, আসলটা কি বেরুচ্ছে ? সেইটেই কথা। সে আমরা সব অনেক-রকম করি। তবে, এই যে বুকটা খুলে গেল, কাপড়টা কোথায় ? উড়ে পড়ছে ? গান্ধীজির কাপড় ওড়ে ? এ্যা ? এদিক থেকে মনে হচ্ছে কাপড়টা শুকোতে দিয়েছে! এই যে গাছের ডালটা, এটা আলাদা করে বসানো। মিলছে না, রিয়ালিস্টিক হয়ে গেছে। মাথাটা অত ঝুঁকে কেন। গান্ধীজি হাঁটবেন, বুক ফুলিয়ে। তেজটা কই ?

**পোর্ট্রেটটা ? মিলেছে কি ?**

ওতো দূর থেকে দেখবে লোকে। আদলটা ধরা পড়বে। আসল কথা পার্সনালিটি। সেইটেই ফোটাতে হবে।

**আপনার কি মনে হচ্ছে ? ফুটেছে সেটা ?**

তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

পার্ক স্ট্রীট ছাড়িয়ে গাড়ী চলল ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হলের দিকে, আউট-রামের মূর্তিটা দেখবেন। গাড়ী থেকে না নেমে দূর থেকেই দেখলেন।

'হ্যাঁ। খুব ভাল। আচ্ছা হাতে যে একটা সোর্ড ছিল ?'

**মূর্তিটাকে কি ঠিক জায়গায় রাখা হয়েছে ?**

বেশ তো। গাছের ছায়া। এখন অবসর। বিশ্রাম নিচ্ছেন। একটা এ্যাসে-সিয়েশন আছে। তবে আরো উঁচু পেডেস্টালে আরও ওপেন স্পেসে রাখা উচিত। আগেকার কালের কাজ। ক্লাসিকাল। শক্ত কাজ।

**এই ধরনের মূর্তি' সরানো সম্বন্ধে আপনার কি মত ?**

যেটা শিল্প সেটা থাকবে। সবই থাকা উচিত। সরাবে কেন ? সরানো অন্যায়।

**ওই যে অন্য একটা মূর্তি তে লায়ন দেখছেন, এতো ব্রিটিশদের সিম্বল। এসব কি এখনো থাকা উচিত ?**

লায়ন তো আমাদেরও। অশোকস্তম্ভের লায়ন। সে কত যুগের। মত বদলালে মূর্তি বদলাবে কেন ? কত সেন্ট রয়েছেন আমাদের দেশে। যেমন বুদ্ধ, মহাবীর। মূর্তি তো তেমন ভাঙা হয় নি। পুরীর মন্দির বুদ্ধ মন্দির ছিল। সেটাকে হিন্দু মন্দির করে দিল। সেইরকম হয়েছে একটু আধটু।

আমরা এলাম রবীন্দ্রসদনে। সদ্যস্থাপিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তির কাছে। কোন কথা না বলে অনেকক্ষণ দেখলেন। তারপর বলে উঠলেন, 'ভলুম বাড়িয়েছে খুব। শীতের দিনে কাজটা করা নাকি ? জোব্বাটা কম্বল হয়ে গেছে হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ........'

**হাসলেন কেন ?**

দাড়ি দেখলেই বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। আমিও করেছিলাম। বড় হয়েছে।

**কী বড় হয়েছে ? দাড়ি ?**

না, মাথাটা, চুলের ট্রিটমেনটটাও ঠিক হয়নি।

**নাক ?**

দাঁড়াও, প্রোফাইলটা দেখি। না। হয়নি। ইকুইলিয়ান নাক। ভাঁজটাও নেই। ডানহাতের কাপড়ের ফোল্ডগুলোও হয়নি। ভুঁড়িটা বেশী হয়ে গেছে। ভুঁড়ি সামান্য ছিল। তবে আরো ভিতরে হবে।

**আচ্ছা পিছনের হাতটা দেখছেন ?**

হাত। হ্যাঁ, আজানুলম্বিত বাহু। ভুল হয়েছে। সোজা করলে হাঁটু পেরিয়ে যাবে। তাই না ?

**সিঁথিটা ?**

সিঁথি আছে নাকি ? আছে ? ওঃ। ওটা আগের। বৃদ্ধ বয়সে ছিল না। চুলটা ঠিক হয়নি, চুলের ওপর একটা অদ্ভুত মায়া ছিল। এক চুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। হ্যাঁ, ঠিক। বেঁটে হয়েছে মূর্তিটা।

**সাড়ে চারের মত দেখাচ্ছে বডিটা। আপনার কি মনে হয় ?**

ভিস্যুয়ালি যা দেখেছি, উইদাউট মেজারমেণ্ট, ক'মাত্র হচ্ছে ? ৬ মাত্রা, আমাদের নিয়ম মতন। হয়নি। আরো ফুটদুয়েকের মত লম্বা হবে। অবশ্য হাইট বাড়িয়ে দিলেই যে ভাল হোতো, তা নয়। ট্রিটমেণ্ট-এর উপর নির্ভর করছে।

**আচ্ছা, গান্ধীজির মূর্তি দেখে আপনি বললেন যে, স্মার্ট লোকটাকে পাচ্ছেন না। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তেমনি কি পাচ্ছেন না বা পাচ্ছেন ?**

পার্সনালিটি। সেইটেই আগে। তার উপরে কিছু নেই।

**সেটা কি ফুটেছে ?**

খুব সাধারণ কাজ। সাধারণ, লুজ ওয়ার্ক। ভুলই যখন করল, ভাল করে

ভুল করলে পারতো। সে বরং ভাল ছিল। কী বল?

দেখুন, কলকাতাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি, এটা রবীন্দ্রনাথের শহর। সেই শহরে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি'টা কি রকম হওয়া উচিত?

সে আলাদা করতে হবে। চলো।

আমরা এলাম একাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর প্রাঙ্গনে। সেখানেও রবীন্দ্রনাথের মূর্তি। কংক্রীটের।

'কে করেছে?'

'সেলিম মুন্সী। আপনারই তো ছাত্র।'

'মনে হচ্ছে যাত্রা দলের এ্যাকটর। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। সেদিক দিয়ে অবশ্য পোট্রেটটা ভালই হয়েছে। হাতে কি? বই? কলেজে যাচ্ছেন নাকি? এর চেয়ে রবীন্দ্রসদনে কার্তিক পালের একটু জ্ঞান আছে। চলো, চলো…।'

এরপর রেড রোড ধরে সুভাষ চন্দ্রের কাছে। ঘুরে ঘুরে চারপাশ থেকে দেখলেন। প্রদোষ দাশগুপ্তের কাজ।

'হাতে ওটা কী?'

'রেনকোট।'

'অত বড় বর্ষাতি কেন? পায়ে গামবুট। বৃষ্টি হচ্ছিল বুঝি? সিঙ্গাপুর তো?'

কেমন লাগছে আপনার?

বর্ষাতিটা বেশী হয়ে গেছে। বাঁ হাতটা ঢেকে রেখেছে। তাই উইক হয়ে গেছে। জোর নেই।

আচ্ছা, মুখটা কি একটু কচিকচি লাগছে না সামনে থেকে?

তা ওই রকম একটু ছিল। আমি তো দেখেছি। গোলগাল ভাব। এখানে বেশী লাগছে।

তাহলে মিলিটারী পোষাক পরানো হলো কেন? ধুতি পাঞ্জাবী পরালেই হতো।

ওয়েস্টার্ন জেনারেলদের দেখে করেছে। ওরা এইরকম একটা গাউন দেয় তো। তবে দেবীদার[১] গান্ধীজির চেয়ে এটা ভাল। একসেপট পিছনের ঐ রেনকোর্টটা, আদার ওয়াইজ অল রাইট।

এরপর আরও দুটি মূর্তি। টিলক এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। 'তা মন্দ কি, তা মন্দ কি'—বলে তিনি এগিয়ে যেতে চাইলেন। এগোলাম। তারপর ক্ষুদিরাম, এসেম্লী হাউসের কোনে। দেখামাত্রই অভিভূত।

'এই তো, খুব ভাল কাজ, কে করেছে?'

'তাপস দত্ত।'

'কে? তোমরা চেনো?'

১. দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

'গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে'র ছাত্র ছিল। আমাদের চেয়ে সিনিয়র।'

'কাজ করে এখনও ?'

'করে নিশ্চয়ই। আপনার ভাল লাগছে ?'

'খুব ভাল। সকলেই ভাল বলবে, শুধু আমি নয়। এই রকমই তো ক্ষুদিরাম। যতগুলো মূর্তি দেখলাম, তার মধ্যে এর পাতিনার কাজও ভাল। সবুজটা এই রকমই করতে হয়। পিছনের হাতে কী ? ওঃ, হাতটা বাঁধা। ফাঁসীর মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডিফাইং ডেথ। আমি হলে হাতে বোমা দিতাম। ক্ষুদিরাম মানেই তো বোমা। হাঃ-হাঃ-হাঃ……'

এরপর কিছুক্ষণ চা-পানের জন্যে বিরতি। বিরতি শুধু ঘোরার। প্রশ্নের নয়। 'আচ্ছা কিঙ্করদা, আমি হরিপদ রায়ের একটা লেখায় পড়েছি, রবীন্দ্রনাথ নাকি একবার নন্দলালকে ডেকে বলেছিলেন, 'আপনারা শান্তিনিকেতন ছেড়ে কিছুদিন জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে স্টাডি করুন।' তখন নন্দবাবু বলেছিলেন, 'গুরুদেব, আমাদের এই শাস্তিটা দেবেন না। যদি শিশুর হাসি আর নারীর স্তন দেখতে না পাই, আমরা শিল্পীরা মরে যাব। কথাটা কি সত্যি ?'

'হ্যাঁ। হতে পারে। একটা যোগাযোগ রয়েছে। স্তনের সঙ্গে শিশুর একটা যোগাযোগ রয়েছে তো। নন্দবাবু যদি বলে থাকেন, নন্দবাবু ঐরকমই বলেন, বড্ড কাটা কথা, একেবারে ক্লিয়ার কাট। গান্ধীজিকে বলেছিলেন একবার। গান্ধীজি বললেন, 'আচ্ছা কোনারক-টোনারকে এই যে সব মৈথুনী মূর্তি, এগুলো কি ভাল ?' নন্দবাবু বললেন, 'থিনক অব ইওর ফাদার এণ্ড মাদার।' একটা কথা, বুড়া চুপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ……'

'আরও একবার এমনি বলেছিলেন। আপনার মনে আছে ? হরিপুর কংগ্রেসের কথা ?'

'হ্যাঁ। নন্দবাবু কংগ্রেসের পতাকার উপর কাপড়ের তৈরী ফুল বসিয়েছেন। নেতারা বললেন, জাতীয় পতাকার উপরে আর কিছু থাকবে না। সবাই গান্ধীজিকে গিয়ে ধরল। নন্দবাবু বললেন, 'সবার উপরে থাকবে আর্ট।' গান্ধীজি বললেন, 'নন্দবাবু যা বলছেন, তাই হবে।' 'একটা কথা, ব্যস। চলো এবার বেরোই।'

বাইরে চিতা জ্বলছে। চিতার আগুন ঠেলে গাড়ি ছুটে চলল শ্যামবাজারের দিকে। পথে গিরিশ ঘোষের মূর্তি। নাদুসনুদুস। বললেন, 'ভুঁড়িটা বেশ হয়েছে।' তারপর পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজীর অশ্বারোহী মূর্তি। দূর থেকে মূর্তির আদলটা দেখতে পেয়েই প্রশ্ন করলেন—

'ওটা কী ?'

'ওই তো নেতাজী।'

তারপর কাছ থেকে দেখলেন।

'এটা কি ? ঘোড়ার লেজ ? নেতাজীর নাম শুনেই ঘোড়ার লেজটা এমন খাড়া

হয়ে গেছে নাকি ?'

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন জোরে……। 'হরাইজেণ্টাল। ঘোড়া ঝড়ের বেগে ছুটলেও তার লেজ এরকম হরাইজেণ্টাল হয় না। এখানে তো ছুটছে না। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে গেছে।'

'ঘোড়া যদি প্রবল জোরে ছোটে তাতে কি সুভাষবাবুর পক্ষে ঐরকম রিলাক্সিং ভঙ্গীতে বসে থাকা সম্ভব ?'

'না। কাজটা ভাল হয়নি হে। কে করেছে ?'

'বোম্বাইয়ের একজন ভাস্কর, আপনিও তো ঘোড়ায় চড়া নেতাজীর অনেকগুলো ছোটখাট মডেল করেছিলেন, কী হল ?'

'করেছিলাম বটে। তার কম্পোজিশন অন্যরকম ছিল। এরকম নয়।'

**আচ্ছা, এরকম একটা বিজি জায়গায় কি এই জাতীয় মূর্তি বসানো উচিত ?**

সে তোমরা জানো। আমি কী বলবো। উচিত তো নয়। স্কাল্পচার তো চারদিক থেকে দেখার। এদিক ওদিক থেকে দেখতে হয়।

**চারপাশ থেকে তো আপনিও এই মূর্তিটা দেখলেন। কেমন লাগল, বলুন ?**

বলেছি তো ভাল হয় নি। সুভাষ চন্দ্রটন্দ্র কিছু হয় নি। ঘোড়াটাই সব খেয়ে ফেলেছে। ক্যারিকেচর হয়েছে একটা।

শ্যামবাজারেই প্রথম ভীড় জমে উঠল তাঁকে ঘিরে। ছেলে ছোকরাদের ভীড়। সকলেরই মুখে, 'কে ইনি, কে দাদা ?' প্রশ্ন উত্তর শুনে কাউকে বেশী উৎসাহী হতে দেখা গেল না। সম্ভবত ইনি চিত্রতারকা, খেলোয়াড় কিংবা পলিটিক্যাল নেতা এর কোনটারই আওতায় পড়েন না বলে। নেতাজীর পর আরও একাধিক মূর্তি তিনি দেখলেন, আজাদ হিন্দ এবং কলেজ স্কোয়ারে। স্বামীজী, বাঘাযতীন, সূর্য সেন, পি, সি, রায়, বিদ্যাসাগর দেখলেন। কিন্তু মন্তব্য করলেন না তেমন কোনো। বিবেকানন্দের মূর্তিটা সম্বন্ধে বিশেষ করে জানতে চাইলে, উত্তর দিলেন ঃ

'গুড-ই, গুড-ই। ভাল ভাল।' আর কিছু নয়।

শুধু ভাল লাগার খানিকটা খুশী ফুটে উঠল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মূর্তি দেখে। রাস্তা থেকে এ মূর্তি দেখার উপায় নেই। হকার্স কর্ণারের ঘেরাটোপ, ভিতরেও কদর্য নোংরা, উদ্বাস্তুদের ঘরসংসার, কাঁথাকানি, কাঠকাঠরা, উনোন। সে সব ডিঙিয়েই মূর্তির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা।

'হ্যাঁ, অবিকল সেই মানুষটা। দেখেছি। বাঁকুড়ায় গেছলেন। আমাদের ন্যাশনাল স্কুলে। গোঁফ, চুল, দাঁড়ানোর ভঙ্গীটি—সব সেই মানুষটার মত। খুব সাধারণ ধরনের মানুষ ছিলেন তো। সিমপল ম্যান। সেইটে আছে।'

**বিদ্যাসাগরও তো সিমপল ম্যান ছিলেন। তাহলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি'টা আপনার ভাল লাগল না কেন ?**

না, বিদ্যাসাগর সিমপল ম্যান ছিলেন না। সেটা শুধু বাইরে থেকে দেখতে।

সাজ পোষাকে। ভেতরে তো আগুন। তেজ। অতবড় তেজস্বী মানুষ হয়েছে আর। যে লোকটা মূর্তি গড়েছে সে তো শুধু খানিকটা চাদরের ফোল্ড এঁকে ছেড়ে দিয়েছে। চাদরের ফোল্ডটা কি বিদ্যাসাগর ?

প্রথম দিনের প্রদক্ষিণ পর্ব শেষ। গাড়ী ছুটে চলল মধ্য কলকাতার এক হোটেলের দিকে। গাড়ীর মধ্যেই আমরা তাঁকে প্রশ্ন করলাম—

'কলকাতার ভাস্কর্যের খানিকটা চেহারা তো দেখলেন। এই কলকাতায় আপনার নিজের কি কোনো একটা মূর্তি গড়তে ইচ্ছে করছে ?'

'কে আর করতে দিল। দিলে তো করতাম।'

'করবেন ?'

'কেন করবো না। তবে মন্ত্রীসভাটভা থাকবে না পিছনে। টেণ্ডারফেণ্ডার, মাতব্বরি নয়। তোমরা থাকবে। কাজ করবো। খানিকটা খোলা জায়গা দাও। পয়সা না থাকে চুন সুরকি সিমেণ্ট তো দিতে পারবে। তাতেই হয়ে যাবে। করবো একটা কাজ। বড় রকমের।'

আমরা, কলকাতাবাসীরা সত্যিই লজ্জিত। এই শহরে রামকিঙ্করের গড়া কোন মূর্তি নেই। কলকাতার রাক্ষসের মত রোদ্দুরকে কাঁপিয়ে শিশুর মত হেসে উঠলেন রামকিঙ্কর বেইজ।

রাত পোহালো। সকাল হতেই আবার মূর্তি প্রদক্ষিণের পালা শুরু। গাড়ী ছুটে চললো গড়িয়াহাটের দিকে। আমরা এসে দাঁড়ালাম গোলপার্কের শ্বেতশুভ্র বিবেকানন্দের মূর্তির কাছে। অনেকক্ষণ শিল্পীর মুখে কোন কথা নেই।

**কেমন লাগছে কিছু বলুন ?**

দাঁড়ানোর ভঙ্গীটার মধ্যে গোলমাল আছে। সামনের দিকে মাথার ঝোঁকটা বেশী। যেভাবে বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছেন সিংহের মত ভঙ্গী হবে। কই সেটা ? পা আর মাথার লেভেলটা ঠিক নেই। হিপস্‌টা সেইজন্যে উঁচু। তা তো হয় না এভাবে দাঁড়ালে। এই পোজটা না নিলেই পারতো, সবাই নেয়। আমেরিকান ফটো, শিকাগো ক্যালেণ্ডারেও খুব চলে।

**ড্রেপারির কাজটা দেখেছেন ? বুকের কাছে, ডানদিকে ?**

হ্যাঁ। তাই তো বলছি। ফটো দেখে করা তো। ফোল্ডগুলো ডিজাইনের মত প্যারালাল হয়ে গেছে।

**পিছনের সাপোর্টটা দেখেছেন ?**

হ্যাঁ। ওটা ঠিক হয় নি। কী দরকার ? ভয় পেয়ে দিয়েছে। মূর্তিটা পড়ে যাওয়ার ভয়। উইকনেস আর কি।

**আচ্ছা, স্কেচ অনুযায়ী মূর্তি'টা কি ঠিক হয়েছে ?**

আরো বড় হওয়া উচিত ছিল।

**কত বড় ?**

কত বড়, সে যিনি গড়বেন, তিনি জানেন। ঐ যে নারকেল গাছটা দেখছো, অতটা উঁচু হলেই বা ক্ষতি কী। তবে বড় হওয়া উচিত ছিল। লোকে তো দূর থেকে দেখবে। দূর থেকে একটা পার্সনালিটি চোখ টানবে, এইটেই তো চাই। নইলে শুধু একটা পাথর দাঁড় করিয়ে দিলে কী লাভ ? শিল্পীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। যাঁরা এসব করান, তাঁদেরই এটা বোঝা উচিত।

**শিল্পীদের দোষ নেই কেন ?**

আরে, তাদের তো আর বলা হয় না যে, এই জায়গায় যেমন মূর্তি মানায়, তেমনটা করে দাও, তাদের অর্ডার দেওয়া হল, ওহে, আমাকে একটা অত ফুটের অমুক মূর্তি বানিয়ে দাও। কোথায় বসবে না বসবে, বসলে কেমন মানাবে, সে তো কিছুই জানে না। আমার নিজের কী হয়েছিল ? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূর্তি। আমাকে তো বলা হল ২৫ ফুট হবে হাইট, তারপর স্পটে গিয়ে তো অবাক। ২৫ ফুট কী হবে এত বড় বাড়ীতে। হারিয়ে যাবে যে। বলে কয়ে আরো বাড়ালাম। তাতেই বা কী হয়েছে। আরো বড় সাইজ ডিমাণ্ড করছে।

গোলপার্ক থেকে দেশপ্রিয় এবং হাজরা। তাঁর ভাল লাগল কেবল যতীন দাসের পোট্রেটটুকু। 'যতীন দাস কি এখনো জেলখানায় ?' প্রশ্ন করেই হো হো হেসে উঠলেন। গাছপালার আড়ালে, লোহার খাঁচায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মূর্তিটিকে যেভাবে রাখা হয়েছে, তা দেখেই শিল্পীর এই পরিহাস। পার্ক থেকে বেরুবার মুখে ছোট্ট একটি মূর্তি। তাঁকে দেখালাম আমরা।

'এ ধরনের কাজ আপনার কেমন লাগে ?'

'খুব ভাল, আমি তো তাই চাই। বারবার বলছি ফ্রি-কম্পোজিশান। তবে পার্কের যা চেহারা। যত্ন কই ? এটা তো এখুনি ফেটে গেছে। কে করেছে কাজটা ?'

'উমা সিদ্ধান্ত।'

'ও, মেয়ে ? ভালই করেছে। ডিফেক্ট আছে কিছু। বাচ্চার মাথ'টা যেমন। তবু ভাল।'

হাজরা থেকে সোজা কার্জন পার্ক। সম্রাটের ভঙ্গীতে দাঁড়ানো সুরেন্দ্রনাথের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

'এই দেখ, দেবীদার কাজ। কতটা সেন্সিটিভ। একটা টেনস ভাব আছে। গাউনের ফোল্ডগুলো ন্যাচারাল। ওয়েটটা পাওয়া যায়।'

'পোট্রেট কেমন হয়েছে ?'

'ঠিক হয়েছে। যেমন মানুষ তেমনি। ছাতি ফুলিয়ে আছেন। কী যেন ছিলেন ? আন্-ক্রাউণ্ড কিং। সারেণ্ডার নট। সেইটে তো ধরা যাচ্ছে। ইংলিশ স্কুলের কাজ। দেবীদাতো ইংলিশ এ্যাকাডেমির ছাত্র।'

## আমি বিশ্বাস করি আর্ট বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়

সেই ১৯২৫ থেকে কতো বছর হয়ে গেলো টুকটাক এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে যাওয়া ছাড়া কখনো শান্তিনিকেতন ছাড়িনি। এখানকার প্রকৃতি, আবহাওয়া আমার মনের মতো। তখন তো আরও সুন্দর ছিল। আরও নির্জন। চাদ্দিকে রুক্ষ খোয়াই, প্রচণ্ড গরম। তার মাঝে নির্জন, ঠাণ্ডা, গাছগাছালিতে ঢাকা অচেনা উপত্যকার মতো শান্তিনিকেতনের আশ্রম। নন্দলাল বসু পড়াচ্ছেন। আমরা ছাত্র। বড়ো বাড়ী হয়নি। এতো লোক, এতো ব্যস্ততা ছিল না। ছবি আঁকতাম, মূর্তি গড়তাম, মাঝে মাঝে নিজেরাই নাটক করতাম, গান গাইতাম। একটা সুন্দর সুখী যৌথ পরিবারের সবাই হয়ে বেশ ছিলাম। ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, শান্তিনিকেতনকে জড়িয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছু জানতাম না তখন। এখনো।

আমি যখন শান্তিনিকেতনে নেহাত বালক মাত্র রবীন্দ্রনাথ তখনো বেঁচে। দেখেছি তাঁকে, দূর থেকে, দীর্ঘকায় তিনি। তখন ঈষৎ ন্যুব্জ। কখনো সকালের দিকে বসে আছেন ইজি-চেয়ারে, পেছনে হাত দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন একাকী উত্তরায়ণের মাঠে, সন্ধ্যা নেমে আসছে খোয়াইয়ের দিগন্ত ছুঁয়ে। কখনো বন্ধু-আত্মীয় পরিবৃত গল্প করছেন বসে বসে। ভয়ে ভয়ে কখনো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। মুখের রেখা, চোখ, কপালের কুঞ্চন গুরুদেবের মূর্তি গড়ার সময় সেসময়ের দেখা কাজে দিয়েছে। একবার তাঁকে দেখেছিলাম উত্তরায়ণের জানালায়, শোকাহত। মাথা নীচু করে টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসে আছেন। সি, এফ, এনড্রুজ মারা গেছেন। দূরে মাঠে দাঁড়িয়ে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় গুরুদেবের এই শোকাহত রূপ আমার মাথার ভেতরে তালগোল পাকিয়ে দিলো। ঘরে ফিরে এসে একটা স্কেচ এঁকে রাখলাম। পরে একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি করলাম। উনিশ শ' একচল্লিশ হবে বোধহয়। ৭৬ সেঃ মিটারের। কলাভবনের দোতলায় সেটা আছে এখনো।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছি মন দিয়ে। ভালো লাগে। ওঁর বিভিন্ন নাটক আমরা অভিনয়ও করতাম। আমার সবচেয়ে প্রিয় ওঁর গান। যতবারই আমি গুরুদেবের গানের কথা ভাবি, বিস্মিত হই। আনন্দের দিনে গেয়েছি ওঁর গান, দুঃখের রাতেও। যখনই যে মুডে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছি, ওঁর গান ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাই নি। আমি গানও গাইতে পারতাম ভালোই। গলাটা খুব দরাজ ছিলো বলে, আবেগ ছিলো বলে অভিনয়ের সময় গান গাইতে হবে এমন রোলই আমাকে দেওয়া হতো। আমরা যখন ছাত্র হয়ে আঁকা শিখছি নন্দলালবাবুর কাছে, তখন তো গুরুদেবও আঁকছেন।

কবিতার কাটাকুটি দিয়েই শুরু। ভালো খেয়াল। শেষ দশ বছর ঐ পাগলামিতেই পেয়ে বসেছিলো। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে খুব আলোচনা হয়। বিদেশের অনেক জায়গায় চিত্রশিল্পী হিসাবেই নাকি গুরুদেবের প্রধান পরিচিতি। কালার, স্ট্রোক, প্যাশন ইত্যাদি নিয়ে রবি ঠাকুরের ছবি সম্পর্কেও অনেকে আলোচনা করে। বিশিষ্টতা হয়তো আছে। তবে মূলতই খেয়াল। কবিতার কাটাকুটি করতে করতেই এসব ইচ্ছার জন্ম। ভালো। খারাপ কি ?

( রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙের ব্যবহার, কল্পনার অভিনবত্ব নিয়ে আমি একটা আলোচনা শুরু করেছিলাম। রামকিঙ্কর মন দিয়ে শুনলেন। হঠাৎ হেসে উঠলেন। সেই আত্মভোলা, পাগলাটে, শিশুসুলভ হাসি। কাঁপা কাঁপা হাতে বাঁদিকের বুক-সেলফ থেকে একটা বই বের করে রবীন্দ্রনাথের আঁকা কয়েকটা ছবি দেখিয়ে বললেন, 'এই তো, দ্যাখো না।' আমি যখন এই বিষয়টা নিয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা করতে যাচ্ছি, বললেন—'অন্য কথা বলো না ভাই। একই কথা বার বার।' )

রাবীন্দ্রিক বলে একটা শব্দ শুনি। এর অর্থ আমি জানি না। রবীন্দ্র ভক্ত ? হ্যাঁ, আমি তো তাই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পাগলামি বা অহেতুক বাড়াবাড়ি ? তা কেন করবো ? করে নাকি কেউ ? উনি তো একজন পর্বত প্রমাণ প্রতিভা। কারুর কিছুর অতিরিক্ততায় তাঁর কি যায় আসে ? তবে দেখেছি ওঁর উপস্থিতি, ব্যক্তিত্ব। ভোলা যায় না।

অবন ঠাকুর, গগন ঠাকুরকেও দেখেছি মুখোমুখি, অনেকটা দূরত্ব নিয়ে বসে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার ছবি আঁকতে। গগন ঠাকুরের ছবিতে রহস্যময়তা বেশী। মৃত্যু, অন্ধকার, একাকীত্ব, বিষাদ ইত্যাদি বিষয়কে অসম্ভব রঙে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। ছবিতে কিউবিজমের এমন সার্থক প্রয়োগ আমাদের দেশে তাঁর আগে বিরল। আলো আঁধারির কাজও অনেক বেশী। অবন ঠাকুর যেমন দেশীয় উপকরণ এবং দেশীয় স্বভাবের সাথে সাযুয্য রেখে ছবি এঁকেছেন, গগন ঠাকুর—সেভাবে দেখতে গেলে, কিছুটা বিদেশীয়। আর রোমান্টিক বিষণ্ণ জগত যা অবনীন্দ্রনাথের অনেক সিরিজেই লক্ষ্য করা যায়, তা গগন ঠাকুরে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। হয়তো সে কারণেই কিছুটা কম পরিচিত। অবন স্কুল অব আর্টের মতো গগন স্কুল অব আর্ট চালু হয় নি এদেশে। অবন ঠাকুর রঙ, বিষয় ইত্যাদি মিলিয়ে দারুণ ছবি আঁকতেন। ওমর খৈয়াম সিরিজের তো তুলনা মেলা ভার। দারুণ গল্প জমাতে পারতেন। এখানে যখন উপাচার্য ছিলেন, দেখেছি ছাত্র-ছাত্রীরা ঘিরে ধরে গল্প শুনতো। ওঁর এই কথকতার গুণ ওঁর গদ্যে। এমন চিত্রধর্মী গদ্য, রচনার গুণ, শৈলী যে-কোনো লেখকের পক্ষেই ঈর্ষার যোগ্য। ওঁর বাগেশ্বরী শিল্প বক্তৃতামালা ভীষণ জ্ঞানগর্ভ, ভীষণ জরুরী। ছবি আঁকা-আঁকির জগতে এতো বড় সহায়ক বই আমাদের ভাষায় খুব বেশী নেই। এতো বড়ো শিল্পী, এতো যাঁর নাম যশ, কখনো কিন্তু বিদেশ

যাননি। আমিও কখনো যাইনি। অবশ্য নেপাল যদি বিদেশ হয়, একবার গিয়েছি তাহলে।

নন্দলাল বসু তো আমার শিক্ষকই ছিলেন। অতো বড়ো একজন শিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করেছি, আমার সৌভাগ্য। শিল্পী হিসাবে যেমন মর্যাদাবান, শিক্ষক হিসেবেও তেমনি। অবন স্কুল অব আর্ট, যা বলা হয়ে থাকে, তার সবচেয়ে সার্থক ধারক। এতো বড়ো পেন্টার, এতো নিখুঁত স্ট্রোক। প্রায় সমস্ত ছবিরই বিষয় বা ব্যাক-গ্রাউণ্ড খুব সাদামাটা। সাধারণ চরিত্র, কমন ল্যাণ্ডস্কেপ, একেবারে গ্রামের কমপ্লিট ক্যারেকটার নিয়ে ওঁর ছবি। এই সাদামাটা সুরটাই আমাকে ভীষণভাবে টানে। আমার ছবি বা মূর্তির অধিকাংশ ক্যারেকটারই যে খুব সাধারণ তা অনেকটা নন্দলালবাবুর পরোক্ষ প্রভাব। আমি যখন গান্ধীজির ব্রোঞ্জের মূর্তি গড়ি, তা ১৯৬৫-৬৬ সাল হবে বোধহয়—দাণ্ডী অভিযানের ঐ রূপ, নন্দলালবাবুর একটা স্কেচ তার ব্যাক-গ্রাউণ্ড। কলাভবনের বাগানে একটা খুব বড়োসড়ো কালো কংক্রীটের গান্ধী মূর্তি আছে। দাণ্ডী অভিযানের মুড। কিন্তু সময়টা ধরেছি দাঙ্গার সময়। দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণে চলেছেন গান্ধীজি। পায়ের নীচে কঙ্কাল-করোটি। কোমরে সেই বিখ্যাত থলি এবং ঘড়ি। পায়ের কাছে শান্তির বাণী খোদিত রয়েছে। আমারই করা। ঠিক কমপ্লিট কাজ নয়। ঋত্বিক ঘটকের এটা অবশ্য খুব প্রিয় কাজ বলে মনে হতো। ও বলতো, 'এই মূর্তিটার মধ্য দিয়ে আপনি একেবারে রিয়েল গান্ধীজির অবদান মূর্ত করতে পেরেছেন।' গান্ধীজির আরেকটা ছোট ব্রোঞ্জের মূর্তি আছে কলাভবনের দোতলায়।

মোটামুটি ঐ সময়ের শিল্পী যামিনী রায়। খুব বড়ো শিল্পী। যাকে বলে, ফিনিশড আর্টিস্ট। বিভিন্ন মুডে ছবি আঁকতেন। পেয়ে গেলেন কালীঘাটের পটের মিডিয়াম। ঐ মেজাজেরই ছবি আঁকতে শুরু করলেন। আমাদের দেশের নিজস্ব লৌকিকতা, উপকথা, গ্রামীণ রূপ, মাতৃরূপ, বৈষ্ণব গাঁথা ইত্যাদি নিয়ে ছবি আঁকতেন। এতো বড়ো দেশীয় শিল্পী খুব কম পেয়েছি আমরা। রঙ এবং রেখার ব্যবহার শিক্ষণীয়। শুনেছি ভারতীয় শিল্পী হিসেবে বিদেশে ওঁর পরিচিতিই নাকি বেশী। এমন কোনো দেশ নেই যেখানে ওঁর ছবি নেই। অথচ কোনদিন বিদেশে যান নি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় বা ছবি বিক্রীর জন্য। বিদেশীরাই তাঁর বাড়িতে এসে ছবি কিনে নিয়ে গেছে। আমাদের জেলারই লোক উনি। বাঁকুড়ার। বেলেতোড় অঞ্চলের।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তো আমারই সহপাঠী। জন্মাবধি ওঁর একটা চোখ অন্ধ, অন্য চোখে সামান্য দেখতে পেতেন। ঐ সামান্য দৃষ্টি নিয়েই ছবি আঁকতেন। এখন তো সবই গেছে। পুরোপুরি অন্ধ। তবু ছবি আঁকা বন্ধ রাখেন নি। এমন অসামান্য জেদ একমাত্র ওঁকেই মানায়। হিন্দী ভবনে ওঁর কিছু ছবি আছে। খুব কমপ্লিট ছবি। একটা মুরালের কাজ সত্যি দেখার মতো। আমরা দু-একজন একই

সঙ্গে পড়েছি নন্দলাল বসুর কাছে। অবৈতনিক কাজ করেছি কলাভবনে। নন্দলালবাবু তখন পেতেন পঞ্চাশ টাকা। পরে আমি আর বিনোদবাবু পেতাম সাড়ে বারো টাকা করে। দু'বেলা মাছ ভাত আর টিফিন হিসাবে লুচি হালুয়া—লাগতো দশ টাকা। বাকী টাকায় হাত খরচা চলতো। তবু আমরা আনন্দে ছিলাম। প্রাণের আনন্দে কাজ করেছি। শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবিনি কোনোদিন। শুনেছি, সত্যজিৎ রায় ওঁকে নিয়ে একটা ছবি করেছেন। দেখিনি। সত্যজিৎ তো তখন এখনকার সত্যজিৎ নয়। কমার্শিয়াল আর্টের ছাত্র হয়ে এখানে এসেছিলেন। খুব অল্পদিনের জন্য। ফিরে গিয়ে বহুদিন পরে একটা 'বই' করেন। সেটা দেখেছিলাম। পথের পাঁচালী। বিভূতিভূষণের লেখা। ভালো লেগেছিল সিনেমাটা। আর কিছু দেখিনি। এখন তো ওঁর বিশ্বজোড়া খুব নাম ডাক। ভালো 'বই' করে শুনেছি।

প্রথম প্রথম শুধু ছবি আঁকতাম। পরে মূর্তি গড়ায় মন দিই। ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার সময় বার বারই যে কথাটা আমার মনে হতো, আমাকে স্বতন্ত্র হতে হবে। ভীষণভাবে স্বতন্ত্র। কোনো স্কুল অব আর্ট-এর যোগ্য উত্তরসূরী বা অন্য কারোর মতো ছবি আঁকা—এসব করলে আমি নিজে শিল্পী হিসাবে স্বতন্ত্র চিহ্নিত হতে পারবো না। এক্ষেত্রে আমাকে স্বার্থপর হতেই হবে। সেই সময় আমি সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখতাম কোন আঙ্গিক বা মিডিয়াম, কোন বিষয়, কোন শৈলী এখনো ব্যবহৃত হয়নি। শিল্পের কোন অঞ্চলে এখনো একটিও আঁচড় পড়েনি। ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার সময় আমি এ বিষয়ে সব সময়ই সতর্ক থেকেছি। আলাদা হতে চেয়েছি। আমার প্রায় সমস্ত মূর্তিই খোলা আকাশের নীচে। ঘরের চৌহদ্দি থেকে আমি তাদের মুক্তি দিতে চেয়েছি। প্রায় সবই বড়ো বড়ো সাইজের। খোলা মাঠে, আলো-বাতাস-বৃষ্টি-জ্যোৎস্নায় তারা বেশ আছে। প্রায় সবকটা মূর্তিই মুভিং। স্থবিরতায় আমার বিশ্বাস নেই। ইউক্যালিপ্টাসের মাঝখানে যে 'সুজাতা' দাঁড়িয়ে আছে সেও কিন্তু স্থির নয়। পায়েসের পাত্র মাথায় নিয়ে সেও চলেছে। সমস্ত শরীরের শেপটা দিয়েছি নিষ্পত্র বৃক্ষের কাণ্ড। এমন কি, ঐ যে 'সাঁওতাল পরিবার'—কলাভবনের বাগানে রয়েছে—একটি সাঁওতাল পুরুষ. কাঁধে বাঁক, এক বাঁকে মালপত্তর, আরেক বাঁকে একটি শিশু বসে, পাশে সাঁওতাল রমণী, মাথায় জিনিস-পত্তর, পাশে একটি কুকুর—এও মুভিং। চলেছে। বসে নেই। এটা করেছিলাম বোধহয় ১৯৩৮-এ। ডাইরেক্ট কংক্রিট। এমন কি 'কলের বাঁশি' মূর্তিটাও তাই। কংক্রিটে করা। কলাভবনের বাগানে এটাও আছে। একেবারে রাস্তার ধারে। এই মূর্তিটার ভেতরে আমি পথের চলমানতাকে ধরার চেষ্টা করেছি। দুটি সাঁওতালী মেয়ে। একেবারে ভরা যুবতী। কলের বাঁশী শুনে পুকুরে স্নান করে কাপড় শুকোতে শুকোতে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে। পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে। স্থির মডেলে আমার বিশ্বাস নেই। আমার মডেল তারাই যাদের আমি

সকাল সন্ধ্যায় দেখতাম। পাশেই পিয়ার্সন পল্লী। ওখানে সাঁওতালরা থাকে। রোজ সকালে ওরা ঐভাবে কাজ করতে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে। আমি রোজ যাদের দেখতাম, মিশতাম—তারাই আমার মডেল। আমার অধিকাংশ কাজ, বিশেষত মূর্তি, আলোর অভিলাষী। অন্ধকারে আমার মোটেও বিশ্বাস নেই। প্রায় সমস্ত কাজই করেছি দিনের আলোয়, প্রখর রোদে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। বেলা তিনটে পর্যন্ত কলাভবনে শিক্ষকতার শেষে কাজ করতাম। ফলে গ্রীষ্মকাল আমার প্রিয়। যদিও এই বীরভূমে গ্রীষ্ম দারুণ দুঃসহ—তবু কাজের সুবিধার জন্য এই সময়টাই আমার প্রয়োজনে লাগতো। শান্তিনিকেতনে বর্ষাও খুব সুন্দর। নিঃসঙ্গ খোয়াই জুড়ে বর্ষা নেমে আসতো। আমাদের আশ্রমের গাছগাছালির মাঝে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির শব্দ শোনা, সেই দৃশ্য, অসম্ভব সুন্দর। এই বর্ষা নিয়ে তো অনেক কবিতা লিখেছেন গুরুদেব। অনেক গানও। প্রত্যেক ঋতুরই নিজস্ব রং আছে। নিজস্ব আবেদন। এমন কি রাত, দিন—দুটোরই আলাদা রূপ, ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। প্রতিটি ঋতুই সে অর্থে ইমপরট্যাণ্ট। ছবি আঁকতে গেলে তা মনে রাখতে হবে। আমার জল রঙে আঁকা বিভিন্ন ল্যাণ্ডস্কেপে এসব ধরার চেষ্টা করেছি। ফাঁকা মাঠ, পুকুর পাড়, ঝর্ণা, খোয়াই, নিঃসঙ্গ তালগাছ, জ্যোৎস্না বিভিন্ন ঋতুতে এদের বিভিন্ন মুড—আমার প্রিয় সাবজেক্ট। ছবিতে ওরা আছে।

## ২

বিকেল বিকেল শান্তিনিকেতন পৌঁছেছিলাম, আমি আর গৌতম। ট্যুরিস্ট লজে নির্দিষ্ট ঘরে জিনিসপত্তর রেখে একটা রিক্সা নিয়ে রওনা দিলাম। রামকিঙ্করের সঙ্গে দেখা করবো বলে।

এর আগে দুদিনের জন্য মিশেছিলাম ওঁর সঙ্গে। রতনপল্লীতে। গিয়ে দেখি ভগ্নস্তূপ হয়ে আছে। জরাজীর্ণ, মলিন চেহারা সেবারই দেখে গিয়েছি। কিন্তু এমনভাবে যে ভেঙ্গে পড়বে বাড়ীটা বুঝি নি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম ঐ দিকের বারান্দায় আমরা কয়েকজন গুণগ্রাহী ওকে ঘিরে বসেছিলাম। অনেক কথা, অনেক তরল মেশামেশি হয়েছিল সেদিন। সুন্দর জ্যোৎস্না ছিল সেবারে।

বাগানে সিমেণ্টে তৈরী উড্ডীন পাখী। মলিন। শ্যাওলা জমেছে। লাল মাটির দেয়াল একা একা দাঁড়িয়ে আছে। এ জমিটা ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরীর। রামকিঙ্করের ছাত্র। এখন তাই তিনি ফর্টি-ফাইভ কোয়ার্টার্সের কুড়ি নম্বর কোয়ার্টারে।

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি। বেশ শীত। সন্ধ্যা নামছে। বাতাস কেটে রীতিমতো সোঁ-সোঁ ঝড় তুলে ঝাঁকে ঝাঁকে আম্রকুঞ্জে ফিরে এলো পাখী।

কলাভবনের বাগানের সামনে রিক্সা দাঁড় করাতে হলো। 'সাঁওতাল পরিবার' 'কলের বাঁশী' 'ধান ঝাড়া' সন্ধ্যার শীত গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে। এমন ছন্দময়

দৃঢ়তা, এমন আদিম উপজাতীয় পেলব রুক্ষতা, ভীষণ বাস্তব, এতো বিশাল, এতো আবেগ এবং গতিশীলতা—অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমশঃ। ভীত এবং বিহ্বল হয়ে পড়া ছাড়া কোনো রাস্তা নেই।

৩

কুড়ি নম্বরে কড়া নাড়লাম। 'কে ? ম্যানা দেখ তো রে কে এলেন ?' 'দাঁড়ান।' 'ম্যানা, ম্যানা, এই ম্যানা'—সেই উদাত্ত, ভরাট, অতি ব্যস্ত, ঈষৎ জড়িত কণ্ঠস্বর।

দরজা খুলে দিল একটি মেয়ে। বছর কুড়ি বাইশের। এই-ই বোধ হয় ম্যানা। হাতে কুপি। লোডশেডিং এখানেও।

'আমি, আমার নাম……' পরিচয় এবং উদ্দেশ্য জানালাম। 'বোসো, বোসো। দরজাটা বন্ধ করে দাও। ঠাণ্ডা আসবে।'

আমরা দুই বন্ধু মোড়ায়। শুয়েছিলেন রামকিঙ্কর। উঠে বসলেন তক্তাপোষে। মাথার উপরে মশারি চাঁদোয়া করে রাখা। গায়ে সোয়েটার। পায়ে গরম মোজা। বড়ো বড়ো চুল এলোমেলো। লেপটা সরিয়ে রাখলেন পাশে।

সামনে একটা ছোট টুল। টুলের উপরে পিকদানী। উডবাইনের প্যাকেট। বিড়ির বাণ্ডিল। জবা ফুল। নীচে অসমাপ্ত বোতল। কুপি জ্বলছে।

মাথার পিছনে বইয়ের র‍্যাকে কয়েকটা বই। ডানদিকে একটা টেবিল। টেবিলের ওপরে সেলোফিন চাদর গায়ে জড়িয়ে একটা টেবিল ফ্যান একপাশে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

দেয়ালে অজস্র ঝুল। কোনো ছবি নেই। এমনকি একটা ক্যালেণ্ডারও।

৪

দেয়াল ফাঁকা রাখতে হয়। ফাঁকা দেয়াল দেখলেই আঁকার ইচ্ছে জাগে। নিজের শিল্পকর্ম যদি দেয়ালে চোখের সামনে টাঙিয়ে রেখে মোহিত হয়ে বসে থাকি তাহলে নতুন ছবি নিয়ে ভাববো কবে। একজন শিল্পীর শিল্পকর্ম তার চোখের সামনে রেখে দিতে নেই।

তবে এখন তো আঁকতে পারি না। পায়ে বাত, কোমরে যন্ত্রণা, হাত কাঁপে, বুকে অসম্ভব শ্লেষা, চোখে দেখতে পাই না কিছুই। পড়তে পারি না। কেউ পড়ে দিলে শুনি। কেউ ধরলে হাঁটতে পারি। একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছি। অনেক কিছু মাথার ভেতরে ক্রশ-পাজল খেলে। ছাত্র-ছাত্রীরা মাঝে মাঝে আসে। তাদের বলি। কিন্তু নিজে এঁকে উঠতে পারি না। হাত অসম্ভব কাঁপে। সমর্থ বয়সের অত্যাচার তার শোধ তুলে নিচ্ছে। প্রকৃতির নিয়ম। মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়। পাগল পাগল লাগে। কিন্তু কিছুই করার নেই। একেবারে বাতিল হয়ে গেছি। রিটায়ার্ড হয়েছি বয়স যখন ছেষট্টি। এখন উনসত্তর।

না, কলকাতা শহরে আমার গড়া কোনো মূর্তি নেই। কোনদিন কেউ বলেওনি কিছু করতে। ওখানে যারা বসে আছে, তারা নিজেদের নিয়ে এতো ব্যস্ত যে কখনো বলার সুযোগ পায় নি। ঐ শহরে বেশ কয়েকবার প্রদর্শনী হয়েছে। একক এবং যৌথভাবে। বিভিন্ন জয়েণ্ট একজিবিশনে এখনো ছবি যায়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে গেছি খুব কম। শেষ গিয়েছি তাও বছর তিনেক কি চারেক হয়ে গেলো। অমিতাভ চৌধুরী আমার খুব প্রিয়। উনিই ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্ণেন্দু পত্রী ছিলো সঙ্গে। কলকাতা শহরে গত কয়েক বছরে তো বিভিন্ন ধরনের মূর্তি বসানো হয়েছে. তার সম্পর্কে মতামত জানাতে। প্রায় সব কটা মূর্তিই খুব হাস্যকর। কোনো ব্যালেন্স বোধ নেই। কোন ক্যারেকটারই উঠে আসে নি। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সুরেন্দ্রনাথের মূর্তিটি এর ব্যতিক্রম। সবচেয়ে হাস্যকর শ্যামবাজার মোড়ে নেতাজীর মূর্তিটা। একটা কুমীর যেন ঘোড়ার পেছনে কামড়ে ধরেছে। তেমনি হাস্যকর রবীন্দ্রসদন এবং একাডেমীতে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি। কোনো প্রপোরশন জ্ঞান নেই। তবু এইসব মূর্তি শহরে থাকবে। প্রচুর অর্থব্যয়ে তৈরী হয়েছে তো।

আমি তো এই শান্তিনিকেতনে ছেড়ে বিশেষ কোথাও যাইনি। দিল্লী, বোম্বে মাঝে মাঝে গেছি। দিল্লীতে বেশ কিছুদিন ছিলাম। ঐ 'যক্ষ-যক্ষী' মূর্তিটা গড়ার জন্য। দিল্লীর রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আছে। সবাই খুব ভালো বলে শুনেছি। ওটা বেশ কষ্ট করে মন দিয়ে করেছিলাম। যদি সে অর্থে বিদেশ বলা যায় তবে একবার গেছি নেপালে। তাও কাজ করতে। আর কোথাও যাইনি। বহুবার বিদেশ যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছি। যাই নি। কি হবে গিয়ে? দেশ ছেড়ে লাভ কি? আমার ছবি আঁকা, মূর্তি গড়ার যা প্রেক্ষাপট, যারা অনুষঙ্গ—তারা তো সব এখানেই আছে। বিদেশ গিয়ে শিখবোই বা কি? ওদের সব কিছু খবর তো এখানে বসেই পাওয়া যায়। আর ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়া? সে তো নিজের এলেমের প্রশ্ন। তার জন্য অতো দরজায় দরজায় ভিক্ষে করা কেন? অনেকেই যান অবশ্য। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিল করে সেই তো ফিরে আসতে হয় এই দেশে। অবন ঠাকুর বিদেশে যান নি। যামিনী রায় যান নি। শুনেছি বড়ে গোলাম আলিরও সেই এক ব্যাপার।

ঋত্বিক ঘটক প্রায়ই আসতো আমার কাছে। ওর দাদা মণীশ ঘটকও আসতেন। দিনের পর দিন থেকেছেন ওঁরা। ওঁদের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগতো। ঋত্বিকের মধ্যে একটা জেদ ছিলো, অভিমান ছিলো, অনেক অসন্তোষের বিক্ষোভ ছিলো। অনেক কিছু জানতো ও। ব্যাখ্যা করতে পারতো সুন্দর। আমার উপর ছবি তুলবে বলে একবার অনেক দলবল নিয়ে এলো। সুটিং করলো। রাত্রি, জ্যোৎস্না. আমার মূর্তিদের অনেক ছবি তুললো। ওঁর সঙ্গে আমার একটা আলোচনার সুটিং ছিলো, তাও তুললো। ছবিটা কমপ্লিট হয়েছে। নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু ছবিটা আজ পর্যন্ত বেরুলো না। কি জানি, কেন? ওঁর স্ত্রী চেষ্টা করছেন, শুনলাম। ওঁর নাকি এরকম অনেক ছবি আছে, রিলিজ হয় নি। সেগুলো রিলিজ হলে নিশ্চয়ই এটাও বেরুবে।

ঋত্বিকের কোনো ছবি আমি দেখিনি, এর জন্য ওঁর আফশোষ ছিল। আসলে আমি তো একদমই ফিল্ম-গোয়ার নই। একটা ছবি দেখেছিলাম অনেকদিন আগে। 'গুড আর্থ'। দারুণ ভালো লেগেছিল।

(আমি কয়েকবার বললাম, 'যদ্দুর শুনেছি, ছবিটা কমপ্লিট হয়নি। আলাউদ্দিনের উপরেও একটা ডকুমেণ্টারি করা শুরু করেছিলেন ঋত্বিক। সেটারও ভবিষ্যৎ জানা নেই।' উনি জোরের সঙ্গে বললেন, 'হতেই পারে না। অন্য কোনো ব্যাপার থাকতে পারে। ঋত্বিক কোনো কাজ ইনকমপ্লিট করার লোক নয়।' আমি আর কিছু বললাম না, হয় সত্যিসত্যিই পুরো ব্যাপারটা আমার জানা নেই। অন্যথায় শুধু শুধু সত্যি কথায় ওঁর আশায় চিড় ধরতে পারে।)

আসলে একই সঙ্গে পেণ্টার এবং স্কাল্পটার খুব কমই হয়েছে এই দেশে। রবীন্দ্রনাথ বা অবন ঠাকুর বা নন্দলাল এঁরা মূলতই চিত্র শিল্পী। চিন্তামণি কর আগে ছবিই আঁকতেন, পরে পুরোপুরি ভাস্কর্যে চলে যান। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী যেমন ছবি আঁকতেন, তেমনি মূর্তি গড়তেন। যখন ছবি আঁকি তখন ছবিই আঁকি। যখন মূর্তি গড়ি তখন মূর্তিই গড়ি। কখনো বিরোধ বাঁধেনি দুইয়ে। দীর্ঘকাল তো দুটোই চালিয়ে গেলাম। মূর্তির গড়ার আগে কখনো এঁকে নিই, তারপর ষোল ইঞ্চির একটা মডেল গড়ি। সেটাকে তারপর আনুপাতিক বড়ো করি। জিওমেট্রিক্যাল কনসেপশন মূর্তি তৈরী করার ব্যাপারে ভীষণ জরুরী। ব্যালেন্স বোধও চাই। অধিকাংশ শিল্পীরই এটা নেই। ভালো করে মাটির মূর্তিই বানাতে জানে না। আমি তো প্রথম প্রথম মাটির মূর্তিই গড়তাম। অনেক পরে ঐসব কংক্রিট, পাথর বা ব্রোঞ্জের মূর্তি গড়ি। শেষ বড়ো কাজ করেছি দিল্লীর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঐ 'যক্ষ-যক্ষী' মূর্তি। ঐ দিল্লীতেই প্রথম একক প্রদর্শনী হয় আমার। ১৯৪২-এ।

অনেকেরই ছবি দেখেছি বা মূর্তি দেখেছি আমি। যেহেতু কখনো বিদেশ যাইনি, ডাইরেক্ট কোনো কাজ দেখি নি, বই পড়েছি, জেনেছি ওঁদের সম্পর্কে। প্রভাবিত হয়েছি কি না, সে চুলচেরা বিচার করবেন—আছেন সেরকম কিছু সমালোচক। অনেক পড়েছেন তাঁরা। অনেক জানেন। মিল খুঁজে বের করতে ওস্তাদ তাঁরা। সে অর্থে প্রিয় বলতে আমার কেউ নেই। পিকাসো তো আমাদেরই সমসাময়িক। সেজান বোধহয় একটু আগে। ভ্যানগগ, গঁগা, গোইয়া, রেমব্রাণ্ট আমার ভালো লাগে। এঁরা অনেকেই নমস্য। তবে অধিকাংশরই ভাগ্য ভালো তাঁরা ইউরোপে জন্মেছেন। হাততালি ওখানে তাড়াতাড়ি বেজে ওঠে। জাহাজে করে নামগুলোও পৌঁছে যায় বিভিন্ন দেশে খুব সত্বর। তবে সে অর্থে বলা যেতে পারে পিকাসো আমার ফেভারিট। ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তবে কিছু মডেল যা তৈরী করেছেন তার প্রায় সবই বোগাস। ভাস্কর বলতে ম্যুর বা রঁদা আছেন। রঁদাই আমার প্রিয়। ওঁর কাজের সঙ্গে আমার মিল আছে প্রচ্ছন্ন। আমি

কোনদিন কোন স্থির মডেল নিয়ে কাজ করিনি। রঁদাও তাই। বলতেন মুভ মুভ। মুভমেণ্ট না হলে ক্যারেক্টার জীবন্ত হয় না। আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ানো মানুষজন, তাদের মুভমেণ্ট, কথা বলা, হাসি, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের মিশে থাকা আমার স্মৃতিতে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি মূর্তি গড়তে পারি।

৫

যে-কোনো বড়ো শিল্পকর্মের পেছনেই বড়ো আবেগ। অন্ধ আবেগ। আর প্রেম? সে তো থাকবেই। প্রেম ছাড়া ঐসব ছবি, মূর্তি করতে পারতাম? সে তো এসেছেই। বারে বারে। বহুবার। নিঃশব্দ চরণে নয়। ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, লয়ের কারুকিরির মতো। 'বিনোদিনী' পেইণ্টিং বা 'সুজাতা', 'নারীর মুখ' 'কলের বাঁশী'র মতো মূর্তি গড়বো কি করে: আমার জীবনে যতো ইম্পর্ট্যাণ্ট প্রেম এসেছে, সবই আমি রেখার আদলে ক্যানভাসে এঁকে রেখেছি বা মূর্তি গড়েছি। 'সুজাতা' মূর্তিটা তৈরী করি 'জয়া আপ্পাস্বামী'কে দেখে। ওরই আদলে। এখানে পেইণ্টিং নিয়ে পড়তো। আমারই ছাত্রী। ওর সঙ্গে আমার কোনো প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ওর ফিগার ছিলো খুব সুন্দর। লম্বা ছিপছিপে। মূর্তি গড়া শেষ হলে নাম দিলাম 'জয়া'। নন্দলালবাবু নাম বদলে রাখলেন 'সুজাতা'। যেন মাথায় পরমান্ন নিয়ে 'সুজাতা' চলেছে বুদ্ধদেবের কাছে। তখন ওখানে এতো বাড়ীঘর হয়নি। ইউক্যালিপ্টাসের অরণ্যে সুজাতাকে মানাতো ভালো। এখন সেই নির্জনতা নেই।

প্রেম এসেছে জীবনে। সেক্সচুয়াল রিলেশনও হয়েছে। তা কখনোই বলার নয়। কিন্তু একটা জিনিস, কখনো লেপটে থাকিনি। যদি কেউ সত্যি সত্যি কিছু ক্রিয়েট করতে চায়, তাহলে লেপটে থাকলে চলবে না। সবসময় যদি লেপটেই থাকবো, তাহলে ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়বো কখন। প্রেম, নারী—এসেছে স্বাভাবিক নিয়মে। এ নিয়ে ভাবিনি বিশেষ। স্বাভাবিক নিয়মেই তা চলে গেছে আবার। যখনি বুঝেছি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, তখনি ইতি টেনে দিয়েছি তাতে। আমার প্রাক্তন প্রেমিকারা কেউই তেমন কিছু হতে পারেনি জীবনে। মেয়েরা যেমন হয় আর কি। সব কমন লেডি হয়ে গেছে। শিল্পীসত্ত্বা বিঘ্নিত হতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই হয়তো বিয়ে করা হয়নি। ঠিক তাই বা বলি কি করে। বিয়ে করতে গেলে তো অর্থ চাই। প্রচুর অর্থ। ওটাই তো আমার ছিলনা। দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে চাকরী করেছি অবৈতনিক। পরে নন্দলালবাবু পেতেন পঞ্চাশ টাকা। আমি আর বিনোদবাবু পেতাম সাড়ে বারো টাকা করে। ঐ টাকায় তো আর বিয়ে করা যায় না। আর তখন তো ছবি আঁকছি, মূর্তি গড়ছি চুটিয়ে। এভাবেই চলছে বহু বছর। সবাই যে বয়সে বিয়ে করে, সে বয়সে তো অর্থের মুখ দেখিনি। অন্য চাকরীরও চেষ্টা করিনি। শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার কথা ভাবিনি কখনো। হয়তো ঠিক এটাও কারণ নয়। বিয়ে করার কথা যতবারই ভেবেছি, মনে হয়েছে

বাধ্যবাধক সংসার করলে ছবি আঁকার ক্ষতি হবে। ছবি আঁকতে পারবো না। মূর্তি গড়তে পারবো না—এই ভয় থেকেই বিয়ে করার কথা ভাবিনি। ভীতু ভাবছো? স্বার্থপর ভাবতে পারো। নিজের শিল্পসত্ত্বাকে বেশী ভালোবেসে ফেললে একটু ভীতু, একটু স্বার্থপর হতেই হয়। তুমি বিয়ে করেছো? করো আর নাই করো, কখনো শিল্পের জগৎ থেকে সরে যেওনা। যদি ভয় থাকে, ভীতু হয়ো, একটু ভেবে দেখো।

৬

মদ আমি আগে কখনো খেতাম না। যখন ঐসব মূর্তি গড়ছি, ঘুম আসতো না রাতে, ক্লান্ত লাগতো। পরিশ্রমও করতাম তখন খুব। কাজ করতাম সাধারণত দুপুরের রোদে। এই রোদের সঙ্গে আমার কাজের একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিলো। ফলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তাম। এই পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য একটু আধটু খেতাম। এভাবেই নেশা হয়ে গেলো। কাজের সময় অবশ্য কখনোই চূড়ান্ত নেশাগ্রস্ত হতাম না। মদ খেতে খেতেই কাজ করেছি। চূড়ান্ত নেশা করে অজ্ঞান হয়তো কখনো সখনো হয়েছি, কিন্তু সেটাই রুটিন ছিলো না। হলে কাজ করতাম কি করে? তবে কখনো রাস্তাঘাটে মাতলামো করিনি। খুব মদ খেয়ে ক্লাস করতে যাইনি। মদ্যপ অবস্থায় কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি। ফলে আমার মদ্যপান নিয়ে কখনোই শান্তিনিকেতনে ঝড় ওঠেনি। সে-সময় মদ খেতে কনসেনট্রেশন আসতো। ক্লান্তি অপনোদন হতো। কাজ করার প্রেরণা পেতাম। মদ তাই সঙ্গী। এখনো ছাড়তে পারি নি। ছাড়ার প্রশ্নও ওঠে না।

গান আমার খুব প্রিয়। শুনতো বড়ো ভালো লাগে। মিউজিকের সঙ্গে পেণ্টিং-এর কোথায় যেন ভীষণ একটা যোগ আছে। গান, বিশেষতঃ ক্ল্যাসিকাল, শুনতে শুনতে আমার মাথার ভেতরে অদ্ভুত একধরণের ছবি ফুটে ওঠে। আবেগ কাজ করে। ফৈয়াজ খাঁ, আমীর খাঁ ইত্যাদিরা ব্রেইনে ইমারত গড়তে জানেন। সামনা-সামনি বসে গান শুনেছি অনেকের। আর এই শান্তিনিকেতনে মিউজিক নিয়ে তো সর্বদাই পড়াশুনা চলছে। চর্চা চলছে। যশস্বী সংগীতকারেরাও আছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। আহা, কী গান তাঁর। গান আমি খুব একটা খারাপ গাইতাম না। সবাই বলতো, দরাজ গলা। শুনবে? এক লাইন, কি দু-লাইনের বেশী গাইতে পারবো না। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর…।' কেমন গাইলাম?

( এ আমার জীবনে অভূতপূর্ব সম্পদ। রামকিঙ্করের গলায় গান শুনলাম। বাঃ! অপূর্ব। )

অভিনয়ও করতাম আমি। একেবারে প্রথম জীবনে তো থিয়েটারের ড্রপসিন ইত্যাদি আঁকতাম। শান্তিনিকেতনে বহুবার অভিনয় করেছি। নাটক আমার প্রধান

প্যাসটাইম ছিলো। 'রক্তকরবী' নাটকে বিশু পাগলার রোলটা এখানে একসময় আমিই করতাম। গান গইতে পারতাম বলে ঐ রোলটা আমিই পেতাম। ( যথার্থই পেতেন রামকিঙ্করবাবু। বনিকী, স্বার্থপর, খ্যাতিলোলুপ, অর্থগৃধ্নু এই পৃথিবী তো আসলে এক যক্ষপুরী। সেই যক্ষপুরীতে আপনি সত্যই বিশু পাগল। কোনো কিছু প্রাপ্তির আকাংখ্যা না করে আপনমনে নিজের কাজ করে গেছেন। আর শিল্পীর যথার্থ মুক্তির পথনির্দেশ করেছেন। সেজন্যই আপনি বিচ্ছিন্ন। নিঃসঙ্গ। আপনার সমসাময়িক শিল্পীদের কাছ থেকে যেহেতু আপনি নন্-কনফরমিস্ট, আপনার জীবনযাপন অনেক বেশী অপ্রতিরোধ্য। দূরপয়াত্ত। অনেক বেশী রাস্টিক। যেহেতু আপনি বিশু পাগলা )।

আসলে আমার মনে হয়, আর্ট মূলতঃ যুক্তিবিহীন, কারণবিহীন। এবং শিল্পের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব শিল্পীর সৃজনের বন্ধ্যা ও কল্পনার দারিদ্র থেকে জন্ম নেয়। নিজের মধ্যেই সে একধরনের চাহিদা বহন করে থাকে। তা হলো পূর্ণ হয়ে ওঠার। কমপ্লিটনেসের চাহিদা।

আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব অভিজ্ঞতা, কৈশোরের কাহিনী, বই, শিক্ষক, আলাপচারী পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের চিরকালীন ঐতিহ্যের দুর্লভতম সংগ্রহশালা রয়েছে আমাদের মস্তিষ্কে। একজন শিল্পীর পক্ষে এসব জরুরী। তাও শিল্পীকে ভুলতে হয় তাঁর শিল্পকর্মের সময়। একে উত্তীর্ণ করে আরও কোনও বিশাল ঈপ্সিত সত্যের পথ নির্দেশ করতে হয়।

আর্ট একধরনের চ্যালেঞ্জ। বিশাল ঝুঁকি। জীবনের কুৎসিত নগ্নতা, সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সৃজনশীল প্রাণবন্ততার চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ এবং তার প্রতিক্রিয়া এক-জাতের খেলা। শিল্পের খেলা। হারজিতটা বড়ো কথা নয়। আজকের হার আগামীকালের জয় বলেও চিহ্নিত হতে পারে। অথবা বিপরীতও সত্য। খেলাটাই আসল। এই খেলা যে পূর্ণ আস্থা নিয়ে খেলতে পারবে সেই শিল্পী।

কোনোদিন প্রত্যক্ষ রাজনীতি তো করিনি, তাই বুঝতে পারি না শিল্পীর কতটুকু রাজনীতি করা উচিত আর কতটা করা উচিত নয়। আমার অনেক শিল্পী বন্ধু ছিলেন যাঁরা অনেকেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত সব ছেড়েছুড়ে দেন। অনেকে টিঁকে থাকেন। আবার অনেকে শুধু ফয়দা তুলে একটা পোজ নিয়ে বসে রইলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথা বুঝি না—এতো দ্রুত ভোল বদলায়। কিন্তু শিল্পী হিসেবে এই সমাজের প্রতি সবসময়ই কিছু না কিছু দায়িত্ব বর্তে যায়-ই। যিনি শিল্প করেন, তিনিও তো একজন মানুষ—সামাজিক জীব। এবং তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু তো সেই মানুষ—তাঁর সব জাগতিক এবং আত্মিক অনুভূতি। সুতরাং দাঙ্গা, দেশবিভাগ, মন্বন্তর, যুদ্ধ—যেখানে যত মানুষের প্রতি অপমান, শিল্পীকে আন্দোলিত করবেই। রবীন্দ্রনাথ বারবার আন্দোলিত হয়েছেন। যে কোনো মহান শিল্পীই হবেন। শিল্পীর উচিত তাই

আলোর কথা, ক্লেদ উত্তীর্ণ জগতের, জীবনের কথা ঘোষণা করা।

এখন কোনো কাজ নেই। বৃদ্ধ হয়ে গেছি। ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই আসে। বন্ধু-বান্ধব শান্তিনিকেতনে এলে দেখা করে। চিন্তামণিবাবু[1] কিছুদিন আগে এসেছিলেন এখানকার এগজামিনার হয়ে। দেখা করেছেন। এ অঞ্চলের প্রায় সব মানুষ আমাকে চেনেন। ভালোবাসেন। আড্ডা জমাতে আসেন। এই ঘরে বসে আজকাল টের পাই, বিভিন্ন বয়সের বেশ কিছু গুণগ্রাহী আছে আমার সারা দেশজুড়ে। প্রায় প্রতিদিনই কেউ-না-কেউ অনেকদূর অঞ্চল থেকে দেখা করতে আসে।

দ্যাখো—খ্যাতি, যশ বা অর্থ কোনোটা নিয়ে তো কোনোদিন ভাবিনি। ওসব নিয়ে বেশী ভাবলে কাজ করা যায় না। অর্থ তো পরবর্তী সময়ে এসেছে, আবার চলেও গেছে। ধরে রাখতে পারিনি। ধরে রেখে লাভই বা কি হতো? কলকাতা শহরে অনেক উঁচুতে একটা ফ্ল্যাট? তাতে আমার সুকৃতি কোথায়? এখনো তো স্বচ্ছল অর্থের মুখ দেখা যায়। বেশী আকাঙ্খা নেই। শান্তিনিকেতনের আগানে-বাগানে যেসব মূর্তি গড়েছি, তার ব্যয়ভার বহন করেছে কর্তৃপক্ষ। নিজে পয়সা নিইনি। বিক্রী করিনি। আমি মনে করি আর্ট বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়। কখনো কোন সমসাময়িক বা অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পী আমার তুলনায় বেশী পাবলিসিটি বা পপুলার হয়ে যাচ্ছে দেখে চিন্তিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ছবি সংরক্ষণ সম্বন্ধেও কখনো বিশেষ ভাবিনি। ভাবার সময়ই পাইনি। তুমি বলেছিলে না, ব্ল্যাক হাউস থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হোস্টেলটা তুলে দিয়ে সংগ্রহশালা করতে। কি লাভ তাতে? একটা মরা মিউজিয়াম-এর পরিবর্তে ওখানে জীবনের প্রবাহ বয়ে চলেছে। ভালোই তো। আফটার অল লাইফ ইজ ইমপরট্যান্ট।

আমার মনে হয়, ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার পর আমার দায়িত্ব শেষ। অহেতুক কোনো পাবলিসিটির চিন্তা না করলেও চলবে। আর তাছাড়া, শিল্প তো এক অর্থে রহস্যময় মায়া। এই-ই জীবনকে মূল্যবান করে তোলে। শিল্পের জগতে সত্যি সত্যি ভালো কাজ করতে পারলে মানুষ ঠিকই মনে রাখবে।

**সমীর চট্টোপাধ্যায়**

১. চিন্তামণি কর।

## মশাইরা—আমি চাক্ষিক, রূপকার মাত্র, শাব্দিক নই

.............................................................

### শিল্প ও নিজের সম্পর্কে আরো কিছু

'সুরেনের[১] সঙ্গে গিয়েছিলুম তোমাদের কলকাতায়। একটা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে। সে উপলক্ষে একটা পুস্তিকায় আমার বিষয়ে লিখতে গিয়ে একজন লেখক আমাকে সাঁওতাল বলে পরিচয় দিয়েছেন। অনেকেরই এরকম ধারণা আছে যে আমি সাঁওতাল। ধারণাটা ঠিক নয়। যাঁরা লেখেন, তাঁরা কি একটু খোঁজখবর নেওয়াও দরকার মনে করেন না? সাঁওতালদের মূর্তিটুর্তি বেশী গড়েছি বলেই বোধ হয় লোকে এরকম ভাবে। কিন্তু কেউ তলিয়ে দেখে না আমি বাঁকুড়ার লোক। যামিনী রায়ের বাড়ী ছিল আমাদের পাশের গ্রামে, বেলেতোড়ে। আমাদের বংশে আমি ছাড়া আর কেউ ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার কাজ করেনি। আমার 'বেইজ' পদবী নিয়েও অনেক কথা শুনি অনেকের মুখে। 'বেজ' পদবী এসেছে 'বৈদ্য' শব্দ থেকে। 'বৈদ্য' থেকে 'বৈজ'। এবং তার অপভ্রংশ হল 'বেইজ'।'

রবীন্দ্রনাথ আমাকে একবার বলেছিলেন, 'ওহে, শুধু ছবি আঁকলে আর মূর্তি বানালেই চলবে না। সেই সঙ্গে প্রচুর পড়াশোনাও করতে হবে।' এলিয়টের একখানা কাব্যগ্রন্থ দিয়ে বলেছিলেন, 'এখানা পড়ো। প্রথমে হয়তো ঠিক বুঝতে পারবে না, বারবার জোরে জোরে আবৃত্তি করে পড়ো দেখবে পরে বোধগম্য হতে আরম্ভ করবে।'

বিস্তর বই ঘাটাঘাটি করতাম। টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ডস্টোয়েভস্কি, বার্নাডশ'র বিস্তর বই আমি পড়েছি। বার্নাডশ'র Man & Superman আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে।'

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নিধুবাবুর টপ্পা সে এক মজার জিনিস। আমি দুটোই খুব বেশী পছন্দ করি, আমি দুটোই খুব গাইতে পারি।'

দু'একটা আধুনিক ছবির মতো তোমাদের আধুনিক কবিতা বুঝি না, কষ্ট হয় হে। তবু পড়ি, বুঝতে চেষ্টা করি কোথায় কি। মডার্ন, ম-ডা-র্ন হেঃ—য়েঃ।'

একবার কলকাতায় গেছি। এক রঙের দোকানে গিয়ে বললাম—'অয়েল কালার, অয়েল কালার নাম শুনেছি দোকানে আছে?' সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো টিউব বের করে দিলো। জিজ্ঞেস করলাম—'এ কেমন করে লাগায়?' দোকানী বলল,

১. সুরেন দে

'টিউব টিপে রঙ বের করবেন, তেল নেবেন, লাগাবেন ব্যস্।' সেই দোকানীই আমার অয়েল পেণ্টিং-এর গুরু।'

রামানন্দবাবু আমাকে শান্তিনিকেতন নিয়ে আসেন। রামানন্দবাবু তো পরিচয় করিয়ে দিলেন, কিন্তু টাকা পয়সার কথাটা আছে। খাব কি? হাঃ...হাঃ...হাঃ... ভাত কোথায় পাব? তা সত্যি কথা। তখন কমার্সিয়াল আর্ট করতুম। করে করে খাওয়াটা চলে যেত। বেশীদিন না, এই একবছরের মধ্যে কিছু ছবি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। আমার সুবিধা হয়ে গেল। তখনকার দিনে খাওয়াটা যে কম। মাসে দশ টাকায় তোমার খাওয়া হয়ে যাবে—হাঃ...হাঃ...হাঃ আজকের কথা নয় দশ টাকা!'

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'ভরে দাও, সব ভরে দাও। আমরা পারলাম না, তোমরা ভরে দাও।' উনি দশ বছর ধরে ছবি আঁকলেন, গান-কবিতা লেখা বন্ধ করে দেখিয়ে দিলেন, এমনি কেউ পারবে না। আমরাও পারব না। অন্য রবীন্দ্রনাথ আসবে। চিরন্তন, চিরন্তন ব্যাপার, চিরন্তন। কিছু ভয় নেই। গো অন, এগিয়ে চলো, বুঝলে...চরৈবেতি—কোন ভয় নেই। এই আর কি। বেঁচে থাকতেই হবে মানুষকে।'

জানো, অবনীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, 'আর্ট ফর আর্ট সেক নয়, আর্ট ফর পেট সেক।'

মানসিকভাবে যে শিল্প-চিন্তা আমার ভেতরে রয়েছে, যেকোন মাধ্যমেই হোক খুব বেশী মাপঝোপ না করে তাকে ফুটিয়ে তোলাটাই চিরকাল আমার নেশা হয়ে গেছে। এই তো মডার্ন, মডার্ন—সব আধুনিক।'

যেখান থেকে শিল্প হচ্ছে সেখানের সব কিছু নিতে নেই, কিছু রেখে দিতে হয়। আবার তার মধ্যে কিছু যোগানও দিতে হয়। এই যোগান দেওয়ার পুরো ব্যাপারটা আসে শিল্পীর মন থেকে।'

আমি আধুনিক কিনা জানি না, আমি যা অনুভব করি তাই প্রকাশ করি।'

যেখানে যত লাইন আছে সব আয়ত্ত করা উচিত। নেচার হচ্ছেন দেবশিল্পী, কতরকম সুন্দর সুন্দর লাইন সৃষ্টি করে চলেছেন। সেসব শিখে নিয়ে মনে রেখে পরে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে হবে। লাইন সুন্দর হলে ছবি ভালো লাগবেই। মানে থাক আর না থাক।'

এই শতকের পাশ্চাত্য শিল্পকলা আমাকে বেশী আকৃষ্ট করেছে। নিজের মনের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীদের অনেক মিল খুঁজে পেয়েছি। এই বাংলার লোকশিল্পকলাও আমাকে অনেক নাড়া দিয়েছে। ছোটবেলায় গ্রামে কুমোরদের কাছে গিয়ে পোড়ামাটির পুতুল গড়া দেখতে খুবই ভালো লাগত। কী নিখুঁত সেসব কাজ। এছাড়া জাপানের ও চীনের নিজস্ব একধরনের আর্ট আমার খুবই প্রিয়। আমাদের দেশে গুপ্তযুগের শিল্পকলা নিয়েই যেন বেশী মাতামাতি হচ্ছে কিন্তু পালযুগের দেবদানও কিছু কম নয়।'

আমি যা দেখেছি—যেমন শিবলিঙ্গ, মহেঞ্জোদড়ো, হরাপ্পা থেকে পাওয়া মূর্তি-

শিল্পে আমরা স্পষ্টভাবে যা পাই তার উপর আর পাচ্ছি না—চোখই তার একমাত্র উপায়। প্রকৃতিতে আমরা দুটি আকৃতি পাই—পুরুষ আর নারী। তৃতীয় হচ্ছে তার প্রযেনী—বাচ্চা। এই থীম-টি এক অদ্ভুত সুন্দর। এর উপর কত আনন্দ, কত সৌন্দর্যের খেলা চলেছে। এটিকে একটা ফর্মের ভেতর থেকে প্রকাশ করার চেষ্টা। তার নাম সিম্বল (symbol)। আজকাল খালি কথার প্রচার। এবং প্রচার। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কানেও ঢুকছে না। এতই যদি মেশিনের যুগ—এবার সাইলেন্সারের যুগ কবে আসবে তারই আশায় রইলাম।'

যা ভালো লাগে তাই করি। সবকিছুর অত ব্যখ্যা চলে না। আর্ট জিনিসটা চিরদিনের ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, অহেতুকী। কোন কিছু প্রপাগেট করবার কাজ তার নয়। কত কিছু রয়েছে পৃথিবীতে—গাছ, মানুষ, পাহাড়, শহর। একভাবেই না এঁকে, নানাভাবে আঁকলে ক্ষতি কি? রাশিয়ান আর্টে স্টেট আর স্টালিন ছাড়া কথা নেই। তাই অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টিস্টরা সব ছেড়ে চলে এসেছেন। কোন বাঁধাধরার মধ্যে থেকে আর্ট হয় না। কিন্তু তা বলে কি গান্ধীজির ছবি করব না? করব। যদি চাই। কিন্তু গান্ধীজি আঁকলেই ফার্স্ট প্রাইজ, অন্য কিছু করলে মার খেতে হবে, তা তো চলতে পারে না। শিল্পী সব সময় পথে রয়েছে। সে চলেছে। কোথাও আটকে নেই।'

একাডেমিক শিক্ষায় ওরা (West) দেখে দেখে অ্যানাটমির চর্চা করে ছবি আঁকে। ওরিয়েন্টাল বা মডার্ন আর্টে শিল্পীর নিজের কল্পনা বড়ো হয়ে উঠেছে। অ্যানাটমির শেকলে বাঁধা চর্চার চেয়ে ছন্দের ওপর জোর পড়েছে বেশী। ওরিয়েন্টাল আর্টের ছন্দপ্রধান রূপ থেকেই আধুনিক ইউরোপের শিল্পীরা অ্যানাটমি ও রিয়ালিজমের বাড়াবাড়ি ত্যাগ করেছেন। মডার্ন আর্ট তো এভাবেই জন্ম নিল—জাপানী ছবির প্রিন্ট দেখে। জাপানী ছবিতে অ্যাকাডেমিক পার্সপেকটিভ নেই অথচ বেশ দূরত্ব বোঝা যাচ্ছে—এসব দেখে ইউরোপের আর্টিস্টরা অবাক হয়ে গেলেন। আমাকে অনেকে বলে, পশ্চিমের শিল্পীদের প্রভাবে আঁকি। কিন্তু আমার ধারা তো এদেশেরই ধারা। এদেশের শিল্প কখনো নকল করে নি। ছন্দ হল তার ভেতরের কথা। পূজোর ঠাকুরের মূর্তির কথা যদি ছেড়ে দাও, আমাদের দেশের মূর্তির মোদ্দা কথা হচ্ছে স্ট্রাকচার, ছন্দময় রূপগঠন। তবে বাইরের পরিবর্তন কিছু হবেই, আগে শিল্পের পেছনে ধর্মের পটভূমি ছিল। এখন তা নেই। এখনকার দুর্গা প্রতিমা সিনেমা স্টারের মতো। ওরা বলে, দুর্গার চেহারাটা চাই অমুক স্টারের মতো, সরস্বতীটা অমুকের, কার্তিক হবে হয়তো অশোককুমারের মতো। আমি জিজ্ঞেস করি—অসুরটা কার মতো হবে? এখনকার ধর্ম হল জীবন। জীবনকে দেখে তার থেকেই ছবির বিষয়, রূপ নিতে হবে।'

ওরিয়েন্টাল আর্ট কিছুটা রিপ্রেজেনটেশন (প্রতিকৃতি) রাখতে চায়, একটা পরিচয়ের অবলম্বন। কিন্তু বস্তুর প্রতিকৃতি অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে একেবারে বাদ পড়েছে।

রেখা ডিজাইন প্রধান হয়েছে। স্ফিয়ার, সিলিণ্ডার, শোওয়া লাইন, খাড়া লাইন, বাঁকা রেখা বা তাদের উর্ধ্বগতি, নিম্নগতি—এই নিয়েই কাজ। কোনো রূপের অনুকরণ না করে কেবল ভেতরের সুরটি এতে ধরা পড়বে। সঙ্গীতও তো কপি করে না। বসন্ত রাগিনী গাইতে তবে তো গাইয়ে কোকিলের মতো কু-কু করতো। সুরটাকে নিয়ে একটা টাইপ ধরে দেওয়া তাঁর কাজ। কোকিলের ডাক, পাপিয়ার ডাক আলাদা করে কিছু নেই, সব মিলেমিশে বসন্তের পরিবেশ রচনা। অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ করা। রাগিনীর এভাবেই সৃষ্টি। অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টও সেই রেখা ও ছন্দে বাঁধা সঙ্গীত। নানাভাবে এই ডিজাইন, সঙ্গীত রচনা করতে করতে দেখতে হয় সুরটা ঠিক হল কিনা ; রচনা সুন্দর হল কিনা। আমাদের ক্ল্যাসিক্যাল গান একভাবে ইনফিনিটিকে ধরেছে শুধু সুর দিয়ে, অনুভব দিয়ে। কথা দিয়ে নয়। গুরুদেবের গান আবার আরেকভাবে সেই ইনফিনিটিকেই ধরেছে। সেখানে সুরের সঙ্গে কথাও আছে, অর্থও আছে। ছবিতেও তাই—কখনও বর্ণনা বা অর্থ দিয়ে ধরা হয়, কখনও হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের বর্ণনা বাদ দিয়ে শুধু রাগিনীর মতো রূপ দিয়ে। আমরা তো শিল্পের শিক্ষার দিকটা ওড়াচ্ছি না। শিল্পের মূল মন্ত্রগুলি শিখতে তো হবেই। কিন্তু আজকের দিনে এই আর্টের প্রতিও প্রবণতা রয়েছে, লোকে আনন্দ পাচ্ছে সেটা কেন স্বীকার করা হবে না? আমাদের প্রচলিত শিল্পধারা থেকে গুরুদেব প্রথম অন্য পথে গেলেন। অন্য অনেক বড় কবি ছবি এঁকেছেন—কিন্তু তাঁদের ছবি অত্যন্ত একাডেমিক। কারণ গুরুদেবের মতো দৃষ্টিশক্তি, অনুভূতির গাঢ়তা তাঁদের ছিল না। এই দুটির গুণ না থাকলে গুরুদেবও অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে ফেল করতেন। অন্য কবি হলে খুব কাব্যিকের ছবি আঁকতেন। এদেশের অনেক আঁকিয়ে তা করেছেন, আবার গুরুদেবেরই কবিতার লাইন ছবির তলে বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু গুরুদেব তা করলেন না। তাঁর ছবিতে রয়েছে বলিষ্ঠতা, ভাইটাল অবজারভেশন, ঘনভাব, ওয়ারমথ...আর তা ছাড়া অর্থে বাঁধা পড়া মন হঠাৎ ছুটি পেতে চায়। সাধারণ মানুষও হঠাৎ কথা ছাড়া সুর ভেজে চলে—তা করতে ভালো-বাসে। অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিও তাই।'

বিভিন্ন মুডে গুরুদেবকে দেখেছি, তাঁর কয়েকটি মুহূর্ত আমার সামান্য ভাস্কর্যে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। সফল হয়েছি সে দাবী তো আমি করতে পারি না। তবে গুরুদেব প্রশংসা করেছেন।'

রূপকারের কাছে শব্দের অর্থ অতি ক্ষীণ। রবীন্দ্রনাথ যখন রূপ নিয়ে কাজ করছিলেন, তখন দেখেছি তিনি নিঃস্তব্ধ থাকতেন। অথচ শব্দ নিয়ে তিনি প্রায় সারা জীবন কাটিয়েছেন। কথোপকথনের শিল্প, সঙ্গীতের শিল্প—এ দুটোই শাব্দিক। রূপশিল্পের বেলায় একেবারে চুপচাপ ধ্যান। মশাইরা—আমি চাক্ষিক, রূপকার মাত্র, শাব্দিক নই।'

ধরো একটা বাচ্চা। ছোট ছেলেমানুষ একটি। কাপড় পরে নি। তাকে তুমি

কোলে নিচ্ছো, আদর করছো কিন্তু যদি ফিমেল ফিগার নিউড করা যায় দর্শক সেটা খারাপ মনে করতে পারে। আমার কাছে সেটা খারাপ হচ্ছে না। আচ্ছা, যদি দর্শকের কথা যদি বলো, তাহলে দর্শকই মিথ্যা। আমিই সত্য। কেননা আমিই দেখছি। দর্শক যদি নিউড পছন্দ না করে তাহলে বেঁশ তো, সে কাপড় পরাই করবে। দর্শক দর্শকই, এ দর্শক আলাদা দর্শক। দর্শক ভগবান। ভগবান। ভগবানের চোখ। আচ্ছা, ভগবান কি কাপড় দিয়ে তৈরী করেছে মানুষ ? সে করেনি তো। তখন তো সে কুৎসিত বলছে না। তাই বলছি যে, একটা ছোট মেয়ে, কুৎসিত বলব ? তাহলে মেরে দাও তাকে। তাকে কোলে নিচ্ছ, আদর করছো, সে ভগবানের তৈরী যদি ধরো। একবার, একটা গল্প বলি, কোনারকে গেছি। ওখানে নিউড ফিউড সব আছে তো। একটা মেলা ছিল, অনেক লোকটোক ওখানে এসেছে। মা, ছেলেপুলে সব নিয়ে সেইসব মূর্তি দেখছে। কিন্তু আমাদের যদি আর্ট স্কুলের ছেলেরা যায়, তারা দেখে খিলখিল করছে। কিন্তু সেই লোকগুলি ঘুরে ঘুরে দেখছে, বলছে সব ভগবানের তৈরী। ভগবানের তৈরী। তখন তারা নিউডগুলো নিউড দেখছেই না কিন্তু। সফিস্টিকেশন বলে একে। আমাদের আর্ট স্কুলের ছেলেরা দেখছে, খিলখিল করছে, হাসছে। সেইজন্য আমাদের প্রফেসর নন্দবাবু, উনি বলে দিয়েছিলেন—ছেলেমেয়ে আলাদা-আলাদা সব দেখতে। আজকে আলাদা করবে, কালকে আলাদা করতে পারবে কি ? শিল্পী কোনদিন দর্শকের মুখ চেয়ে ছবি করেন না। কেন করবে ? সে তো ভগবানের পুত্র। সে কেন করবে। আমরা এমনি দর্শকের চোখের জন্য করি। আমরা যখন মানুষকে দেখছি, পুরোপুরিই দেখছি। এখন, আমরা কাপড়টা পরছি এমনি। কিন্তু আসল মানুষ যদি দেখি, তবে 'চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো।'

ইম্প্রেশনিজম। ওটা কিছু না। তুমি যা দৃশ্য দেখছো, তোমার চোখে তারই আভাস নিয়ে যেটা কাজ হলো সেটাই হচ্ছে ইম্প্রেশনিজম। সেইটার আবার রকমারি ব্যাপার আছে। ইম্প্রেশনিজম বলতে যেটা সেটা ফটোগ্রাফিতেও করছে। কিন্তু তার মধ্যে তোমার যে বিশেষত্ব একটা, তোমার মানসিক এফেক্ট, সেটা এসে যাবে ওর ভিতরে। সেইজন্য ফটোগ্রাফির সঙ্গে তফাৎ হয়ে যাচ্ছে একটু। এই হচ্ছে ব্যাপার।'

কিউবিক আর্ট হচ্ছে আমরা যা দেখছি সেটারই একটা কিউবিক ফর্মের মধ্যে ফেলছি। যেমন একটা গাছ। গাছটা। তার মধ্যে আমি সব দেখছি অবশ্য। তার নীচের যে রস, তার ডালপালা, সবই দেখছি। কিন্তু সেটি একটা ফর্মের মধ্যে ফেলা হচ্ছে। সেটি কিউবিক ফর্মে ফেলছি। এখন কিউবিক ফর্মটা কী দেখতে হবে। সেটা কী ? সেটা হচ্ছে আবার কিউব। সেটা চতুষ্কোণ হচ্ছে, ত্রিকোণ হচ্ছে। সেটাকে ফেলে একটা সলিডিটি আনা হচ্ছে। একটা সলিড ফর্মে ফেলছি। আসল প্রতিফলিত। আসল ফর্মটা আসছে, তার মধ্যেই আসছে। কিউবিক কেন করছি ? যেমন রস দিয়ে মিছরী তৈরী হল। তুমি যখন মিছরীটা গলিয়ে দিলে, রস পেয়ে

গেলে। কিউবিক হলো ঠিকই, কিন্তু ওর ভিতরে রসিকের যে ইয়েটি, সেটি কিন্তু থাকা চাই বাবা, তা না হলে কিউবিক হবে না, বুঝলে ? কাজেই কিউবিক হলে কেউ যদি বলে ওটা বাজে হয়ে গেল, তা চলবে না। ওটা তার মধ্যেই সেই রসিকতা, রসিক মনের প্রতিফলনটা হওয়া চাই। বা তুমি গালিয়ে দিলেই সেটি আবার সেই রসে পরিণত হবে। সেই রস। কিউবিকের মধ্যে অন্য কিছু মেশানো যায় কিনা যেমন গোল বা অন্য কিছু ? যাই করো না কেন রসিক মনের পরিচয় থাকা চাই। তা না হলে অন্য লোক, দর্শক বুঝবে না। তুমি রস পাবে। তার মধ্যে যদি না পাও, তাহলে সেটা নেহাত ব্রিক হয়ে যাবে। একটা ইঁট হয়ে যাবে। রসিক মন যদি হয় তাহলে এসে যাবে এটা। কত কিউবিক ছবি দেখবে, কোনটা বেশ চমৎকার লাগছে, আবার কোনটা লাগছে না।'

কিউবিক থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট হচ্ছে আবার। যেমন ধরো একটা লণ্ঠন। টেক এগজামপেল, এ লণ্ঠন। ইউটিলিটি আছে যে আলো জ্বলবে। কিন্তু ফর্মটা তুমি করছো : ফর্মটা তুমি দিয়েছো। এ্যাঁ, সেটা কিউবিক নাকি ? তা তোমার এখন বিচার্য। কিন্তু আলো দেবার যে কায়দাটা সেটা তো তোমাকে করতে হয়েছে। ফর্মটা ইটসেলফ একটা। যেটা তুমি এমনি প্রকৃতির মধ্যে পাচ্ছো না। কিন্তু আমরা করছি সেটা। ইউটিলিটি যে আলো জ্বলবে। তার ভেতরে পলতে থাকবে, তেল থাকবে। করে তবে সেটি আলো জ্বলবে। বাতাসে নিভবে না। এ সমস্ত কায়দা দিয়ে সেটি হচ্ছে। অ্যাবস্ট্রাক্ট বলতে তুমি যদি দেখ ভালো করে প্রকৃতিকে, তবে তুমি অ্যাবস্ট্রাক্টে পৌঁছে যাবে। প্রকৃতিকে যদি দেখা যায় তাহলে অ্যাবস্ট্রাক্টে পৌঁছে গেলে তুমি। সেটা ডিপেণ্ড অন ইউ। তুমি কতটা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারো জিনিসটা, সেটার উপরে নির্ভর করবে।'

আমি যখন শান্তিনিকেতনে কিছু ভাস্কর্য নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম তখন আমার মা মারা যান। যখন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ তখনও আমি তাঁকে দেখতে যেতে পারি নি। না, না সেই মৃত্যুর ছায়া আমার শিল্পকে স্পর্শ করেনি। সবাই মারা গেছে, আমার দাদা-বোন-বাবা-মা সবাই, সবাই। কারো মৃত্যুই আমার শিল্পকে কোনভাবেই স্পর্শ করেনি। সবসময়ই আমি আমার নিজের কাজেই খুব বেশীভাবেই ডুবে ছিলাম। মৃত্যু সম্পর্কে আমি সবসময়ই উদাসীন। খুব সত্যি কথা মৃত্যু সম্পর্কে আমি কোন চিন্তাই করি নি। একজন শিল্পী যতক্ষণ সৃষ্টির নেশায় মাতাল হয়ে থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু কোনভাবেই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।'

একজন পাগল লোক সবসময় বিভ্রান্তির তাড়নায় পথ হাঁটে। সে তাঁর নিজের পথ চিনে নিতে পারে না। সামঞ্জস্যহীন নানান উদ্ভট ভাবনা-চিন্তা তার মাথার মধ্যে ভিড় করে আসে। আর সে গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে যায়। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই একজন শিল্পীরও মাথার মধ্যে নানান উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা খেলা করে। কিন্তু সে প্রতিনিয়ত একটা মাধ্যমের অনুসন্ধান করে চলে—সে কম্যুনিকেট করে—একজন বুঝতে পারে

তাঁকে। কিন্তু একজন পাগল লোক এখানেই ব্যর্থ হয়, সে কোন যোগ স্থাপনই করতে পারে না। এই-ই পার্থক্য দুজনের। একজন শিল্পী নিজেকে পাগল হিসাবে প্রতিপন্ন করে, একজন পাগলের ভূমিকায় নিয়ে যায় নিজেকে। দয়া করে জেনে রাখুন এটা একটা স্ট্যান্ট। স্ট্যান্টই। একজন পাগল লোক এটা করতে পারে না। কারণ সে সত্যিসত্যিই পাগল আর এটাই তাঁর সমস্যা।'

শিল্পী কেন, যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই ভালোবাসার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আবার কেউ কেউ ভালোবাসার বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়ে যায়। ভালোবাসাই জীবন, ভালোবাসা মহান আবার ভালোবাসা ভয়াবহ, ধ্বংসাত্মকও। দৈহিক ভালোবাসাকে কেউ কেউ ভালোবাসার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেখে থাকেন। আমি ভালোবাসার এরকম দৈহিক সংজ্ঞায় বিশ্বাসী নই। যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায় ততক্ষণ ভালোবাসার কোন অস্তিত্বই কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। একজন শিল্পীর মৃত্যু পর্যন্তই ভালোবাসার তৃষ্ণা থেকে যায়।'

সর্বকিছুর মধ্যেই সেক্স আছে, সেক্স ছাড়া সর্বকিছুই অসাড়-প্রাণহীন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মহান শিল্পীরা মনে রাখার মতো বিখ্যাত বিখ্যাত কাজ করে গেছেন যেহেতু তাঁরা কোনরকম যৌন বিধিনিষেধ ( sexual inhibition ) এবং মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন না। আমি শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।'

ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি শহরের পাশাপাশি গ্রামও থাকবে। লোকে বলে, শহরের জীবনে গতি বেশী কিন্তু আমি আমার গ্রামের কুটিরের বারান্দায় বসে বসে কখনো কখনো অনুভব করি সূর্যের আলো পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রত্যেকটি দিন চমৎকারভাবে তার গতি প্রকাশ করে চলেছে। পাখী, মৌমাছি, প্রজাপতি এরা কেউই বসে নেই, সবাই কাজ করে চলেছে, খাবার সংগ্রহে ব্যস্ত এবং দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মিনিটেই আলোর পরিবর্তন হচ্ছে। শহরে আকাশ দেখা যায় না। অন্ধকারের রঙও দেখতে পাওয়া যায় না।'

পশ্চিমে জন্মগ্রহণ করলে আমি খুশী হতাম কি হতাম না এ নিয়ে আমি একদমই চিন্তা করি না। আমি এখানেই জন্মগ্রহণ করেছি এটাই ঘটনা এবং এটাকেই আমি গ্রহণ করেছি। বিদেশে যাওয়া এবং পশ্চিমের শিল্পীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের চেষ্টা না করার ব্যাপারে আমার একটা ভুল ধারণা আছে। একজন শিল্পীর অ্যাডভেঞ্চার না থাকা ভালো নয়।'

বিবাহ নামক একধরনের সামাজিক প্রথার মাধ্যমে একটি মেয়ে এবং একটি পুরুষ যদি একসঙ্গে বসবাস করতে পারে তো ভালোই। যদি না পারে তবে প্রয়োজন নেই। এই প্রথার ভিত্তি হলো শিশু উৎপন্ন করা। বিয়ে না করেও শিশু উৎপন্ন করা যেতে পারে কিন্তু বিয়ে করার পর যে শিশুর জন্ম হয় তা একটু অন্যরকমের। কারণ কোন একজন এই শিশুর দায়িত্ব নিয়ে থাকে। আমিও শিশু ভালোবাসি। কিন্তু আমি কখনোই একটি মাত্র শিশু চাই না। আমার চারপাশেই অনেক শিশু আছে। আমি মনে করি এরা সবাই আমার।"

বাঁকুড়া থেকে শান্তিনিকেতন

নিকটজনদের চোখে রামকিঙ্কর

# আমার কাকা রামকিংকর

দিবাকর বেইজ

বাড়ীর অবস্থা কোনদিনই ভালো ছিল না আমাদের। খাওয়া-পরারও ঠিক ছিল না কোন। আজ ডালভাত খাচ্ছি তো কাল খাচ্ছি না—এইরকম করে সংসার চলতো। আমাদের পারিবারিক বৃত্তি ছিল ক্ষৌরকাজ। যজমানী করে সংসার চলতো কোনরকম। ক্ষৌরকাজে সারাদিনে রোজগার হতো সবমিলে কোনদিন হয়তো দু-আনা, কোনদিন তিন-আনা, কোনদিন বা ছ-পয়সা। তার উপর আমাদের সংসারে লোক ছিল অনেক। অতএব কাকাবাবু অর্থাৎ রামকিঙ্কর বেইজ হলেন খুবই গরীব ঘরের ছেলে। আমার ঠাকুরদা অর্থাৎ কাকাবাবুর বাবা চণ্ডীচরণ ক্ষৌরকাজে সারাদিন রোজগার করে বেলা তিনটের সময় চকবাজার যেতেন তরিতরকারী কিনতে। চালটাল আমাদের যজমানদের বাড়ী থেকে পাওয়া যেত কিছু। সেই যজমানদের বাড়ীর আয় থেকে আমাদের সংসার চলতো অনেকটা। বাড়ীতে গাইটাই ছিল, তাতে দুধটুধ হতো কিছু।

ভাইপো দিবাকর

কাকাবাবু আর আমার মধ্যে বয়সের তফাৎ বারো বছরের। যখন জ্ঞান হয়েছে, বুঝতে শিখেছি আমার কাকাবাবু—সেইসময়ে সাইনবোর্ড লেখা, নাটকের সীন আঁকা এবং নাটকে তাঁর অংশগ্রহণের কথা মনে পড়ে। তবে নাটক করার চাইতেও নাটকের পাত্র-পাত্রীদের রূপসজ্জা, মঞ্চ ইত্যাদিই করতেন বেশী। সেইসময়ে অবোরা ক্লাবের জন্য কাকাবাবুর আঁকা একটি সীনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সেটা ছিল বাল্মীকি মুনির আশ্রমের একটি দৃশ্য। দৃশ্যটায় ছিল একটি চালাঘর, পাশে একটা গাছ এবং তার পাশে আরোহীবিহীন পরিত্যক্ত গোরুর গাড়ী একটি। আশপাশে গাছগাছালি। নির্জন। মানুষজন ছিল না কোন। এছাড়াও কলকাতা থেকে কিছু

সীন আনা হয়েছিল। একসময়ে কাকাবাবুর আঁকা একটি সীন চুরি হয়ে যায় আমাদের বাড়ী থেকে। সীনটা অবশ্য সম্পূর্ণ ছিল না। ছিল আনফিনিসড।

ছবি আঁকা, মূর্তি বা পুতুল গড়ায় কাকাবাবুর ভীষণ নিষ্ঠা আর একাগ্রতা ছিল ছেলেবেলা থেকেই। সেকালের যুগীপাড়ার একজন জাতশিল্পী ছিলেন অনন্ত সূত্রধর। অবশ্য অনন্ত মিস্ত্রী নামেই সবাই ডাকতো তাঁকে। অন্যান্য প্রতিমা ছাড়াও পাড়ার এবং আশপাশের দুর্গাপ্রতিমা করতেন তিনি। তাঁর কাজ কাকাবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন একমনে। কাকাবাবুর একাগ্রতায় খুশী হয়ে অনন্ত মিস্ত্রী তাঁর প্রতিমা তৈরীর কাজে মাঝেমধ্যেই লাগিয়ে দিতেন তাঁকে। তিনিও পরম আনন্দে লেগে যেতেন। এভাবেই তাঁর শিল্পকাজে হাতেখড়ি হয়ে যায় ছোটবেলায়। আর অনন্ত মিস্ত্রীই হয়ে যান তাঁর ছেলেবেলাকার গুরু। যাঁর কথা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি তিনি।

বাড়ীর অবস্থা যেহেতু খুবই খারাপ তাই রঙ কিনে ছবি আঁকাআঁকি করা মানেই ছিল বাড়ীর লোকের কাছে একধরনের অত্যাচার। তাই রান্নার হলুদ দিয়ে হলুদ রঙ, শিমপাতা নিংড়ে সবুজ রঙ, পুঁই মেচুঁড়ি দিয়ে বেগুনী—ছবি আঁকার নানান রঙ তাঁকে জোগাড় করতে হতো এইভাবে। তাঁর ছেলেবেলার একটা কথা। কথাটা অবশ্য কাকাবাবুর মুখ থেকেই শোনা আমার : তখন কাকাবাবুর বয়স তের কি চোদ্দ হবে। আঁকাআঁকি করার সমস্ত রঙ কিনতে এক টাকার মতো দরকার। বাড়ীতে আর বন্ধুবান্ধবদের কাছে চেয়ে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে মুষড়ে পড়েছেন। কি করবেন চিন্তা করতে করতে হতাশ হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন বিছানায় পড়ে আছে একটি টাকা। মন আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু ভাবছেন টাকাটা এলো কোথ থেকে। বাড়ীর লোকদের আর বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারলেন না ব্যাপারটা। যা হোক, ঐ টাকায় রঙ কিনে শান্ত হলেন।

ছোটবেলায় যখন কাকাবাবু পুতুল, ছবি ইত্যাদি করছেন তখন ঠাকুরদা এগুলো বিক্রীর জন্য নিয়ে যেতেন এক্তেশ্বরের চোদ-পরবের মেলায়। বিক্রী হতো দু-পয়সা, চার-পয়সায়। তবে খুব একটা বিক্রী হতো যে তা নয়। এই দুটো চারটা। তাতেই আনন্দ। তখন চার পয়সাই অনেক। সেইসময় কাচা পরার চল ছিল। কাচা মানে ছ-হাতি খাটো ধুতি। কাকাবাবু ওটাই পরতেন বেশী। এছাড়াও বাড়ীতে হাফ প্যাণ্টও পরতেন।

আগেকার দিনে মাইনর পর্যন্ত পড়েছিলেন তিনি। তার উপরে জানি না। সম্পূর্ণ পাস করেছিলেন কিনা তাও বলতে পারবো না। প্রথমে পড়েন সুরেন পণ্ডিতের পাঠশালায়। এরপর মাচানতলায় একটা নাইট স্কুলে কিছুদিন। দিনের বেলায় ছবি আঁকাআঁকির জন্য সময় পেতেন না তাই ওখানে পড়তে যেতেন রাতে। শুনেছি অঙ্কে অত্যন্ত কাঁচা হলেও ইংরাজী শেখায় তাঁর আগ্রহ ছিল খুব। কিছুদিন ওখানে পড়ার পর দত্তবাঁধের পাড়ে একটা স্কুল হয়, নামটা বলতে পারবো না,

সেখানেও পড়েন কিছুদিন। এই দত্তবাঁধের পাড়ের স্কুলের পড়াটাই শেষ পড়া বলে মনে হয় আমার। তবে লেখাপড়ার দিকে খুব একটা মন ছিলো না। এই যা হচ্ছে—হচ্ছে। ছবি আঁকার দিকেই মনটা ছিল খুব।

অতুল কুচল্যান আর বিশ্বনাথ নন্দী হলেন কাকাবাবুর ছেলেবেলার দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনবন্ধু মিলে প্রত্যেকদিন বিকেলবেলায় গন্ধেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর নদীর দিকে বেড়াতে যেতেন। একদিন দুইবন্ধু কাকাবাবুর স্টুডিওতে যথারীতি এসে তাঁদের বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছেন। স্টুডিও বলতে দোলতলারই পরিচিত একজন প্রতিবেশীর বাড়ী। যেখানে তিনি নির্বিঘ্নে, নিরালায় ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়ার কাজ করতেন। সেই সকাল থেকে সেদিন ছবি আঁকার কাজ চলছে। বন্ধুরা বসে বসে একমনে তাঁর ছবি আঁকা দেখছেন। একসময় বন্ধুদের উপস্থিতি টের পেলেন। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়েছে। ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়ায় বরাবরই তাঁর এমন নেশা আর ঝোঁক ছিল যে খাওয়াদাওয়া স্নান করার সময় কখন যে পার হয়ে যেতো খেয়ালই থাকতো না।

কাকাবাবু যখন প্রথম শান্তিনিকেতন যান তখন আমি নেহাতই ছোট। তারপর যখন শান্তিনিকেতন থেকে বাড়ী আসতেন তখন একটু বড়ো হয়েছি। বুঝতে শিখেছি। সাধারণ কথা কি জানেন, কাকাবাবু যে এতো বড়ো হয়েছেন তখন তো বুঝি নাই। তখন কি করছেন, না ছবি আঁকছেন, এইরকম ভাব আর কি। শান্তিনিকেতন গেলেন তো গেলেন। দেখুন, আমাদের এখানে, এই যুগীপাড়ায় কতকগুলো ছুতোর মিস্ত্রী আছেন, যাঁরা আর্টিস্ট, শিল্পী, মানে ছবিটবি আঁকাআঁকি করেন। মাটির পুতুল, মূর্তি করেন। এখন কি ভাবতে পারি এ'দের জীবনী ইতিহাস কিছু একটা পাবো। এটা কি ভাবতে পারি ? না। অতএব কাকাবাবুরও তা ভাবি নাই। আমি কেন তা অনেকেই ভাবেন নাই। তাহলে জীবিত অবস্থায় এতো দুঃখকষ্ট পেতে হোত না লোকটাকে।

কাকাবাবুর শান্তিনিকেতন যাবার ব্যাপারে অনেকে অনেক কথা বলে থাকেন। তবে আমি এ ব্যাপারে ঠাকুরদার মুখ থেকে যা শুনেছি তা এরকম ঃ তখন কাকাবাবুর বয়স নেহাতই কম। বাড়ীতেই ছবিটবি আঁকাআঁকি করেন। রামানন্দবাবুর ( চট্টোপাধ্যায় ) বাড়ী এখানেই, পাশের ঐ পাঠকপাড়ায়। ঠাকুরদা চণ্ডীচরণ ওনাদের বাড়ীতে হাজামত করতে যেতেন, মানে দাড়িটাড়ি কাটা নয়, ঐ নখটখগুলো বড়ো হলে কেটে দিতেন। মানে যজমানী করতেন। ওনারা ছিলেন আমাদের যজমান। ঠাকুরদাকে পাড়ার সকলেই ভালোবাসতেন খুব। পাড়ার বিয়ে বাড়ী, শ্রাদ্ধ বাড়ীতে ঠাকুরদাকে না পেলে কাজই হতো না। কেন হতো না ? কারণ পুরোহিতরা মন্ত্র ভুল বললে তিনি তা ধরিয়ে তো দিতেনই এমনকি পুরোহিতদের মন্ত্র পর্যন্তও বলে দিতে পারতেন তিনি। এজন্যই পাড়ার সকলেই তাঁকে ভালোবাসতো খুব। এইভাবে রামানন্দবাবুর বাড়ীতে যজমানী করতে করতে গল্প হচ্ছে একদিন, 'চণ্ডী

তোমার ছেলেরা কি করছে হে?' 'কি আর করবে, ছবিটবি আঁকাআঁকি করছে একটা।' 'ছবিটবি আঁকে নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে অবসর মতো আমি তোমার ছেলের ছবিগুলো দেখবো।' একদিন হঠাৎ বাড়ীতে এসে গেছেন। 'কৈ চণ্ডী তোমার ছেলের ছবিগুলো দেখাও।' তখন আমাদের বাড়ীটা এরকম ছিল না। খড়ের বাড়ী ছিল। এরকম দালান ছিল না। ছবিটবি দেখানো হলো। কাকাবাবুকেও দেখলেন। তখন কাকাবাবুর বয়স কম। বললেন, 'আমি শান্তিনিকেতন যেয়ে তোমাকে একটা চিঠি দেব। চিঠি পেয়ে তুমি চলে যেও।' এই বলে তিনি চলে গেলেন। ছবিগুলো দেখে ওনার পছন্দ হলো এইরকম ভাব আর কি। উনি চলে যাবার কিছুদিন পরে, কিছুদিন পরে মানে এই মাস ৩/৪ পর চিঠি দিলেন একটা। চিঠি পেয়ে কাকাবাবু বিপদে পড়েছেন, একে তো ছেলেমানুষ, তারপর শান্তি-নিকেতনের পথঘাট কিছুই জানা নাই। কোনদিকে যাবো, কি করে যাবো, কি করবো এইসব সাতপাঁচ ভাবছেন। তারপর শুধিয়ে শুধিয়ে আসানসোল হয়ে ঘুরে কোনরকমে শান্তিনিকেতন পৌঁছালেন। নন্দলালবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন রামানন্দবাবু। তিনি বলেছিলেন, 'কিছু ছবি নিয়ে যাবে।' ছবিগুলো দেখে নন্দলালবাবু বললেন, 'তুমি কি করতে এখানে এলে, এ তো সব করেই ফেলেছো। আর কি শিখবে? যা হোক যখন এসেই গেছো এখানে থেকে যাও কিছুদিন। তারপর যাহোক করা যাবে।' এভাবেই তিনি শান্তিনিকেতনে থেকে গেলেন।

. আমাদের পূর্বপুরুষরা অন্য জায়গায় থাকতেন বলে শুনছি এখন। এটা আমি জানতাম না। আমি এখানেই দেখছি বরাবর। আমার ঠাকুরদা পর্যন্ত। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদারা হয়তো ছিলেন ওখানে, বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরের ওধারে কৃষ্ণবাটীতে। কাকাবাবুর মামার বাড়ী ছিল বিষ্ণুপুরের কাদাকুলি। তিনি মাঝেমধ্যেই বিষ্ণুপুর যেতেন। আমার শোনা কথা। তবে আমার জ্ঞান হবার পর উনি যখন শান্তিনিকেতন থেকে বাঁকুড়ায় আসতেন তখন হয়তো হঠাৎ বিষ্ণুপুর চলে গেলেন। আমরা জানতেই পারলাম না। এসে বললেন, 'বিষ্ণুপুর গেছিলাম।' তখন শান্তিনিকেতনে মাস্টারি করছেন। আমাদের পদবী এখন বেইজ। এটা কাকাবাবুই প্রথম লেখেন। আগে ছিল পরামানিক। 'লাই' পদবীও ছিল নাকি বলছেন কেউ। আমি এসব কিছুই জানি না। পরামানিকটাই জানি।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে কাকাবাবুর সম্পর্কটা মন্দ ছিল না। তবে টাকা-পয়সার দিকে লক্ষ্য ছিল না খুব একটা। এরকম ভাব যে, আমারই পয়সা নাই তোমাদের দেব কি? তখন তো কাকাবাবুরও অভাব চলছে। কত আর পান বিশ্বভারতী থেকে। এই ১০/১৫ টাকা পাঠাতেন। দিদিমার আশা ছিল ছেলেটা এতো বড়ো হলো আমার পয়সা কিছুই হলো না। আমার অভাবটাই রয়ে গেল। মরন পর্যন্তই তাঁর অভাবটাই রয়ে গিয়েছিল। দিদিমার সঙ্গে অর্থাৎ কাকাবাবুর মায়ের সঙ্গে আমার মার খুব একটা বনিবনা ছিল না। নানারকম ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকতো। আমার

বাবা অর্থাৎ কাকাবাবুর দাদা রামপদ একটু মদটদ খেতেন। খেতেন মানে বেশ ভালোই। এছাড়া বেশ্যাসক্তও ছিলেন। মদ খাওয়াতে কাকাবাবু খুবই বিরোধী ছিলেন। এমনকি তিনি বিড়ি, পান এসব কিছুই খেতেন না। এজন্যই আমার বাবার উপর বিরোধী ছিলেন তিনি। মারামারি, ঝগড়ঝাটি বাপবেটাতে হচ্ছে আবার ভায়ে ভায়েও হচ্ছে—শুনতাম যে এইসব হচ্ছে। এই কারণে আমাদের একটু অশান্তির মধ্যে বাস করতে হতো।

একবার কাকাবাবুর বিয়ের কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে যায়। একেবারে দিন তারিখ ধরানো, আদানপ্রদান সমস্ত ঠিক। হঠাৎ চলে গেলেন না বলে। সেই যে গেলেন আর এলেন না। অনেকদিন পর এসেছিলেন আবার। ছেলে বিয়ে করলে না বলে কাকাবাবুর মা কাঁদতে লাগলেন। কান্না ছাড়া আর কি ? আমাদের সামনেই শাঁখারী পাড়ার ওধারেই ছিল মেয়েটার বাড়ী। মেয়ের বাবা আমাদের বাড়ীতে আসতেন খুব। পরে শুশুনিয়ায় বিয়ে হয়ে যায় মেয়েটার। বিয়ে ভেঙে যাবার পর আর কোন চেষ্টা হয়নি বিয়ের। 'আমি বিয়ে করবো না'—এই লিখে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। পরে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বিয়ে না করে চলে এলেন কেন ? বলেছিলেন, 'বিয়ে করে জড়িয়ে যাবো। পা-টা বাঁধা পড়ে যাবে। আমার এই যে সাধনা, এতো বড়ো সাধনা, সাধনাটা নষ্ট হয়ে যাবে। বন্ধনে আমার দরকার নাই। অতএব বিয়ে করে কি হবে ? বিয়ে করে করব কি ?'

বৌদিকে অর্থাৎ আমার মাকে কাকাবাবু ভালোবাসতেন খুব। ছোট থেকেই বৌদির সঙ্গে খাওয়া শোওয়া সবই ছিল। লাটবাঁধের পাড়েই থাকতো একটি মেয়ে। বিবাহিত। বৌদির সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছিল। কাকাবাবু বলেছিলেন, 'ঐ মেয়েটি বেশ। মেয়েটির বেশ চেহারাটি।' মেয়েটিকে বিয়ে করবো এরকম কিছু বলেন নি। তবে আমাদের ধারণা হয়েছিল ঐরকম একটি মেয়ে পেলে বিয়ে করতেন। মেয়েটি মারা গেছে।

কাকাবাবুর বয়স যখন প্রায় ৩০/৩২ বছর তখন বাবা চণ্ডীচরণ ৮৫ বছর বয়সে মারা যান। তারপর মা অনেকদিন জীবিত ছিলেন। শেষের দিকে কাকাবাবুর মায়ের মাথাটা গোলমাল হয়ে যায়। রাত্রিবেলায় বাড়ী থেকে উঠে উঠে চলে যেতেন। কি রকম মতিভ্রম হয়ে যায়। ও…ও…ঐদিকে যাবো, এ…এ…এইদিকে যাবো—এইরকম বলতেন। অনেকবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এনেছি। মা এরকম হয়ে যাওয়াতে কাকাবাবুকে চিঠি লিখলাম, 'আসুন একবার। দেখাসাক্ষাৎ করে যান।' লিখলেন, 'যাবো, যাবো। কাজে ভয়ানক ব্যস্ত। মোটেই যেতে পারছি না। পরে যাবো। মাকে একটু সেবা করিস।' বললাম, 'হ্যাঁ, মাকে তো সেবা করছিই। আমি আর কতটুকু করবো। আপনি হচ্ছেন ছেলে। অতএব মাকে সেবা আমি করবো, না আপনি করবেন ? আমি তো ছেলেমানুষ। আমি সেবা করার কি জানি।' 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, তুই সব করবি, তুই সব করবি। তোরি তো সংসার রে বাবা।' এইসব বলতে

লাগলেন। দিদিমাকে এখানে সেখানে নিয়ে গেলাম কিন্তু কোথাও পছন্দ হলো না। আমার মনে হয়েছিল শেষের দিকে উনি কাকাবাবুর কাছে শান্তিনিকেতনে যেতে চেয়েছিলেন। আমি তো তখন ছেলেমানুষ। শান্তিনিকেতনে যাবার রাস্তাঘাট চিনি না, জানি না। আমার রামপদ তো তখন অন্ধ হন নাই। পরে হয়েছিলেন। আর এসব কিছুর খোঁজখবর রাখতেন না। নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। এইভাবে বাইরে উঠে উঠে চলে যাওয়াতে শেষে একদিন পড়ে গেলেন। আর পড়ে যাওয়াতেই রোগে ভুগে ভুগে শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। কাকাবাবুকে লিখলাম : 'দিদিমা পড়ে আছেন। আপনি একবার তাড়াতাড়ি আসুন।' এসেছিলেন। দেখলেন। তারপরের দিনে সকালে বললেন, 'আমি চলে যাবো। ওরে আমার থাকার তো অবসর নাই।' বললাম, 'এরকম মরণাপন্ন অবস্থা, এসময়ে তাহলে দেখবে কে ?' 'আরে তুই তো আছিস। আবার কি আছে। আমার থাকার প্রয়োজন নাই। ও ভালো হয়ে যাবে। ভালো হয়ে যাবে। তাছাড়া দাদা আছে।' অনেক বললাম কিন্তু কোন কথা শুনলেন না। চলে গেলেন। উনি যেই চলে গেলেন, দিদিমা মারা গেলেন। এক বছর দেড় বছর মাথাটা ঐরকম থাকার পর ৭০/৭২ বছর বয়সে দিদিমা মারা যান। আর বাবা চণ্ডীচরণ মারা গেলে দাহ হবার পরের দিনে কাকাবাবু এসেছিলেন। এসে শ্মশানে গেলেন। কান্নাকাটি করলেন। আবার তারপর দিন চলে গেলেন। পরে এসেছিলেন। এলে মাথামুণ্ডন করতে বললেন সবাই। বললেন, 'ওসব করার কি আছে ? আছে—আছে। বাবা মারা গেছেন—গেছেন। লোকজন খাওয়াও।' লোকজন খাওয়ানো হলো। সব কাজকর্ম হলো। আবার উনি চলে গেলেন।

আমি সর্বপ্রথম কাকাবাবুর কাছে যখন যাই তখন আমার বয়স আনুমানিক ২৫/২৬ বছর। আমরা অনেক পরে গেছি। কাকাবাবুর যখন বয়স কম তখন যেতে পারি নি। আমার সম্বন্ধিকে নিয়ে আন্দাজে একদিন বার হলাম। শান্তিনিকেতনের পথঘাট কিছুই জানি না। মেজিয়া হয়ে রাণীগঞ্জে গাড়ী চাপলাম। লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা—বোলপুর কোন ট্রেনে যাবো ?' বলল, 'এ—এই ট্রেনে চলে যান।' সেই ট্রেনে গেলাম। যাচ্ছি···যাচ্ছি অনেকদূর। কোথায় রে বাবা শান্তিনিকেতন। ট্রেনের লোককে জিজ্ঞাসা করলাম। বলল, 'আপনি যাচ্ছেন যান। কিন্তু সাঁইথিয়াতে ট্রেনটা চেঞ্জ করে নেবেন।' সাঁইথিয়ায় নামলাম তখন রাত্রি ১০টা। ট্রেন ধরে রাত বারোটায় নামলাম বোলপুর স্টেশনে। তখন বোলপুরের রাস্তাঘাট সব মাটির। ভাবলাম যে এতো রাত্রে যেয়ে কোথায় খুঁজবো। অতএব রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোর ভোর চলে যাবো। রাতটা বোলপুর স্টেশনে কাটিয়ে ভোরে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, রামকিঙ্কর বেইজ কোথায় থাকেন ?' তা শ্রীপল্লীর একটা ঘর বলে দিলেন। ওখানেই থাকতেন তখন। গেলাম। উঁকিঝুঁকি মারছি। 'কাকাবাবু ?' ডাকলাম। তখন সেই আলখাল্লার মতো আর্টিস্টের একটা জামা

পরে বেরিয়ে এলেন। হাতে চুরুট। তখন চুরুট খেতেন। যেতেই জিজ্ঞাসা করছেন, 'কে দিবাকর ? এরে—কখন এলি ?' 'এই তো আসছি।' 'তা বেশ বেশ। আচ্ছা কখন যাবি বলতো ?' 'কেন বলুন তো ? এই তো সবেমাত্র আপনার বাড়ীতে পা দিয়েছি। অতএব এক্ষুনি যাবার কথা হচ্ছে ? কখন যাবো, কবে যাবো তার কোন ঠিক নাই।' হাঃ...হাঃ...হাঃ খুব হাসতে লাগলেন তারপর। 'বেশ বেশ এসেছিস, ভালো করেছিস। তা এটি কে ?' 'আমার সম্বন্ধি।' 'ও ঠিক আছে। ঠিক আছে। তা বোস। ঐ বাইরেই বোস।' বাইরেই বসলাম। চিন্তা করছি—নতুন গেছি তা কাকাবাবু কেন বাইরে বসতে বললেন। কেন বাইরে বসালেন। উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলাম, কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরে বুঝলাম মদটা ঘরের ভিতরে লুকানো আছে। তখন মদ ধরেছেন। আর সেইজন্যেই ভিতরে বসতে দিলেন না।

সেইসময়ে গোলক বলে একটা ছেলে ছিল। আমার থেকে ছোট। ও চা-টা করতো। আবার ছবিটবি আঁকাআঁকিও করতো। বাগালও ছিল তখন। রান্নাবান্না করতো আবার মূর্তির জন্য মশলাটশলাও করতো। তা সেদিন স্নান করে জলটল খাওয়া হলে কাকাবাবু গোলককে বললেন, 'ওদের ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।' গোলক আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে এলো। দুপুরে ফিরে এলাম। কাকাবাবু বাগালকে বললেন, 'বাগাল।' 'হ্যাঁ।' 'তাহলে এদের জন্য ভাতটাত চাপিয়ে দে। এরা যখন এসেছে। আর কোথা থেকে কিছু আনতে হবে না ঘরেই করে নে। ঘরেই তো হয়। তা এক কাজ কর কিছু চালটাল কিনে নিয়ে চলে আয়।' 'চালতো আনবো কিন্তু আমার হাঁড়িটা যা তাতে করে এতোগুলো লোকের ভাত হবে না যে।' 'ওরে ভাত হবে না রে।' কাকাবাবু বলছেন। বললাম, 'কেন ?' 'না হাঁড়িটা বড়ো ছোট।' 'পাশের বাড়ী থেকে একটা বড়ো হাঁড়ি নিয়ে আসুন। আনলেই তো হয়ে যাবে।' 'হ্যাঁ রে বাগাল পাশের বাড়ী থেকে একটা হাঁড়ি চেয়ে আন না।' 'তা সে তো আনবো কিন্তু চাল আনতে বহুদূর যেতে হবে।' 'হ্যাঁরে আর হলো নাই রে। চাল অনেকদূর থেকে আনতে যেতে হবে। তাহলে কি করবি ? তাহলে এক কাজ কর, আমি লিখে দিচ্ছি সোজা চলে যা, ওদিকে একটা হোটেল আছে সেইখানে তোরা খেয়ে চলে আয়।' বললাম, 'না, এখানেই খাবো। বাগাল ব্যবস্থা করুক। আচ্ছা বাগাল একটা ব্যবস্থা করো। শুধু ভাত আর আলু দিয়ে একবার ভাতটা করে নাও, একবার করে নিয়ে আর একবার চালটা চাপিয়ে দাও।' 'হ্যাঁরে বাগাল, ঠিক বলেছে দিবাকর, একবার করে আর একবার চাপাবি তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক বলেছে।' না, এসব সম্বন্ধে একদমই খেয়াল থাকতো না কাকাবাবুর।

আর একবারের একটা ঘটনা বলি। তাহলে বুঝতে পারবেন কাকাবাবু কিরকম ছিলেন। পাশাপাশি আমাদের দুটো ঘর। পাশের বাড়ীটা মাটির ছিল। মাটির বাড়ীটা পরে ভেঙে গেলে কাকাবাবুকে বললাম, 'একটা ঘরদুয়ার না করলে কি করে কি হবে ?' 'ঘর করে নাও।' 'পয়সা তো চাই।' 'না বাবা আমার পয়সা নাই।

পয়সা আমি দিতে পারবো না। টাকা পয়সা আমার নাই। আমার রোজগারই নাই। বেতনটেতন তেমন কিছু পাই না।' 'কিছু না দিলে ঘরটা কি করে কি হবে?' কাকাবাবু যে কতো বেতন পেতেন তা আমরা কিছুই জানতাম না। যা হোক, কিছুদিন পর হঠাৎ একটা চিঠি দিলেন ঃ 'বাড়ীটা করবি, তাহলে একটা কাজ কর। চারদিকে মাটির দেয়াল দিয়ে তালপাতা দিয়ে ছেয়ে দে। তাহলেই থেকে যাবি।' 'না এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে করে বর্ষার সময় আমাকে কষ্ট পেতে না হয়।' এইভাবে তালপাতার বাড়ীর প্রস্তাবটা নাকচ করে দিই। আবার কিছুদিন পর চিঠি দিলেন ঃ 'আচ্ছা এক কাজ কর, মাটির ছাদ করে উপরে আলকাতরা দিয়ে দে।' ঐ যেমন 'শ্যামলী'র বাড়ীটা আর কি। 'না এটাও আমার পছন্দ নয়। কতদিন থাকবে, না থাকবে তার ঠিক নাই। তারপর আমি ছোটাছুটি করবো। ওসব নয়, একেবারেই যা করবেন পাকা করুন। অন্য করুন। বর্ষার সময় যেন কষ্ট না পাই।' এরপর একদম চুপ হয়ে গেলেন। নিস্তব্ধ। আমি বার বার চিঠি লিখতে লাগলাম। এরপর লিখলেন ঃ 'আচ্ছা এক কাজ কর দরদালান কর। গাড়ার গাঁথনি করে উপরটা মাটি দিয়ে শেষটায় তালপাতা দিয়ে দে। তাহলেই হয়ে গেল। ওর ভিতরেই থেকে যাবি।' 'ওরকম প্ল্যান আমি কিছুতেই নেব না। বৃষ্টিতে ভিজবো তবু ঐরকম প্ল্যানে আমার দরকার নাই।' এরপর একটা চিঠি লিখলেন তাতে শুধুই হাসি ঃ 'হাঃ…হাঃ…হাঃ তোর মনে একটা অন্য ভাব আছে। তোরা দালান করতে চাস হাঃ… হাঃ…হাঃ।' চিঠিতে দরদালানের একটা ছবিও এঁকে দিয়েছিলেন। সেসব চিঠি এখন নাই। নষ্ট হয়ে গেছে। যা হোক, লিখলাম, 'এগুলোর কোনটাই পছন্দ নয় আমার।' তারপর হঠাৎ তিনশ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিতে লিখলেন, 'তবে পাকাই কর। পাকাই যখন তোর ইচ্ছা, তাই কর। আমার বাবু পাকাতে দরকার নাই।' এইভাবেই পাকা বাড়ীটা হয়।

শান্তিনিকেতন থেকে মাসিক কিছু টাকা পাঠাতেন। আমার বাবা অর্থাৎ কাকাবাবুর দাদা রামপদ অন্ধ হয়ে যাওয়ায় খুব অল্প বয়সেই আমার উপর সংসারের বোঝা চেপে যায়। এছাড়াও কাকাবাবুর বাবা এবং মায়ের সেবা যত্নের ভার পড়ে আমার উপরেই। এজন্য তিনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। বিষ্ণুপুরে কার্পেনটারি ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু বাড়ীর অচলাবস্থার তাগিদে আমার সেখানকার পড়া আর শেষ করা হয়ে ওঠে নি। শেষ করলে তিনি আমার জন্য কিছু একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

পড়াশোনা তো বটেই সেইসঙ্গে শরীর গঠনের দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল খুব। আমার ছেলে শিবপ্রসাদের জন্য মাসিক ১০০/২০০ টাকা পাঠাতেন। মানি অর্ডার ফর্মের নীচে ভাতের ফ্যান, ডিম, আলুসেদ্ধ খাবার নির্দেশ দিতেন বরাবর। তাঁর চিঠিপত্রে কখনও কোন দেবতার নাম দেখিনি। শান্তিনিকেতন যাবার আগে একটি ভাগবত গীতা কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন বাঁকুড়া থেকে। সেটি অবশ্য পাঠ করতে

দেখিনি কখনও। পরে শান্তিনিকেতনের বাড়ী থেকে সেটি সংগ্রহ করে বাঁকুড়ায় নিয়ে আসি।

মাঝে মাঝে পুত্রসহ শান্তিনিকেতনে তাঁর কাছে যেতাম। তখন তিনি যে কি-রকম আনন্দে আপ্লুত হয়ে যেতেন তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তিনি গাইতেন, 'ঘর করিলাম বাহির আর বাহির করিলাম ঘর / পর করিলাম আপন আর আপন করিলাম পর।' তাঁর সঙ্গে আমাদেরও জোরে জোরে গাইতে বলতেন। গান শেষ হতে না হতেই হোঃ···হোঃ···করে উঁচু গলায় ঘর ফাঠানো হাসির শব্দ এখনও কানে বাজে।

একবার তাঁর সঙ্গে নন্দনে বেড়াতে গেছি, তিনি জনৈক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই লোকটা, এই লোকটা আমার পেছনে খুব লেগেছে।'

রাধারাণী দাসী নামে একজন মহিলা তাঁর সেবা যত্ন করতেন। তিনি আমাদের পছন্দ করতেন না। কাকাবাবু হয়তো তাঁকে ভালোবাসতেন। কিন্তু রাধারাণী তাঁকে ভালোবাসতেন কিনা জানি না। কাকাবাবুকে মাঝে মাঝে গাইতে শুনতাম, 'যে নিদারুণ অকবুজার সাথে রে পিরিতি করিলাম না বুঝিয়া।' গাইতে গাইতে কখনও তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছি। কখনও দেখেছি হেসে উঠতে।

আমি একজন কাঠের মিস্ত্রী। সংসারের অচলাবস্থার কথা প্রায়ই জানাতাম তাঁকে। তিনি পরিবার নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসার জন্য বলতেন। আমরা একবার শান্তিনিকেতনে পরিবারসহ একবছর ছিলাম। তখন তাঁর ক্ষমাসুন্দর উদার মনোভাবের নানান পরিচয় প্রত্যক্ষ করেছি। একবার কোথা থেকে একটি নেড়ী-কুত্তা জুটে যায়। তিনি তাকে প্রত্যেকদিন খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন। সেবার তার চামড়ায় ঘা হয়। দেখেছি তিনি প্রত্যেকদিন কুকুরটির ঘায়ে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছেন। কুকুরটি যখন মারা যায় তখন তাঁর দুচোখ দিয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়েছিল জল। বিড়ালও ভালোবাসতেন খুব। বিড়ালের সঙ্গে একসাথে খেতেও দেখেছি।

বাড়ীর চালে খড় নেই, বর্ষাকালে বিছানায় জল পড়ছে। মশারীর উপর অয়েল পেণ্টিংগুলো সাজিয়ে তার নীচে দিব্যি নাক ডাকছেন তিনি। কষ্টকে এইভাবে উপেক্ষা আর অগ্রাহ্য করতেন।

টাকা পয়সার প্রতি কোনদিনও কোন আগ্রহ বা লোভ দেখিনি। তখন বেশ কয়েকবছর হয়েছে, কাকাবাবু অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়েছেন। মাসে ছ'শ টাকা পেনসন আর মাঝে মধ্যে ছবি বিক্রির টাকায় আমার পরিবারসহ কাকাবাবুর মোটামুটি চলে যায়। একবার হাতে কোন টাকাপয়সা নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করা যায়?' বললেন, 'চুপ করে বসে থাক।' পরে না জানিয়ে রতনপল্লীর একজনের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে ফিরে এসে দেখি কলকাতা থেকে কয়েকজন এসেছেন কাকাবাবুর স্যুটিং নিতে। তিনি তাঁদের কথা মতো ক্যামেরার সামনে ছবি আঁকা—চলাফেরা করলেন। স্যুটিং শেষে তাঁরা তাঁকে পাঁচ-শ টাকা এবং কলকাতা

ফিরে আরো টাকা পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি তাঁদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও একটি টাকাও নিলেন না।

চিংড়ি মাছ বেটে বড়ি করে টকের সাথে রান্না করে খেতে ভালোবাসতেন খুব। সুন্দরের পূজারী কাকাবাবু থাকতেন একখানা ছেঁড়া লুঙ্গি আর জীর্ণকায় একখানা গেঞ্জি সম্বল করে। নিস্তব্ধ, নিঃঝুম পরিবেশ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। বয়সের ভারে অবনত মানুষটির মন কিন্তু ছিল অত্যন্ত সজীব আর সক্রিয়। পারুল লতার উপর সকাল, দুপুর আর বিকালের রোদের লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে তাঁর সময় পার হয়ে যেতো। কখনও কখনও কাউকে ডেকে দেখাতেন। অকৃতদার, নিঃসঙ্গ এই মানুষটি অবশ্য বিয়ে না করার জন্য শেষ বয়সে আফশোষ করেছিলেন।

কাকাবাবুর পোস্টেডগ্নাণ্ডে একটা অসুখ ছিলো। সবসময় বিছানাপত্র ভিজে যেতো আর সেগুলো কাচাকাচি করে আমরা হয়রান হয়ে যেতাম। প্রভাস সেনের পাশের বাড়ীতে থাকতেন অরুণ সাহা। একদিন অরুণবাবুর বাড়ীতে ওঁরা আলোচনা করে বললেন, 'কিঙ্করদাকে কলকাতা নিয়ে যাবো, কিঙ্করদাকে কলকাতা নিয়ে যেতে হবে।' কাকাবাবু বললেন, 'না না আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবার দরকার নাই।' 'না আপনার অসুখটা সারছে না। আর দেখাচ্ছেনও না।' 'না ঠিক আছে, ঠিক আছে।' এরকম বলতে লাগলেন কাকাবাবু। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এবং অপারেশনের জন্য সই দিয়ে একটা লিখিত অনুমতি দিতে হয়েছিল আমাকে। আমি ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করি, 'ওঁরা আমার সই চাইছেন। একটা লিখিত অনুমতি চাইছেন। কিন্তু আমার দেবার ইচ্ছা নাই। কারণ অপারেশনের পর বাঁচবেন না মরবেন, কি হবে, না হবে তাতো জানি না। হয়তো পরে বলবে সই দিলে না, দিলে হয়তো বেঁচে যেতো।' ডাক্তার বললেন, 'না, বাঁচুক আর মরুক তোমার সই দিতে হবে। কারণ হচ্ছে যদি মরে যায় তাও তোমার দোষ আর যদি বেঁচে যায় তাহলে বলবে না বেঁচে গেলো।' ভালো ডাক্তার যখন বলছেন যে অপারেশন করে ব্রেনের জলটা বার করে দিলে ব্রেনটা ভালো হয়ে যাবে তখন আমাকে সই দিতে হলো। কিন্তু যে রোগটার জন্য কাকাবাবুর বিছানাপত্র ভিজে যেতো সে রোগটা ভালো হয় নি। সেইরকমই ছিলো। সেটা চিকিৎসার কি যে হ'লো আমি খুঁজে পেলাম না। যেদিন কাকাবাবুকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয় তার আগের দিন আমি বাঁকুড়ার বাড়ীতে চলে আসি। হাসপাতালে কবে নিয়ে যাওয়া হবে তা জানতাম না। আমার অনুমতি দেবার ২/৩ দিন পর আমাকে টেলিগ্রাম করা হয়। টেলিগ্রাম পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে চলে গেলাম। যখন পৌঁছালাম তখন অনেক রাত। পৌঁছে দেখি অপারেশন হয়ে গেছে। কোন জ্ঞান নেই। কথাবার্তা বন্ধ। নার্স বললেন, 'আপনারা খাওয়া-দাওয়া করে এসে ওয়েটিং রুমে বসবেন। দরকার হলে আমরা ডেকে পাঠাবো।' কাকাবাবুর আগে আর একবার অসুখ হয়। তখনও আমি কলকাতায় যাই। ঐ প্রভাসবাবুই নিয়ে যান আমাকে। সেবার হাসপাতালে গেছি, কাকাবাবু

আমাকে বলছেন, 'ও দিবাকর, এসেছিস ? ঠিক আছে, ঠিক আছে বোস বোস। এক কাজ কর ঐদিকে রাধারাণীর বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে ঐখানে তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে আয়।' ঐ কলকাতায়, প্রথমবারে। হাসপাতালে আছেন ৩/৪ তলা উপরে। সেখান থেকে রাধারাণীর বাড়ীটা দেখিয়ে দিচ্ছেন ও…ও…ঐ দিকে। ঠিক কাকাবাবুর মায়ের মতো। একই হাবভাব। একজেক্ট।

যাই হোক, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে ওয়েটিংরুমে এসে বসলাম। তারপরেই আমাদের কল করলো, 'রামকিঙ্কর বেইজের কে আছেন ? আপনারা আসুন।' তখন মারা গেছেন। যেদিন মারা গেছেন সেদিনকার একজন নার্সের কথা বলি। উনি জানতেন না যে কাকাবাবু একজন শিল্পী। ভেবেছিলেন এমনি একজন সাধারণ লোক। ভর্তি করে দিয়ে গেছেন প্রভাস সেন। প্রভাসবাবুকে চেনেন কিনা জানি না। মারা যাবার পর নার্সটি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'ইনি আপনার কে ?' 'আমার কাকাবাবু।' 'কোথায় থাকেন ?' 'শান্তিনিকেতনে।' 'ইনি কি জাতি ?' 'জাতি বলতে গেলে, আমরা হচ্ছি নাপিত।' 'নাপিত ?' 'নাপিত মানে বুঝতে পারছেন না ?' 'না তো।' 'আপনাদের কলকাতায় যারা দাড়ি-টাড়ি কামায়।' 'ও হো নাপতে।' তখন নার্সটি বুঝলো যে নাপিত। তারপর বলছেন, 'ভর্তি হবার পর থেকে আমরা তো সাঁওতাল ভেবেছিলাম।' আমি তো অবাক। বললাম, 'বলেন কি ? এরকম ধারণা হয়ে গেলো যে একদম সাঁওতাল ভেবে নিলেন। উনি একজন শান্তিনিকেতনের আর্টিস্ট। সাঁওতাল ভেবে নিলেন কি করে আপনি ?' 'না আমাদের এরকম ধারণা ছিল।' বললাম, 'এই তো মারা গেছেন। কাল সকালে দেখবেন ভীষণ মূর্তি। ইনি কে বুঝতে পারবেন কাল সকালে। আপনি তো সব পরিচয় নিলেন যে আমাদের বাঁকুড়াতে বাড়ী। ইনি সারাজীবন শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন। একজন মস্ত বড় আর্টিস্ট।' 'তা তো আমরা জানি না।' 'তাহলে আপনি কি নার্সারি করছেন। যাঁরা ভর্তি করেছেন তারাও কি পরিচয় দেন নি আপনাদের।' সকাল হতেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। না এতো সাঙ্ঘাতিক লোক ! কত লোক ফটো তুলছেন, কলকাতার যতো আর্টিস্ট এসে জড়ো হয়েছেন। লোকে লোকারণ্য। ওখানে অনেকক্ষণ দেরী হলো। কাকাবাবুর মৃত দেহ রাখা ছিলো হিমঘরে। এরপর কলকাতা থেকে কাকাবাবুকে নিয়ে আসা হয় শান্তিনিকেতনে। এখানেই তাঁকে দাহ করা হয়। আমি তাঁর মুখাগ্নি করি। চিতার আগুন জেলে দিই।

অনুলেখন : **প্রকাশ দাস**

## বাল্যবন্ধুদের চোখে রামকিঙ্কর

..................................

### বাসুদেব চন্দ্র

সকলের মতো রামকিঙ্করেরও বাল্যকাল ছিল, বাল্যবন্ধু ছিল। কিন্তু যা ছিল তা অতি সাধারণ।

ছুতার পাড়ার মাঝখানে রামকিঙ্কর বেইজের পৈতৃক বাড়ী। জন্মাবধি বাল্যকালটা তাঁর ছুতার পাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পৈতৃক বাড়ীর একদিকে, মানে পশ্চিমে ছুতার পাড়া, পূর্বদিকে একটা বড় পুকুর, নাম লাটবাঁধ। লাটবাঁধের পূর্বদিকটায় কর্মকারদের বাস। অতএব তাঁর বন্ধুবান্ধব সব ছুতারপাড়া আর কামারপাড়ার বাসিন্দাদের কেউ, ক'জন মাত্র। মাত্র ক'জনের মধ্যে বাল্যকাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি যাঁরা সঙ্গী ছিলেন তাঁরা দুই বন্ধু—বিশ্বনাথ নন্দী ও অতুলচন্দ্র কুচ্‌ল্যান। রামকিঙ্করের কথা বলতে গেলে এই দুই বন্ধুর কথা বার বার এসে যায়।

বাল্যকালে খেলাধূলা তো ছিলই, তবে রামকিঙ্করের খেলাধূলাতে যতো না মন ছিল, মাটি নিয়ে পুতুল গড়া, রঙ তুলি নিয়ে ছবি আঁকা এইসব ছিল তাঁর খেলার অঙ্গ। সুতরাং কামারপাড়ার সঙ্গীরা জুটে গেলো খেলার মাধ্যমে। খুব কাছে গন্ধেশ্বরী নদী, সেখানেই তাঁদের খেলাধূলা, ঘুরে বেড়ানো কাজ।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছবি আঁকা আর মূর্তি-গড়া এগিয়ে চললো তালে তালে। ভাগ্যক্রমে শান্তিনিকেতনের মাটি তাঁকে টানলো নিবিড় করে। দৃঢ়-কর্ম-ব্যস্ত তরুণ শিল্পীর নাম-যশ ছড়িয়ে পড়লো ক্রমশঃ। শান্তিনিকেতন থেকে বেশ কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরে যখন বাড়ী আসতেন তখন বন্ধুরা সবসময় তাঁকে ঘিরে থাকতো, কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর মিলনের আকর্ষণ বেড়ে যেতো। পূর্ণ যৌবনকালে মুখে চুরুট, মাথায় টুপি এবং টাই—তাঁর চেহারার এই আভিজাত্য বা স্টাইল দারুণভাবে লক্ষ্য করে বন্ধুরা। একবার বাঁকুড়ার স্বনামধন্য শল্যচিকিৎসক অনাথবন্ধু রায় যুবক রামকিঙ্করের বাড়ীতে তাঁর দাদার চিকিৎসার জন্য এসে সাহেব বেশধারী রামকিঙ্করকে দেখে অবাক হয়ে যান। যাই হোক্, বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ভালোবাসা কোনদিনের জন্য ম্লান হয়নি। মধ্যবয়সে তাঁর পোষাক ছিল সাদা পা-জামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবী। শান্তিনিকেতনের ছাত্র রামকিঙ্কর বাঁকুড়ায় এলে তাঁর কর্মের খ্যাতি অনেকের কাছে শুধু প্রচার-ই হয়নি কর্মের মৌলিক নিদর্শনও অনেকে রাখেন।

বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথ নন্দীর বিয়ে হয় সতের বছর বয়সে। স্ত্রীর বয়স আট। বেশ

কিছুদিন কেটে যাবার পর রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতন থেকে এলে আলাপ হয় প্রিয় বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে। বালিকাবধূ লাজুকে তো নিশ্চয়ই, তখনকার দিনে একহাত ঘোমটার মধ্যে মুখ রেখে একটা-আধটা হুঁ-হাঁ মাত্র। বিশ্বনাথ তাঁর নববিবাহিত স্ত্রীর একটি ছবি এঁকে দিতে বললে রামকিঙ্কর বলেন, 'তোমার বৌয়ের মুখই দেখলাম না, ছবি আঁকবো কি করে?' বিশ্বনাথ স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে কিছুতেই রাজী করাতে না পেরে শেষে একটা ফটো দেয় রামকিঙ্করকে। সেই ফটো দেখে বড় মাপের একখানা অয়েল পেণ্টিং করে ফিনিসিং টাচ্ দিতে বন্ধুর স্ত্রীকে ঘোমটা খুলে সামনে আসতে হলো অবশ্য বিশ্বনাথের অনেক সাধ্যসাধনা ও রাগারাগির পর। ঐ অপূর্ব এবং অমূল্য ছবিখানি এখনো তাঁদের বাড়ীর দেয়ালে সুরক্ষিত।

বাল্যবন্ধু অতুল কুচল্যান তাঁর মায়ের একখানি ছবি করে দিতে বললে, সামনে বসিয়ে তাঁর মায়ের একখানি ছোট মাপের অয়েলে ছবি এঁকে দেন। সেটিও

**বাল্যকালের তিনবন্ধু**
বামদিক থেকে : অতুলচন্দ্র কুচ্ল্যান, বিশ্বনাথ নন্দী এবং সবশেষে দাঁড়িয়ে উনিশ বছর বয়সী রামকিঙ্কর। (ছবি ১৯২৫)

এখনো সযত্নে রাখা আছে।

বাল্যবন্ধু অনাদি চট্টোপাধ্যায় তাঁর জ্যাঠামশায়ের একখানি ছবি ও সিমেণ্টের আবক্ষ মূর্তি করিয়েছিলেন। সেগুলিও বর্তমান।

এছাড়াও বন্ধু অশ্বিনী পালের বাড়ীতে তিনখানি সিনারি রয়েছে। এই ছবিগুলি শান্তিনিকেতনে যাবার আগে আঁকা।

বন্ধুরা সবাই মিলে থিয়েটার করতো, রামকিঙ্কর আঁকতো সিন।

বাল্যবন্ধুদের চোখে রামকিঙ্কর শুধু শিল্পী নয়, প্রাণের দরদী বন্ধু। অন্তরঙ্গতা গভীর না হলে বৃদ্ধ বয়সেও তিনজনে একাত্ম হয়ে থাকতে পারতেন না। বন্ধুদের বহু বহু ঘটনা; গল্প, আলোচনা, মান-অভিমান, আব্দার কিছু কিছু টেপে ও ফটোগ্রাফীতে ধরে রেখেছি। জানিনা ভবিষ্যতে রামকিঙ্কর অনুরাগীদের কোন কাজে লাগবে কিনা।
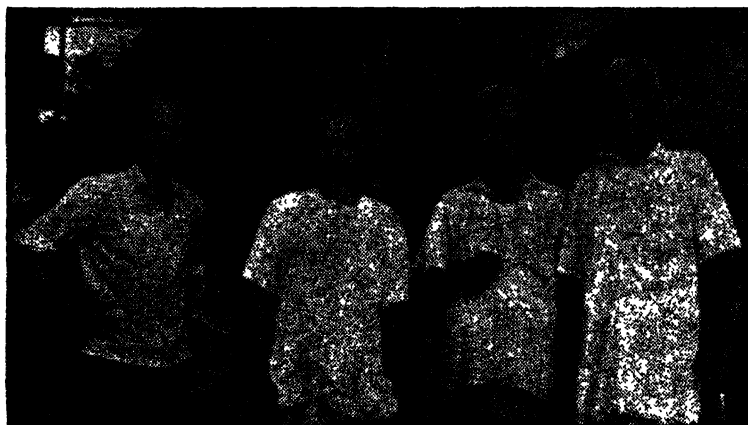
**বৃদ্ধ বয়সের তিন বন্ধু**
বাম দিক থেকে : লেখক, অতুলচন্দ্র কুচ্‌ল্যান রামকিঙ্কর এবং বিশ্বনাথ নন্দী,
ছবিটি ১৯৭০ সালের।

বিশ্বনাথ নন্দী এবং অতুল কুচ্‌ল্যান ছাড়া আর যাঁরা সব বাল্যবন্ধু ছিলেন, তাঁদের মধ্যে—সত্যেন দাস, নারান পাল, নগেন্দ্র পাল, সত্য দাস (সতু)। এঁদের সকলকে ঘিরে রামকিঙ্কর, রামকিঙ্করকে ঘিরে এঁরা সকলে। এছাড়াও তাঁর গুণমুগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে বাঁকুড়ার ছোটবড় সবাই ছিলেন। সকলকে তিনি মনে রেখেছিলেন, কাউকে ভুলে যাননি। বাঁকুড়ার কেউ শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে সকলের নাম ধরে খোঁজখবর নিতেন। পৌষমেলায় যেতে প্রতিবারই আমন্ত্রণ আসতো বিশ্বনাথ আর অতুলের কাছে। সস্ত্রীক যেতেন ওঁরা বাল্যবন্ধু রামকিঙ্করের ভগ্ন কুটিরে। যেকদিন একত্রে সকলে থাকতেন—মহা

আনন্দেই থাকতেন। বন্ধুদের বিদায় দেবার সময় হো-হো করে কেঁদে বলতেন, 'সংসার করিনি, যেকদিন তোমরা আমার কাছে ছিলে আপন হয়ে ছিলে। তোমরা চলে যাচ্ছো আবার আমি একা থাকবো।'

বন্ধুদের তিনি চিঠি লিখতেন পোস্টকার্ডে। প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে ছবি এ'কে দিতেন। একবার তিনবন্ধু সখ করে ফটো তুলিয়েছিলেন বাঁকুড়ার এক স্টুডিওতে। সেই ফটোখানি এখনো দেখা যায়—ধুতি-পরিহিত তিন তরুণ বন্ধু—রামকিঙ্কর বেইজ, বিশ্বনাথ নন্দী ও অতুল কুচ্‌ল্যান। এই তিন বন্ধুর বৃদ্ধাবস্থার ফটো বেশ কয়েকটা তুলে রেখেছি।

যুবক রামকিঙ্কর গানের আখড়ায় যেতেন। গানের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র বা সেতুবন্ধন হয় কিশোর বয়স থেকে। রাজেন্দ্রনাথ দত্তের গানের স্কুলে তখন খুব বেশী যাতায়াত করতেন। তখন কে ভাবতো রামকিঙ্কর বড়ো হয়ে বিশ্ববিখ্যাত চিত্র শিল্পী ও ভাস্কর হবেন। তবে হ্যাঁ, জেনেছিলেন সঙ্গীত শিক্ষক রাজেনবাবু। একবার তাঁর আখড়ায় গানবাজনা হচ্ছে, রামকিঙ্কর গান শুনতে শুনতে ছবি আঁকছেন। গান শেষ হলে রামকিঙ্কর গানের ভাবের দৃশ্যটুকু এ'কে দেখান। রাজেনবাবু বলেছিলেন—'কিঙ্কর বড়ো হয়ে আর্টিস্ট হবে।' বন্ধুরা তাঁর কর্মের নিদর্শন দেখে ভাবতো বা জানতো সে বড়ো সঙ্গীত শিল্পী হবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে শান্তিনিকেতনে গিয়ে এভাবে যে এতো বড়ো হবেন কেউ ভাবেনি। তিনি বড়ো চিত্র শিল্পী এবং ভাস্কর হলেন। বিশ্বজোড়া নাম তাঁর খবরের কাগজে বা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতো। তাঁর আঁকা ছবি যখনি কোথাও প্রকাশিত হতো একমাত্র বিশ্বনাথ নন্দী সেগুলি নানাভাবে সংগ্রহ করে রাখতেন। শান্তিনিকেতন থেকে বাঁকুড়ায় এলে বিশ্বনাথ সেগুলি বন্ধুকে দেখাতেন—'এই দেখো তোমার জিনিস সংগ্রহ করে রেখেছি।' তিনি তা দেখে মৃদু হেসে নিরুত্তাপে উত্তর দিতেন—'বেশ তো। ভালোই করেছো।' কোন গর্ব-অহঙ্কার কোন কৃতিত্বের অতিরিক্ত স্ফুরণ তাঁর মুখে চোখে ঠোঁটে ঠিকরে পড়তো না।

তাঁর বাল্যবন্ধুদের একজন বলাই কর্মকার ছিলেন গানের ভক্ত। 'কিঙ্কর, শান্তিনিকেতন থেকে এবার নতুন কি গান শিখে এলে শোনাও।' তিনি খোলা-মেলা গলায় একটার পর একটা গান গেয়ে শোনাতেন। সবই রবীন্দ্রসঙ্গীত। আকুল কেশে···' গানটির প্রতি বলাই কর্মকারের খুব আকর্ষণ ছিল। শেষবয়সেও দেখেছি তাঁকে এই গানটি গাইতে বলতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গানটি ধরতেন। আমার বাড়ীতে বসে ওনারা গান গাইতেন, আমাকে 'গীতবিতান' বার করে গানের কলি ধরিয়ে দিতে হতো। 'জানো বলাই, এবারের পৌষমেলায় বাউলের মুখে এই গানটা শুনেছি। খুব ভালো গান।'

'আচ্ছা কিঙ্কর, তোমার ওই গানটা মনে আছে ?'

'কোনটা ?'

'ছ'জনায় পথ দেখায় রে।'

তিনি হেসে বললেন—'না, না, ওরকম কথা নয়। কথাটা হচ্ছে—আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে পদে পদে পথ ভুলি হে। রবীন্দ্রনাথের গান।'

'এটা দেহতত্ত্বের গান।'

'হতে পারে। তবে এটা ব্রহ্মসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।'

'গানটা একবার করো, বেশ ভালো লাগে।'

'ভুলে গেছি সব কথাগুলো, অনেক বড় গান তো।'

বাল্যবন্ধু অতুল কুচ্‌ল্যানও গানের লোক ছিলেন। তিনি স্বদেশী গান বেশী গাইতেন। স্বদেশী যুগে আন্দোলন করেছেন, জেল খেটেছেন। রামকিঙ্করও স্বদেশীযুগে বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে পোস্টার লিখতেন, রাত্রিবেলায়, দোলতলার গোলক কর্মকারের ঘরে। সে যুগের আন্দোলনকে তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন ছবিতে ও পোস্টারে।

তিন বন্ধু মিলে একদিন রামকিঙ্করের বাড়ীতে দুপুরবেলায় নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। টেপ করছিলাম। ওনার বাড়ীর ঠিক সামনে আমার বাড়ী, মাঝখানে বড় পুকুর লাটবাঁধ। কথায় কথায় বিশ্বনাথদা একটু অভিমানের সঙ্গে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললেন—'তুমি বাঁকুড়ার এত বড়ো একটা পিলার, বাঁকুড়ার কাউকে তুমি তৈরী করে গেলে না? ভবিষ্যতে তোমার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকতো। তোমার ট্রেডেসেন রাখতো ?'

উনি শান্ত-গম্ভীর হয়েছিলেন। ওঁকে চুপচাপ দেখে বিশ্বনাথদা আরো উত্তপ্ত হয়ে বললেন—'এতো এতো লোককে কতো কি শেখালে, এখানেব কাউকে তুমি কিছু শেখালে না ?'

উনি আমাকে দেখিয়ে বললেন—'এই তো একজন হচ্ছে।'

'তা বেশ তো, একেই তুমি তৈরী করো।'

'আমি আবার কি করবো ? এ তো হচ্ছে। আমি কি একে হাতী করে দেবো ?'

'না হাতী করবে কেন ?'

'তবে ?'

আমি প্রসঙ্গটা পাল্টে দিয়ে বলি—'আমরা চাইছি বাঁকুড়ায় আপনাকে নিয়ে কিছু করবো।'

'কি করবে ?'

বললাম—'আপনার একটা মিউজিয়াম করবো।'

'না বাবা, আমার টাকা নেই।'

বললাম—'না, না। আপনাকে টাকা লাগবে না। আপনি শুধু রাজী হোন এবং মত দিন। আর আপনার ছবি এবং মূর্তিগুলো শান্তিনিকেতনের বাইরে যেখানে যা আছে আপনি বলুন, আমরা তা জোগাড় করে একটা মিউজিয়াম করি।'

'না বাবা, আমার টাকা নেই।'

বিশ্বনাথদার রাগ তখনো কমেনি। 'শুনছো, শুনছো তো। ওর ঐ এককথা। দ্যাখো, বিষ্ণুপুরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামে কলেজ হয়েছে, লাইব্রেরী হয়েছে। আমরা তোমার নামে কিছু করতে পারি না ?'

তিনি মৃদুভাবে বললেন—'ওঁর অনেক টাকা। আমার কিছুই নেই। থাকগে।'

কথা পাল্টে অতুলদা বললেন—'একটা মজার ঘটনা বলি শোনো। তালাজুড়ি নামে একটা গ্রামে পুকুর কাটা হচ্ছিল। সেখানে মাটির নীচে একটা খুব সুন্দর পাথরের মূর্তি পাওয়া গেল। আমিও দেখলাম মূর্তিটা। যার পুকুর সে মূর্তিটা বিক্রী করে দিলো একজনকে।'

উনি বললেন—'মূর্তিটা কত বড়ো।'

'বেশ বড়ো। যে কিনলো, সে গোরুর গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে গেল। আমি হলে মূর্তিটা বিক্রী করতাম না।'

'কি করতে তুমি ?'

'রেখে দিতাম। বিক্রী করতাম না।'

উনি হেসে বললেন—'তুমি কোথায় রাখতে ? রেখে কি করতে ? তার চেয়ে বিক্রী করে ভালোই হয়েছে।'

মিউজিয়াম করা প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল। খুব সত্যি কথা, ওনার হাতে টাকা পয়সা থাকতো না। ছবি, মূর্তি বিক্রী করে যা পাওয়া যেতো তা যতই হোক থাকতো না। থাকতো অভাব। সেই চিরঅভাবী মানুষটিকে যাঁরা জানতেন, যাঁরা দেখেছেন, যাঁরা বুঝেছেন তাঁরা এখনো ভোলেন নি তাঁকে, ভোলা যায় না। তিনি ছিলেন শিশুর মতো উদার, সরল আর ভালো মানুষ। কোনদিন কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি বরং প্রাণের ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন সকলকে।

রামকিঙ্করের বাল্যবন্ধুদের বহু কথা, বহু ঘটনা বলে বা লিখে শেষ করা যায় না। যাই হোক, বাল্যবন্ধুদের মধ্যে আগে চলে গেলেন অনাদি চট্টোপাধ্যায়, তারপর বলাই কর্মকার, বিশ্বনাথ নন্দী এবং রামকিঙ্কর বেইজ। সবশেষে গেলেন অতুল কুচ্‌ল্যান।

বাল্যবন্ধুদের এখন যাঁরা দুজন বাড়তি সঙ্গী রয়েছেন তাঁরাও একসঙ্গে মিলিত হবার পথ চেয়ে দিন গুনছেন—তাঁরা হলেন রামপদ মণ্ডল ও হাবু কর্মকার।

## আমার সহপাঠী রামকিঙ্কর*

.....................................

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকিঙ্কর যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে আসে তখন আশ্রমের গৌরবের যুগ চলছিল। তার বাইরের সৌষ্ঠব এবং আয়তন আজকের শান্তিনিকেতনের অর্ধেকও ছিল না। কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্যে সে তখন উদ্বেলিত। শিল্পাচার্য নন্দলাল তখন কলাভবনের কর্ণধার। তিনি নিজে প্রতিদিন স্থানীয় প্রকৃতি এবং মানুষের কাছ থেকে সৌন্দর্য সৃষ্টির দীক্ষা নিচ্ছেন এবং নিজের আনন্দের ফসল ছাত্রদের মধ্যে উজাড় করে বিলিয়ে দিচ্ছেন। সেদিন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক মাসোজী প্রভৃতি প্রথিতযশা গুণীশিল্পীরা। এঁদের পর ১৯২৩ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে এসেছিলুম আমরা—হরিহরণ, সুকুমার দেউস্কর, বাসুদেবন, সুধীর খাস্তগীর, বনবিহারী, কানু দেশাই, সত্যেন্দ্র ( নাথ ) বিশী প্রভৃতি। আমরা তখন প্রাক-কুটির ছেড়ে তোরণঘরের নীচের তলায় আছি কলাভবন এবং শিক্ষাভবনের বারো-চোদ্দজন ছাত্র। কলাভবনও তখন উঠে এসেছে দ্বারিক ছেড়ে গ্রন্থভবনের দোতলার, বর্তমান পাঠভবনের, প্রকাণ্ড হল ঘরটাতে। তার দেয়ালে অলংকরণের কাজ চলছে জয়পুরী কারিগরের সাহায্যে শিল্পাচার্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী। নীচের তলায় তাঁর চৈতন্য-জন্ম, নটীর পূজার নাচ ও ছাত্রছাত্রীদের কাজ চলছে ভিত্তিগাত্রে, দোতলায় মিশরী, চৈনিক, পারসিক, অজন্তা, জয়পুরী প্রভৃতি নানা শৈলীর কাজের সঙ্গে আশ্রমের বৈতালিকের চিত্রও আঁকা হয়েছে। এই পারিপার্শ্বিকে রামকিঙ্কর যখন এসে দাঁড়াল, তখন তার আগমন তেমনভাবে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

রামকিঙ্কর প্রথম যেদিন আমাদের তোরণঘরের নীচের তলায় এসে দাঁড়াল, সেদিন তার অত্যন্ত সাদামাটা মলিন গ্রাম্যভাবাপন্ন খদ্দরপরা চেহারার মধ্যে অসাধারণত্বের কোন লক্ষণ কেউ দেখি নি। সে ঘরে তখন আমিই খদ্দর পরতুম এবং আমার কিছুটা প্রাধান্য ছিল। সুজিত সঙ্গে সঙ্গে নবাগতের নাম দিল 'খদ্দর বন্ধু'। কলাভবনের দো-তলায় আমাদের কাছাকাছি একটা মাদুর, ডেস্ক, জলের গামলা, ড্রয়িং বোর্ড এবং রঙের বাক্স নিয়ে সে ছবি আঁকতে বসল। জলরঙে কাগজের উপর ওয়াশের ছবি সে আমাদেরই মতো আঁকত। ঘরে আমাদেরই পাশে একটা

* রামকিঙ্করের দু'বছর আগে কলাভবনের ছাত্র হয়ে আসেন প্রবন্ধটির লেখক। সঃ

তক্তাপোষে স্থান হল তার। প্রথমদিকে তার দুটো দুর্বলতা কিছুটা হাস্যাস্পদ করে তুলেছিল তাকে। প্রথমতঃ সুকণ্ঠ না হলেও তার খুব গান গাইবার ঝোঁক ছিল। শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল গ্রামের দিকে মাঠের মধ্যে তাকে গলা সাধবার পরামর্শ দিতে সে মেনে নিয়েছিল। দৈনিক একবার করে তার দূরাগত কণ্ঠধ্বনি আমরা শুনতে পেতুম। দ্বিতীয়তঃ তার পিতৃদত্ত নাম এবং পদবী নিয়ে কয়েকজন বন্ধু রসিকতা করায় সে কিছু বিব্রত বোধ করত। তাই তার রঙীন ছবি প্রবাসীতে ছাপা হয় রামপ্রসাদ দাস নামে।

ছাত্রদের মধ্যে আমি এবং সুধীর খাস্তগীর ক্রমে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠি। ঘরে-বাইরে একসঙ্গে ঘোরা, ভিত্তিচিত্র আঁকা, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় আশ্রম পরিষ্করণের কাজে পরস্পরের সহায়তা—এমনি নানাভাবে আমাদের অন্তরঙ্গতা বেড়ে যায়। একবার বড়দিনের ছুটিতে পঞ্চাশ টাকা হাতে নিয়ে আমরা উত্তর ভারত এবং রাজপুতানা ভ্রমণে বেরই। নালন্দা, রাজগীর, গয়া, বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র, কাশী, সারনাথ, প্রয়াগ, দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর, মথুরা, বৃন্দাবন, আজমীর, পুষ্কর, জয়পুর, চিতোর, উদয়পুর ঘুরে দেখি।[১] পিঠে বিছানা-কাপড়ের বোঝা, বিশ্রাম অবৈতনিক ধর্মশালায়, নির্দিষ্ট ব্যয়বরাদ্দে ন'আনা বা বারোআনা সের পুরী তিনজনে ভাগ করে খাওয়া। ভারতের প্রাচীনযুগের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের সঙ্গে রামকিঙ্করের সেই প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় মুগ্ধ করে তাকে। জয়পুরে মহারাজের বাঙালী দেওয়ানের কাছে নন্দলালবাবু চিঠি দিয়েছিলেন। সতীর্থ সোভাগমল গেহলটের জয়পুরের বাড়ীতে একদিনের আতিথ্যে তৃপ্ত হয়ে তাকে রান্না করতে বারণ করে আমরা গেলুম বাঙালী দেওয়ানের বাড়ী। বেলা বারোটা পর্যন্ত গল্প করে তিনি কিছু দেখাবার ব্যবস্থা না করে যখন বিদায় দিলেন তখন আমরা পথের ধারে এক হলোয়াইয়ের দোকানে খানকয়েক পুরী কিনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছি—এমন সময় দেখি সোভাগমল সেই পথে আসছে। চোখের নিমেষে পাশেই একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে আত্মগোপন করি আমরা। এদিক সেদিক ঘুবে বিকেলে সোভাগমলের বাড়ী ফিরি। এরপর সোভাগমল আমাদের সঙ্গী হল রাজপুতানা ভ্রমণে। আজমীড়ে পীরের কবর ও দুর্গ, পুষ্করে সাবিত্রী পাহাড়ে ওঠা ও সন্ধ্যায় আরতির সময় হ্রদের চতুর্দিক থেকে পুরোহিতদের দেওয়া খাবার খেতে দলে দলে কুমীর ভেসে আসা ভোলা যায় না। দিল্লীতে শীতের রাতে ধর্মশালায় ঢুকে দেখা গেল সমস্ত ঘর, বারান্দা ও উঠোনে যাত্রীরা আগুন জ্বেলে ভীড় জমিয়েছে। দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। ওদিকে আমাদের হোটেলে যাবার মতো অর্থবলও নেই। ভাগ্যক্রমে দেয়ালের গায়ে একটা প্রকাণ্ড দেয়াল আলমারী ছিল। কাঠের পাল্লা খুলে তার তিনটে পাথরের তাকে তিনবন্ধু বিছানা পেতে রাত কাটিয়ে দিলাম। ধোঁয়া এড়াবার জন্য পাল্লাগুলো প্রায়

১. প্রবন্ধকার আমাকে এই ভ্রমণের সময়সীমা জানিয়েছেন ১৯২৭-২৮ সাল। সঃ

বন্ধ রেখে ভিতর থেকে দাঁড় বেঁধে টেনে দেওয়া হয়েছিল।

আগ্রায় দিনের বেলায় দুপুর রৌদ্রে তাজমহল দেখে হতাশ হয়ে রাতে চাঁদের আলোয় যখন কুয়াশায় মিশে তাজের চূড়ো আকাশের মেঘের সঙ্গে মিশে স্বপ্নরচনা করল এবং যমুনাতীরে পাথরের বেঞ্চে বসে সুধীর তার বাঁশীর সুরে সেই স্বপ্নকে রহস্যময় করে তুলল, তখনকার স্মৃতি আজও ভুলিনি। আজমীড়ে চিতোর যাবার জন্য টিকিট কেটেছি—কলাভবনের সতীর্থ রঘুবীর সিং-এর সঙ্গে দেখা। সে টিকিট ফেরত দিয়ে ত্রিশ মাইল দূরে নিয়ে গেল ট্রেন ভাড়া দিয়ে। তিনদিন তার মা-বোনের যত্নে অস্থির হয়ে আমরা তার অনুপস্থিতে লুকিয়ে পালিয়ে আসি। উদয়পুরে এক অবৈতনিক ধর্মশালায় মোটঘাট ফেলে তিন আনায় তিনখানা খাট ভাড়া করে আমরা গেলুম প্রাসাদ দেখার অনুমতি চাইতে বাঙালী দেওয়ান প্রভাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। তিনি নিজের মোটরে আমাদের বিছানা তুলিয়ে আনলেন উদয়পুর হোটেলে। রাজকীয় ব্যবস্থায় তিনদিন থাকা এবং তাঁর বাড়ীতে তাঁর পাশে বসে রাজভোগ খাওয়া গেল। দুর্গে সে যুগের বহু বহু প্রাচীন ছবি, প্রতাপ সিংহের ছবিটি ছিল রবি বর্মার আঁকা, অস্ত্র-পালঙ্ক-সিংহাসন প্রভৃতি দেখা গেল। তাঁর মোটর আমাদের উদয়-সাগর পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনল। তিনদিন তিনি তাঁর গাড়ী আমাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। পিছোলা হ্রদের মধ্যে শ্বেতপাথরের বাড়ীগুলিও ভোলবার নয়। ঐবার ভ্রমণের সময় জয়পুরে বিখ্যাত ভাস্কর মালিরামের সঙ্গে পরিচয়ে আমরা লাভবান হয়েছিলাম।

. তখন শান্তিনিকেতনে আমরা মূর্তি গড়তে আরম্ভ করেছি। ফন লিজাপট নামের একজন বিদেশী মহিলাশিল্পী এসেছিলেন। সতেন্দ্র বিশী তাঁর প্রথম ছাত্র হয়। আশ্রমের বৃদ্ধ ভৃত্য 'ওস্তাদ'কে আদর্শ করে সে তার আবক্ষ মূর্তি গড়ে মাটিতে এবং তার ছাঁচ নেয় প্লাস্টার অব প্যারিসে। তারপর সুধীর, আমি ও কিঙ্কর তাঁর ছাত্র হই। গ্রন্থভবনের দোতালায় চিত্রকরদের মধ্যে জল কাদার কাজ চলবে না বলে আমাদের স্থান হল বারান্দায়। মাস্টারমশাই লিজাপটের নির্দেশ মতো একবুক উঁচু চারটে ঘুরণচৌকী করিয়ে দিলেন আমাদের কাজের সুবিধার জন্য। বারান্দায় স্থানাভাব ঘটল ছাত্র বাড়তে থাকায়, অগত্যা তোরণঘরের দোতলায় মডেলিং ক্লাস আরম্ভ হল। লিজাপট যাবার পর এলেন ইংরেজ মহিলা শিল্পী মাদাম মিলওয়ার্ড। তিনি জগদ্বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রঁদার বেলজিয়ান শিষ্য বুরদেলের শিষ্যা। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাদের মূর্তি গড়ার ও ছাঁচ নেওয়ার কাজ শেখান। সে সময়ে কলাভবনের একমাত্র ভৃত্য 'নব' চিত্রকরদের নিয়ে ব্যস্ত, অগত্যা মূর্তি তৈরীর সমস্ত ব্যবস্থা করতে হল আমাদেরই। সাঁওতাল গ্রামে যাবার পথে খেলার মাঠ পার হয়ে কিছু দূরে একটা তালগাছ তলায় একটা কোণায় নরম মাটি পাওয়া যেত। আমি, সুধীর ও রামকিঙ্কর সেই মাটি কেটে ঝুড়ীতে ভরে ধরাধরি করে বয়ে এনে তোরণঘরের দোতলায় তুলতুম। সেই মাটি চটকে, কাঁকড় বেছে গামলায় করে রেখে দিতুম ভিজে চট চাপা দিয়ে। প্রথম দিকে আবক্ষ মূর্তিই হত বেশী। শরীর-সংস্থানবিদ্যা শেখবার জন্য

প্রথম দিকে অ্যানাটমির বই ছিল না। 'গ্রেজ অ্যানাটমি' থেকে অস্থি-পেশী প্রভৃতি খাতায় তুলে নিতুম আমরা। শ্মশান থেকে মড়ার মাথার খুলি এবং হাড়ের টুকরো কুড়িয়ে আনতুম। নন্দলালবাবু আমাদের আগ্রহ দেখে তারে গাঁথা সম্পূর্ণ একটা নরকঙ্কালের বাক্স কলকাতা থেকে আনিয়ে দিলেন। বইও কিনে দিলেন কিছু। প্রতিকৃতি গঠনের মধ্যে মধ্যে মন থেকে নানা মূর্তি গঠনেও সবাই হাত দিলুম আমরা। আয়োজনের মধ্যে জল, ন্যাকড়া, রবার ক্লথ, প্লাস্টার অফ প্যারিসের টিন ছাড়া মাটি চাঁছবার, কাটবার, টেপবার কতকগুলি লোহার যন্ত্র লাগত। মাঠ পার হয়ে শ্রীনিকেতন রোডে কামারের দোকানে ফরমাশ দিয়ে রামকিঙ্কর ও আমি সেইরকম কয়েকটি যন্ত্র করিয়ে আনি।

এই মূর্তিগঠনের সময়েই রামকিঙ্কর সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। শরীর-সংস্থান বিদ্যায় তার ধারে কাছে কেউ রইল না। রামকিঙ্কর, সুধীর খাস্তগীরের যে অপূর্ব জীবন্তপ্রায় আবক্ষ মূর্তিটি গড়েছিল খেয়ালের বশে সেটি ভেঙে ফেলে। সে সময়ের সুধীরের গড়া রামানন্দবাবুর মূর্তি, আমার গড়া জগদানন্দবাবুর মূর্তি এখনও আছে। অন্য বহু মূর্তি নতুন ভাস্কর্যভবনে জায়গার অভাবে ভেঙে ফেলা হয়েছে বা 'নন্দন' বাড়ীটার কাছাকাছি মাটির তলায় পুঁতে দেওয়া হয়েছে। মিলওয়ার্ডের সময় থেকেই মডেলিং ক্লাসে নিজেরা চাঁদা করে পয়সা দিয়ে ভদ্র বেশবাস পরা সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ মডেল রাখা আরম্ভ হয়। বনবিহারী, রাজু প্রভৃতি ছেলেরা ছাড়াও অনুকণা, ইন্দুসুধা, মন্দাকিনী, গীতা প্রভৃতি মেয়েরাও ক্লাসে যোগ দেয়। মিলওয়ার্ড বিদায় নিলে বের্গম্যান (Bergemen) নামের একজন ভাস্কর কিছুদিন আমাদের 'রিলিফের' কাজ শিখিয়েছিলেন মাটির টালিতে। তাঁর নিজের বিদ্যা অল্পই ছিল। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বিদায় নিলেন। তারপর মাস্টারমশাই নন্দলালবাবু নিজে ভার নিলেন। ঘুরণচৌকিতে নির্মীয়মান মূর্তিকে ঘুরিয়ে দেখে যাতে সর্বদিক থেকে সুন্দর দেখায় তার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু ছুটির সময় মাসের পর মাস ঘুরণচৌকির অভাবে ছাত্রদের কাজ যাতে বন্ধ না থাকে সেইজন্য তিনি এমন এক ঘুরণচৌকি আমাদের করে দিলেন যা ট্রাঙ্কে ভরে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া যায় এবং যেকোন টেবিলে বসিয়ে কাজ চালানো যায়।

পরবর্তী সময়ে মাস্টারমশাই এবং রামকিঙ্করের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শান্তিনিকেতনের তৎকালীন শিল্পীরা আশ্রমকে সাজিয়েছে নানাভাবে। প্রকৃতিতে যা আছে তাতে তার মন ভরছিল না আর। এইভাবেই আরম্ভ হয় তার অতিপ্রাকৃত বা বিমূর্তবাদের সৃষ্টি। সে নতুন কিছু করতে যাওয়ায় নন্দলালবাবুর সঙ্গে তার মতবিরোধ হয়। কিন্তু রামকিঙ্কর যতই বিমূর্তবাদের ভক্ত হোক না কেন তার বাস্তবানুগ কাজের নিদর্শনগুলিই প্রমাণ করবে সে অক্ষম বলে অতিপ্রাকৃত মূর্তি গড়তে যায়নি। বাস্তবানুগ মূর্তি গড়তেও সে ছিল সক্ষম। নন্দলালবাবুর ভাষায় সে ছিল দেবীপ্রসাদের চেয়েও বড়ো শিল্পী। অতি আধুনিকতার মোহে সে পথ-ভুল করেছিল

কিনা-কে বলবে ? প্রতিভাধরেরা বাঁধা পথে চলতে ভালোবাসে না। গুরুগোবিন্দের ভাষায়—'অন্যের তৈরী পথে চলে ভীরু, ফেরু আর বাপের কুপুত্র। শের, সিংহ, সুপুত্র নিজেরা নিজের পথ তৈরী করে চলে দুর্গম বনে।' এর জন্য তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

রামকিংকরের সবচেয়ে বড় কাজ হল দিল্লীর রিজার্ভ ব্যাংকের সামনে দু'দিকের বিরাট 'যক্ষ-যক্ষী'। ভারত সরকারের নির্দেশে তৈরী পাথরের এই মূর্তি দুটি কারো মতে অপূর্ব বলিষ্ঠ কাজ, আবার কারো মতে বা 'শিল্পে দুঃস্বপ্ন'। এই মূর্তি দুটির পাথর খুঁজতে এবং কাটাতে কয়েক লক্ষ টাকার অপব্যয় নিয়ে নানা সমালোচনা হয়। কিন্তু সে ছিল নির্বিকার। মান-সম্মান পাবার পূর্বে এবং পরে সে হাজার হাজার টাকা ছবি এঁকে এবং মূর্তি গড়ে উপার্জন করেছে কিন্তু তার অমায়িক ব্যবহার, ছাত্রপ্রীতি এবং বন্ধুবাৎসল্য কমে নি। মূর্তি গড়বার সময় দুপুরের প্রচণ্ড রোদে সোলাহ্যাট মাথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

আমি যখন নন্দলালবাবুর পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার জন্য 'কারুসঙ্ঘ'কে রূপদান করি তখন রামকিংকর ছিল আমাদের অন্যতম সদস্য। কারুসঙ্ঘের কাজেও সে নিজের পছন্দ না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজ খরিদ্দারকে দিতে দিত না। সে যুগের তার কয়েকটা বর্জিত কাজ আমার কাছে আছে আজও। অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের ফরমাসে তৈরী সিমেন্টের টালিতে খোদাই করা দুটো অজন্তার হাঁসের মূর্তি আমি নিজে কলকাতায় গিয়ে তাঁর বাড়ীতে দিয়ে এসেছিলুম। সেই সুন্দর টালি লাগানো হয়েছিল এলগিন রোডের বাড়ীতে তাঁর সদর দরজার মাথায়। উপস্থিত সেগুলিকে ঢাকা দিয়ে বাটার বিজ্ঞাপন বসেছে।

তার বন্ধুবাৎসল্যের শেষ দুটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করব আমি। তখন স্বদেশী করি, শিল্পজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছি বহুদিন। কলকাতা থেকে মাইল কুড়ি দূরে চব্বিশ পরগণার এক হরিজন পল্লীতে পরিত্যক্ত এক মাটির কুটিরে থাকি। স্বেচ্ছা-সেবকদের নিয়ে গ্রাম সেবার কাজ করি। রামকিংকর আমার সঙ্গে সেখানে গেছিল মোটর-লঞ্চে। মাটির কুটিরের দেয়ালে খড়িমাটি এবং গিরিমাটি দিয়ে সে একটি ছবি এঁকে দিয়ে এসেছিল। প্রস্ফুটিত পদ্মের মধ্যে দাঁড়ানো একটি তলোয়ার। কুটির ভেঙে পুলিশ সে ছবিটি নষ্ট করেছিল। বারো বৎসর স্বাধীনতা যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি দৈবদুর্বিপাকে সেবাকার্যের পর শ্রীনিকেতনে যাই রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে লোকশিক্ষা সংসদের ভার নিয়ে। বিশ বছর চাকরির পর আদর্শরক্ষার তাগিদে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধে চাকরি ছাড়তে হয়। বাষট্টি বছর বয়সে নতুন করে আবার ছবি আঁকতে আরম্ভ করি। কিংকর খবর পেয়ে আমার শ্রীনিকেতনের বাড়ীতে এসে আনন্দ করে ছবিগুলি দেখে যায়। যৌবনে পাঁচ-দশ টাকার জন্য কারুসঙ্ঘের সাহায্য নিয়েছে সে, আবার বার্ধক্যে বহু সহস্র টাকা উপার্জন

করে ছাত্রদের সাহায্যও করেছে সে। জীবনের সকলরকম রূঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে তাকে। তবু তার মুখের হাসিটি শেষদিন পর্যন্ত অম্লান থেকেছে। তার ছাত্রপ্রীতি কলাভবনের সকল ছাত্রের আপনজন করেছে তাকে।

আমি নিজে অসুস্থ, শয্যাগত*। সাধারণ চিকিৎসালয় শুয়ে আমার বয়ঃকনিষ্ঠ সেই বন্ধুর প্রতি প্রণাম জানাচ্ছি যাকে পথের আহত কুকুরের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে দেখেছি।

* সম্প্রতি মারা গেছেন। সঃ

## সৃষ্টিমগ্ন রামকিঙ্কর

..............................

### ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন

শিল্প সৃষ্টি করাই ছিল রামকিঙ্করের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। মনের আনন্দে তাই তিনি জীবনভোর ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে গেছেন। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ছিল তাঁর মনের মতো। এখানকার উদার উন্মুক্ত প্রান্তর, ঢেউ খেলানো লালরঙের খোয়াই, দূরপ্রান্তে নীলাভ গাছপালা, তাল গাছের সারি, মাথার উপরে বিরাট নীলাকাশ—সব মিলিয়ে এই যে অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি সবই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এই তৃপ্তিকর আকর্ষণের মায়া ত্যাগ করে অন্যত্র মোটামাইনের চাকরী রামকিঙ্করকে কখনও প্রলুব্ধ করতে পারেনি। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, 'যাঁরা সাধক তাঁরা এখানে থেকে যাবেন। আর যাঁরা পথিক তাঁরা এখান থেকে চলে যাবেন।' রামকিঙ্কর ছিলেন সেই সাধনার পথের ব্যক্তি তা নাহলে কি এমন নিবিড়ভাবে কেউ রূপসাগরে ডুব দিতে পারে ?

রামকিঙ্কর যখন কলাভবনে এসে ভর্তি হয়েছিলেন তখন পুরোনো লাইব্রেরীর উপরতলায় ছিল কলাভবন। সেই সময়ে এখানে একমাত্র ছবি আঁকাই ছিল শিল্প-শিক্ষার প্রধান বিষয়। ক্রমে পরপর দু'জন বিদেশিনী ভাস্করের আগমন এবং তাঁদের সহায়তায় কলাভবনে মূর্তি গড়ার কাজের সূচনা হয়। এই ভবনের ছাত্রদের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচজন এই শিক্ষায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। রামকিঙ্কর ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম একজন। গুরু নন্দলালের উৎসাহে এবং রামকিঙ্করের চেষ্টায় পরবর্তী সময়ে কলাভবনে মূর্তি গড়া বা মডেলিং ক্লাসের কাজ শুরু হয়। এই ভবনের এই শিক্ষায় রামকিঙ্করের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কলাভবনের খোলা মাঠে রামকিঙ্কর কতকগুলি বড় বড় মূর্তি গড়ে দিয়ে গেছেন। দারুণ গ্রীষ্মের প্রখর রোদে যখন তিনি এই মূর্তিগুলি তৈরী করছিলেন তখন তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না, কণ্ঠে গুনগুন গানের ধ্বনি ছিল কেবল। দুটি সাঁওতাল রমণী ছুটে চলেছে, 'কলের বাঁশী' নামে খ্যাত এই ভাস্কর্যটি যখন রামকিঙ্কর তৈরী করছিলেন তখন ছবি আঁকতে আঁকতে আমার স্টুডিও ঘরের জানলা দিয়ে লক্ষ্য করতাম দারুণ গ্রীষ্মের গরমে, দুপুরের রোদে তিনি কাজ করেই চলেছেন। কখনও হয়ত তালপাতার টোকা আছে মাথার উপরে। দারুণ গ্রীষ্মের গরম আর রোদের প্রতি তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আমার চোখের সামনে ঐ মূর্তি গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হতে দেখেছি। এটি ছাড়াও কলাভবনের চারপাশে আরও বেশ কয়েকটি

মূর্তি আছে তাঁর, মূর্তিগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচন ও শিল্প-সৃষ্টির উচ্চমানের বৈশিষ্ট দর্শকদের মনকে সবসময় আকর্ষণ করবে। রামকিঙ্করের ছবিগুলিতেও তাঁর নিজের ঢঙের বৈশিষ্ট উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বর্তমানে অনেক ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে আত্মপ্রচার, বিদেশী শিল্পীদের কিঞ্চিৎ করুণালাভে নিজেকে ধন্য বোধ করা ইত্যাদি প্রচার করবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেসব শিল্পী এই বিদ্যায় পারদর্শী তাঁরা অনেকেই ভালো চাকরী লাভ, সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছেন। আবার এমন শিল্পীদেরও দেখেছি যাঁরা এইসবের উর্দ্ধে ও প্রচার বিমুখ। তবে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ ছিলেন তেমনি একজন শিল্পী। তিনি ছবি আঁকতে, মূর্তি গড়তে, রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে, অভিনয় করতে ভালোবাসতেন। যথার্থ উঁচু দরের শিল্পীই ছিলেন তিনি। রামকিঙ্করের আর একটি মহৎ গুণের কথা উল্লেখ করতে হয়। গুরু নন্দলালের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি আর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁকে কোন সময়েই গুরুর প্রতি কোন বক্রোক্তি করতে শোনা যায় নি। এমন কি নিজে খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করবার পরেও না।

সুর ও ছন্দকে নিয়ে ভাবের রস সৃষ্টিই সঙ্গীত। তেমনি ছবির বেলাতেও রঙ, রেখা আর ছন্দকে নিয়ে ভাব প্রকাশকেই শিল্প সৃষ্টি বলে। সুর আর রঙ দুই-ই নিস্ফল হত যদি না তা ছন্দের গতিতে আবদ্ধ থাকত। নদীর জল-স্রোতে, সমুদ্রের ঢেউয়ে, ষড় ঋতুর আবর্তনে, ঝড়ের তাণ্ডবে, বিশ্বের সর্বত্রই ছন্দের গতিতে দোলায়মান। কবিতায় ছন্দের একটি বিশেষ স্থান আছে। ছবির বেলাতেও তাই। শিল্পীরা নিজের ভাব প্রকাশকে ছন্দের গতিতে ধরবার প্রয়োজনে আকার-রূপের মধ্যে পরিবর্তন বা ভাঙ্গন এনে অরূপের মহত্ত্বে পৌঁছে দেন। এইখানেই যথার্থ শিল্পীর কার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মডার্ন আর্টের ভারতীয় অনুগামীরা এই আকার-রূপ ভাঙ্গনের রীতির প্রতি সর্বদা সচেতন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশরই আকারের ঠিক ধারণা না থাকায় আকার-রূপ ভাঙ্গনে দুর্বলতা ও ছন্দপতন বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ইজম (ism) সর্বস্ব বা অতিরীতি নিষ্ঠাবান হলে যথার্থ রূপসৃষ্টির আবেগ ও আত্মপ্রকাশ বাধা পায়। রামকিঙ্কর এই দোষমুক্ত ছিলেন। তাঁর চিত্রে বা ভাস্কর্যে ছন্দের খাতিরে আকার-রূপ ভাঙ্গন কোথাও বৃথা হয় নি। তার একমাত্র কারণ শিল্পীর ভালোভাবে সকল জীবজন্তুর আকার বা শরীর-গঠন প্রণালীর (Anatomy) ড্রয়িং জানা ছিল, তার সঙ্গে ছিল ভাবের তীব্র আবেগ। সেই কারণে শিল্পীর সব সৃষ্টির কাজেই ছন্দের তাগিদে আকার-রূপ ভাঙার মধ্যে একটা দৃঢ়তা, সুসামঞ্জস্য ও বলিষ্ঠ ছন্দ-গতির মাধুর্য এনে দিয়েছে। আকারের ভাঙ্গন (distortion) শিল্পীর কাজে কোনপ্রকার অবনতি না ঘটিয়ে বরং উন্নত করেছে ভাবের প্রকাশে। যারা রোদ-বৃষ্টিতে মাঠে ঘাটে খেটে খায় সেইসব মেহনতী সাধারণ লোক ও সাঁওতাল নরনারীর বলিষ্ট দেহের সৌন্দর্য শিল্পীর মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাই এইসব মানুষকে তাঁর

অধিকাংশ ছবিতে ও ভাস্কর্যে দেখতে পাওয়া যায়। চিত্রে ও ভাস্কর্যে শিল্পীর সাফল্য আধুনিক শিল্প ইতিহাসে বিশেষ অবদানরূপে গণ্য হবে।

একজন ভালো ওস্তাদ গাইয়ে যেমন সুরে, লয়ে সুন্দরভাবে গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন, একজন কবি ভাষার ছন্দে, ভাবের মাধুর্যে যেমন একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেন তেমনি রামকিঙ্কর তাঁর ভাস্কর্যে, তাঁর ছবিতে রঙ-রেখার সমন্বয়ে অপূর্ব শিল্প রচনা করেছেন। তাঁর ড্রয়িং-এর দৃঢ়তা, ছন্দের মাধুর্য দর্শকদের মনকে স্বভাবতই আকর্ষণ করে এবং আনন্দ দেয়। দুর্বল কাজ রামকিংকরের হাত থেকে বের হতে দেখিনি। তাঁর সব কাজই সবল বলে মনে হয়। এই গুণটি তাঁর সব স্কেচেও দেখতে পাওয়া যায়। ভালো ড্রয়িং জানা এবং নর-নারী, পশু-পাখীদের দৈহিক-গঠনজ্ঞান থাকায় তাঁর সব ছবিতেই একটা সবলভাব প্রকাশ পেয়েছে। মূর্তি গড়ার কাজেই হোক বা ছবি আঁকাতেই হোক মনের মতো যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অদলবদল করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না। যেমন-তেমন করে কাজ করা রামকিংকরের স্বভাবে ছিল না। দেখা গেছে একটা মূর্তিকে তিন-চারবার ভেঙে আবার গড়তে। ছবির ক্ষেত্রেও তিন-চারবার মুছে আবার এঁকেছেন।

তাঁর ছবিতে ভাঙ্গন (distortion), সরলীকরণ (Simplification) ইত্যাদি থাকলেও ইজম-এর (ism) খাতিরে প্রাণহীনতা ছিল না। ছিল রস সৃষ্টির গুণে তারা উত্তীর্ণ। চীনা চিত্রের সম্বন্ধে পড়তে গিয়ে একটি সুন্দর কথা জানতে পেরেছিলাম। কথাটি হল Tiger Like এবং Like Tiger. ক্যালেণ্ডারের পাতায় অনেক সময় বাঘের ছবি দেখতে পাই—এই ছবি দেখে মনে হবে বাঘের ফটো, একেবারে ঠিক বাঘের চেহারা আঁকা—এটা হল Tiger Like. চীনে শিল্পীর আঁকা একটি বাঘের ছবি সূক্ষ্ম বিচার করলে হয়ত anatomical কিছু গলদ থাকতে পারে কিন্তু এই বাঘের ছবি দেখলেই মনে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়। ব্যাঘ্রত্ব বা বাঘের যে ভয়াবহ গতি (spirit) তা এই ছবিতে বিদ্যমান—এটা হল Like Tiger, বাঘের মতো। অনেক ভালো ছবিতে Like Tiger-এর গুণটি থাকে। রামকিংকরের ছবিতে বা চিত্রে এই গুণটি আছে। তাঁর ভাস্কর্যে বা মূর্তির কাজে এই গুণের কোন অভাব দেখা যায় না।

## সাধকশিল্পী রামকিংকর

..........................................

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

রামকিংকরের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। মূর্তিশিল্পের জন্য তিনি আজ বিখ্যাত। মূর্তি ও চিত্রের ক্ষেত্রে রামকিংকরের প্রতিভা আজ সর্বজনস্বীকৃত। মঞ্চসজ্জায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। 'হ-য-ব-র-ল', 'মুক্তধারা', 'শতরঞ্জকে খিলাড়ী' ইত্যাদির মঞ্চসজ্জা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা অবশ্যই আমার কথা সমর্থন করবেন। শিল্পী রামকিংকরের সঙ্গে সাধারণ লোকের সম্পর্ক কিরকম ছিল তার একটু পরিচয় দিই।

মন্দিরের পুরোনো গেস্ট হাউসের সামনে রামকিংকর মূর্তি করছেন (abstract)। রসিক মেথর এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছে ঃ

'বাবুমশাই এটা কি হচ্ছে ?'

'তুই বল না এটা কি হচ্ছে ?'

'এমন তো বাবু কোথাও দেখি নি। এ জানতে হলে যেতে হবে একেবারে বেদে।'

রামকিংকর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাস্য করে বললেন ঃ

'দেখলেন তো ! কে বলল সাধারণ মানুষ abstract art বোঝে না ?'

রাস্তার ধারে তাঁর বিখ্যাত মূর্তি 'সাঁওতাল পরিবার' করছেন। সাঁওতালরা যেতে আসতে দাঁড়ায়, ঘুরে ঘুরে দেখে। একজন বলে ঃ

'বাবু এটা কি দেবতা করছিস ?'

'তোরা বল না এটা কি হচ্ছে ?' আরেকজন চেঁচিয়ে বলে ওঠে ঃ

'বাবু এটা করেছিস কি ? এত বড়ো মানুষ আর তালাই করেছিস এত ছোট। শোবে কি করে ?'

পরে রামকিংকর তালাই লম্বা করে দিয়েছিলেন।

এবার রামকিংকর সম্বন্ধে আচার্য নন্দলালের একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করি। 'কালোবাড়ী'র দেয়ালে রামকিংকর মাটি দিয়ে মূর্তি করছেন। দুপুরবেলা আচার্য নন্দলাল আমার স্টুডিও ঘরে এসে উপস্থিত। বললেন ঃ 'বিনোদ, গিয়ে দেখো রামকিংকর মাটির কাজ করছে, তার হাতের dexterity দেখে বুক কেঁপে যায়। একি আর এক জন্মের সাধনায় হয়েছে ! অনেক জন্মের সাধনা নিয়ে কিংকর জন্মেছে।'

রামকিংকর যেমন দরাজগলায় গান গাইতেন তেমনি দরাজ ছিল তাঁর হাসি।

দরাজ হাসি ও গানে সকল বিভাগের ছাত্র-শিক্ষককে তিনি চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করে রেখেছিলেন।

রামকিঙ্করের ব্যবহার ছিল অতি ভদ্র। কিন্তু তাঁর মধ্যে শহুরে কেতা-দুরস্ত আড়ষ্টভাব একেবারেই ছিল না। রামকিঙ্করের সকল মূর্তিতে এবং চিত্রে দরাজ মেজাজের কাজ সহজেই দর্শককে আকৃষ্ট করে। রামকিঙ্করের মতো হৃদয়বান মানুষ কমই দেখা যায়। যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা জানেন একথা। তাঁর শিল্প-সৃষ্টির পূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়[১]। তাঁর ব্যক্তিত্বের যে অংশ ভাবীকালের কাছে পৌঁছাবে না, কাহিনী গল্পের মতো থাকবে, সেই সম্বন্ধেই দু-চার কথা বললাম। সমদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পী রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন প্রথম যৌবনে। তারপর সমস্ত জীবন বহু ঝড়ঝাপ্টা সত্ত্বেও নিজের আসন তিনি কখনও ত্যাগ করেন নি।

১. রামকিঙ্করের শিল্পসৃষ্টি নিয়ে আলোচনা আছে এই লেখকের পরবর্তী পর্যায়ের প্রবন্ধ 'রামকিঙ্করবাবুর কথা'য়। সঃ

# শিল্পী বাউল

.........................

দিনকর কৌশিক

যখন কিঙ্করদার কথা মনে আসে তখন একজন গায়কের একটা ভাবমূর্তি আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে যায়। মনে হয় তিনি 'খোয়াই'-এর তরঙ্গায়িত নৈসর্গিকতার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এবং তাঁর দৃষ্টিলব্ধ ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে চলেছেন পলাশ, শিমূল, শাল আর গৃহাভিমুখী স্বাধীনচেতা সাঁওতাল যুবতীর ভঙ্গীমাময় হেঁটে যাওয়ার আনন্দঘন ধনবৈভব। শান্তিনিকেতনের জীবনের এইসব সাধারণ দৃশ্যাবলীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেহাতই কল্পনা-জাত ছিল না। তিনি এর মধ্যে জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস আর ছন্দ খুঁজে পেতেন। আমি তাঁকে প্রায়ই 'ক্ষ্যাপা বাউল' বলে উল্লেখ করতাম যিনি দৃষ্টিলব্ধ ভাষার মধ্য দিয়ে জীবনের স্তব গান গেয়ে আনন্দ পেতেন। এবং কি এক সীমাহীন ভিন্নতা আর সৌন্দর্যে পূর্ব-প্রস্তুতিহীনভাবে তিনি তাঁর গানগুলি রচনা করেছিলেন। সেখানে রঙ ছিল, সেখানে গতি ছিল এবং যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল তিনি যেটিতেই হাত দিয়েছেন তা সে স্কেচ বা পেণ্টিং বা ভাস্কর্য যাই হোক না কেন সেখানেই উপচে পড়েছে আবেগ।

এই শতাব্দীর তিরিশের শেষ এবং চল্লিশের গোড়ায় কিঙ্করদাকে দেখার এটা একটা ধরাবাঁধা দৃশ্যবস্তু ছিল যে খালি গায়ে তালপাতার বিশাল টুপী পরা কিঙ্করদা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের ভরা দুপুরে উঁচু মাচার উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন। কখনো সিমেণ্ট-সুরকির প্লাস্টার লাগাচ্ছেন, কখনো বা বাড়তি অংশ ছেঁটে ফেলছেন আর দীর্ঘ টানটান গলায় ভেঁজে চলেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। এবং তিনি তাঁর করে যাওয়া কাজকে আরো ভালোভাবে দেখে নেবার জন্য মাঝে মাঝে মাচা ছেড়ে নেমে আসছেন নীচে আর তাঁর নিভে যাওয়া বিড়িতে টান দিচ্ছেন যেটা জ্বলে থাকার চেয়ে বেশীরভাগ সময় নিভেই থাকত। পুরানো নন্দনের দক্ষিণ-পূর্বে 'ধানঝাড়া'কে ঘিরে তাঁর কাজ করাকালীন সময়কে আমি এভাবেই স্মরণে আনতে পারি।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এইভাবে গ্রহণ আর বর্জনের মধ্য দিয়ে একটি ফর্ম বেরিয়ে এসেছিল। উরুর অনেকটা অংশ এবং মাথা ও হাতের কিছুটা অংশ নিয়ে এটি একটি মেয়ের আকৃতি যেখানে মাথার উপর দিয়ে পেছনের দিকে বেঁকে যাওয়া দৃঢ়বদ্ধ দুটি হাত ধরে আছে ধানের আঁটি যা শ্রমের টানটান একটি মুহূর্তকে ধরে রাখে। মূর্তিটির স্তন সম্পর্কে একটা ধারণা হয় কিন্তু মাথার কোন অস্তিত্বই আমাদের ধারণায় আসে না। এটা আছে কিন্তু দ্রুত ধানঝাড়ার ফলে বেঁকে যাওয়া সমস্ত

শরীর নীচু থেকে উপর এবং পেছনের দিকে ক্রমাগত চলে যেতে থাকে। ভাস্কর্যটিতে স্ত্রীলোকের আদল আছে, কি আছে না, এটা কোন বিষয় নয়। কিন্তু এর আন্দোলিত মেজাজের সমস্তটুকুই গুরুত্বপূর্ণ। কিঙ্করদার কাজগুলিকে মানবিকতার প্রতীক হিসাবে শ্রমজীবী মানুষকে চিহ্নিত করে। কিছু অমনোযোগী দর্শক যাঁরা সপ্তাহ শেষে আশ্রমে বেড়াতে আসেন তাঁরা মূর্তিটির দিকে আপাত তাকিয়ে মন্তব্য করেন, 'মাথা নেই!' এ ব্যাপারে কিঙ্করদার উত্তর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, 'মাঠের কাজ দু-হাত দিয়ে হয়, বুদ্ধির দরকার হয়না!'

মহিলা হোস্টেলকে বিস্তৃত করতে প্রয়োজনীয় জমির জন্য এই উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যটিকে এর মূল জায়গা থেকে সরিয়ে শ্রীনিকেতন-শ্রীপল্লীর সংযোগ রাস্তাব কোণে পরে বসানো হয়। স্থানান্তরিত করাকালীন এটি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁরই যোগ্য ছাত্র সুশেন ঘোষ এই গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্যটিকে ১৯৭২-৭৩ সালে একবাব মেরামত করেন।

১৯৪০ সালে যখন আমি শান্তিনিকেতনে আসি প্রথমে আমার জাযগা হয সঙ্গীতভবনে। কলাভবনের সমস্ত আসন পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় মাস্টারমশাই আমাকে অপেক্ষা করতে বলেন। মারাঠী হিসাবে কিঙ্করদা একদিন আমাকে খুঁজে বার করলেন। কারণ সেই সময়ে মারাঠী বলতে যাঁদের সবচেয়ে বেশী পরিচিতি ছিল তাঁদের অন্যতম হলেন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখাণ্ডে অথবা ভীমরাও শাস্ত্রী। হয়ত আমি এই মারাঠী ঐতিহ্যকে মনে রেখেই সঙ্গীতভবনের ছাত্র হয়েছি এই ভেবে কিঙ্করদা একদিন আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবং মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি 'তোড়ী' রাগ জানি কিনা?' খুব সংশয়ের সঙ্গে গুনগুন করে আমি তাঁকে এই রাগিণীর কিছুটা শোনালাম। কিঙ্করদা ভীষণ আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন। এবং মুহূর্তেই অদ্ভুত এক আনন্দে তাঁর সারা মুখ ছেয়ে যেতে দেখলাম। তিনি তাঁব গম্ভীর উদাত্ত গলায় উঁচু সুবে গেয়ে উঠলেন, 'রজনীব শেষ তারা / আঁধারে আধো ঘুমে / বাণী তব রেখে যাও।' কিছুক্ষণ তিনি গাইলেন এবং একসময় তাঁর ভিজে আসা চকচকে চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোড়ী রাগ সম্বন্ধে গুরুদেবের গভীর জ্ঞান ছিল এবং এই গান ঐ সুরের চমৎকার মেজাজকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। এই রাগ প্রথম সূর্যের আলোয় প্রকাশিত ভোরের বন্দনা গান করে এবং যার মধ্যে পাওয়া যায় জীবন ও দৃঢ়তার বাণী। গুরুদেবের গানের মধ্যে একটা চমৎকার 'বন্দীশ' আছে।'

সেই সময়ে সত্যজিৎ রায় কলাভবনের ছাত্র ছিলেন। এবং তিনি প্রায়ই ইউরোপের কিছু বড় বড় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীদের গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড নিয়ে আসতেন। ঐ সময়েই সত্যজিৎ আমাদের মধ্যে বাক, মোজার্ট, বেটোফেন প্রভৃতির সূচনা করেন। সেই সঙ্গীত আসরে পরিচিত শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ অ্যালেক্স

আরনসন্, কিঙ্করদা, সকলো সুরিয়া ( একটি শিলংবাসী ছাত্র ), পৃথ্বীশ নিয়োগী, সত্যজিৎ স্বয়ং এবং আমি। তখন কেউ লক্ষ্য করে থাকবেন যে কি এক গভীর আগ্রহ আর অনুভূতির সঙ্গে কিঙ্করদা এইসব ইউরোপীয়ান সঙ্গীত শুনতেন। আর পল রবসন অথবা শালিয়াপিন-এর ( Chaliapin ) রেকর্ড বাজাবার অনুরোধ নিয়ে মাঝেমাঝেই নিজের আসন ছেড়ে উঠে আসতেন। এই সমস্ত পশ্চিমী ওস্তাদদের গম্ভীর কণ্ঠের গান তাঁর উপরে একটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করত। তিনি প্রায়ই মিনমিনে গলায় গাওয়া গুরুদেবের গানগুলিকে সমালোচনা করে বলতেন, 'নাভিমূল থেকে রবসনের গান উঠে আসে। তাঁর সমস্ত শরীর কণ্ঠকে অনুরণিত করে তোলে। অন্যদিকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ছিমছাম গায়কেরা মিহি কণ্ঠে গান গেয়ে যান। তাঁদের লাউড-স্পীকার এবং অন্যান্য সহযোগী বস্তুর দরকার হয়। কি অদ্ভুত পার্থক্য !'

পরবর্তী সময়ে একজন সমাজ-বিজ্ঞানী কিঙ্করদা সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে কয়েকটি চমকপ্রদ মন্তব্য করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কিঙ্করদার অবস্থাটা হল সমাজ প্রত্যাবর্তনতা ( social regression )। সবসময়ের জন্য তিনি তাঁর শহর বাঁকুড়ার বাড়ী ছেড়ে এসে উন্নতির উচ্চশিখরে যান। এবং শান্তি-নিকেতনের অনেক ভালো অবস্থা ও ভিন্নতার মধ্যে বেড়ে ওঠেন, যেটা তিনি পছন্দ করেছেন অথবা সম্ভবতঃ তা এড়িয়ে তিনি তাঁর মূল জায়গায় ফিরে গেছেন। এর কারণ হয়ত তিনি এই নতুন অবস্থা বা প্রজন্মের মধ্যে সারহীন শূন্যতাকে দেখে-ছিলেন নতুবা হয়ত তাঁর মূল অবস্থার মধ্যে অনেক বেশী পার্থিব রমণীয়তার গন্ধ পেয়েছিলেন। সমাজ নৃ-বিজ্ঞান অথবা সমাজবিজ্ঞানের এইসব ভার্টিক্যাল ও হরিজণ্ট্যাল মুভমেণ্ট সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম না। আমি বেশীরভাগ সময়ই ভাবতাম এই পণ্ডিত অধ্যাপক কি 'প্রতিষ্ঠা' করতে চাইছেন। আমি মৃদু হেসে মন্তব্য করেছিলাম, 'কিঙ্করদার ব্যাপারটা তা নয়, তিনি হলেন একজন মহাবিপ্লবী। আমি মনে করি তিনি বাঁকুড়ায় কখনোই 'বাক', 'মেজার্ট' অথবা 'তোড়ী' রাগ শোনেন নি। কিন্তু বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে তিনি সেগুলির প্রতি সাড়া দিতে পারতেন। সমাজ-বিজ্ঞানের 'অ্যাসোসিয়েটিভ এনভাইরনমেণ্ট থিয়োরী' দিয়ে কিঙ্করদার মতো একটি ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। সাংস্কৃতিক জীবনে কিঙ্করদার উপরের দিকে এগিয়ে যাবার গতি তাঁর খাওয়া, থাকা এবং মধ্যবিত্ত আচার-আচরণের সঙ্গে সরাসরি বিরোধিতা করে। এখানে আদৌ প্রত্যাবর্তনের কোন ব্যাপারই নেই। সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে তিনি উন্নতির উচ্চ শিখরে গিয়েছিলেন যা একটি ভারতীয় হৃদয়ে প্রস্ফুটিত সবচেয়ে ভালো পুষ্প উদ্যানটিকেই অধিকার করে রাখে।'

১৯৪৩-এর বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের প্রতি তাঁর অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তিনি তাঁর ক্রোধ এবং হতাশাকে প্লাবনের মতো বইয়ে দিয়ে ক্ষুধা এবং মৃত্যুর জন্য হীন মানবিকতাকে আঘাত করেছিলেন। তাঁর দুর্ভিক্ষের ছবিগুলিতে

মৃত্যু তার লকলকে আগ্রাসী আঙুলে বিস্তার করে ক্ষুধা ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এখানে তিনি কিন্তু কাউকেও অভিশাপ দেন নি বা এরজন্য শোকও করেন নি। তিনি এখানে কেবলমাত্র করুণার আরোগ্য স্পর্শ বয়ে এনেছেন এবং কোন এক অজানা হতভাগ্যের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেছেন যিনি আমাদের কোন একজনের মতোই এখানে একদিন শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েছিলেন, বসবাস করেছিলেন এবং ভালোবেসে গিয়েছিলেন।

তাঁর এক বন্ধুর মৃত্যুর খবরে কিঙ্করদার প্রতিক্রিয়ার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। আমি তখন দিল্লীর পলিটেকনিকে শিক্ষকতা করি। তখন আমাদের এক সহকর্মী শৈলজ মুখার্জী সম্প্রতি টিটেনাসে মারা গেলেন। আমরা আমাদের বিভাগীয় গ্যালারীতে তাঁর ছবির একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করি। কিঙ্করদা যখনই দিল্লী আসতেন তখন অনেক রাত পর্যন্ত শৈলজদার সঙ্গে কাটাতেন। যখন তাঁকে বলা হল, 'শৈলজদা আর নেই'—দেখা গেল তিনি মুষড়ে পড়েছেন। কিন্তু এই বলে তিনি তাঁর উপলব্ধিকে লুকাতে চাইছিলেন, 'হ্যাঁ, হতভাগ্য শৈলজ খুব ভাল মানুষ ছিল। কিন্তু তখন সে ছিল 'সেণ্টিমেণ্টাল'।' কিছুক্ষণ পর তিনি আমার সঙ্গে তাঁর কাজ দেখবার জন্য গ্যালারীর দিকে এলেন। এবং তাঁর কাজ দেখতে দেখতে বললেন, 'ভালো বন্ধু, কিন্তু তখন সে ছিল 'সেণ্টিমেণ্টাল'।' কিছুক্ষণ পর আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। তিনি তাঁর চোখ মোছার কোন চেষ্টা করলেন না। প্রদর্শনী দেখে যেতে লাগলেন। এবং বারবার বলতে লাগলেন, 'কিন্তু তখন সে ছিল খুব সেণ্টিমেণ্টাল'।' দেখা শেষ করে ইতিমধ্যে তিনি অঝোর ধারায় কেঁদে ফেললেন। আমরা তাঁকে আমাদের স্টাফ রুমে ধরে নিয়ে গিয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগলাম।

পঞ্চাশের গোড়ার দিকে 'দিল্লী শিল্পীচক্র' নামে স্থানীয় একটি শিল্পীগোষ্ঠীর অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত ছিলাম। শিল্পী ও সমাজ সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়ে ঐ সময়ে ঐ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের বড় বড় শিল্পীদের মধ্যে আমি কিছু প্রশ্নাবলী বিতরণ করি। এই প্রশ্নাবলীর একটি কপি কিঙ্করদাকে পাঠাই। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়া পাবো কিনা এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন ছিলাম না। আমাদের সৌভাগ্য, তিনি একদিন দিল্লী এলেন, যদি আদৌ আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দেন তাহলে আমি তাঁর কাছে পেশ করে তা নথিভুক্ত করবো এই ভেবে আমি তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার স্মৃতি যদি বিশ্বাস-ঘাতকতা না করে তবে সেই প্রশ্নের অন্যতম একটি ছিল এইরকম : 'গোড়ার দিকের রাজা এবং অভিজাতদের শিল্পের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা আস্তে আস্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সমাজের পজিটিভ প্রয়োজনে যদি না একজন শিল্পী সাড়া দেন তবে তাঁকে শূন্যে কাজ করে যেতে হয়। যেখানে কোন সামাজিক চাহিদা নেই এবং নেই কোন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এমত অবস্থায় এসময়ে একজন শিল্পীর কি করা

উচিত বলে আপনি মনে করেন ?'

কিঙ্করদা এই প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ প্রাণখোলা হাসি হেসে তাঁর স্বভাবসুলভ ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গীতে বললেন ঃ 'সামাজিক চাহিদা আমার মাথা ব্যথা নয়। আমার মধ্যে এক অদম্য দাবী তৈরী হয়, যে দাবীই আমাকে কাজ করতে হুকুম করে। আমার ভেতরের এই উদ্দীপনা আর দাবীতেই আমি আঁকি কিংবা গড়ি। শৌখিন সমাজ আমার কাজের কোন প্রয়োজন বোধ করল বা করল না তাতে আমার কি আসে যায় ? যে সমস্ত জরুরী ফর্ম বা আকৃতি বাইরে আসার জন্য আমার মধ্যে জন্ম নেয় এবং আমাকে আলোড়িত করে তোলে তাদের রূপদান করে আমি অবশ্যই আমার ভিতরে একটা স্বস্তি এবং প্রশান্তি লাভ করি। তুমি কি তা বোঝ না ?' এই উত্তরই কিঙ্করদার সৃষ্টিশীল প্রতিভা এবং জীবন ও শিল্পের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা মুহূর্তেই প্রকাশ করে দেয়।

নতুন দিল্লীর পার্লামেন্ট স্ট্রীটের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার জন্য কিঙ্করদার বিশাল মূর্তি 'যক্ষ-যক্ষী' করা কালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার জন্য ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরকে পাঠানো হয়। তখনও তিনি তাঁর সেই ছোট্ট ম্যাকেট এবং স্কেচের কাজ আরম্ভ করেন নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রায় আশি হাজারের মতো টাকা খরচ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ফাইনাল কাজের জন্য তখনও পর্যন্ত পাথরের কোন অর্ডার দেওয়া হয় নি। অথচ কাজের জন্য অনুমোদিত টাকার প্রায় সবটাই শেষ হবার মুখে। তাঁর সেই বরাবরের অভ্যাস মতো, অভিন্ন পোষাকে, কাছের তাঁর এক দো-ভাষী ছাত্রের সাহায্যে দেরীর কারণ জানালেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর এইরকম চুক্তিভঙ্গের পরিণতি কি, তা কিঙ্করদাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। নিষ্পাপ নিরস্ত্র ভঙ্গীমায় কিঙ্করদা গলা ছাড়া হাসিতে ফেটে পড়লেন! 'বেশ তো, চুক্তি ভাঙার জন্য আপনি কি আমাকে জেলে পাঠাতে চান ? চমৎকার! তখন ভাস্কর্য নিয়ে কাজ করার অফুরন্ত মুক্ত সময় আমি পাবো। তাহলে নিশ্চই কাজ শেষ হয়ে যাবে ?'

এমত অবস্থায় ডিরেক্টর মশায় তিতো-বিরক্ত হয়ে কাজের জন্য নির্ধারিত টাকার পরিমাণ এবং সময়সীমা দুটোই তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দেন।

এবার তাঁর পাথর অনুসন্ধানের পালা। মথুরার বেলেপাথর খুব বেশী লাল অথবা ঈষৎ হলুদ এবং ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর সাধারণ বেলে পাথরের স্ট্রাকচারের সঙ্গে এটা এর চরিত্র হারিয়ে ফেলবে। তাঁর শক্ত, কর্কশ ডিজাইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানানসই হবার পক্ষে মাকড়া মারবেল খুব কোমল-মসৃণ-চকচকে এবং সাদা। দক্ষিণ-ভারতীয় গ্রেনাইট প্রায় কালো এবং রঙ যথাযথ নয়। সুতরাং তাঁর ডিজাইনকে মানানসই করে তোলবার জন্য তিনি এবার পাথর শিকারে যাত্রা করলেন। তিনি ভাঁকড়া গেলেন এবং অবশেষে ধর্মশালার কাছে বৈজনাথে গিয়ে গাঢ় নীল পাথরের

একটি অপূর্ব পাহাড় দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে রাস্তার পাশেই তাঁবু গাড়লেন। তাঁর সহযোগী, শক্ত মাথার, বাস্তববোধসম্পন্ন প্রণব দেববর্মন এখান থেকে পাথর সংগ্রহ করে নিয়ে যাবার ঝামেলা গভীরভাবে অনুভব করে উপদেশ দিয়ে কিঙ্করদাকে একাজ থেকে বিরত থাকতে প্রণব বললেন, 'দূরত্বের জন্য এই সমস্ত পাহাড়গুলিকে সুন্দর নীল মনে হয়। শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি 'মামা-ভাগনে' পাহাড়ের মতো এগুলির রঙ মেটে ধূসর। আমি অন্ধ্র থেকে আপনার জন্য সুন্দর পাথর আনিয়ে দেব।'

কিন্তু ইতিমধ্যেই কিঙ্করদা বৈজনাথের সেই নীল পাহাড়ের প্রেমে পড়ে গেছেন। তাঁর ঠোঁটে তখন একটি পুরানো কীর্তন :

'কৃষ্ণ প্রেম কি সাধে মেলে!'

অবশেষে বোম্বাই-এর একটি ইংলিশ ফার্মকে ডেকে পাঠিয়ে বৈজনাথ থেকে দিল্লীতে সেইসব পাথর আনাবার জন্য খুব চড়া খরচে কনট্রাক্ট দেওয়া হয়। কিন্তু তখন তাই-ই করতে হয়েছিল যেহেতু কিঙ্করদা বৈজনাথের 'নীল শীলা'র প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন।

নাটক উপস্থাপনায় কিঙ্করদার উৎসাহ ছিল অদম্য। গোড়ার দিকে তাঁর পরিশ্রমী প্রচেষ্টায় মঞ্চস্থিত নাটক 'পোয়েটেস্টার্স অফ্ ইস্পাহান' এবং 'মুক্তধারা'য় তিনি প্রচুর সুনাম পেয়েছিলেন। সবসময়ই তাঁর নাটকীয় মুহূর্তগুলির উপস্থাপনা ছিল নতুন তেজ শক্তিতে পূর্ণ। অভিনয়ের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অভিগমনকে টেনে বাইরে আনার জন্য তাঁর পরিকল্পিত পোষাক-আষাক এবং মঞ্চ হত দুঃসাহসী। জানা যায় যে সত্যেন বসু উপাচার্য থাকাকালীন যখন ইংরাজীর কোন এক অধ্যাপক একটি নাটকের মহড়া পরিচালনা করছিলেন তখন কোন একজন কিঙ্করদাকে সেখানে যেতে এবং তাঁর প্রয়োজনীয় সাজেশন দিতে অনুরোধ করেন। তাঁর বরাবরের স্বভাব মতো, দেড় ঘণ্টা কি তারও বেশী সময় ধরে গভীর মনযোগ দিয়ে তিনি সেই মহড়া দেখেন এবং তারপর কিছু বিপরীত মন্তব্য করেন। নাটকের একমাত্র একটি অংশের সঙ্গে এই মন্তব্যের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ইংরাজীর সেই অধ্যাপক এটিকে একটি বিদ্রুপ বা উপহাস মনে করেছিলেন। জানা যায়, তিনি কিঙ্করদাকে তাঁর বেত দিয়ে প্রহার করে বলেন, 'একজন মাতাল লোকের ভালোভাবে ব্যবহার করতে শেখা উচিত।' এরকম ব্যবহারে কিঙ্করদা ভীষণ হতবাক হয়ে যান। 'এর উপযুক্ত আমি কি করেছি, আমি জানি না'—বলে তিনি সেই জায়গা ছেড়ে দ্রুত চলে যান। এই ঘটনার কথা আশ্রমের চারদিকে আগুনের মতো ছড়িয়ে যায়। তাঁদের প্রিয় আপনজন কিঙ্করদার প্রতি এরকম অশ্রদ্ধার জন্য ছাত্ররা ভীষণ উত্তেজিত ও রূঢ় হয়ে ওঠে। তারা একসঙ্গে ভীড় করে আসে। এবং ক্রুদ্ধ ছাত্রদের কিছু বড়সড় আকস্মিক দুর্ঘটনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ইংরাজীর সেই অধ্যাপক সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দ্রুত আশ্রম ছেড়ে চলে যান।

হরিসাধন দাশগুপ্ত এবং ঋত্বিক ঘটক কিঙ্করদার উপর যখন একটি ডকুমেণ্টারি ফিল্ম করেন তখন মঞ্চ নির্মাণে তাঁর আগ্রহ বা জ্ঞান কিরকম গভীর ছিল তা বিস্তৃত দেখানো হয়। প্রত্যেকদিন খুব সকাল সকাল তিনি তৈরী হয়ে নিতেন এবং হরিসাধন দাশগুপ্তের অপেক্ষায় থাকতেন। সুটিং-এর স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা করে ঠিক করতেন তাঁরা কোপাই ও গোয়ালপাড়ার দিকটায় ঘুরবেন এবং যেমনভাবে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কাজ করতে ভালোবাসতেন কিঙ্করদার কাজের সেই স্পিরিটটা তাঁরা ধরবেন। তিনি বন্যময়-নৈসর্গিক জায়গা পছন্দ করে তার মধ্যে স্কেচ খাতা ও রঙ নিয়ে ঘোরাফেরা করতেন এবং শ্রীদাশগুপ্ত স্যুটিং করতেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই স্যুটিং চলে। পেণ্টিংস-এর সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন মেজাজে তাঁকে ধরে রাখবার জন্য সেই ফিল্মের বেশীরভাগটাই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই ফিল্মের পুরোটাই যথযথ সম্পাদনার অভাবে আর সম্পূর্ণ হয় নি।

খ্যাতিমান সিনেমা পরিচালক ঋত্বিক ঘটক অন্য এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ক্যামেরা-ম্যান—সুনীল জানাকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৭৫-এর শেষের দিকে আর একবার আসেন। কেমনভাবে সেই সিনেমার সূচনা করা যাবে, এর পটভূমি কীরকম হবে, তালগাছ, শরগাছ এবং সাঁওতালদের একটা গুরুত্বপূর্ণ 'ভিউসিয়াল রোল' থাকবে এসব ব্যাপারে সিনেমা তৈরীর সঙ্গে ভাবনা-চিন্তার আদান-প্রদানের জন্য কিঙ্করদাকে সেই সময়ে আর একবার প্রস্তুত হয়ে নিতে হয়। কাজের একদিন সিনেমার নানা দিক নিয়ে আলোচনায় তিনজনের প্রত্যেকেই এমন ব্যস্ত ছিলেন যে ক্যামেরা ও অনুষঙ্গ যন্ত্রপাতি-বহনকারী তাদের জীপ ভুল নির্দেশে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ায় সেদিনের কোন-কিছুই আর যথর্থভাবে তোলা হয় নি। একবার সমস্ত জিনিসপত্র চলে গেলে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, সিনেমার সাবজেক্ট কিঙ্করদা এবং ক্যামেরাম্যান সুনীল জানা-দলের এই তিন উদ্যমীই প্রচুর পান করার ফলে দুর্বল হয়ে পড়েন। এইভাবে গভীর ঝুঁকি আর গভীরতর আন্তরিকতার সঙ্গে প্রাণবন্ত এই তিন বন্ধু সেবার একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন!

সেটা ১৯৬৬। সেই সময়ে শান্তিনিকেতনের একটি সভায় যোগ দেওয়ার সুযোগ ঘটে। আমি তখন লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করি। 'রতনকুটি' থেকে বার হয়ে সৌভাগ্যক্রমে কিঙ্করদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?' আমি আমার লক্ষ্ণৌ-এর কাজের কথা জানাই।

'ওঃ! অসিতদার জায়গা। নবাবরা থাকে। থাকে না?' আমি তাঁকে এই বলে নিশ্চিন্ত করি, 'অনেকদিন আগে নবাবদের দিন ছিল, এখন ঐতিহ্যময় মুসলিম আভিজাত্যের রেশটুকু বজায় আছে শুধুমাত্র তাঁদের অলঙ্কারবহুল কথাবার্তর মধ্যেই।'

'নবাবরা কাবাব খায় এবং সেগুলিকে শরাবের মধ্যে ধুয়ে নেয়! যাই হোক আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার কাছে খাবে। আসবে তো?'

আমি তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে যাই এবং ভালোভাবে জেনে নিই—'কটায় আসব ?'

'আচ্ছা, তাড়াতাড়িই এস, প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ। আমাদের কথাবার্তা বলার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।'

প্রায় আধঘণ্টা আগেই সেদিন আমি তাঁর জায়গায় পৌঁছাই। দেখি চারদিক অন্ধকার। তাঁর কুঁড়েতে কোন বিদ্যুৎ ছিল না। তিনিও কোন আলো জ্বালান নি। ভাবলাম এখানে হয়ত কেউ-ই নেই। বাইরে থেকে হাঁক পাড়লাম, 'কিঙ্করদা কি ভিতরে আছেন ?' আমার দ্বিতীয় ডাকে, 'কে ওখানে ?' আমি আমার পরিচয় দিই। 'এই সেরেছে! মাটি করলে হে!' ভেতর থেকে ভেসে আসা কিঙ্করদার গলা শোনা যায়।

একজন আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি এরকম অভ্যর্থনায় আমি রীতিমত কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ি। কিন্তু এখন আমি নিজেকে সাহসী ও হাসিখুশী রাখার চেষ্টা করি।

'কি হলো কিঙ্করদা ? উদ্বিগ্ন হবার কিছুই নেই। চলুন রতনকুটিতে আমরা আমাদের খাওয়াদাওয়া সারি, বাবুলাল একজন করিতকর্মা রাঁধুনী।'

'আমি তোমার কথা একেবারেই ভুলে গেছিলাম। প্রতিদিনের মতো রাতের খাবার হিসাবে আমি কিছু চিড়ে খেয়ে নিয়েছি। কিন্তু এখন যে তুমি এলে, বসো আমি তোমার জন্য লুচি আর আলুরদম রান্না করি। খুব মজা করে খাওয়া যাবে! কি বলো ?'

সেই রাতে কিঙ্করদার সঙ্গে খাবার খাওয়ার পরম সৌভাগ্যের কথা আমার মনের মধ্যে যত্নের সঙ্গে থেকে যাবে বহুদিন।

সুনীল দাস নামের এক শিল্পী যুবক তাঁর প্রদর্শনী উদ্বোধনের অনুরোধ নিয়ে একদা কিঙ্করদার কাছে উপস্থিত হন। কিঙ্করদা দ্রুত রাজী হয়ে যান এবং খোঁজ নেন, 'তুমি সেই শিল্পী না যে ঘোড়া এঁকেছে ?' সুনীল দ্রুত হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে বলেন, 'কিন্তু আমার সাম্প্রতিক ছবিগুলি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।' তিনি যখন তাঁর ছবি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তখন কিঙ্করদা কি করেছিলেন ? অকপট সারল্যে শুরুতে মন্তব্য করে কিঙ্করদা বলেন, 'সুনীল একসময় ঘোড়া আঁকত, এখন সে ঘোড়ার ডিম আঁকতে আরম্ভ করেছে।' সুনীল দাসের নতুন কাজগুলি ছিল মূলতঃ ব্রাসে করা নানারকম সারকেল। অতএব এই সঙ্গত মন্তব্য।

প্রচলিত মধ্যবিত্ত রীতিনীতিকে তিনি মোটেই গ্রাহ্য করতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যর্থনা, সভা অথবা ভীড়ের মধ্যে তিনি বড় একটা যোগ দিতেন না। হয়ত বহিরাগত বাড়তি একজনের মতো উপস্থিত থাকতেন। সাদা পোষাক অথবা স্ত্রীকরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় তাঁর কাছে অভিশাপের মতো ছিল। কারণ তিনি মনে করতেন পোষাক একজন মানুষকে তৈরী করে না, সে মানুষই থাকে এবং তাঁর মধ্যে থাকে তাঁর সহজাত মহনীয়তা ও জৈব প্রাণশক্তি—যেটা তাঁর পোষাককে

পবিত্রতা দান করে। এসব সত্ত্বেও, তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজপ্রিয় এবং বহির্মুখী মানুষ।

জীবিত কালেই কিঙ্করদার নাম একটি রূপকথায় পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু এটা রূপকথা ছিল না। কারণ মোমবাতির দুটি দিক জ্বালিয়ে 'মদিগলিয়ানি'র মতো তরঙ্গায়িত অগ্নিশিখায় তিনি নিজেকে সাজিয়ে রেখেছিলেন। এমনকি তিনি যখন তাঁর শিক্ষা জগতের অন্যান্য সহকর্মীদের থেকে ভিন্নরকমের পোষাক পরতেন কিংবা ভিন্নরকমভাবে বসবাস করতেন তখনও কিন্তু এটা কোন হতাশা বা প্রতিবাদের প্রকাশ ছিল না। বাইরের জীবনের এইসব প্রথাসিদ্ধ পোষাক-আষাককে তিনি মোটেই গ্রাহ্য করতেন না। এমনকি তাঁর চারপাশে উড়ে বেড়ানো মিথ্যে অপবাদ কিংবা অসম্মানজনক ইশারা ইঙ্গিতেও তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন না। অথচ এগুলি যে-কোন একজনের পলকা শৈল্পিক সামগ্রিকতাকে কিংবা কম শক্তিসম্পন্ন একজনকে ভেঙে দেবার পক্ষে যথেষ্টই ছিল। গগাঁর মত তিনি আড়ম্বরবহুল রঙচঙে মেকি আধুনিক জীবনের জন্য চেঁচামেচি করে কোন দুঃখপ্রকাশ করতেন না। কিংবা দূরে, অনেক দূরে তাহিতির কোন দ্বীপে তিনি তাঁর আশ্রয় খুঁজে ফিরতেন না। তাৎক্ষণিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং উন্মত্ততা থেকে তাঁর নির্লিপ্ত মনোভাবই তাঁর চারিদিকে নিজে নিজেই এক তাহিতির জন্ম দিত। যখন তাঁর বেশীরভাগ সহযোগী বন্ধুই সরবরাহ করা জল, বিদ্যুৎ-শোভিত চুন-সুরকির তৈরী ইঁটের বাড়ীতে বসবাস করতেন তখন তিনি তাঁদের মাঝখানে মাটির বাড়ীতে থাকতেই পছন্দ করতেন। অন্ধকারে জ্বালাতেন কুপি আর পাতকুয়ো থেকে টেনে তুলতেন জল।

স্টুডিও হিসাবে তাঁর এলোমেলো বারান্দাই ছিল তাঁর আঁকা-আঁকির পক্ষে যথেষ্ট ভালো স্থান। তাঁর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ছবিই তিনি এখানেই আঁকেন। সুন্দর-ভাবে আলোকিত সুসজ্জিত স্টুডিও-র অভাবের জন্য তিনি কখনোই দুঃখ প্রকাশ করতেন না। ডালপাতা এবং খড়ের তৈরী কাঠামোই ছিল তাঁর ভাস্কর্যের পক্ষে যথেষ্ট। উইনসর নিউটন (Winsor Newton) রঙের জন্য দুঃখপ্রকাশ না করে হাতের কাছেই যা থাকত কিংবা যা খুব তাড়াতাড়িই পাওয়া যেত তাই দিয়েই আবেগী উন্মত্ততায় কাজে লেগে যেতেন। এবং ঐগুলিই তাঁর গুণমুগ্ধ ও সংগ্রাহকদের জন্য রেখে দিতেন। তাঁর ভেতরের আগুনকে প্রশমিত করবার জন্যই তিনি টেনে নিতেন ক্যানভাস, রঙ আর তুলি।

এইরকমই ছিলেন কিঙ্করদা। ছিলেন শিল্পী বাউল। তিনি চলে গেছেন কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গেছেন নানান গল্প-কাহিনী আর শিল্পের এক বিশাল অমূল্য রত্নভাণ্ডার!

## কিঙ্করদার কিছুটা সময়

.................................

### কুণালকান্তি সাহা

'আমাদের সময় নিয়ে কারবার নয় জায়গা (mass) নিয়ে কারবার' বলেছিলেন কিঙ্করদা। মানে রামকিঙ্কর বেইজ। প্রতিমা দেবীর ইচ্ছায় তখন উত্তরায়ণের পম্পায় একটা তিমি মাছের মূর্তি করছিলেন তিনি। সময়টা ১৯৬৫-৬৬। ১৯৬৪ সালে কলাভবনে ভর্তি হয়ে প্রথম বছরে সুরেনদার (দে) ক্লাস শেষ করে ৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে কিঙ্করদার ক্লাসে ঢুকেছি। তাঁর ক্লাসে একটা নটরাজের মূর্তি করলে মূর্তিটা ভালো লাগায় তিনি আমাকে বললেন, 'চলো আমার সঙ্গে কাজ করবে।' তারপর আমাকে নিয়ে গিয়ে পম্পার মাছের কাজে লাগিয়ে দিলেন। এর কিছুদিন আগে দিল্লী থেকে ফিরেছেন। এবং সেখানের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'যক্ষ-যক্ষী'র জন্য মাছটার কাজ শেষ করতে পারছিলেন না। তখন দেখতাম প্রতিমা দেবী প্রায়ই মাছটা দেখতে আসতেন আর কিঙ্করদাকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কিঙ্কর এটা শেষ করতে কত সময় লাগবে ?' জবাবে বলতেন, 'কাল শেষ হয়ে যাবে।' এইভাবে কিঙ্করদার অনেককাল কেটেছে ঐ তিমি মাছের পেছনে।

কিঙ্করদার সঙ্গে পম্পায় কাজ করার সময় প্রতিদিনই পরিষ্কার জামা কাপড় পরে আসি, তিনি আমাকে প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলেন যে কাজের থেকে আমার জামা-কাপড়ের দিকেই লক্ষ্য বেশী। তাই একদিন সুযোগ বুঝে পম্পার শ্যাওলা ভর্তি জলের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। সারা গায়ে ও মাথায় নোংরা নিয়ে জলের ভেতর থেকে উঠে এলাম। বললেন, 'এবার মন দিয়ে কাজ করো।' কথাটার আসল মর্ম বুঝে কাজে লেগে পড়লাম।

মাছটার মাধ্যমে কিঙ্করদার কাজ করার পদ্ধতি জানলাম। জানলাম উনি কাজ জানেন তবে কিভাবে কাজটা করতে হবে সেটা ভাবতেন না। প্রথমে আমাকে দেখিয়ে দিলেন কিভাবে ও কতটা মশলা লাগাতে হবে। উনি মাছের লেজের নীচের একটা জায়গায় মশলা ধরাচ্ছিলেন। কিন্তু যেভাবে লাগাচ্ছিলেন তাতে করে সব মশলা নীচে পম্পার জলে পড়ে যাবার কথা। ভাবলাম কিঙ্করদার মধ্যে কোন বিশেষ ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতা আছে যার ফলে ঐ জায়গায় মশলাটা বিনা সাপোর্টে থেকে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ মশলা লাগাবার পর বললেন, 'এবার ঐভাবে লাগিয়ে যাও।' আমি ঐভাবে মশলা লাগাতে লাগলাম। কিন্তু সব মশলা নীচে পম্পার জলে পড়ে যাচ্ছিল। এইভাবে কিছুক্ষণ মশলা ছুঁড়ে লাগাবার পর ব্যাপারটা কি

দেখতে চেয়ে মাথা নীচু করে দেখলাম কিঙ্করদা ঐ জায়গায় যেভাবে মশলা লাগিয়েছিলেন তা না লেগে সব জলের মধ্যে পড়ে আছে। তখন কিঙ্করদার কাজের বাস্তব দিকের কিছুটা জানতে ও বুঝতে পারলাম। কিছুক্ষণ আগে তিনি এখান থেকে চলে গেছেন। আমি কয়েকটা ইঁট, টিনের টুকরো ও তার জোগাড় করে ভালোভাবে সাপোর্ট দিয়ে ঐ জায়গায় মশলা ধরালাম। পরের দিন আবার কিঙ্করদার সঙ্গে পম্পায় এলাম। আগের দিনের সব কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি খুব জোরে মন খুলে হাসতে লাগলেন এবং কাজ করার বাস্তব দিকটা নিয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে আবার মাছের কাজে লেগে পড়লেন। কিছুদিন পর মাছটা কিরকম স্টীফ মনে হতে লাগল। মনে হচ্ছিল এটার মধ্যে কোন ছন্দ বা প্রাণ নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরকম লাগছে ?' বললাম, 'কেমন সোজা সোজা মনে হচ্ছে, যেন জলের মধ্যে জোর করে রাখা হয়েছে।' কিছুক্ষণ ভাবার পর তিনি লেজটাকে ধাক্কা মেরে কিছুটা বাঁকাতে চাইলেন কিন্তু আমাদের দুজনের গায়ের জোরেও যখন বাঁকান গেল না তখন তিনি হাতুড়ির ঘায়ে লেজটাকে ডান দিকে বাঁকিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার কেমন লাগছে ?' এবার মাছটা দেখতে ভাল হল ও তার মধ্যে ছন্দ ও গতি এল।

মাছটা শেষ করে নাট্যঘরের মঞ্চের দুধারে ও উপরে মূর্তি করার পরিকল্পনা নিলেন। বামদিকে নন্দলাল বসুর আঁকা রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'র নটীর মূর্তি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে ছবিটা পান নি। সুতরাং বামদিকে বীণা হাতে 'নৃত্যরতা নারী,' ডানদিকে 'লালন ফকির' এবং উপরে 'আগুনের জন্ম' বা 'Birth of Fire'—এই তিনটি মূর্তি বা রিলিফ করবেন স্থির করে প্রথমে বামদিকের কাজটা আরম্ভ করলেন। এই সময়ে বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন সুধীরঞ্জন দাস মহাশয়। কিঙ্করদা একটা ফর্দ দিয়ে জানিয়েছিলেন যে বামদিকের মূর্তিটি করতে খরচ হবে ১১৭ টাকা। পরে প্রায় বারো'শ টাকায় শেষ হয়েছিল কাজটা। খরচের সব টাকাটাই পেয়েছিলেন তিনি।

এরপর আরম্ভ করেন ডানদিকের 'লালন ফকির'। এই সময়ে কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজ থেকে অসিত দাশগুপ্ত দিল্লীর ন্যাশনাল স্কলারশিপ নিয়ে কিঙ্করদার আণ্ডারে কাজ করার জন্য এসেছিলেন। যেকোন মূর্তি করবার আগে কিঙ্করদা বেশ কিছু স্কেচ করে নিতেন। লালন ফকিরের কাজটা আরম্ভ করার কিছু আগে টাইফায়েডের জন্য কিঙ্করদাকে শান্তিনিকেতনের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দেখবার জন্য প্রতিদিনই হাসপাতালে যেতাম। তখন দেখতাম প্রায়ই বিছানা ছেড়ে তিনি নাচতেন এবং নিজের নাচের ভঙ্গীমাটা স্কেচ করে রাখতেন। এইভাবে অনেকগুলি স্কেচ করে তার থেকে একটা স্কেচ বেছে নিয়ে লালন ফকিরের মূর্তিটি করেছিলেন।

এবার আরম্ভ করেন মঞ্চের উপরে 'আগুনের জন্ম'বা 'Birth of Fire'. ৪১

ফুট লম্বা, ৭ ফুট চওড়া এই মূর্তিটির কাজে সহযোগী হিসাবে আমি ছাড়াও ছিলেন হরিদাস শর্মা এবং অসিতদা। সিমেন্টে মাখানো মশলা তোলার জন্য তখন ওখানে একটা 'পুলি' লাগানো হয়েছিল। কাজটা বেশ কিছুদূর এগলো কিন্তু শেষ হবার আগেই নগ্নমূর্তির জন্য নানারকম মন্তব্য করতে লাগলেন কিছু লোক। কিংকরদা তখন আমাদের বলেছিলেন যে, 'যাঁরা বলছেন নগ্নমূর্তি তাঁরা কি জন্মাবার সময় কাপড় পরে জন্মেছিলেন? আমিও পরে কাপড় পরাব।' কিন্তু মন্তব্য এমনি দানা বেঁধে ওঠে যে কাজটা আর শেষ করা গেল না। কাজটা আরম্ভ করার আগে ড্রাই-প্যাস্টেলে আগুনের জন্মের যে একটা ত্রিকোণ ছবি এ'কে নিয়েছিলেন সেই ছবিটি আমার সংগ্রহে আছে আজও। ছবিটির তারিখ ১৫-৬-৬৬। এই মূর্তিটি করার অনেক আগেই সুধীরঞ্জন দাস বিশ্বভারতী থেকে অবসর নিয়েছেন। উনি থাকলে কাজটা ঐ অবস্থায় থাকত না কখনোই। কারণ তাঁর মুখের উপর কথা বলার ক্ষমতা ছিল না কারো। সুধীরঞ্জন দাসের সময় শান্তিনিকেতনের আইন শৃঙ্খলা খুব ভাল ছিল।

কলাভবনে গান্ধীজির যে মূর্তিটি আছে ওটা আসাম সরকারের জন্য আরম্ভ করা হয়েছিল। এটা করার আগে গান্ধীজির যে ছোট মূর্তিটি করেন তার সঙ্গে বর্তমান মূর্তির তফাৎ অনেক। কারণ বড় মূর্তির কাঠামোটা ছোট মূর্তি দেখে আরম্ভ করার পর কাজ কিছুদূর এগোলে আসাম সরকারের লোকজন এসে রিয়ালিসটিক মূর্তি করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু ঐ কাঠামোর উপর মূর্তিটিকে ঠিক রিয়ালিসটিকে আনতে পারা যায়নি। গান্ধীজির মাথাটা প্রথমে মাটিতে করে সেটাকে কাস্টিং করে লাগানোর পর দেখা গেল শরীরের তুলনায় মাথাটা বড় হয়ে গেছে। পরে কেটে ঠিক করা হয়। যদিও গান্ধী মূর্তির কাজ নিজে না করে সহকারীদের হাতে ছেড়ে দেন শেষপর্যন্ত।

পিয়ার্সন পল্লীর পাশে 'খোয়াই'-এ বহুদূর থেকে একটা বড় তালগাছ দেখা যেত। ঐ তালগাছের মত প্রায় ৭৫ ফুটের একটা গান্ধী-মূর্তি করার ইচ্ছা ছিল কিংকরদার।

তাঁর রতনপল্লীর বাড়ীতে দুটো ছবি দেখেছিলাম। একটি মহাভারতের, অন্যটি রাধাকৃষ্ণের। কিঙ্করদাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলাম ছবিগুলি তাঁর শান্তিনিকেতনে আসার আগে ছেলেবেলার আঁকা। ছবি দুটো দেখে বুঝতে পারলাম প্রতিভা কি জিনিস। ড্রয়িং, লাইন, রঙ সব মিলেমিশে সে এক অদ্ভুত ছবি যা অন্য এক জগতে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। জানি না সে ছবিগুলি এখন কোথায়, কার কাছে। ঐদিন কিঙ্করদাকে জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে আসার আগে প্রথম জীবনে দেবদেবী, রামায়ণ, মহাভারতের ছবি আঁকতেন। শান্তি-নিকেতনে আসার পর আস্তে আস্তে চিন্তা-ভাবনা বদলাতে থাকে। এবং স্বাধীনভাবে ছবি আঁকা আরম্ভ করেন।

কিঙ্করদার আঁকা আর একটা কৃষ্ণের ছবিতে, যেটি শান্তিনিকেতনে আসার পরে আঁকা, কৃষ্ণের হাতে ছটা আঙুল থাকায় ছবিটি অনেকে অনেকরকম ব্যাখ্যা করেন।

একটা খবরের কাগজে কৃষ্ণের হাতের এই ছটা আঙুলের ব্যাখ্যা পড়ে ব্যাপারটা জানার জন্য কিঙ্করদাকে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, 'ভুল করেই হয়ত ছটা আঙুল হয়ে গেছে।'

শিক্ষক কিঙ্করদাকে দেখেছি যে ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তিনি কাজ করে যেতেন[১]। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের ধৈর্য থাকত না এত। তাই তিনি ক্লাসে এলে ক্লাস ছেড়ে পালিয়ে যেত অনেকেই। কিন্তু যাদের সত্যিকারের কাজ শেখার ইচ্ছা ছিল তারা ধৈর্য সহকারে কিঙ্করদার অত্যাচার সহ্য করে যেত। আমাদের পরীক্ষার সময় মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন, ঐ সময় যদি কোন ছবি বা মূর্তির মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতেন তবে সঙ্গে সঙ্গেই ঐখানেই হাত লাগিয়ে ছবি বা মূর্তি ঠিক করতে লেগে যেতেন। তাঁকে বোঝান মুশকিল হত যে এটা পরীক্ষার কাজ।

অ্যাবস্ট্রাক্ট বা মডার্ন কাজ পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, 'আগে সা, রে, গা, মা শেখ তারপর নিজেই সব পারবে, ফাঁকি মেরে বা ভাঁওতা দিয়ে কিছু হবে না।' মূর্তির মধ্যে কিভাবে প্রাণ আনতে হয় সেদিকেই জোর দিতেন তিনি। পোট্রেট করার সময় দেখেছি যে মডেলকে কখনো কাঁদাতেন, কখনো হাসাতেন, প্রয়োজনে বকাবকি করতেন। ঐ অবস্থায় তার পোট্রেট করতেন। এইভাবে তিনি মডেলের সঙ্গে মিশতেন। মিশে তার আসল চরিত্রকে, তার প্রকৃতিকে জেনে পোট্রেট করতেন। অ্যানাটমির দিকে জোর দিতেন বেশী। পোট্রেট করার আগে নানাদিক থেকে মডেলের স্কেচ করে নিতেন। আর ছবিতে বা মাটিতে পোট্রেটগুলো সবসময় মেপে করতেন। এর জন্য অনেকসময় কিঙ্করদার কাজ শেষ করতে খুব বেশী সময় লেগে যেত।

সুন্দর মুখ দেখলেই পোট্রেট করতে বলতেন। আমি কলাভবনে আসার পর তিনি যে প্রতিকৃতি ভাস্কর্যগুলি করেছিলেন সেইসব মডেলের যথাসম্ভব একটা তালিকা দেবার চেষ্টা করছি ঃ

| | | |
|---|---|---|
| শীলা বর্মা | — | কলাভবনের ছাত্রী |
| চৈতালী দে | — | ” ” |
| কিরণ থাপা | — | ” ” |
| কুমকুম ভট্টাচার্য | — | ” ” |
| দনুজ দলনী | — | গ্রামের বৌ |

এছাড়াও ছবি দেখে করেছিলেন মনিপুরের মহারাজার একটা পোট্রেট।

কিঙ্করদার করা গর্ভবতী মহিলার একটা পোট্রেট আমার সংগ্রহে ছিল বহুদিন। তিনি যেদিন মারা যান সেদিন মূর্তিটি পড়ে ভেঙে যায়। তার একটা ফটোগ্রাফ

১. প্রভাস সেনের পরবর্তী পর্যায়ের 'শিক্ষক রামকিঙ্কর' প্রবন্ধে রামকিঙ্করের শিক্ষকতা প্রসঙ্গে আরো বিস্তৃত আলোচনা আছে। সঃ

এখনও আমার কাছে আছে। কুমকুম ভট্টাচার্যের পোর্ট্রেট এখনও আমার কাছে আছে ভালোভাবেই। দনুজ দলনীর পোর্ট্রেট কলাভবনে দেখেছিলাম। বাকী পোর্ট্রেটগুলি যাঁদের দেখে করেছিলেন তাঁরাই নিয়ে নিয়েছিলেন। কিঙ্করদার কাজগুলির মধ্যে নাইফের (knife) একটা কাটা গুণ থাকত। তবে কিছু কিছু জায়গা তিনি আঙুল দিয়ে করতেন। আবার কখনোবা মাটি লাগিয়ে নাইফ দিয়ে কাটতেন। মূর্তিতে জল ছেটানোর সময় মুখে জল নিয়ে ফুঁ দিয়ে মূর্তির গায়ে ছেটাতেন। কাজ শেষ হলে হাতে জল লাগিয়ে উঁচু জায়গায় হাত বুলিয়ে দিতেন।

শিক্ষক কিঙ্করদার বসার কোন চেয়ার টেবিল ছিল না। স্টুডিওর সামনে একটা মহানিম গাছ ছিল, সেখানে ছিল সিমেণ্টে বাঁধানো একটা বসার জায়গা আর ঐ জায়গাটাই ছিল কিঙ্করদার অফিস। ক্লাসের পরে ঐখানে বসে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন। কখনো বা গান জুড়ে দিতেন। তাঁর প্রিয় গান ছিল, 'আরো একটু বসো।' গান করতে করতে কখনো দু-চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ত জল।

তিনি মাঝে মাঝে ছাত্রাবাসে আসতেন। রুম নোংরা দেখলে রেগে যেতেন খুব এবং সঙ্গে সঙ্গে রুম পরিষ্কার করিয়ে ঠিকঠিক জায়গায় জিনিসপত্র রাখা করাতেন। সকালে উঠে প্রায়ই আমি তাঁর বাড়ীতে যেতাম। দেখতাম নমস্কার না করলে রেগে যেতেন। তিনি সবসময় চাইতেন ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করুক।

একবার কোন এক ছাত্রের সঙ্গে রিক্সায় বোলপুর যাচ্ছিলেন। ছাত্রটি রিক্সা-ওয়ালাকে 'তুই' সম্বোধন করায় তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'রিক্সাওয়ালা তার চাকর নয়, সে মেহনত করে খাচ্ছে, অতএব তাঁকে তাঁর যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হোক।'

কিঙ্করদাকে দুটো নাটক করতে দেখেছি। একটি অবনীন্দ্রনাথের 'লম্বকর্ণের পালা', অন্যটি ইংরাজী নাটক 'পোয়েটেস্টার্স অফ ইস্পাহান'। দ্বিতীয় এই নাটকটি করার সময় বিশ্বভারতী থেকে তাঁকে কোনরকম সাহায্য করতে রাজী না হওয়ায় সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'আমি রামকিঙ্কর, রামের বাহন হনুমান, আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না।' নাটকটি Government of India-র ফিল্ম ডিভিসনকে তুলতে দেখেছিলেন নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল কলাভবনের গাছতলায়। সাধারণ মঞ্চের পেছনে নীলরঙের একটি পর্দা টাঙানো হয়েছিল কেবল। বিজলী বাতির পরিবর্তে ব্যবহার হয়েছিল হ্যাচাকের। ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাকআষাক চেয়ে-চিন্তে তৈরী হয়েছিল নাটকের পাত্র-পাত্রীদের রূপসজ্জার সাজ-সরঞ্জাম।

তিনি পাশের গ্রামের লোকজনদের কিরকম ভালোবাসতেন দেখেছিলাম ঐ ইংরাজী নাটকের দিন। নাটক আরম্ভের সময়সীমা পেরিয়ে যায় নাটক আর আরম্ভই হয় না। যতবারই আরম্ভ করার জন্য তাগাদা আসে ততবারই বলতে থাকেন, 'আমার গ্রামের লোকজন এখনো পৌঁছায় নি, নাটক আরম্ভ হবে না।' একেই ইংরাজী নাটক, তার উপর দর্শক গ্রামের সাধারণ মানুষজন সুতরাং আমাদের অবাকই হতে হয়েছিল সেদিন। একটু দেরী করেই এলেন কিঙ্করদার গ্রামের মানুষেরা,

আরম্ভ হল ইংরাজী নাটক।

সাঁওতালদের জীবন নিয়ে বহু ছবি ও মূর্তি করেছেন তিনি। তাদের জীবনের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে তার পরিবর্তে যেভাবে তাদের জীবনের ছন্দ, গতি ও ভাবকে কাজের মধ্যে প্রকাশ করেছেন সেভাবে নিজেকে বিলিয়ে না দিলে ঐ প্রকাশভঙ্গী কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাঁর কাজের মধ্যে একটা সাঁওতালী সুর ও গন্ধ পাওয়া যায়। কিঙ্করদার সঙ্গে আমাদের সময়ের শিল্পীদের বড় তফাৎ এখানেই যে আমরা সব জিনিসটাকেই দূর থেকে দেখি, যেখানে তিনি তার গভীরে ঢুকে নিজের সবকিছু দিয়ে—সময় বা পরিবেশ, ভাল, মন্দ, লাভ. লোকসানের দিকে না তাকিয়ে কাজ করে গেছেন।

শান্তিনিকেতন থেকে দূরে কোন পল্লীর দিকে স্কেচ করতে চলে যেতেন তিনি। স্কেচ করতে যাবার কোন নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। যেখানে মন যেত সেখানেই চলে যেতেন। সময়ের দিকে খেয়াল থাকত না কোন। স্কেচ করতে যাবার সময় ন্যাকড়ার মধ্যে ছোলা বেঁধে, তার মধ্যে পাথর কিংবা ইঁটের টুকরো দিয়ে গ্রামের কাছাকাছি কোন একটা পুকুরের জলে ডুবিয়ে রেখে চলে যেতেন। খিদে পেলে ঐ ছোলা বাঁধা জায়গায় ফিরে এসে স্নান করে ঐ ছোলা খেয়ে আবার কাজে গেলে যেতেন। তাঁকে বাইরে থেকে দেখে বোঝাই যেত না যে তিনি একজন বিরাট মাপের শিল্পী, অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী।

কিঙ্করদা শান্তিনিকেতনকে ভালোবাসতেন খুব। প্রত্যেকটি ছাত্রও তাঁকে ভালোবাসত ভীষণ। তাঁর অধিকাংশ সময়ই কেটে যেত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। কোন মেয়েকে ভালো লাগলে পোট্রেট করতেন তার। ভীষণ নিঃসঙ্গ আর একাকী ছিল কাজের বাইরে কিঙ্করদার জীবন। রতনপল্লীর বাড়ীতে একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, বাড়ীতে অন্য কেউ ছিল না তখন, পাশের বাড়ীর হৃষিকেশদা (চন্দ) দু'দিন পর খোঁজ নিতে এসে দেখেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। এইভাবে ভগবানের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন তিনি। একথা জোর দিয়েই বলতে পারি কিঙ্করদার বিরাট প্রতিভা যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারে নি শান্তিনিকেতন। তিনি যদি বিদেশে জন্মাতেন তবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বা শিল্পী হিসাবে জানতে পারত বিশ্বের মানুষ। শান্তিনিকেতন ও কিঙ্করদার সঙ্গে মিশে আমি এটাই অনুভব করতে পেরেছি যে রামকিঙ্করের মত শিল্পী হতে গেলে প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে হবে, নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ সততা থাকতে হবে এবং কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা, অনুশীলনের দ্বারা, নিষ্ঠার দ্বারা তাকে প্রকাশ করতে হবে। আর এই সমস্ত সব গুণই যা কিঙ্করদার মধ্যে ছিল। শান্তিনিকেতনের খোলা আকাশের নীচে একজন দরাজ মানুষ ও একজন সত্যিকারের জাতশিল্পীর দেখা পেয়েছিলাম আমি।

## আমার প্রতিবেশী রামকিঙ্কর

হৃষিকেশ চন্দ

১৯৫০-এর এক শীতের সন্ধ্যায় বাড়ীর বারান্দায় বসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করছি। তখন আমার বাড়ীর পেছনেই ছিল দিগন্ত প্রসারী মাঠ। বিজলী বাতি তখনো এখানে পৌঁছায়নি। ঘুটঘুটে অন্ধকার মনে ভীতির সঞ্চার করত।

হঠাৎ শুনতে পেলাম কে একজন পেছনের মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে অন্ধকার বিদীর্ণ করে অট্টহাসি হাসছেন। অনেকক্ষণ ধরে এই হাসি শুনে ব্যাপার কি দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলুম। একটা টর্চ লাইট হাতে নিয়ে খুঁজতে বেরুলুম মানুষটিকে, যিনি এই অন্ধকার তেপান্তরের মাঠে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হেসেই চলেছেন। দেখলুম, মাঠের কাঁটা ভাঁত ছিয়াকুল ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কে একজন হেসেই চলেছেন। অনেক কষ্টে, অনেক কাঁটার খোঁচায় রক্তাক্ত হয়ে হাত ধরে কাঁটা বন থেকে উদ্ধার করে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। পাশের কোন গ্রামে গিয়েছিলেন। সময় মতো ফেরার কথা হয়তো মনেই পড়েনি। অন্ধকারে আসতে গিয়ে কাঁটা বনের মধ্যে পড়ে যান। এগোবার চেষ্টা করলেই কাঁটা ফুটছে। তারই ফলে এই অট্টহাসি। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম ইনিই শিল্পী রামকিঙ্কর। পরিচয়ের সূত্রপাত এমনি অদ্ভুতভাবেই হোল।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হোল আরো অদ্ভুতভাবে। একদিন রাত প্রায় ন'টায় সাইকেলে আমার কর্মস্থল শ্রীনিকেতন থেকে ফিরে আসছি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, সঙ্গে নানারকম ফুলের গন্ধ। লাল কাঁকড়ের রাস্তার উপর হাওয়ায় দোল খাওয়া গাছের পাতার ছায়া যেন কতরকমের মায়াময় আলপনা এঁকে চলেছে। হঠাৎ চেয়ে দেখি একজন এমনি একটা পাকুড় গাছের তলায় রাস্তার উপর হামা দিয়ে চলেছে। সাইকেল থেকে নেমে কাছে গিয়ে দেখি আমাদের রামকিঙ্কর। কি করছেন জিজ্ঞেস করায় সপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, 'আলো ছায়ার খেলা স্টাডি করছিলাম।' বলে আমাকে নানাভাবে সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৪ সনের কোন এক সকালে তিনি আমার রতনপল্লীর পাশের বাড়ীতে উঠে এসেছিলেন। সঙ্গে বর্ষীয়সী এক মহিলা। নাম রাধারাণী। বাড়ীটি তাঁর ছাত্র শঙ্খ চৌধুরীর। বিরাট মাটির বাড়ী। খড়ের ছাউনি। এদিক ওদিক ভেঙে পড়ে। কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে মেরামত হয়। বারান্দার এক কোণে একটা ছোট ঘরে থাকেন। চালা ফুটো হয়ে জল পড়ে। খড়ের ফাঁকে চন্দ্র-সূর্যও দেখা যায়। এতে তাঁর বড় আনন্দ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চাঁদের আলো,

আকাশের তারা দেখতে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা! চালাটি নিশ্ছিদ্র করা হলে খুশী হতেন না।

বাড়ীতে বিজলী বাতি ছিল না। এর জন্য তাঁর কোন অভাববোধও ছিল না। লণ্ঠন বা প্রদীপের সীমিত আলোয় তাঁর কাজ চলতো।

একবার কতগুলো বড় বড় অয়েল পেণ্টিং শুরু করলেন। গভীর রাত পর্যন্ত লণ্ঠনের কালি পড়া চিমনীর আবছা আলোয় অতি কষ্টে কাজ করেন। কাজের বিরাম নেই। তাঁর অসুবিধা দেখে একদিন তাঁকে আমার বাড়ী থেকে একটা ইলেকট্রিক লাইন টেনে দিতে চাইলাম। এতে তাঁর ভীষণ আপত্তি। বললেন, 'লণ্ঠনের মৃদু আলোতেই নাকি তাঁর কাজ ভাল হবে।'

বিজলী বাতির প্রতি তাঁর এই বিরাগের কারণ একটা অনুমান করে নিয়েছিলাম। এখানে আসবার আগে শ্রীপল্লীতে একটা বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন ( বিশ্বভারতীর কোয়ার্টার্স )।

একদিন রাতে বাড়ী ফিরে দেখেন তাঁর ঘরে আলো জ্বলছে না। একে একে সবকটা সুইচ টিপে দেখেন আলো আর জ্বলে না। বাইরে তাকিয়ে দেখেন সব বাড়ী আলোয় আলোময়। শুধু তাঁর বাড়ীই অন্ধকার। কয়েকমাস ইলেকট্রিক বিল দেন নি। তাই লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। একদিন সন্ধ্যার পর তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখলাম বিছানাপত্র বাইরের বারান্দায় টেনে আনা হয়েছে। এরপর ও বাড়ীতে যতদিন ছিলেন ঘরের ভিতরে যান নি। তাঁকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'বিলের টাকাটা দিয়ে দিলেই আবার লাইন দিয়ে দেবে।' তিনি বললেন, 'টাকা না দিলে লাইন কেটে দেবে কেন? ও আমি আর চাই না।'

একসময় আমরা দুজনেই বিশ্বভারতীর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করি। রামকিঙ্কর ক'বছর আগে। আমি তার কিছু পরে। সুদীর্ঘ অবসর। অনেক সময় তাঁর কাছে গিয়ে বসি। কখনো বা তিনি নিজে আমার কাছে আসেন। নিজেদের মধ্যে নানারকম আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। কখনো শিল্প, কখনো সাহিত্য নিয়ে। কখনো সঙ্গীত নিয়েও। উনি মাঝে মাঝে কাঁপা কাঁপা গলায় গান গেয়েও শোনান। কেবলমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়, উচ্চমার্গের গান সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান সুগভীর। একসময় বাউল গানও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। একটা ভাঙা দোতারায় টুংটুং সুর তুলে বহুদিন প্রতি সন্ধ্যায় তিনি প্রাণ খুলে সঙ্গীত চর্চা করতেন। সুদীর্ঘ বৎসর তাঁকে যেমন দেখেছি, তাঁর মুখে যা শুনেছি তার কিছুটা আভাস দেবার চেষ্টা করছি।

একদিনের কথা মনে পড়ে। আমি ক'দিন অসুস্থ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে উঠোনে চেয়ারে বসে আছি। পাশের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখি শিল্পী অস্তগামী সূর্যের দিকে পেছন ফিরে বসে আপন মনে গাইছেন তারস্বরে। মাঝে মাঝে একটা ভাঙা দোতারা নিয়ে টুংটুং করে সঙ্গত করছেন। গুরুদেবের গান, ঈষৎ-জড়ানো স্বরে

একমনে গেয়েই চলেছেন :

'কোন খেলা যে খেলব কখন—
ভাবি বসে সেই কথাটাই
তোমার আপন খেলার সাথী করো,
তাহলে আর ভাবনা তো নাই ॥
শিশির ভেজা সকাল বেলা
আজ কি তোমার ছুটির খেলা—
বর্ষণহীন মেঘের মেলা
তার মনে মোর মনকে ভাসাই ॥'

গানটি রামকিঙ্করের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর কণ্ঠে অনেকবার শুনেছি। গানটি নাকি গুরুদেব একদিন মুখে মুখে বেঁধে সুর দিয়ে অনাদি দস্তিদার মশাইকে শুনিয়েছিলেন তাঁর উপস্থিতিতে। রামকিঙ্করের মনে সেই থেকে সুরটা গেঁথে আছে। তিনি তন্ময় হয়ে গাইছেন। তাঁর গানে পাছে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করি তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কাছে গেলাম না।

পরের দিন সন্ধ্যায় অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। তাই ধীরে ধীরে রামকিঙ্করের পাশে বসে পড়লাম। আজ দেখি সেই বিখ্যাত দোতারা যন্ত্রটি অনুপস্থিত। বুঝলাম তিনি আজ আর গানের মুডে নেই। আজ কথা কইবার আগ্রহ। কিন্তু দৃষ্টি তাঁর দূরান্তে নিবদ্ধ। আপন মনে কথা বলে চলেছেন। বললেন, 'জানেন আমার গুরু কে ? গুরু আমার রবীন্দ্রনাথ, কৌপীনবিহীন গুরু। আমার যা কিছু সবই ঐ গুরুর কাছেই পেয়েছি।

আধ্যাত্মিকতা আজকালকার দিনে দুর্লভ। যুদ্ধপূর্বকালে শিল্পীকূলে একটা আধ্যাত্মিকতা ছিল, একটা দর্শন ছিল। ধর্মের ছায়া অল্পবিস্তর সবার উপরেই ছিল।

দেখুন না, আমাদের দেশেই কতো শিল্পী রামায়ণ, মহাভারত নিয়ে, রাগ-রাগিনী নিয়ে কত শিল্প সৃষ্টি করে গিয়েছেন। কিন্তু আজকাল সে আধ্যাত্মবাদ কোথায় ? তবে কি আছে ? আছে Cosmic reality. আজকালকার শিল্পী তা নিয়েই করবে শিল্প সৃষ্টি।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষ তো বদলাবেই। মানুষ-মানুষ, সে আবার কি বদলাবে ? বদলাবে তার মতবাদ। মানুষ শাশ্বত। আমি বলি মানুষেরই জয়গান কর—শিল্পে, গানে, কথায়।'

এর কিছুদিন পরের কথা। কয়েকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি তিনি প্রায়ই একাকী চুপটি করে বসে থেকে কি যেন ভাবেন। সূর্য অস্তগামী হয়। তিনি বিপরীত দিকে মুখ করে বসে থাকেন। পূর্বাকাশে বিলীয়মান আলোর দিকে চেয়ে থেকে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করেন।

একসময় সুযোগ বুঝে তাঁর কাছে গিয়ে বসি। আজ আবার সেই পুরোনো

প্রসঙ্গ তুললাম। চিত্রকলা, না ভাস্কর্য কোনটা তিনি বেশী ভালোবাসেন, কোনটাতে বেশী আনন্দ পান এবং কেন? আগে একটা দায়সারা উত্তর পেয়েছি, তাতে তৃপ্ত হইনি। ধীর শান্তভাবে আজ অনেক কথাই মন খুলে বললেন :

'মানুষের দেহের ভিতরে যে কঙ্কালটা আছে সেই ধরে রেখেছে শরীরের অস্তিত্বকে। তারই উপরে মেদ আর মাংসের স্তর, জেগেছে প্রাণ।

সুন্দরী কন্যার দিকে তাকাও, শিল্পী-স্থপতির কি অনবদ্যই না সৃষ্টি। পাথরের অনড়ত্বও অনবদ্য রেখায় এবং তার রসানুভূতিতে প্রাণময় হয়ে ওঠে।

আমরা বিশ্বকর্মার সন্তান, তারই মহৎলীলায় আমরা ভাস্করেরা যোগ দিই আমাদের সামান্য শক্তি নিয়ে। এই পাথরের বুকেই দেখুন জেগে উঠবে ফুলের আর নারীর পেলবতা।

সাহিত্য গ্রন্থ পোকায় নষ্ট করবে, গানের রেশ মিলিয়ে যাবে বাতাসে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এইসব শিল্পায়িত প্রস্তর সময় বা প্রকৃতির বিরোধিতাকে জয় করবে।

রেখায় এবং রঙে চিত্রকলা অনায়াসে বিবৃত করে তার সৌন্দর্য—আমার প্রিয়ার মুখ আমি দেখি। তার কাজল আঁখি, রক্তিম ওষ্ঠ আর পরিধান—সবই কেমন মাধুর্যে চিত্রায়িত হয় রঙ আর রেখায়। চিত্রের সার্থকতায় আমার সন্তানের রৌদ্রোজ্জ্বল মুখের দীপ্তি আমি দেখি। পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা মহৎ সেসব সৃষ্টি মানুষ দু'চোখ ভরে দেখে।

কিন্তু ভাস্কর্য কাকে বলে? এই বর্ণহীন জড়ীভূত প্রস্তরখণ্ড কি কথা বলে? এই বর্ণহীন জড় কিভাবে মনকে টানে? এইটেই প্রশ্ন।

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি ছবি আঁকা এবং মূর্তি গড়ার কাজ কোনটাকে বেশী উপভোগ করি। আমি তাদের বলি—যখন বর্ণ এবং আলো-কে প্রকাশ করতে চাই, আকাশ আর জলের বিস্তার অথবা নারী এবং ফুলের রমণীয়তা উপভোগ করতে চাই, আমি আঁকি। কিন্তু সূর্য যখন তার শেষ আলোটি মুছে দিয়ে অস্ত যায় আমি চোখ বুঁজি। অর্ধরাত্রে আমার সন্তান যখন কাঁদে তখন অন্ধকারে তাকে আমি স্পর্শ করি, ভালবাসি। অন্ধকারের ভিতরেই তাকে আমার বুঝে নিতে হয়। ঠিক তেমনটিই হয় ভাস্কর্যের বেলাতেও। একটা তীব্র গভীর ব্যক্তিগত অনুভূতি—রঙ এবং রোদের সাহায্য ব্যতিরেকেই। পাথরের ভিতরে জীবন এবং আকারের অনুভূতি—বর্ণ এবং রৌদ্রানুভূতির চাইতেও তীব্রতর, এটা একটা প্রস্তরীভূত সত্যের মত।

মাতৃগর্ভ থেকে মাটিতে পড়ে প্রথমবার পৃথিবীটাকে চেয়ে দেখবার মত করেই আমি আমার ভাস্কর্যের সৃষ্টি সমাপনান্তে তাকে মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড় করিয়ে দিই। তারপর সূর্যালোকে, চাঁদের আলোয় বা অজস্র বৃষ্টিধারার ভিতরে তাকে আমি বারে বারে দেখি।' একদিন বলেছিলেন, 'একজন ভাস্করের সীমিত উপকরণ

এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে কাজ করতে হয়। কঠিন প্রস্তরের ভিতর তাঁকে রক্তমাংসের অনুভূতি ফুটিয়ে তুলতে হয়। তবু তিনি প্রস্তর খণ্ডটির ভিতরেই সীমাবদ্ধ নন। প্রতিদিনই তিনি চরাচর এবং ব্রহ্মাণ্ডের নিকট থেকে অনুভূতির শিক্ষা নিচ্ছেন, সত্যকে প্রকাশ করবার ভিতরে যে সৌন্দর্য আছে সেই বোধের দ্বারা।

বেদনাময় অবস্থার ভিতর থেকেও শিল্পী এই বর্ণহীন প্রস্তরের ভিতর সত্যকে ক্রমেই রূপায়িত করে তোলেন।

আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছি শিল্পের এই কঠিন মাধ্যম উন্মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে রসিক মানুষের মনে বিরাট আলোড়ন আনছে। কত মানুষ এলো গেল, রাষ্ট্রের কত পরিবর্তন ঘটল, কিন্তু এই পরুষ কঠিন প্রস্তর মাধ্যমে শিল্প রইল চিরায়ত। বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলির দিকে চেয়ে দেখুন—ভারতের, ইজিপ্টের, গ্রীসের, ব্যাবিলনিয়ার, সুমেরুর অথবা ক্রীটের এইসব ভাস্কর্য আজও প্রাণময়।'

তাঁর কাছে শোনা একটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর 'ওয়াশ'-এর কাজ নিয়ে একবার একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল। গুরুদেব রবীন্দ্র-নাথের তিরোধানের পর অবনীন্দ্রনাথ এসেছেন আচার্য হয়ে। তিনি প্রায়ই কলাভবনের বারান্দায় এসে বসেন। দেখেন ছেলেমেয়েরা টেম্পারার কাজ করছে। একদিন একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোরা ওয়াশের কাজ কিছু শিখিস নি? তোরা কার কাছে কাজ শিখিস?

''কিঙ্করদার কাছে। উনি বলেন ও আর শিখে দরকার নেই।'

এমন সময় রামকিঙ্কর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিঙ্কর তুমি ওদের ওয়াশের কাজ শেখাও না কেন?'

'ও আর শিখে কি হবে।'

'তুমি হয়তো নিজেই ভালো পারো না, শেখাবে কি করে।'

'না পারি।'

'ঠিক আছে আজ তোর সাথে আমার কম্পিটিশন হয়ে যাক।'

সম্মুখেই একটা দোলনচাঁপার ঝাড় ছিল, স্থির হল ওটাই দু'জনে আঁকবেন। তিনদিন রোজ একঘণ্টা করে। মাস্টারমশাই নন্দবাবু হবেন বিচারক। তিনদিন পর অবনীন্দ্রনাথ রামকিংকরের ছবিখানা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'বাঃ বেশ হয়েছে, আমাকে হারিয়ে দিয়েছিস।' বলে হাসিতে ভেঙে পড়ে চিৎকার করে মাস্টারমশাইকে ডেকে বললেন, 'ও নন্দ, ও আর দেখবে কি। ও আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।'

এতক্ষণ শিল্পী রামকিংকর ও তাঁর শিল্পকলার কথাই বলেছি। কিন্তু তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী হিসাবে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করে মানুষ রাম-কিংকরকে কেমন দেখেছি এবং কিভাবে বুঝেছি এবার তারই কিছুটা বলা যাক।

আমার ছেলেমেয়েরা শান্তিনিকেতনের পাঠ শেষ করে বাইরে চলে গেছে। ছুটিছাটায় বাড়ী এলে অনেক রাত অবধি গানের আসর বসায়। রামকিঙ্কর তাঁর বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তা উপভোগ করেন। মাঝে মাঝে পরদিন সকালে তাদের ডেকে বলে দেন কোন সুরটা কোথায় ভুল হয়েছিল, কি হওয়া উচিত ছিল। আবার কখনো কাঁপা কাঁপা গলায় গেয়ে শুনিয়েও দেন।

আমার মেয়ের বিয়ের সময়কার একটা ঘটনা বলি। সেবার আমরা দু'বাড়ীর মাঝের তারের বেড়া খুলে দিয়ে দু'বাড়ী এক করে ফেলেছি। চারদিক ঘসেমেজে পরিষ্কার করা হয়েছে। রামকিঙ্কর মঙ্গলঘট আঁকছেন, আলপনার পরিকল্পনা তৈরী করছেন। ভয়ানক ব্যস্ত। তাঁর বাড়ীর সম্মুখে একটা বড় পলাশগাছের উপর মাচা বেঁধে রসনচৌকির ব্যবস্থা হল। বর্ধমান থেকে ওস্তাদ সানাই বাজিয়ে আনা হল। বিয়ের আগের দিন ভোররাতে সানাই বেজে উঠল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার করুণ সুর তন্ময় হয়ে উপভোগ করছি। হঠাৎ খেয়াল হল সানাই মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। আবার বেজে উঠছে। বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি রামকিঙ্কর সেই পলাশগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন। যখনই শুনছেন সানাই-এর আলাপ শাস্ত্রসম্মত হচ্ছে না তখনই বাদককে থামিয়ে দিচ্ছেন। আর নিজে গেয়ে শুদ্ধ সুর শুনিয়ে দিচ্ছেন। সানাই আবার বেজে উঠছে। সানাই তিনদিন ছিল। ঐ তিনদিনই রামকিঙ্কর আর গাছতলা ছাড়েন নি। বাদক উৎসাহিত হয়ে বাজিয়ে চলল। রামকিঙ্করের আহার নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড়। ধরে-বেঁধে তাঁকে কোন রকমে স্নান খাওয়ার জন্য নিয়ে যেতে হোত। বিয়ে সুসম্পন্ন হোল। বর-কন্যা রওনা হয়ে গেল।

রাত ন'টা দশটায় বাড়ীর সকলে একটা ঘরে মন খারাপ করে বসে আছি। বিয়ের কথাই আলোচনা করছি। হঠাৎ পাশের ভাঁড়ার ঘরে খুট খুট শব্দ শুনে চুপি চুপি উঠে গিয়ে দেখি পাচকঠাকুর দু'হাত ভরে অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছেন। হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন। চোর ধরে এনে বারান্দায় বসিয়ে-রাখা হয়েছে। আলোচনা চলছে পুলিশে দেওয়া হবে কিনা। এমন সময় রামকিঙ্কর উপস্থিত। সব শুনে চোরকে বললেন, 'ব্যাটা চুরি করতে গেলি কেন ? চেয়ে নিলেই তো পারতিস। আর দেখুননা ব্যাটা কেমন মুখ শুকিয়ে বসে আছে। নে ব্যাটা বিড়ি খা'—বলে একমুঠো বিড়ি তার হাতে তুলে দিলেন। কতটাকা দিয়ে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল জিজ্ঞাসা করে বললেন, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই খুব অভাবী, নয় চুরি করতে যাবে কেন ? দিয়ে দিন সব টাকা চুকিয়ে। আরো গোটা কুড়ি টাকা বাড়তি দিয়ে দিন।' পাচককে বললেন 'নে ব্যাটা পালিয়ে যা। আর কোনদিন চুরি করিস নে। অভাবে পড়লে চেয়ে নিবি।' শিল্পীর রায়ই শেষপর্যন্ত মেনে নিতে হল।

তাঁর একটা ভাঙ্গা সুটকেসে কতগুলো সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জের পদক দীর্ঘকাল অনাদরে পড়ে থাকতে দেখেছি। কোনটা কোথায় এবং কেন পেয়েছেন প্রশ্ন করলে

বিব্রতবোধ করতেন। মুখ কাঁচুমাচু করে বলেন, 'তা তো বলতে পারবো না। আমার অত কথা মনে নেই।' একবার হঠাৎ তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। আমরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি। ভাইপো দিবাকরকে তার করে আনানো হয়েছে। দিবাকরকে বললেন, 'সুটকেসটা খুলে দেখ ওতে কতগুলো জিনিস আছে, ওগুলো দিয়ে তোর মেয়েকে কিছু গড়িয়ে দিস।' পরদিন দিবাকর সেগুলো নিয়ে আমাকে বলল, 'কাকা হাসপাতালে যাবার আগে এগুলো দিয়ে গেছেন মেয়েকে কিছু গড়িয়ে দেবার জন্য। দেখুন তো এগুলো কি ?' বললাম, 'দেশ বিদেশে নানা প্রদর্শনীতে তাঁর শিল্প যে খ্যাতি লাভ করেছে এগুলো তারই নিদর্শন। অর্থ দিয়ে এর মূল্য নিরূপণ করা যায় না। যদি সম্ভব হয় এগুলো যত্ন করে রেখে দিও।'

তাঁর একজন প্রিয় ছাত্র তাঁকে একটি সোনার হাতঘড়ি উপহার দেয়। শুনেছি কলাভবনের স্টোররুমে একটা সুটকেশে তাঁর কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র থাকতো। ঘড়িটি ঐ বাক্সের অন্ধকার গর্ভে স্থান পায়। তার হৃদস্পন্দন কোনোদিন শোনা যায় নি। অথচ তাঁর অন্য কোন ঘড়িও ছিল না। অবশ্য সময়ক্ষণ দেখবার কোন বালাইও ছিলনা তাঁর। যদি কোথাও যাবার কথা থাকে যাঁদের গরজ তাঁরা এসে নিয়ে যাবে। তারিখ সময় এসব মনে রাখবার প্রয়োজন নেই।

২৬শে জানুয়ারী গৌরপ্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন। আমাদের যাবার কথা। আমাকে বলেছেন সময়মতো সঙ্গে নিয়ে যেতে। যথাসময়ে গিয়ে দেখি নীলরঙের একটা মস্ত উলেন পুলওভার গায়ে চাপিয়ে ছেঁড়া একটা লুঙ্গি পরে নিশ্চিন্ত মনে বসে আছেন। আমাকে দেখে মনে পড়েছে যাবার কথা। বললেন, 'পাঁচমিনিট অপেক্ষা করুন, তৈরি হয়ে নিই।' পুলওভারটা বেশ আঁটোসাঁটো হয়ে গায়ে চেপে বসেছে। কিছুতেই খুলতে পারছেন না। হাতের কাছে একটা ব্লেড পড়েছিল। মুহূর্তের মধ্যেই সেটা দিয়ে দুফালি করে ফেললেন। বারণ করার সময় পেলাম না। বললাম, 'এটা কি করলেন ? এমন মূল্যবান জিনিস নষ্ট করে ফেললেন ?' বললেন, 'আমার এক ছাত্রী নিজের হাতে বুনে ওটা আমাকে উপহার দিয়েছিল। যা হোক, পরা তো হোল।'

অনেকবারই দেখেছি কোন জিনিসের উপর তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। একবার হাতে নিয়ে দেখলেন, তারিফ করলেন, ব্যাস, তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। একপাশে ফেলে রেখে দিলেন।

তখন তিনি চাকুরীতে আছেন। সব সম্পত্তি থাকে বিছানায়, বালিশের তলায়। ট্রাঙ্ক, সুটকেসের বালাই নেই। শ' চোদ্দ-পনেরো টাকা স্থান পেয়েছে তাঁর বালিশের নীচে। তিন-চার দিনের মধ্যেই সব শেষ। তাঁর ঘরের বারান্দায় বসে গল্প করছি, এমন সময় পাওনাদার এসে প্রাপ্য টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল। ক্রমে উত্তেজিত হয়ে আপমানজনক কথা বলতে আরম্ভ করল। মাঝে পড়ে কোনোরকমে

পাওনাদারকে বিদায় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মাত্র চার-পাঁচদিন আগে এতগুলো টাকা পেয়েছেন, সব খরচ করে ফেলেছেন ? আমাকে বলুন তো কি কি খাতে কত খরচ করেছেন, একটা হিসাব করে দেখি।' তিনি বারবারই আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'নিশ্চয়ই খরচ হয়ে গেছে, তাই তো বালিশের তলায় আর কিছুই নেই। যদি খরচ না হতো তাহলে তো থাকতোই। এ সামান্য কথাটা বুঝতে পারছেন না কেন ?' এ কথার পর আর কোন কথা বলা চলে না।

একদিন সকালে হঠাৎ তাঁর ডাকাডাকি শুনে তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখি দুটি ইউরোপীয়ান তরুণ এসেছেন। সঙ্গে তাঁদের ম্যুভি ক্যামেরা আর কিছু লটবহর। তিনি তাঁদের কথাবার্তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, তাই আমার ডাক।

তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম তাঁরা ফরাসী। ফরাসী মিশ্রিত ইংরেজী বলেন, যা প্রায় অবোধ্য। বারবার প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, তাঁরা দুজনেই ভাস্কর, থাকেন প্যারিসে, রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের অনেক প্রতিলিপি তাঁরা দেখেছেন। মাত্র এক সপ্তাহের জন্য তাঁরা এদেশে এসেছেন। মুখ্য উদ্দেশ্য রামকিঙ্করের সঙ্গে ব্যক্তিগত-ভাবে পরিচিত হওয়া, তাঁর সঙ্গে ভাস্কর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা। এবং তাঁর মূর্তি ও ছবিগুলো স্বচক্ষে দেখা। সম্ভব হলে কিছু ফটো তুলে নেওয়া। আর এইজন্য ম্যুভি ক্যামেরা সঙ্গে এনেছেন। দীর্ঘসময় ধরে নানা আলোচনা, অনেক ফটো তোলার পর একসময় তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর মূর্তি এবং কলাভবনে রক্ষিত ছবিগুলো দেখিয়ে নিয়ে এলাম। বিকেলে তাঁরা কথাবার্তা বলে ফিরে যাবার ঠিক আগে পাঁচশ টাকায় দু-খানা ছবি কিনে নিয়ে গেলেন।

ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। সন্ধ্যার পর রেডিওতে সংবাদ শুনে ছুটে গেলাম খবরটা দিতে। এবং অভিনন্দন জানাতে গিয়ে দেখি তিনি নির্বিকার বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'আরে হৃষিকেশবাবু, আজ সন্ধ্যায় একটা মজার খবর এসেছে। তার পেলাম ভারত সরকার আমাকে কি একটা 'পদ্মটদ্ম' দিয়ে দিল। দেখুন তো ব্যাপারটা কি ?' আমি বললাম, 'আপনি একজন খ্যাতিমান শিল্পী, তাই আমাদের সরকার আপনাকে এই উচ্চসম্মানে সম্মানিত করল।' তিনি মুখ ভার করে বললেন, 'ও দিয়ে কি হবে ? অন্য কাউকে দিয়ে দিলেই তো হোত।'

পরদিন সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আলোয় কলাভবনের একদল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে ধীর পদে শোভাযাত্রা করে এসে শিল্পীর পদপ্রান্তে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন। সুগন্ধ ধূপের ধোঁয়া আর দীপের মৃদু আলোয় তাঁকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করা হোল। দেখলাম তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন। দুটি চোখ অশ্রু সজল। তাঁরা চলে যাবার পর আমাকে বললেন, 'এটাই তো হেল আমার সবচেয়ে বড় সম্মান। কোনদিন এর চেয়ে বেশী তো কিছু চাই নি।'

বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করা হবে ঠিক করা হয়েছে। তিনি এ খবর পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। সমাবর্তনের দিন আম্রকুঞ্জে হাজার হাজার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আচার্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাত থেকে মানপত্র নিতে হবে, এ ঝামেলার কি প্রয়োজন ছিল ? শেষপর্যন্ত সমাবর্তন উৎসবে যেতেই হোল। যেন কি একটা মহালজ্জাকর ব্যাপার। কোনরকমে মানপত্রটি নিয়ে কাজটি সমাধান করে বাড়ী পালিয়ে এলেন।

১৯৭০ সালে শ্রীনিকেতনে মাঘ মেলা শুরু হয়েছে। একটি তরুণ এসে আমার সম্মুখে দাঁড়াল। বলল, 'আমাকে আট-দশ বর্গফুট জমি দিতে হবে। ভাড়া দেবার সামর্থ আমার নেই। তবে যদি ভালো উপার্জন করতে পারি সামান্য ভাড়া দেব।' প্রশ্ন করে জানলাম যে সে শিল্পী, পোট্রেট আঁকে। পোট্রেট পিছু আটআনা থেকে একটাকা নেবে। মিনিট পনেরো সময়ে একখানা করে শেষ করতে পারবে। তাছাড়া মেলার মাঝখানে বসে নানান দৃশ্য স্কেচ করে ধরে রাখবে।

আমি পরীক্ষামূলকভাবে তাকে জমির ব্যবস্থা করে দিলাম। সবসময় তার চারদিকে বেশ ভীড় জমে থাকে। এক সুযোগে তার কাছে গিয়ে বসলাম। দেখলাম, ছেলেটির নৈপূণ্য অসাধারণ। কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে শিক্ষা পাবার সুযোগ হয়নি, যা আয়ত্ত্ব করেছে তা নিজের চেষ্টাতেই। এছাড়াও এই মেলায় তার আসার উদ্দেশ্য হল তার কাজ দেখে যদি শান্তিনিকেতনের কোন শিল্পী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে টেকনিক সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দিতে রাজী হন তাহলে তার এখানে আসা সার্থক হবে।

রামকিঙ্করকে ছেলেটির কথা জানালাম। পরদিন তাঁকে মেলায় নিয়ে গিয়ে তার কাজ দেখাব স্থির করলাম। তিনি গেলেন এবং তার কাজ দেখে খুব সন্তুষ্ট হলেন। ঠিক হয়ে গেল মেলা শেষে ছেলেটি আমার সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে যাবে।

যথাসময়ে তাকে নিয়ে রামকিঙ্করের কাছে উপস্থিত। ঠিক হোল পরদিন থেকেই জলরঙ এবং তেলরঙের প্রথম পাঠ শুরু হবে। ছেলেটি উৎফুল্ল হয়ে ফিরে যাবার মুখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তার বাড়ী কোথায় ? কে কে আছেন ?' উত্তরে সে বলল, 'তার বাড়ী হাওড়ায়, মা, বাবা, স্ত্রী-পুত্র সবাই আছেন।' শুনে রামকিঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'যা ব্যাটা, বেরো আমার বাড়ী থেকে। ব্যাটা বিয়ে করে ঘরসংসার করবি আবার শিল্প সৃষ্টি করবি ? যা ব্যাটা, বাড়ী গিয়ে বৌ-এর ফুট-ফরমাস খাটগে আর ছেলের ভিজে কাঁথা বদলাগে।' আমার অনুরোধ সব ব্যর্থ হয়ে গেল। ছেলেটি ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

তিনি মনে করতেন বিবাহিত হয়ে সংসারধর্ম পালন করতে গেলে তাঁর পক্ষে সমগ্র সত্তা দিয়ে শিল্প সৃষ্টির কাজ করা সম্ভব হবে না।

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে কোন একসময় দিল্লীতে একটা প্রদর্শনী হচ্ছিল। তাতে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটা বিশেষ প্যাভিলিয়ন

নির্দিষ্ট হয়েছিল। যা প্রায় দু'তলা বাড়ীর সমান উঁচু। সামনের দেওয়ালের উপরের দিকের খানিকটা জায়গা রাখা ছিল রামকিঙ্করের ছবি আঁকার জন্য। কথা ছিল উঁচু করে প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে দেওয়া হবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। কিন্তু এতে দমবার পাত্র নন তিনি। একটা দশ-বারো হাত লম্বা বাঁশের লগার মাথায় একটা ঝাঁটা বেঁধে কয়েকটা বালতিতে গোলা নানা রঙে ডুবিয়ে ঝাঁটা দিয়েই ছবি আঁকা শুরু হয়ে গেল। লিকলিকে ডগা সোজা করে ধরে রাখা কঠিন, তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এঁকেই চলেছেন। সম্ভবতঃ আমিই ছিলাম তাঁর একমাত্র মুগ্ধ দর্শক। পরে অনেকের মুখেই এই ছবির প্রশংসা শুনেছি। শিল্পী নির্বিকার। একাজে কারো কাছ থেকে এতটুকু সাহায্যও পেলেন না তবু তার জন্য কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও নেই।

চিঠিপত্র প্রায়ই খুলে পড়েন না। টাকা পয়সার সঙ্গে সবকিছু তাঁর বালিশের নীচে স্থান পায়। বালিশের তলায় হাত দিয়ে টাকা না পেলে বুঝতেন টাকা ফুরিয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতিদ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। বাড়ীতে কেউ ছিল না। জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে দেখি বালিশের তলায় একগাদা চিঠি। অধিকাংশই খোলা হয়নি। হঠাৎ নজরে পড়ল পোলিস্ সরকারের একখানা চিঠি। তাঁরা তাঁকে কিছুদিনের জন্য পোল্যাণ্ড নিয়ে যেতে চান। তাঁর অনুমতি পেলেই লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবার এবং ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে। দু'খানা চিঠি বছরখানেক আগে এসেছে। কিন্তু খামগুলো খোলাই হয় নি।

আসাম সরকারের গান্ধী মূর্তি তৈরী করবার সময় একদিন একখানা চিঠি এল। দেখলাম খামখানা না খুলেই যথারীতি বালিশের তলায় চালান হয়ে যাচ্ছে। সরকারী চিঠির খাম দেখে চেয়ে নিয়ে দেখি আসাম সরকারের চিঠি। সঙ্গে বিশ হাজার টাকার একখানা চেক। বললাম, 'দেখুন তো আমি না খুললে কত বড় ক্ষতি হয়ে যেত।' তিনি হেসে প্রসঙ্গটা চাপা দিলেন।

একবার কথা হল তাঁকে রতনপল্লীর বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়ে হোস্টেলে রাখা হবে। তাঁর ছাত্ররা সেবা-যত্ন করবে। সুযোগও এসে গেল। তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে হাসপাতালে দেওয়া হোল। কথা হোল সুস্থ হলে আর এ বাড়ীতে না এনে একেবারে হোস্টেলে নিয়ে তোলা হবে।

আমাদের বড় ডাক্তারবাবু শচীন মুখার্জীর নির্দেশে তাঁর সুরাপান বন্ধ করা হোল। সেই অভিমানে তিনি ধূমপানও ছেড়ে দিলেন। একদিন আমাকে বললেন, 'আমার সময় যে আর কাটে না। কি করি বলুন তো?'

আমার কাছে জাপান থেকে আনা ভালো রঙ, তুলি ও কাগজ ছিল। আমি তাঁকে দিয়ে বললাম, 'যতক্ষণ পারেন ছবি এঁকে সময় কাটিয়ে দিন। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদিন গিয়ে দেখি মুখখানা অন্ধকার করে বসে আছেন। যেতেই বললেন, 'আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কি ?' বালিশের তলা থেকে একখানা কাগজ টেনে বার করে এনে বললেন, 'দেখুন কি এঁকেছি।' দেখলাম কাগজে কতগুলো হিজিবিজি টানা ছাড়া আর কিছুই নেই। বললাম, 'আমাদের ঘাট হয়েছে। আপনি আবার ওষুধের মতো একটু করে খেতে আরম্ভ করুন। আমি ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে আসছি।' শুনে মুখখানা খুশীতে ভরে গেল।

পরদিনই খবর পেলাম তিনি হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে গেছেন। শান্তিনিকেতন, বোলপুর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কলাভবনের ছেলেরা আমার কাছে ছুটে এল। ব্যাপারটা আমার কাছে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। বললাম, 'রাধারাণী'র বাড়ী কোপাই নদীর ও-পারে সিহালা গ্রামে। ওখানে গিয়ে খুঁজে দেখতে পারো।' ওখানেই তাঁকে পাওয়া গেল। দেখা গেল রাধারাণীর বাড়ীর দাওয়ায় পানপাত্র হাতে নিয়ে দিব্যি বসে আছেন। তারপর আমরা আর কোনদিন তাঁর অন্য কোন ব্যবস্থার কথা ভাবিনি।

এরপর এ-বাড়ীটি একেবারে ভগ্নদশায় এসে পড়ল। বিশ্বভারতী তাঁকে এণ্ড্রুজ-পল্লীর একটি বাড়ীতে থাকতে দিলেন। সেখান থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে জীবিত অবস্থায় তিনি আর এ-বাড়ীতে ফিরে আসেন নি কোনদিন। কেবলমাত্র তাঁর মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার পথে তাঁর প্রিয় এই বাড়ীটিতে কয়েক মুহূর্তের জন্য এনে রাখা হয়েছিল।

তাঁর জীবনের শেষ দু'বছর এণ্ড্রুজপল্লীর বাড়ীতে কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু ঐ বাড়ীটি ও তার পরিবেশ তাঁর মনঃপূত ছিল না। আমি যখনই যেতাম, বলতেন, 'পুরোনো বাড়ীতে কি আনন্দেই না ছিলাম। মাটির বাড়ী, খড়ের চালা আর চারদিক গাছপালা। যেন গ্রামের স্পর্শ পেতাম। আর এখানে চারদিকে অসংখ্য ইমারত। যেন কেমন একটা শহুরে ভাব। আমার মন অহরহ ঐ বাড়ীটির জন্য কাঁদে।' পুরানো এ বাড়ীতে ছিল তাঁর প্রজাবৃন্দ। আশপাশের কিছু দরিদ্র পরিবার আশ্রয় পেয়েছিল। কয়েকটি পথচারী কুকুর বেড়ালও এসে জুটেছিল। একদল শিশুর কলরবে বাড়ীটি মুখর হয়ে থাকত। তিনি বারান্দায় ভাঙা মোড়াটির উপর বসে নীরবে চোখ মেলে দেখতেন। মুখে তৃপ্তির হাসি।

একটি ঘেয়ো কুকুর তাঁর প্রিয় ছিল। তার গায়ে সযত্নে 'নিম' টুথপেস্ট মাখিয়ে দিতেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে বাঁচে নি। বহুদিন পর্যন্ত তার জন্য দুঃখ করেছেন। খেতে বসলে একদল বিড়াল তাঁকে ঘিরে বসত। অনেকসময় পাত থেকে খাবার নিয়ে পালায়। তিনি নির্বিকার। হাত দিয়ে তাড়াবার চেষ্টাও করতেন না।

একবার শখ হোল বারান্দায় বসে বসে ধানের উপর বাতাসের ঢেউ খেলানোর দৃশ্য দেখবেন। দ্রুত ব্যবস্থা হয়ে গেল। উঠানে লাঙল পড়ল। ধান রোপণ করা

হোল। কিন্তু ধান আর হোল না। বর্ষার পরই সব গাছ শুকিয়ে খড় হয়ে গেল। এরজন্য তাঁর আফসোসের সীমা ছিল না।

তাঁর মৃত্যুর কয়েকমাস আগে একদিন তাঁর কাছে গেছি। দেখি চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ভাবছেন?' বললেন, 'ভাবছি না, মনে মনে ছবি আঁকছি, মূর্তি গড়ছি। দেহটা যত অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে, মনটা তত সক্রিয় হয়ে উঠছে। দিনের পর দিন আমি মনে মনে কত কিছু সৃষ্টি করে চলেছি। যদি কিছুটা ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকত ওগুলোকে রূপ দিয়ে যেতে পারলে কিছুটা কাজের কাজ হোত।'

শেষের দিকে রোগে ভুগে ভুগে যখন একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন, হয়তো সেবা-যত্নও ঠিক তেমনটি হোত না, তখন একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'হৃষিকেশবাবু, বিয়ে-থা না করে কি ভুল করেছি? একাকী রোগশয্যায় পড়ে থেকে থেকে মাঝে মাঝে ভাবি আজ যদি স্ত্রী-পুত্র বিছানার পাশে ঘিরে বসে থাকত, সেবা যত্ন করত, তাহলে হয়তো নিজেকে এতটা অসহায় মনে হোত না। আবার তখনি মনে হয় আমি ঠিকই করেছি। নিজের সব সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে একমনে শিল্পের সাধনা করেছি। এটাই ঠিক করেছি। কি বলেন?' আমি নির্বাক হয়ে পাশে বসে থাকি।

যেদিন শেষবারের মতো কলকাতা রওনা হবেন সেদিন ভোরে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন, 'হৃষিকেশবাবু আমাকে আপনারা পাঠাবেন না। আমাকে শান্তিনিকেতনেই মরতে দিন।' উত্তরে বললাম, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনার কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে সুচিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। আমি বাধা দিলে শুনবে কেন?'

মনটা ভেঙে গেল। কেন জানি না মনে হোল উনি হয়তো আরফিরে আসবেন না। অতি কষ্টে বিদায় নিলাম। এটাই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

আমার প্রতিবেশী-বন্ধু রামকিঙ্করের ভাঙা ভিটে আজ উন্মুক্ত পড়ে আছে ঠিক সেই দরাজ মানুষটিরই মতো যিনি সমস্ত জীবন বুক ভরে সূর্যরশ্মি পান করেছিলেন।

## চোখে দেখতে পাচ্ছি কিংকরবাবু এখনও আছেন

### বাগাল রায়

ডাক নাম বাগাল। পুরোনাম বাগাল রায়। ভাগ্যান্বেষণের তাগিদে সুদূর দুমকা থেকে একদিন এসে পৌঁছেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সেইসময়ের শান্তিনিকেতন আজকের তুলনায় আয়তনে ছিল অনেক ছোট। পরিবেশও ছিল তুলনায় ভিন্নরকমের। ইতিহাস হয়ে যাওয়া আজকের সেইসব মানুষেরা শান্তিনিকেতনের মাটিতে তখন করে চলেছিলেন তাঁদের সৃষ্টি কাজ। বাগাল রায় ছিলেন সেই বিরল সৃষ্টিশীলদের অন্যতম একজন। তবে তাঁর সৃষ্টিশীল মনস্কতা ছিল একটু ভিন্নরকমের। সাধারণ মজুর হিসাবেই শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিছুসময় পরে কলাভবনে যোগ দেন ঐ একই পদমর্যাদায়। আরো একটু পরে খুব কাছাকাছি চলে আসেন রামকিঙ্করের।

সহকারী বাগালদা

এবং তাঁর ভাস্কর্যের মশলা তৈরীর সহকারী হিসাবে জীবনের প্রায় পুরোটাই কেটে যায় তাঁর কাছে। অন্যান্য ভাস্কর্য ছাড়াও শান্তিনিকেতনের খোলা হাওয়ায় রামকিঙ্করের যেসব বিশাল আর বিমুগ্ধ করে দেবার মতো ভাস্কর্যগুলি আজ আমরা দেখতে পাই সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই হাত ছিল বাগালদার। তপ্ত গ্রীষ্মের প্রখর দাহে যখন ঝিমিয়ে পড়ত গোটা শান্তিনিকেতন তখন উন্মাদ করা সৃষ্টিমাতাল রামকিঙ্করের কাছাকাছি নিঃসঙ্গ প্রহরীর মতো সজাগ আর সচেতন দাঢ্যতায় কর্মচাঞ্চল্যে জেগে থাকতেন এই একজন। রামকিঙ্করের অনেক ঝড়ঝাপটার সাক্ষী এই মানুষটির কাছে পৌঁছই ভরা গ্রীষ্মের এক তপ্তবেলায়। এভাবে দেখবো তাঁকে ভাবিনি আগে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দির ভেতরে লালবাঁধে তাঁরই ভিটে-মাটির সাধারণ চারচালা বাড়ীর

পাশের এক জীর্ণ গোয়াল ঘরের একচালায়। দড়ির খাটিয়ায় অনেক কাঁথাকানির মধ্যে ডুবে থাকা বাগাল রায়ের কাছে রামকিঙ্কর সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টার পর নিরাশ হয়ে ফিরে আসার মুখে অনেক অনুরোধ আর উপরোধে অবশেষে উঠে আসেন তিনি। রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের মতোই ভেঙে চৌচির হয়ে যাওয়া খাটুনীর সেই ভরাট শরীর থেকে মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছিল বিকল ইঞ্জিনের বিকট আর ঘড়ঘড় শব্দধ্বনি। হাঁপানির অত্যাচারে জর্জরিত বাগাল রায় প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে রেগে উঠছিলেন মাঝেমাঝে। বলছিলেন, 'এবার যান, ঘাঁটাবেন না আর আমাকে।' চকিত বিদ্যুৎরেখার মতো ভেসে ওঠা ওঁর কালো আর রাগী মুখের ভেতর দিয়ে ভেসে উঠতে দেখছিলাম রামকিঙ্করের মুখ। সত্যি ঘাঁটানো হচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু আমরা নিরুপায়। যদি কিছু জানা যায় রামকিঙ্করের ঘনিষ্ঠ এই মানুষটির কাছে। এই ইচ্ছাই বারবার উলোটপালোট করে হাতড়ে ফিরছিলো এই মানুষটিকে। অনেক ক্ষোভ আর অভিমান ছিল তাঁর কথায়। নিপাট আর অমল ভালোবাসাও ছিল সেইসব কথার ভাঁজে ভাঁজে। তথাকথিত কোন শিক্ষার ধারে কাছে না গিয়েও এমন কিছু কথা শোনা গেল তাঁর মুখে যা বিস্ময়ে অভিভূত করে আমাদের। যে বিস্ময় তাঁর কথাই। যে-কথা খুব স্পষ্ট আর টানটান। যে-কথা তৎকালীন সেই শান্তিনিকেতন, তার শিল্প, তার মানুষজন, তার পরিবেশ, সর্বোপরি মানুষ আর শিল্পী রামকিঙ্করকে মিলিয়ে মিশিয়ে। সাক্ষাৎকারটিতে বাগাল রায়ের মুখের কথা হুবহু রাখা হয়েছে। সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় ৬. ৬. ৮৬ সালের দুপুর বেলায়। আসুন শোনা যাক তাঁর কথা।

**আপনার ডাক নাম 'বাগাল' আমরা জানি। রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের সহকারী হিসাবে আপনি একজন স্মরণযোগ্য বা শ্রদ্ধেয় মানুষ। আপনার পুরো নামটা বলুন।**

বাগাল রায়।

**আপনার বর্তমান বয়স?**

এখন মোটামুটি ৭০/৭২ বছর হবে।

**শান্তিনিকেতনে কত বছর বয়সে আসেন?**

সালের কথা বলতে পারব না। তবে মোটামুটি ১৬/১৭ বছর বয়সে শান্তি-নিকেতনে এসেছি। তখন চার-পয়সা সের চাল বিক্রী হইছে।

**শান্তিনিকেতনে কিভাবে আসেন?**

আমার আগে শান্তিনিকেতনে আমার মামা-মামী আসেন। এইভাবে যোগাযোগ।

**কিভাবে কলাভবনে ঢোকেন এবং কিভাবে রামকিঙ্করের কাছাকাছি আসেন?**

কলাভবনে ঢুকলাম এইভাবে যে এক 'মাঝি' ঐ পাড়াতে থাকত। নাম কালা। নিশিথদার বাড়ীতে থাকত। মানুষটা বেশ শিক্ষিত মানুষ। লেখাপড়া ভালো জানত।

গরু-বাছুর দেখত। এটা-ওটা কাজ করে দিত নিশিথদার। তখন তো এত লোকও ছিল না। আর বাইরের লোকও কেউ আন্দোলন করে ঢুকত না এখানে। আসত না। কেন আসত না ? সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। লোকে বলত, 'এই ওরা একদল খ্রীস্টান। এই খ্রীস্টান করে দিবেক যাবি না।' এইসব বলত। কলাভবনে ঢোকার আগে আমি ধানকলে, এখানে ওখানে মজুর-টজুরের কাজ করতাম। কিছুদিন নন্দলালবাবুর বাড়ীতে কাজ করেছিলাম। বাগানেটাগানে কাজ করতাম। তারপর ছেড়ে দেওয়া হল। জল নাই। সামান্য জল তো। তখন তো এতো জল ছিল না। ফসল-টসল ছিল না। কি কাজ করব বাগানে ? নন্দলালবাবুর কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে কাজ করতে চলে গেলাম। তারপর মাস্টারমশাই ( নন্দলাল বসু ) খোঁজ করলেন। বললেন, 'কলাভবনে আমাদের একটা লোকের দরকার।' কালা আমাকে খোঁজটা দেয়। তারপরে মাটি সানার জন্য ওখানে নিয়ে গেলেন। মাটি সানতে লাগলাম। মাটিটাটি সেনে দিয়ে পরে যেখানে গর্তটর্ত আছে, গাঁড়া আছে, মাটি কেটে সমান করতে হত। তখন তো কলাভবন এমন শো-র জায়গা ছিল না। এইভাবে কাজ করতে করতে কিঙ্করবাবুর কাছে আসি।

**তখন বেতন হিসাবে কত পেতেন ?**

মাসে দশ টাকার মত মাইনা হয় আমার। এখন তো ছুটি পাচ্ছে, তখন আমাদের ছুটি ছিল না। ছুটির দিনে একবেলা কাজ হত। গাছ খোঁড়া, যেসব গাছপালা বড়ো বড়ো হয়ে গেইছে সেগুলো কেটেকুটে ঠিক করা, এগুলো আমাদের সকালের দিকে করে আসতে হত।

**আপনার দেশ ?**

আমাদের পূর্বপুরুষের বাড়ী দুমকায়। আমরা জাতিতে ঘাটোয়াল।

**আমরা জানি আপনি রামকিঙ্করের করা ভাস্কর্যগুলির সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। আপনি আসার আগে বা আপনি নিযুক্ত থাকার সময় অন্য আর কি কেউ তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন ?**

একজন ছিল। সে এমনি মাটিটাটি সেনে রেখে দিত। ঐ ওখানে, ঘণ্টা ঘরের কাছে। তারপরে ছেলেরা এসে কাজ করত।

**সে কি আপনার মতোই ছিল ?**

না, আমার মতো নয়।

**কাশীনাথ বলে একজন ছিল শুনেছি।**

কাশীনাথ ছিল। ঐ কালোবাড়ীটা (Black House) আছে, ও ঐখানেই কাজ করত। দিনমজুরের মতো। আমার মতোই। কলাভবনে এসেছে পরে।

আপনি কতদিন কলাভবনে কাজ করেছিলেন ?

আমি তো কাজ করেই যাচ্ছিলাম, রিটার্ন ( রিটায়ার্ড ) করেছি এই ৫/৬ বছর।

রামকিঙ্করের সহকারী হিসাবে ?

বরাবরই করেছি।

আচ্ছা বাগলাদা আপনি থাকতে থাকতেই রাধারাণীদি কিঙ্করদার কাছাকাছি আসেন। কিন্তু কখন প্রথম দেখেন ?

সালফাল বলতে পারবো না। ওঁদের ভাব তো বহুদিন থেকেই ছিল। ঐ যে রাস্তার ধারে, যেখানে আমাদের দারোয়ান থাকে, ঐ শ্রীপল্লীর বাড়ীতে রাধারাণী প্রথম আসে। তখন কিঙ্করবাবুর রান্নাবাটা করতাম আমি। ঐ বাড়ীতে থাকতে থাকতে কিঙ্করবাবুর অসুখ হলো মাঝে। দিয়ে বললেন, 'দিনে তো দেখছিস রে তুই, রাত্রিতে কে দেখবেক আমাকে, একটা রাঁধুনী রাখি।' এই রান্নারান্না করে করেই আসতে লাগল।

সহকারী হিসাবে রামকিঙ্করের সঙ্গে আপনার প্রথম কাজ কোনটি ?

'বাঁক বওয়া' ( 'সাঁওতাল পরিবার' )।

'বাঁক বওয়াটা' করতে কত সময় লেগেছিল ?

অনেকদিন। তখন তো প্রভাসবাবুরা ছিলেন। তারপরে শঙ্খবাবু, সুজিতবাবু, দুর্গাবাবু। দুর্গাবাবু তো যে বছর পাশ করে বেরলেন সে বছরেই মারা গেলেন।

কিঙ্করদা তো অনেক মূর্তি করে হয়তো শেষ হবার মুখেই ভেঙে দিয়েছেন, 'বাঁক বওয়া'টা কি ভেঙেছিলেন একবারও ?

হ্যাঁ ভেঙেছিলেন। একবার। পুরোটাই ভেঙেছিলেন।

বাক বওয়া'টার পর কোনটা করেন ?

ঐ যে গেস্ট হাউস, পুরনো গেস্ট হাউস, মন্দিরের সামনে, ঐটা আগে গেস্ট হাউস ছিল, এখন কি ভবন করেছে বলতে পারব না, ওর সামনে যে কাজটা আছে ওটা তারপর। দেখবেন কোন বুঝা যাবে না, এমনি ঢাবঢিব ঢাবঢিব করে করেছেন। ওটা অনেক লোকে বলত, 'কি জিনিস বটে, কি বটে ?' 'কি জানি বাবা, গাছের মুড়ো বটে আবার কি'—কি আর বলব লোককে। বুঝা বড়ো মুশকিল। কেউ ধরতে পারবে নাই। কাকোকেই বলে শুনান নাই। কিন্তু আছে ওর ভিতরে, বলেন নাই।

ওটাও কি ভেঙেছিলেন ?

না, ওটা ভাঙেন নাই।

কিঙ্করদা 'বাঁকবওয়া'—এইসব যে বড় মূর্তিগুলো করেছিলেন তা ওগুলোর কাঠামোটা কিসের, কি দিয়ে করেছিলেন ?

শিক দেওয়া আছে।

খড়টড় দিয়েও করেছিলেন কি ?

না। খড়ের বালাই নাই। শিক দিয়ে তারপর ন্যাকড়া-ট্যাকড়া জড়িয়ে মাটি লাগাই দিইছি, লেপে দিইছি খানিকটা, তারপরে সিমেণ্ট ( মশলা ) লাগানো হইছে।

অনেকে বলেন মশলাটা চুন মিশিয়ে করা হয়েছে, চুনটা ব্যবহার করেছিলেন কি ?

না, সিমেণ্ট।

সিমেণ্ট আসত কোথা থেকে ?

বিশ্বভারতী দিত।

সিমেণ্টের ভাগটা কেমন দিতেন ?

নির্দিষ্ট ভাগ নাই। নির্দিষ্ট করতে গেলে হয়তো এতগুলো মাখাই রেখে দিলাম, চারটি চারটি নিয়ে হয়তো এতটুকু হলো, যখন যেমন, শেষপর্যন্ত হয়তো বললেন, 'কেটে ফেলে দিস তো, কেটে দিস তো।' মাখাটাই অসোটা ( অযথা ) হয়ে গেল। কাজ করতে করতে সময় লাগে তো, একসঙ্গে মাখালে তাহলে তো হবে না। এতকটা ভাত খেতে গেলেই হয়তো তার পরিবর্তে এতটুকু ( তরকারী ) দিয়ে খেতে হবে। তাছাড়া উপায় নাই। ভাগ আছে ওর মধ্যে হয়তো দুভাগ বালি, একভাগ কাঁকড় আর সিমেণ্ট তার অর্ধেক।

কাঁকড় কোথা থেকে নিয়ে আসতেন ?

এই যে 'খোয়াই'-এ পাওয়া যেত, মেলা কাঁকড়, কাঁকড়ে আমাদের অভাব নাই।

ওগুলো কি কিনে আনতেন, না আপনারাই ঝাটফাট দিয়ে নিয়ে আসতেন ?

গরুর গাড়ী করে দিয়ে যেত। পয়সা দিতে হত।

দাম পড়ত কেমন ?

দু'টাকা, আড়াই টাকা গাড়ী হিসেবে। আবার কি ? সস্তার বাজার তো।

আপনি আগের যে কাজগুলোর কথা বললেন এগুলো ছাড়াও আর কোন কাজগুলোয় কিঙ্করদার সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন ?

'সুজাতা,[১]' ঐ সঙ্গীতভবনের সামনে, শুধু ঐটাতেই আমি কাজ করি নাই। তবে যখন ভাঙাচোরা হল তখন ওটাতেও মেরামত করতে গেইছি। তারপর বুদ্ধদেবটা, বুদ্ধদেবটা হতে হতেই নেপাল চলে গেলেন।

আপনিও তো গেছিলেন কিঙ্করদার সঙ্গে ?

হ্যাঁ। শঙ্খবাবুও ছিলেন।

আপনি যখন কিঙ্করদার সঙ্গে কাজ করতেন তখন উনি কখন করতেন কাজগুলো, যে

১. ডাইরেক্ট কংক্রিটে করা 'সুজাতা', রামকিঙ্করের প্রথম 'মুক্তাঙ্গন' ভাস্কর্য। ১৯৩৫ সালে করেন এটি। সঃ

**কাজগুলো আমরা দেখতে পাই কলাভবনের আশেপাশে।**

বারোটার সময় ক্লাসণ্টাস করে এসে। ওখান ( বাড়ী ) থেকে ক্লাসে আসতেন। এসে হয়তো টিফিন হয়ে গেল। আমিও কাজ বন্ধ করে এসে মশলা মাখাতে আরম্ভ করলাম। মশলাটশলা মাখিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করলাম।

**বারোটার সময় তো কাজ আরম্ভ করলেন, করতেন কতক্ষণ পর্যন্ত ?**

কাজ করতে করতে দুপুর দুটো/আড়াইটা হয়ে যেত। আমি হয়তো বললাম, 'আপনার সময় হয়ে গেইছে।' নিয়ে ক্লাসে চলে যেতেন। তারপর বিকালের দিকে ক্লাস ছুটি হয়ে গেল তখন বললেন, 'চল, আর একটু কাজ করবো।' বলতাম, 'চলুন।' রাতেও করতেন। কাজ করবো বললে না বলতাম না তো। এখনকার মতো তো নয়, আমি ওভারটাইম কাজ করছি, ওভারটাইম পয়সা দাও। তখন তো তা ছিল না। তখনকার যাঁরা দরদী ছিলেন তাঁরা কেউ তো নাই। এখন হয়তো অনেক কিছু হইছে। গাদা গাদা টাকা পাচ্ছে। টাকা পাচ্ছেন তো পাচ্ছেন।

**আপনি তো কিঙ্করদার সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন, তা আপনার এই কাজ করার কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা বাঁধা ছিল কি ?**

আমি তো সবসময়ই ওখানেই থাকতাম। ঘর আসবার অবসর ছিল না। কাজ করে ফিরে আসতে আসতে রাত ১০/১১টা হয়ে যেত। খাওয়াও নাই, দাওয়াও নাই। ওখানেই খাওয়া। ওখানেই রান্না হতো এতটুকু বাটি বা এতটুকু টিফিন বাটিতে দু/তিন মুঠো চাল। এতটুকু ভাত। উনিও খেতেন ঐ ভাত। অন্য লোকের মতো যে হবহব করে খেয়ে শুয়ে পড়ব কিঙ্করবাবুর এটা ছিল না।

**কিঙ্করদার সঙ্গে কাজ করতে আপনার কেমন লাগত ?**

কোন কাজ বলতাম না যে করব না। হয়তো বললেন, 'চল।' বললাম, 'চলুন।' ধরুন কোন মানুষের একটা কোন কাজ করবার উৎসাহ জেগেছে, আমি যদি বলি করব না, তাহলে উৎসাহটা ভেঙে যাবে। সেটার যদি আমি একটু সাহায্য করি তাহলে কাজটা হয়ে যাবে। নয় কি ? হুঁ ?

**কাজ করাকালীন কিঙ্করদাকে কেমন দেখতেন ?**

একমনে কাজ করছেন তো কাজ করছেন। হয়তো বললেন, 'মশলা দেরে। মশলা একটু মাখিয়ে দে।' তখন হয়তো একটু মশলা মাখিয়ে দিলাম। আবার হয়তো দেখিয়ে দিলেন, 'এখানটা একটু কার্টিস, কেটে ঠিক করে রাখিস।' কেটে ঠিক করে রাখতে হতো। কাজ করতে করতে হয়তো বললাম, 'আপনার সময় হয়ে গেইছে।' ক্লাসে চলে গেলেন।

**আপনি তো রামকিঙ্করের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন। একসঙ্গে ছিলেন। তা মানুষ রামকিঙ্করকে কেমন দেখেছিলেন ?**

ভালোই দেখেছি। ভালোই দেখেছি। সবই ভালো। সবদিক থেকে ভালো।

কিরকম ভালো ?

ভালো। সবদিক থেকেই ভালো।

শুনেছি একটু নাকি রাগী রাগী ছিলেন ?

রাগীদার মানুষ তো আমি কিছু বুঝি নাই। রাগীদার নয়।

শান্তিনিকেতনের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন ছিল ?

ভালোই। সবদিক থেকেই ভালো। উনি যে কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে গেইছেন তাও তো করেন নাই। কারো সঙ্গে ঝগড়া করতেন না। ঝগড়া করতেন না কারো সঙ্গেই। কারো মুখ পানে চেয়ে কথাটা বলতেন না কোনদিন। মন মেজাজ সবসময় একরকম। বিনোদবাবুও যা কিঙ্করবাবুও তা।

শান্তিনিকেতনের সেইসময়ের শিক্ষক, ছাত্রদের সঙ্গে রামকিঙ্করের সম্পর্কটা কেমন ছিল ?

ভালো ছিল। ভালোই ছিল। ভালো যদি না থাকে তবে শান্তিনিকেতনে কেউ থাকে ? না তাঁরা গড়ন পেটন করে সে জায়গাটাকে উৎপন্নি করে, হুঁ ? একটা গড়ন পেটন করতে গেলে বহু সময় লাগে। এখন হয়তো পাতা ঘরকন্নায় সবাই বাঘ দাঁড়াইছে। পাতা ঘরকন্নায় সবাই বাঘ দাঁড়াইছে—বুঝলেন ? যে আমি বাঘ, আমি ওর বাঘ। কিন্তু ঘরকন্না যে পাতব সময় তো লাগে, হুঁ, তবে ?

রামকিঙ্করের করা যে সমস্ত কাজ আজ আমরা অবাক হয়ে দেখছি, যে সমস্ত কাজ নিয়ে আজ আলোচনার সীমা নেই, মাত্র যে কয়েকটি কাজের জন্যই রামকিঙ্কর স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বহুদিন, যেমন 'বাঁক বওয়া' বা 'সাঁওতাল পরিবার', 'কলের বাঁশি', 'ধানঝাড়া' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসমস্ত কাজগুলো শান্তিনিকেতনের সেইসময়ের শিক্ষক, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষেরা কি চোখে দেখতেন। কিভাবে কাজগুলো গ্রহণ করতেন বা করেছিলেন? আজকের মতোই কি সেই সময়েও এই কাজগুলো যথেষ্ট বা স্বল্প আলোচনা হত বা হয়েছিল ?

তখন লোকে জানত যে কাজ করছে তো কাজ করছে, আনন্দ। গুরুদেব নিজেও তো বলে গেইছিলেন, 'তুমি কাজ করে যাও, সামনে তাকিয়ে যাবে, পেছনে আর তাকানে না।' তার মানে হচ্ছে যে পেছু দিকে যে একটা কাজ করে গেইছো সেই কাজটা বাদ দিয়ে আর একটা যে সামনে করবে সেটা তাকাও ; নিজে এসে দেখে গেইছিলেন।

কিঙ্করদা যখন কাজ করতেন তখন গুরুদেব আসতেন ?

আসতেন।

আমরা জানি রামকিঙ্কর যেখানে বড় বড় মূর্তিগুলোর কাজ করতেন তার পাশে টাঙানো হত তাঁবু। আসতেন মাস্টার মশাই অর্থাৎ নন্দবাবু, বিনোদবাবু অর্থাৎ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—এইসব শ্রদ্ধেয় মানুষজন। আপনি থাকতেন মশলার কাজে। রামকিঙ্করের লেখায় পড়েছি আপনার কথা। সেসময়ের উপস্থিত মানুষজন এবং তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

হ্যাঁ তাঁবু খাটানো হইছিল। ঐ যে সাঁওতাল মূর্তিটা, যেটা প্রভাসবাবু কাস্টিং

করলেন, সেইখানেই তাঁবু খাটানো হইছিল, তখনই গুরুদেব এসে দেখে গেইছিলেন। বলেছিলেন, 'হ্যাঁ ভালো, কাজ করো, করো।' নন্দবাবু, বিনোদবাবু আসতেন, অনেকেই আসতেন, বসে বসে দেখতেন। সকলেই আসতেন কিন্তু। কারো বাধা নাই যে এ আসতেন না, ও আসতেন না। তখন কোন আক্রোশ ছিল না। আক্রোশ বলে কোন একটা জিনিস ছিল না। এখন হয়তো একটা হাওয়া বাতাস বাইরে থেকে লেগেছে। তখন যে আমাদের শান্তিনিকেতনটা গড়ন পেটন করে হয়ে উঠবে সেই চেষ্টা ছিল। তারপরে দেখবেন দেওয়ালের মধ্যে আছে, মডেলিং ক্লাসের পাশে, ওটাও করতে অনেক সময় লেগেছে। এতটুকু ফটো ছিল ঔরঙ্গাবাদের, সেটা দেখে দেখেই ওটার কাজ করে গেছেন। সেখানে এসে বসতেন সকলেই। শঙ্খ চৌধুরী, প্রভাসবাবু, দুর্গাবাবু এ'দের উৎসাহ খুব ছিল। সকলেই কাজ করতেন। কেউ বলতেন না যে করব না। যতদিনই ছাত্র ছিলেন ততদিনই। ওনারা যখন পাশ করে বেরিয়ে গেলেন, চাকরির লাইনে গেলেন, তারপরে সব বাদ গেল।

**বাইরের যে সমস্ত বড় বড় মূর্তিগুলো দেখি, যেগুলো কিঙ্করদার করা, এগুলো ছাড়াও আর কোন বড় মূর্তি করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন কি? আপনাদের বলেছিলেন কিছু?**

বলাবলির কিছু নাই। ওনার খেয়ালের কাজ। সেটা যে আমাকে বলবেন, এই করব তা নয়। খেয়ালী মানুষতো, বসে বসে খেয়াল করছেন, কখন কি করব, না করব। ওনার অনেকগুলো ডিজাইন ছিল, সেগুলো কে কোথায় নিয়ে গেল আমি জানি না।

**এইসব বড় বড় মূর্তিগুলো করবার আগে এগুলোর পরিকল্পনা কিভাবে করতেন তিনি? কিছু দেখেছিলেন কি?**

মাটিতে ছোট ছোট কাজ করেছিলেন, কাজ করে তারপরে সেই দেখে বড় করেছিলেন। যেমন হয়তো একটুকু মাটি নিলেন, বসে বসে টিপে টিপে কাজ করলেন। তবে উনার হতো কি অন্য লোকের হয়তো যন্ত্রপাতি দিয়ে নানারকম করে করতেন, উনি হাতের মধ্যে আঙুল দিয়ে পালিশ করে একটা জিনিস তুলে আনতেন। এখন হয়তো লোকে অনেক কিছু করছে।

**কিঙ্করদার 'ধানঝাড়া' মূর্তিটা, ঐ যে একটা মেয়ে ধানের আঁটি ধরে পিটোচ্ছে, শুনেছি ওটা নিয়ে একটা সময়ে নানারকম কথাবার্তা হয়। এ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি?**

ওটা করবার সময় ওর উপরটা চারিধার ঘিরে দেওয়া হইছিল। অনেক আপত্তি করেছিল। মেয়ে মূর্তি তো। কাপড়চোপড় নাই। ঢাকা দিয়ে দিতাম গো সবসময়। ঢাকা দেওয়া থাকত।

**কি দিয়ে ঢাকা দিতেন?**

শরপাতা দিয়ে টাঁট বেঁধেছিলাম। এগুলো ঝুলিয়ে দিতে হত।

**আপত্তি কে করেছিলেন?**

অনেকেই।

**আপত্তিটা কি নিয়ে ?**

উনার কাজ তো জানেন। কাজ করছেন, কাজ করতে করতে কোন সময়ে হয়তো পেটটা বড়ো করে দিলেন। কোন সময়ে হয়তো বললেন, 'ওখানটা কেটে ফেলে দে'—নিয়ে পেটটা ছোট করে দিলেন। নিয়ে মেয়েরা দেখেছিল যে পেটটা বড়ো করে দিচ্ছে। বলাবলি করেছিল, 'এ্যাই এটা কি কাজ করছে।' এই নিয়ে ব্যাপার। মানুষের অপবাদ তো। যেমন পারেন তেমন কাজ করে যাচ্ছেন, কি হচ্ছে কি যাচ্ছে কেউতো বুঝে না, যখন কাজটা ফিনিস হয়ে গেল তখন বুঝল।

**তাহলে ওটা নিয়ে বেশ আপত্তি ওঠে ?**

হ্যাঁ ওটা নিয়ে হইছিল, তারপর অর্ধনারী( শ্বর ) করেছিলেন সেইটা নিয়েই খুব একটা ঝামেলা হয়ে গেইছিল।

**কোথায় করেছিলেন কাজটা ?**

মডেলিং ক্লাসেই করেছিলেন।

**ঝামেলাটা কার সঙ্গে ?**

কিঙ্করবাবুর সঙ্গেই হইছিল।

**কিঙ্করবাবুর সঙ্গে আর কার ?**

ঐ ক্লাসের মধ্যেই হল। যে ক্যানে এসব কাজ ? আমাদের চলেনা এ জিনিসটা। তারপরে কিঙ্করবাবু বললেন, 'দেখুন শেষপর্যন্ত আবার এই অভিজ্ঞতাই ঘুরে আসবে।' তখনতো আর কিছুই বললেন না। তারপর রথীবাবুর কানে তুলে দিলে। রথীবাবু বললেন, 'আচ্ছা আমি দেখি কি জিনিসটা হইছে। কি নিয়ে ঝামেলা উঠেছে।' বাগান বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে বসেছিলেন—আমাকে বললেন, 'তুমি যাবে।' বাগান হয়ে ঘুরে আমি মূর্তিটা নিয়ে গেলাম। ছোট একটা মূর্তি। সেই কোন মূর্তিটা নিয়ে গেলাম, থামুন দেখি, হ্যাঁ গান্ধীজির মূর্তি, গান্ধীজির একটা মূর্তি ছিল, ছোট মতো মূর্তি একটা, সেই মূর্তিটা নিয়ে গেইছিলাম। রথীবাবু বললেন, 'হ্যাঁ রে এটা নিয়ে ঝামেলা হইছে ?' বললাম, 'এটা নিয়ে হয় নাই। আর একটা কিছু করেছিলেন। সেটা নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি, ঝামেলা হইছে। আপনাকে কিবা আর দেখাবো বলুন।' 'তা তো বটেই। আর্টিস্ট মানুষ। যা মন যাচ্ছে তা করছে। ভালোই করেছে'—রথীবাবু বললেন। তারপর মূর্তিটা আবার ঘুরিয়ে নিয়ে এলাম। কিঙ্কর-বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হল। ঠিক আছে। আবার বললে অনেকে, 'না আমাদের এখানে এসব চলবে না।' শেষবেলাতে এবার দেখুন, যে কথাবার্তা-আলোচনা করেছিল পিতাপুরুষরা, সেটা তো থাকল না। বেশীরভাগই যারা কথাটাকে রটাই ছিল তারাই আবার সেই লাইনে দাঁড়াল। তারাই করছে। আমি একদিন গেইছে 'হ্যাভেল হলে,' তখন দেখছি টুকটুক আঁকছে। বলি হ্যাঁ, এবার ছেলে দাঁড়াইছো, সেইদিনে যে বড় বলেছিলে মুখ নেড়ে, আজকে দেখি টুকটুক পদটা নাড়াইয়ে আঁকছো।

ঐ ন্যুড স্টাডি করছে ?

হ্যাঁ, আর চিত হয়ে শুয়ে আছে ।

আগে তো ন্যুড স্টাডি হতো না। কিঙ্করদা স্টাডি করেছেন আর ঐ নিয়ে কত ঝামেলা।

এখন সব ঠাণ্ডা। তারপর একটা ছবি নিয়ে টানাটানি হয়ে গেল। ছবি নিয়ে হল যে সেটা কিঙ্করবাবু বলেছিলেন, 'ছবিটা হয় নাই।'

কাকে বলেছিলেন ?

ওখানেই আলোচনা করেছিলেন। তারপর কথাটা নন্দবাবুর কানে তুলে দিইছে। নন্দবাবু বললেন, 'কিঙ্কর ?'

'হ্যাঁ বলুন।'

'তুমি বলেছো যে এই ছবিটা হয় নাই ?'

'না হয় নাই। উল্টো হয়ে গেইছে। যে জিনিসটা পারে না সে জিনিসটা করবার দরকার নাই।'

এই যে শান্তিনিকেতনটা, আমাদের শান্তিনিকেতনটা, কেউ বাইরে থেকে এসে দেখবে, তাঁরা কি দেখবে ? লোক যে আজকে বলছে বিলাত যাবো। বিলাত তো আমাদের এইখানেই। আবার বিলাত যেয়ে কি হবে ? সবকিছু দেখিই দিলেক ! হুঁ, যে হ্যাঁ জিনিসটা এই। এই জিনিসটা ঠিক বটে। যে জিনিসটা পারবে না সে জিনিসটা করবার দরকার নাই বুঝিয়ে দিলে !

আচ্ছা বাগালদা জীবনের এই শেষ দিকে এসে আপনার ঘাম ও শ্রম আর রামকিঙ্করের শিল্পী মন ও মেধায় গড়ে ওঠা আজকের বিশ্ববিখ্যাত মূর্তিগুলির দিকে চেয়ে থেকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে ঐ মূর্তিগুলির সম্বন্ধে আর তার স্রষ্টা অর্থাৎ যিনি করেছিলেন সেই মানুষটি সম্পর্কে আপনার অনুভূতির শেষ কথাটুকু বলুন ?

আমিতো এখনও চোখে দেখতে পাচ্ছি কিঙ্করবাবু এখনও আছেন। দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে ছিলাম আর আমি যখন বেঁচে আছি তখন, এখনও তাঁর সঙ্গেই আছি। এটাও দেখতে পাচ্ছি গুরুদেব হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এনড্রুজ সাহেব ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নন্দবাবু বেঁচে আছেন। আর মূর্তিগুলো ভালোই দেখছি। চোখেনজরে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আছে, চোখে ভাসছে তো। লাল বাঁধের পাড়ে বসে বসে দেখছি গাদা গাদা লোক দেখতে আসছে, কানেও শুনতে পাচ্ছি তাও আনন্দ পাচ্ছি।

প্রকাশ দাস

## আমি তোমার পাশে পাশে আছি

রাধারাণী দাসী

তখন রামকিঙ্করের বাড়ীর ঠিকানা বদল হয়ে হয়েছে এণ্ড্রুজপল্লীর ২০ নাম্বার কোয়ার্টার্স। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরের এক হিমমাখা সকালে টেপরেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে পৌঁছাই এই ঠিকানায়। উদ্দেশ্য, প্রবাদপ্রতীম এই মানুষটির কাছ থেকে তাঁর শিল্প ও শিল্প সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া। তখন তাঁর জীবন সূর্য অস্তাচলের পথে। অস্তমিত সেই সূর্যের আভায় কেবল জেগে আছে তাঁর কিছুটা মুখ। এখানেই আমি প্রথমবার দেখি এই মহিলাকে। আমার প্রথম সাক্ষাৎও সেই প্রথম। তখন রামকিঙ্করের সঙ্গে দেখা করার প্রথম ছাড়পত্র / অনুমতি নিতে হয়েছিল তাঁর। সেই মেলামেশায় এই মহিলা সম্পর্কেও জানতে পারি কিছুটা। সেবার আমাদের প্রতি অনেক আদর-আপ্যায়ন ছিল তাঁর। অসুস্থ রামকিঙ্করের জন্য বিচলিত থাকতেও দেখেছি তাঁকে। ১৯৮৬ সাল। ব্যবধান সাত বছরের। ভেবেছিলাম রামকিঙ্করের ছবি বিক্রীর একটা বড়ো স্বত্ব পেয়ে শান্তিনিকেতনের আশেপাশেই হয়তো কোথাও সংসার গুছিয়ে বেশ ভালভাবেই কাটছে তাঁর। ব্যক্তিগত সম্পর্কের তাগিদেই বহুদিন থেকেই তাঁর সাথে দেখা করার কথা ভেবে আসছিলাম। রামকিঙ্করের ঘনিষ্ঠ, ছাত্রপ্রতীম, কয়েকজনের কাছে কয়েকবার খোঁজখবর নিতে গিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে আবিষ্কার করি তাঁর কোন খোঁজই রাখেন না তাঁরা। রাখার প্রয়োজন মনেই করেন না।

রামকিঙ্কর কৃত ভাস্কর্য 'মা ও ছেলে' হাতে রাধারাণী

অথচ ইতিমধ্যেই শান্তিনিকেতনের চৌহুদ্দিতে তাঁর গল্প তৈরী হয়েছে অনেক। আর সেগুলি লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে অবশেষে জায়গা করে নিয়েছে / নিচ্ছে ছাপা অক্ষরের পাতায়। সে গল্প বেশ মুখরোচকই। সঙ্গে জড়ানো আছেন স্বয়ং রামকিঙ্কর। সে গল্পের সতত্য হয়তো কিছু আছে তবুও গল্পের সঙ্গে বাস্তবতার ব্যবধান দুস্তর। এই বাস্তরের সন্ধানে অনেক খোঁজখবর নিয়ে ভুবনডাঙ্গায় তাঁর বাড়ীর একটা ঠিকানা পেয়ে অবশেষে একদিন সেখানে পৌঁছাই। জানলায় মুখ বাড়িয়ে বসে থাকা মোটাসোটা টেকোমাথার লুঙ্গিপরা একজন হঠাৎ রাধারাণীর খোঁজে আমাদের ব্যস্ততা দেখে অবাক হন। জিজ্ঞাসা করেন, 'ব্যাপার কি ?' বলি, 'ব্যাপার তেমন কিছু নয়। স্রেফ দেখা করা।' রাধারাণীর দুরাবস্থার অনেক কথাই শোনান তিনি। অবাক হই। বলেন, 'টাকা পয়সা সব লোকে নয়-ছয় করে করে ফতুর করে দিয়েছে মাগীর। ভাগ্যের লেখা। আজকাল কি এতো সরল হতে হয়। ঐ দেখুন, সামনে ঐ যে বাড়ীটা দেখছেন ওখানেই জিজ্ঞাসা করুন। খোঁজ পাবেন। তবে নেই। এখানে থাকেন না এখন।' সামনে একটা দোতলা দালান বাড়ীর দিকে এগিয়ে যাই। গেটের কড়া নাড়ি। বিবাহিত এক মহিলার মুখ দেখা যায়। জিজ্ঞাসা করি। বলেন, 'উনি এখানে নেই। থাকেন না। বোলপুব স্টেশনের কাছে একটা বাড়ী আছে ওখানে খুঁজে দেখতে পারেন।' গৃহস্বামীর নাম ও ঠিকানা বলে দেন। জানতে পারি এই দোতলা বাড়ীটি রাধারাণীর। পাশেব একতলা বাড়ীটিও তাঁর। দানপত্র করে দিয়েছেন দুটোই। একটি তাঁর ভিক্ষা ছেলে এবং অন্যটি পালিত কন্যাকে। ভিটে ছাড়া রাধারাণীর খোঁজে পৌঁছাই স্টেশনের কাছের ঐ ঠিকানায়। বাইরে খেলায় মেতে থাকা ৫/৬ বছরের একটি ছেলেকে ডাকি। খেলা ছেড়ে সে ছুটে যায় ভেতরে। বেরিয়ে আসে। সঙ্গে ছেলেটির মা। রাধারাণীর কথা জিজ্ঞাসা করি। বলেন, 'তিনি এখানে এসেছিলেন বেশ কিছুদিন আগে। চলে গেছেন। এখানে থাকেন না। থাকেন ভেদিয়ায়। কালীতলার কাছে নিত্যগোপাল রায়ের বাড়ীতে। ভেদিয়া স্টেশনের কাছে নেমে জিজ্ঞাসা করবেন হয়তো দেখিয়ে দেবেন কেউ।' ফিরে আসি। এদিন সমস্ত বাস বন্ধ। এদিন বাস ধর্মঘট। সুতরাং ট্রেন। তখন দুপুর একটা। স্টেশনে গিয়ে পৌঁছাই। শুনি ভেদিয়া যাবার ট্রেন কিছুক্ষণ আগে ছেড়ে গেছে। পরের ট্রেন ঘণ্টা দু/তিনেকের আগে নয়। সুতরাং পায়ে হেঁটেই রওনা দিই ভেদিয়ার দিকে। আমি একা নই। সঙ্গে বন্ধু কুণাল। কুণাল সাহা। রামকিঙ্করেরই ছাত্র। রামকিঙ্করের কাছে তাঁর কেটেছে বহুদিন। রাধারাণীর সঙ্গে পরিচয় অতএব আগেই। আমরা হাঁটছিলাম রেললাইন বরাবর সুঁড়ি পথ ধরে। দুপাশে বুক খোলা মাঠ। গ্রীষ্মের ভরা সূর্য মাথার উপরে। রামকিঙ্করের অনেক কথাই শোনাচ্ছিলেন কুণাল। শোনাচ্ছিলেন রাধারাণীর কথা। বলছিলেন, 'এই মাঠ আর ঐ গ্রামের দিকেই কিঙ্করদা চলে আসতেন স্কেচের সন্ধানে।' হাঁটতে হাঁটতে অজয়ের উপর দিয়ে চলে যাই। মেলা বসেছে দূরে। অজয়ের পাড়ে। ভাঙা মন্দিরের চূড়ো দেখা যায় দূর

থেকে। নীচে অজয়ের দুরন্ত জল ছুটে চলে। আমরা ছুটে চলি ব্যস্ততায়। দ্রুত পায়ে। মেলা ভিড় করা মানুষের কোলাহল ভেসে আসে। মেলামুখো আর মেলা ফেরৎ দু-একটা মানুষের সঙ্গে দেখা হয় মাঝে মধ্যে। দ্রুততায় পা চালাই। গ্রীষ্মের ভরা সূর্য মাথার উপরে। ঘণ্টা তিনেকের পথ পায়ে হেঁটে পৌঁছে যাই ভেদিয়ায়। খুঁজে বার করি কালীতলা আর নিতগোপালের বাড়ী। 'রাধারাণীদি এখানে থাকেন ?' রাস্তার পাশে বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা রোগা, ঢ্যাঙা, লুঙ্গি পরা ৫০/৫৫ বছরের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করি। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ আছেন। আপনারা আসছেন কোথ থেকে ?' 'আসছি অনেক দূর থেকেই। তবে আপাততঃ শান্তিনিকেতন হয়েই। আপনিই কি নিত্যগোপাল রায় ?' 'হ্যাঁ-আমিই। ভেতরে আসুন।' ভেতরে যাই। 'কি ব্যাপার বলুন তো ?' আমাদের উদ্দেশ্য, নাম, ঠিকানা জানাই। 'ও হো আচ্ছা, উনি পাশেই গুরুমার বাড়ীতে গেছেন। ডেকে পাঠাই। বসুন।' নিত্যবাবুর বাড়ীটি মাটির। সামনে প্রশস্ত উঠান। উঠানে সজনে গাছ দুটি-একটি। ভরা গ্রীষ্মের রোদ শুয়ে আছে পাতায় পাতায়। কোন কোলাহল নেই। গ্রীষ্মের তপ্ত বিকালে সারা পাড়া ঝিমিয়ে রয়েছে। নিঃঝুম চারিধার। কয়েকটি চড়ুই-এর কিচির মিচির কানে আসে। আপাততঃ রাধারাণীর ডেড়া এই নিত্যগোপালের বাড়ী। শান্তিনিকেতন থেকে চলে এসে এখানেই আছেন বহুদিন। কিন্তু এই নিত্যবাবুটি কে ? কেউ নন রাধারাণীর। নিত্যবাবুর বড় ছেলে কলাভবনে পড়তে গিয়ে পরিচয় সূত্রে অন্তরঙ্গতায় উঠে এসেছেন এখানে। ছেলের পড়ার ও অন্যান্য খরচ চলেছে তাঁরই টাকায়। এই নিয়ে নিত্যগোপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে অনেক। রাধারাণীর অনেক টাকাই নাকি হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নিত্যগোপাল। পঞ্চায়েতে খবর গেছে তাঁর বিরুদ্ধে। পঞ্চায়েত বলেছে, 'ব্যাঙ্কের বই আছে রাধারাণীর নামে, তিনি রাজী না হলে নিত্যবাবু কিভাবে ঐ টাকা নিতে পারেন।' জেনেছি রামকিঙ্করের ছবি বিক্রীর বড়ো একটা স্বত্ব, প্রায় একলক্ষ টাকা, যেটা পেয়েছিলেন রাধারাণী সে টাকা প্রায় শেষের মুখে। মাত্র অল্প কিছু টাকা পড়ে আছে। আর এই টাকার মালিক এখন নিত্যগোপাল। মাসের শেষে এখন তিনিই কিছু কিছু টাকা দেন তাঁকে। সেই টাকাতেই আপাততঃ চলছে তাঁর। এই প্রসঙ্গে আমার মর্মান্তিক একটি অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে রাখি আপনাদের। রাধারাণীর সাক্ষাৎকার নেবার মাস পাঁচেক পর বইটির প্রয়োজনেই একদিন তাঁর পূর্ব নির্দিষ্ট ঠিকানা ভেদিয়ায় যাই। গিয়ে শুনি তিনি এখানে নেই। বরাবরের মতোই এবারও শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলায় চলে গেছেন। এঁ'রা আমাকে জানান, তাঁরা খবর পেয়েছেন রাধারাণীর অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। সুতরাং ভেদিয়া ছেড়ে রওনা দিই শান্তিনিকেতনের দিকে। এবং সোজা গিয়ে উঠি ভুবনডাঙ্গায় তাঁর বাড়ীতে। বিখ্যাত মানুষ রামকিঙ্করের দীর্ঘদিনের সঙ্গিনী রাধারাণীর করুণ অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াই। এভাবে দেখব তাঁকে ভাবেনি কখনোই। দেখি, বাহ্যজ্ঞানহীন, অচৈতন্য রাধারাণী-দান করে

দেওয়া তাঁর নিজের দোতলা বাড়ীর বারান্দায় ছেঁড়া চট-কাঁথা-কানি-পায়খানা-পেচ্ছাপের আবর্জনায় শুয়ে আছেন নির্জন একাকী। ভগ্নস্তূপ নোংরা বিছানার ভেতর মুখ লুকিয়ে শুয়ে আছে নীরব সাক্ষী দুটি-একটি বাচ্চা-ছানা কুকুর। আমি ঈষৎ উত্তেজনাময় বিষাদজড়িত কণ্ঠে ডেকে উঠি। আধবোজা চোখ মেলে ইশারায় হাত নেড়ে কিছু বলার চেষ্টা করেন তিনি। বিশাল ক্লান্তির ভিতর চুপ হয়ে শুয়ে যান তারপর। চারদিক নিঃস্তব্ধ, নীরব। দোতলার উপর থেকে নারী কণ্ঠের মৃদু তিরস্কার ভেসে আসে দু-একবার। আমি ভাবলেশহীন চুপচাপ বসে থাকি তাঁর পাশে। কিছুক্ষণ পর আমাকে দেখে বাড়ীর দু-একজন স্ত্রীলোক নেমে আসেন নীচে। তারপর জড়ো হয় আরো দু-একটি পুরুষ। জিজ্ঞেস করি। জানতে পারি, গত পৌষ মেলা থেকে রাত্রে বাড়ী ফিরে সকাল থেকে তাঁরা দেখছেন এরকম। কিছুই খাচ্ছেন না। কথা বলতে পারছেন না। উঠে বসার ক্ষমতা নেই একটুও। সপ্তাহব্যাপী পথ্য-চিকিৎসাহীন রাধারাণী পড়ে আছেন এইভাবে। চিকিৎসা-পথ্যের সেরকম কোন টাকা পয়সা নেই হাতে। শান্তিনিকেতনের পরিচিতজনদের কাছে রাধারাণীর ধার দেওয়া টাকা চেয়েও পান নি তাঁরা। ভেদিয়ার নিত্যগোপালও পাঠাননি তেমন কিছু। আমি উপস্থিত থাকাকালীন রাধারাণীর নাতি, তাঁর ভিক্ষাছেলের ছেলে, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর দিকে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে জানালেন, আজকে যাঁর টাকা দেবার কথা ছিল পাওয়া গেল না একদম। এদিক ওদিক চেয়ে-চিন্তে ডাক্তার আনার ব্যবস্থা হল। আমি দাঁড়িয়ে রাধারাণীর পাশে, দু-চারজন পুরুষ-মহিলার মধ্যে। ভিড়ের মধ্যে রাধারাণীর বহুদিনের পরিচিতা একজন ভিক্ষুক বোষ্টমী। ডাক্তার এলেন। জানালেন, 'সম্ভবতঃ প্যারালাইসিস। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করালে সেরে যেত। চেষ্টা করে দেখি।' তখন দুপুর দেড়টা/দুটো। রাধারাণীকে বারান্দা থেকে তুলে উঠানে শুইয়ে দিলেন দু-তিনজন মানুষ।*

যাই হোক, পূর্বোক্ত ভেদিয়ায় রাধারাণীর কথায় ফিরে যাই এবার। কিছুক্ষণ পর পাশেই গুরুমার বাড়ী থেকে তাঁকে ডেকে আনেন নিত্যবাবুর ছোট ছেলে। আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যান তিনি। লক্ষ্য করি, পূর্বের দেখা শরীরের সেই শক্ত বাঁধুনী ঢিলেঢালা হয়েছে অনেক। ন্যুব্জ ঈষৎ। আস্তে আস্তে খসে গেছে রাজবেশ। কিছুটা মলিন আভা লেপ্টে আছে সারা শরীরে। পরনে পাতলা মলিন পোষাক। কিছুটা অপরিচ্ছন্ন, অবিন্যস্ত। কাপড় পাল্টে ঘরের ভিতর থেকে বাইরে আসেন। বসেন মুখোমুখি। পূর্ব পরিচয় দিই। চিনতে ভুল হয় না তাঁর। আমাদের আর্জি জানাই। অনেক অনুরোধে রাজী করা যায় তাঁকে।

বহুদিন পর আবার দেখলাম বিতর্কিত এই মহিলাটিকে, যিনি সারাজীবনের সঙ্গিনী ছিলেন রামকিঙ্করের। রামকিঙ্কর যদিও স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন

* খবর পাই ১৮-১১-৮৭ তারিখে মারা গেছেন রাধারাণী। সঃ

সাক্ষাৎকারের অন্তরঙ্গ একটি মুহূর্তে সম্পাদকের মুখোমুখি রাধারাণী

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা, শিল্পবোধহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, ঝি হিসাবে জীবন শুরু করা, সংস্কারাচ্ছন্ন, সাধারণ, অতি সাধারণ আর সাদাসিধে এক হিন্দু ব্রাত্য মেয়েকে, তবুও বরাবরের নিয়মভঙ্গা রামকিঙ্কর প্রথাসিদ্ধ কোন বিবাহের মোড়কে বেঁধে ফেলেননি নিজেকে। সাধারণভাবে যে বিবাহের কথা আমরা জানি সেদিক দিয়ে তিনি ছিলেন বরাবরের অবিবাহিত, অকৃতদার। অথচ থেকেছেন একসঙ্গে। দুজনের জীবন কেটেছে স্বামী-স্ত্রীর মতো। কেটেছে, রাধারাণীর কথায়, 'জড়ামড়িতে'। রামকিঙ্করের শিল্পের মতোই তাঁর বিবাহজনিত এই দিকটিও বরাবরের মতো রহস্যই থেকে গেছে সকলের কাছে। কিন্তু রাধারাণী রামকিঙ্করেব জীবনে এসেছিলেন কবে? কখন? কত সালে? এ ব্যাপারটিও সঠিকভাবে বলা যাবে না। রাধারাণীর কথায় পরিষ্কার না হলেও, শান্তিনিকেতনের পুরানো মানুষ-জনদের কাছে, রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের সহকারী বাগাল রায়ের সঙ্গে কথা বলে অনুমান করা যায় যে রাধারাণী এসেছিলেন পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকের কোন একটা সময়ে। তারপর থেকে বরাবরের মতো রামকিঙ্করের সাথে সাথেই কেটেছে তাঁর। রামকিঙ্করের এই সঙ্গিনী নির্বাচনও হয়েছিল অনেক ঝড়-ঝাপ্টার মধ্য দিয়ে। কারণ তৎকালীন শান্তিনিকেতনের ঝাড়া-পোঁছা আশ্রমিক পরিমণ্ডলে এই ধরণের ঘটনা শুধু নতুনই ছিল না, ছিল কল্পনার বাইরে সম্পূর্ণ অন্যধরনের। অনেক ঝড়-

ঝাপটা, চাপ আর বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে অবশেষে রামকিঙ্করের জীবনে এসেছিলেন তাঁরই স্বনির্বাচিত এই মহিলাটি।

সাক্ষাৎকারটি দুটি পর্যায়ে নেওয়া হয়। প্রথমটি ভেদিয়ায়। নিত্যগোপাল রায়ের বাড়ীর দাওয়ায় ১৭-৬-৮৬ তারিখে। কথা ধরে রাখার যন্ত্রটি মধ্যপথে অকস্মাৎ গণ্ডগোল করায় কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়া হয় ঐ দিন।

সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্যায়টি নেওয়া হয় ২৯-৭-৮৬ তারিখে সম্পাদকের বাড়ীতে। পানাগড়ে। ভেদিয়া থেকে বাঁকুড়ার যুগীপাড়ায় রামকিংকরের ভাইপো দিবাকরের বাড়ীতে যাওয়ার পথে যখন এখানে কাটান একদিন-একরাত। দিবাকরের প্রতিবেশী একটি তরুণ তাঁর সঙ্গী হিসাবে ছিলেন। রামকিংকরের করা একটি ভাস্কর্য, মা ও ছেলে, ছিল রাধারাণীর কাঁধের ঝোলায়। ভাস্কর্যটির কপালে ও সিঁথিতে ছিল সিঁদুর। রাধারাণী এটি প্রতিদিনই পুজো করে থাকেন বলে জেনেছিলাম তাঁর কাছে। সাক্ষাৎকারটি এইদিন বিভিন্ন সময়ে নেওয়া হয়। এই সাক্ষাৎকারে রাধারাণীর মুখের কথা হুবহু রাখা হয়েছে। আসুন রামকিংকর বিষয়ে রাধারাণীর কথা শোনা যাক এবার।

## প্রথম পর্যায়

**আপনার নাম তো রাধারাণী দাসী, এছাড়াও?**

রাধারাণী নাম ছাড়া আমার অন্য কিছু নাম নাই। আমি রাধারাণী নামেই সর্বকিছু।

**না, পারিবারিক পদবী তো কিছু একটা?**

হ্যাঁ, আমাদের পদবী গড়াই।

**বাবার নাম?**

চন্দ্র গড়াই।

**মায়ের নাম?**

দুর্গা দাসী।

**আপনারা ক-ভাই, বোন?**

আমরা তিনটি বুন। ভাই নাই।

**আপনি বড়ো?**

হ্যাঁ আমি বড়ো। মেজ বুনটি মরে গেইছে। আর ছোট কমলা।

**আপনার দেশ কোথায়?**

গুসকরা (বর্ধমান জেলা)।

গ্রাম ?

ঐখানেই বাপের ঘর।

না, কোন পাড়ায় ?

আমাদের সাহেব বাগান। সাহেব বাগান এখন নাই। এখন সব গাছপালা কেটে দিইছে। ইস্টিশানের কাছেই ঘর আমাদের।

গুসকরা স্টেশনের কাছেই ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। বোলপুরে আমার বাবা থাকতো। চাকরী করতে যেত শ্রীরামপুরে।

বাবা কিসের চাকরী করতেন ?

ছোট ছিলাম আমরা, কি যে করত অত খেয়াল নাই। চাকরী করে আসত, জিনিস আনত, কাপড় চোপড় আনত তাই জানতাম। আমরা কি করে খেয়াল রাখব।

আপনার এখন বয়স কতো ?

আমার এখন চার কুড়ি বয়স হবে। আমি এখন ঠিক জানি না। আনসাটে ( আন্দাজে ) বলছি। আমার আন্দাজে বলছি। দু / এক বছর কমও হবে।

আপনি কত সালে কিঙ্করদার কাছে আসেন ?

সেই সারাজীবন কেটে গেল।

না কত সালে আসেন। কখন প্রথম দেখেন। বাংলা অথবা ইংরাজী সনটা মনে আছে ?

যখন আমার বয়স কুড়ি বছর তখন শান্তিনিকেতনে গেইছি।

আপনার যখন কুড়ি বছর বয়স। আর কিঙ্করদার ওখানে ?

ওখানে কুড়ি বছর বয়সেই গেইছি।

অচ্ছা, আপনি কত সালে শান্তিনিকেতনে আসেন বা যান মনে নাই তো ?

না, অতটা মনে…

আচ্ছা, তখন কি উনি বেঁচে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ?

হ্যাঁ, উনি বেঁচে ছিলেন।

পুরোনো লোক বলতে আর কাকে আপনি দেখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কি বেঁচে ছিলেন ?

রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি আমি।

না, যখন কিঙ্করদার কাছে আপনি আসেন তখন উনি কি বেঁচে ?

তখন নয়। ওখানকে ( শান্তিনিকেতন ) এসেছি আগে। তখন আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছি।

তার মানে রবীন্দ্রনাথ মারা যাবার পর আপনি এসেছেন ?

হ্যাঁ।

বিয়ে কোথায় হয়েছিল আপনার ?

কার বিয়ে হইছিল ?

তোমার কথা বলছে গো।*

বোলপুরেই হইছিল। বোলপুরেই তো বিয়ে হইছিল।

তা গ্রাম তো একটা আছে বাবু।*

না, বোলপুরেই আমার বিয়ে হইছিল। গ্রাম আবার কি ?

ঐ স্বামীর নাম ?

স্বামীর নাম তো বলতে নাই।

না বললে আমরা জানবো কি করে। বলুন আমরা জানি। কি নাম ছিল ?

চণ্ডী গড়াই।

এখনো কি বেঁচে আছেন ?

না, সে বেঁচে নাই। ছেলে হইছিল একটা। ছেলেটাও মরে গেল।

স্বামী কি করতেন ?

দোকান ছিল। মুদিখানা। জমি জায়গা ছিল কিছু। আমার শ্বশুর চাষবাস নিয়ে থাকতেন।

স্বামীও চাষবাস করতেন ?

হ্যাঁ।

তারপর কি হল ?

তারপরে কি আর হবে আমার। গুণ্ডগুল একটা বেঁধে গেল। খুব বড়ো একটা গুণ্ডগোল বেঁধে গেল। দিয়ে শ্বশুর ঘরের গুণ্ডগোলটা যেইরকম বেঁধে গেল, সেই গাঁয়ের গুমোস্তা, সেই বাবাকে বললেক, 'তোমার মেয়েকে নিয়ে যাও, তানালে বিপদ হতে পারে। বিপদ হবে তখন আমাদের দোষ দেবে।' বাবা আনে নাই। ঠাকুমা যেয়ে নিয়ে এলো আমাকে। বাবা আমাকে বললে 'আমাদের কথা শোন। আমরা যা বলবো তাই করবি। তুর ভবিষ্যৎ ভালো হবে।' মেয়েছেলে তো, আমার মনটা কেমন হয়ে গেল। চলে এলাম। বাবা রাগ করলে। বললে, 'আমার কথা শুনলে না। আমার মুখে জুতো মেরে দিলে।' দিয়ে চলে এলাম। ঐ ঘটনা নিয়ে ঐখানে যাই। নইলে আবার কি করতে যাবো।

ঐ ঘটনা নিয়ে কোথায় যান ?

শান্তিনিকেতনে ঐ ঘটনা নিয়েই তো যাই। বাবা যখন বললে, 'তু আমার কথা শুনলি না। চলে গেলি। তা আর নুবু না। আর ভার নুবু না তুর। তুই বিয়ে করগা।' এই কথা বললে। তাতেই তো শান্তিনিকেতনে যাই।

তারপরে কিঙ্করদার ওখানে চলে গেলেন ?

হ্যাঁ। রাগ করে আমি বললাম, 'কাজ করে খাবো। কাজ করে খাবো।' উনির সেবা করতাম। তা পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিত পেথম প্রেথম। আমি বলতাম যে…

* এই চিহ্নিত প্রশ্ন ২টি করেন নিত্যগোপাল রায়ের স্ত্রী।

কিঙ্করদা তখন কোন ঘরটায় ছিলেন। কোনখানটায় প্রথমে?

তখন ঐ কলাভবনের কাছে ঐ যে কোয়ার্টারটা রইছে।

ঐ সুইমিং পুলটার কাছে?

হ্যাঁ।

জায়গার নাম কি? কি পল্লী যেনো?

দরোয়ানরা থাকে না, আর ঐ একটা ঘর, ছুটো ঘর একটা।

হ্যাঁ, সঙ্গীতভবনের দিকে সোজা একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে, গিয়ে সুইমিং পুলের কাছে যে রাস্তাটা, সেইখানটাতে আগে কিঙ্করদার বাড়ী, কোয়াটার্সটা ছিল[১]। তো উনি ওখান থেকে উঠে গেলেন। কেন উঠে গেলেন কিঙ্করদা?

উঠে গেল। কেন যে উঠে গেল, বললো 'ভালো ঘর আমরা দুবো।' নিয়ে প্রলোভনে পড়ল। ঐ যে কলকাতার সেই···। নামটা কি? নামটা যে মনে পড়ছে না। ঐ নিয়ে গেল। বললে, 'ঘর আছে খুব ভালো। মাটির ঘরটা বাগিয়ে নিতে পারলে আমরা···।'

কে শঙ্খ চৌধুরী?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আর ঐ রতনপল্লীর ওনার সেই খড়ের বাড়ীটা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ মাটির ঘরটা। ঐটায় নিয়ে গেল। বললে, 'ফলের গাছ আছে নানারকম। ফাঁকা।' ফাঁকাতেই থাকতে ভালোবাসতো তো। তখন তো ওখানে কারো বসতি ছিল নাই। খালি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার বাবু[২] আর ঐ হৃষিকেশ বাবু।

হৃষিকেশ চন্দ?

হ্যাঁ। ওরাই ছিল।

কিঙ্করদা যখন সুইমিং পুলের ওখানটায় (শ্রীপল্লী), ওখানেই আপনি প্রথম আসেন?

ঐখানেই।

আপনি যে কিঙ্করদার ওখানে গেলেন, কি করে আলাপ হলো, না কেউ নিয়ে গিয়েছিলো?

অন্নদাবাবু[৩], ঐ সাঁকোর কাছে[৪], উনি আমাকে মীরা দেবীর কাছে প্রথমে নিয়ে যান। প্রতিমাদি[৫] আর মীরাদি সব একই তো। ঐ ধারটা পেরিয়ে উত্তরায়ণ, ঐ ধারটা পেরিয়ে মালঞ্চী (মালঞ্চ)।

রবীন্দ্রনাথের মেয়ে মীরা দেবী?

হ্যাঁ। মীরাদির কাছেই প্রথম গেলাম। তখন বৌ-ঠাকরুণ (প্রতিমা দেবী) বললেন, 'তুমি ওকে কোথা পেলে? আমাকে দাও।' মীরা দেবী বললেন, 'এখন

১. জায়গার নাম শ্রীপল্লী ২. অমল বসু ৩. অন্নদাকুমার মজুমদার
৪. নীচু বাংলা ৫. প্রতিমা দেবী

তোমাকে দিতে পারবো না। আমার কাছেই এখন থাকবে। পরে যেথা যাবে নিয়ে যাবে।' মীরা দেবীর ঘরে থাকতে থাকতে কিঙ্করবাবু ও'দের ঘরে আসতো। দেখলে মানুষটি কোথা থেকে এলো। পরিচয় করলে। নিয়ে আলাপ। বললে, 'খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হয়, আমাকে লোকটি দিতে পারো?' তখন বাগাল[৬] ছিল। বাগাল রান্না করতো।

**কিঙ্করদার রান্না তখন বাগালদাই করতেন?**

হ্যাঁ। নিয়ে তারপরে বললে যে, 'মূর্তিটা নুবো। আমাকে দিতে হবে।' দু-চারদিন করে আমাকে নিয়ে যেত মূর্তিটা নেবার জন্যে। তারপরে…

**মূর্তি মানে এই আপনার মডেল?**

হ্যাঁ, মডেলটা।

**কিঙ্করদা আপনার ছবি আঁকতেন, না মূর্তি করতেন?**

ছবি করত। মূর্তি করত। সব। দু-রকমই।

**আপনার ছবি, মূর্তি আছে কি?**

ওঁরা সব চুরি করে নিলে যে।

**কে কে নিলো?**

ওঁরা সব বাগালে। কুন আপিসে সব ছবি আছে রবি[৭] তো সব জানতো। আর আমি এ্যাতো জানি ছবিগুলো রাখলে কাজ হবে? তাহলে ছবি দেতাম না।

**আপনার কাছে কোন ছবি নাই এখন?**

আছে। দুটো-একটা আছে। তা বলি, এমন জানলে পরে আমি দেতাম নাই। এসব কাজ হবে এগুলো নিলে, এসব বুঝি নাই।

**আর কে নিল? আর কে নিয়েছে ছবি?**

আর ঐ বাবুর সঙ্গে ছিল। ঐ দেখ বাড়ী করেছে ঐখানে। মাঠের ধারে। বিরাট বাড়ী। দালান বাড়ী। বিরাট করেছে। রেতে আসত। ওঁর সঙ্গে কথা কইত। ওঁর

ন্যুড স্টাডি—১ (১৯৫১)
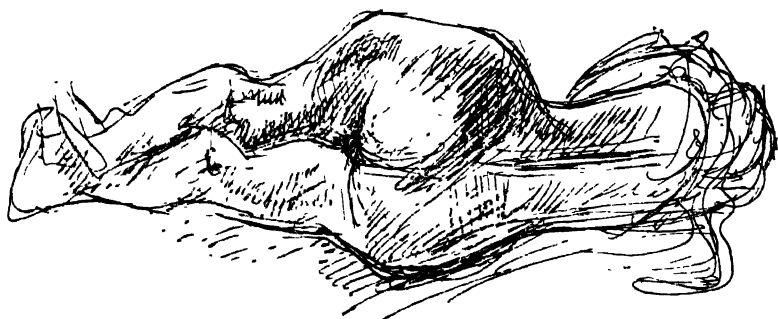
সঙ্গে থাকতো। কাজ করতো। নিয়ে দিল্লী যখন গেল তখন 'যখ-যখিনী' (যক্ষ-যক্ষী) করতো। ওই যো, নামটি ভুলে যেছি গো। নামটি ভুলে যেছি।

আচ্ছা। যেই হোক। ছবি-টবি উনিও নিয়ে গেলেন ?

হ্যাঁ, সেও ছবিটবি সব ওখানে নিয়ে যায়। আর বাবু যেই 'যখ-যখিনী' করতে গেল তখন আমার ঘরটা পুড়ে যায়। তখন আমি পাড়া-গাঁয়ে ধান বেড়ুতে (দেখাশোনা) গেইছিলাম। ধান বেড়ুতে গেলে পরে মাঘের পনের তারিখে, পূর্ণিমের দিন, সেইদিনে ঘরটাকে...। নিয়ে বাবু আমাকে সেই বাড়ীটা করে দিইছিল।

আপনাকে কোথায় বাড়ীটা করে দিয়েছিলেন ?

ভুবনডাঙ্গায়।

কিঙ্করদা করে দিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ, কিনে দিয়েছিলেন। তখন বাড়ী বিক্রী ছিল। ঐ বাড়ীটা যখন পুড়ে যায় তখন আমি চিঠি লিখি যে আমার এইরকম ঘর পুড়ে গেইছে। তা এইরকম আসবেন। তখন টাকা পাঠাই দিইছিল। দিয়ে তারপরে আসেন। পরে আমাকে আবার দালান করে দিলে।

কাকে চিঠি লিখেছিলেন ?

বাবুকে (রামকিঙ্কর)।

কিঙ্করদা ভুবনডাঙ্গার কোন বাড়ীটা করে দিয়েছিলেন ? দোতলা যে বাড়ীটা আছে সেটা, না পাশের একতলাটা ?

এটা তো (একতলাটা) আমি করে নিইছিলাম। টাকা দিইছিল। পাশের বাড়ী আর দোতলা দুটোই করে দিইছিল। বাড়ীগুলো করে দিলে যে, মাটির ঘর পুড়ে গেল, তাইলে আর মাটির ঘর রাখতে হবে না। খড়ের চাল, পুড়ে যাবে, না আর কি হবে, কখন কি হবে, না নিজে মরে থাকবে।

তখন কিঙ্করদা মাটির ঘরে উঠে গেছেন ?

মাটির ঘরে তখন আসে নাই।

রতনপল্লীর শম্ভু চৌধুরীর বাড়ীতে তখন আপনারা যান নি। ঐ শ্রীপল্লীর বাড়ীতে, সুইমিং পুলের কাছেই ছিলেন ?

হ্যাঁ, তখনও ছিলাম। ঐ ঘরে থেকেই দালান হলো। তারপরে যাই যখন (রতনপল্লীতে) তখন ঘরটা দু-তলাট হয়ে গেইছে। পাশের বাড়ীটা হয় নাই। বিচলে একজনা। তা ঘরটা আমরা কিনে নিই। ওটা আবার কি করতে, পাশের বাড়ী, কারা আসবে, মুছলমান যদি আসে তাহলে তো ক্ষতি। বাড়ীটা নতুন করে আবার কেনা হল। তারপরে আবার শ্যামলের বিয়ে দিইছিলাম।

৬. বাগাল রায়
৭. রবি পাল। নন্দন মুজিয়ামের (কলাভবন) বর্তমান কিউরেটর

শ্যামল কে ?

আমার ভিক্ষে বেটার বেটা। তা বাবুতো ( রামকিঙ্কর ) এসে ঐখানে বসে থেকে বিয়ে দিলেন। অনেক লোক এলো। শ্যামলের বিয়ে হলো। তারপরে ওকে পড়ালাম। ঐসব করলাম। ভিক্ষে ছেলে মরে গেল তো।

মরে গেছে ?

ভিক্ষে ছেলে মরে গেইছে। নিয়ে ঐ ঘরেই এখন আমাকে নাতি বলে, 'যাবে না, তুমি কোথাও যাবে না।' আমি এক জায়গায় থাকতে পারলাম না। আমার তো ঘর রইছে। আমি এক জায়গায়··· আমার মাথাটো কিরকম হয়ে গেল। বাবু মরে গেলে আমি এক জায়গায় থাকতে পারলাম না। তাতেই তো আমি বলি, এখানে (ভেদিয়ায়) কি করতে মরতে আসবো। এইরকম সমুস্যা। আমার তো একজায়গায় থাকলে পরে মনটা চঞ্চলা হতো। আর কোথায় যাবো, কি করবো, এইরকম করতাম। মনের বেশ ঠিক থাকতো না।

তার মানে ঐভাবে কিঙ্করদার সাথে আপনার যোগাযোগ। ঐ প্রথমে মীরা দেবীর বাড়ীতে আপনি কাজ করতেন, কিঙ্করদার যাতায়াত ছিল······

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

তারপরে কিঙ্করদা আপনাকে নিয়ে গিয়ে ঐ ছবিটবি আঁকা আরম্ভ করেন।

হ্যাঁ, ছবির ব্যাপারে নিয়ে গেল আমাকে।

কিন্তু ছবি, মূর্তি আপনার একটাও নেই কিঙ্করদা আঁকার মানে এমন কোন ছবি, মূর্তি আমি দেখতে পাই নি, যে ছবি, মূর্তি নিয়ে কিঙ্করদা বলেছিলেন যে ওটা, এটা রাধারাণীর ছবি বা মূর্তি। এমন ছবি বা মূর্তি তো আমরা পাই নি। অথচ আপনি তাঁর সাথে ছিলেন দীর্ঘদিন। আর আমি থাকাকালীন আমিও আপনার ছবি এঁকেছি। কিন্তু কিঙ্করদাকে কোনদিন আঁকতে দেখিনি।*

সেগুলো রাত্রে আঁকতো তো, তা কি করে দেখতে পাবে তুমি ?

সেগুলো মাটির বাড়ীতে এসেও কি আঁকতেন ?

না, মাটির বাড়ীতে নয়, ঐ পাকা বাড়ীতে, মীরা দেবীর ছাঁমুতেই (সামনেই) যে বাড়ীটো। আর আমার তো এখানে ছবি আছে। ঘরে আছে। দেখাবো।

আপনাকে দেখে নিয়ে কিঙ্করদা এঁকেছেন এইরকম ছবি আর আছে ?

না, আপিসে আছে, কলাভবন আপিসে আছে। রবিকে বলো তা'লেই দেখাবে।

আর মূর্তি কি করেছিলেন ?

মূর্তি করেছিলো, ছবি করেছিলো, সবই !

কিরকম, মাথা থেকে পা পর্যন্ত, কি খালি মাথাটুকু ?

শুধু গোটা অঙ্গটা করেছে, আবার আধখানাও করেছিল।

* এই চিহ্নিত প্রশ্নটি করেন সঙ্গী কৃণাল সাহা।

**শিল্পীরা তো অনেকরকম স্টাডি করেন ?**

সবরকমই। এরকম বসিয়ে এঁকে ছিলো, দাঁড়িয়ে এঁকেছিলো। ছবিগুলোতেই তো ওঁর সঙ্গে আলাপ। তা নইলে আলাপ হবে কেনে।

**আচ্ছা, সাঁওতালদের ছবি আঁকতেন কিঙ্করদা ?**

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

**ওটা কি সাঁওতালদের গ্রামে গিয়ে আঁকতেন, কি আপনার কাছে, ওখানে, সাঁওতালদের নিয়ে আসতেন ?**

গ্রামে যেত, আবার আসতো, মেঝেনদের মেয়েগুলোকে ডেকে আনতো বাড়ীতে।

**সাঁওতাল মেয়ে কি ছেলে আসতো ?**

ছোট মেয়ে, এতটুকু ছেলে আসতো, তারপরে মেঝেনগুলো আসতো।

**. মেঝেনগুলো কখন আসতো ?**

আসতো ঐ কাজের অবসরে।

**ওদের মডেল স্টাডি করতেন ?**

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

**আপনাকে যেমনভাবে স্টাডি করতেন তেমনভাবে ?**

স্টুডিওতে করতো তো। ঘরে করতো না। স্টুডিওতে করতেন। আর ছেলে নেংটো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।

**আপনার ছবি তো ঘরে এঁকেছেন, স্টুডিওতেও কি এঁকেছেলেন ?**

স্টুডিওতেও এঁকেছিল। ঘরেই এঁকেছিল বেশী।

**ঘরেই তো বেশী এঁকেছেন। কিন্তু কখন আঁকতেন সেগুলো ?**

দিনে আঁকা হতো না, রেতেই আঁকতো

ন্যুড স্টাডি—২ ( ১৯৫১ )

রাতে মানে কখন সেগুলো অঁাকতেন ?

এই সাতটা, আটটার সময়।

ওনার তো কাজের কোন ঠিক ছিল না, কাজের নেশাতেই মেতে থাকতেন সবসময়, তা আপনার মডেল স্টাডি দিনে, রাতে যেকোন সময়েই করেছেন তো ?

না, দিনে সময় পেতেন না। স্টুডিওতে থাকতেন তো তাই রাত্রে করতেন। যাও এবার জলটল খাও তোমরা।

না, জলটল খেয়ে এসেছি। একটু পরেই শেষ ট্রেন আব আকাশে মেঘ, চলে যাবো।

না, চা-টা খাও খাও।

না, আপনাকে জিজ্ঞাসা করে নিই তারপর। তা, আপনার কতো ছবি বা মূর্তি করেছিলেন মনে আছে কিছু ?

অনেক করেছিলেন। কত তা কি আর মনে আছে।

নাম মনে আছে ? কোন মূর্তি'র নাম ?

ওখানকার 'যখীণি'টা ( যক্ষী ), ঐ দিল্লীতে 'যখ-যখীণি'টা করেছিল, ওটা আমারই মূর্তিটা নিয়ে যেয়ে।

উনি তো আগে মাটির ছোট ছোট মডেল করে নিতেন, ঐ রকম কিছু করেছিলেন কি আপনাকে দেখে ?

হ্যাঁ, করে নিয়েছিলেন।

কতগুলো করেছিলেন ?

কতগুলো করেছিলেন অত কি মনে আছে। লক্ষ্য রাখতে পারি নাই।

ওগুলো কখন কবেছিলেন ?

দিনেও করেছেন। বিকেলেও করেছেন। মনে যখন হচ্ছে তখনই করেছেন। যখন তখন করতেন।

ওগুলো কিভাবে করতেন। স্টাডিতো অনেকভাবে করা হয়, তা কিভাবে স্টাডি করেছিলেন ?

ঐ কাপড় পরাও করেছে, খুলেও করেছে।

আচ্ছা 'যক্ষী'টা তো আপনার মডেল স্টাডি, এছাড়াও আর কি কি ?

ওটাতেই তো বেশী টাকা পেইছিল। নিয়ে আমাকে বলেছিল, 'আমাদের ঘর থেকে কখনও যাবে না, তোমারি টাকা অনেকগুলো পেলাম। তোমার যত দরকার হয় নাও।' বাড়ী-টাড়ী করেছিলাম ও-ত সব টাকা দিইছিল। 'যখ-যখীণি'টা করতে অনেক টাকা পেইছিল।

কিঙ্করদা আপনাকে কত টাকা দিয়েছিলেন ?

বহু টাকা দিইছিল। আমাকে যে কত টাকা দিয়েছিলেন হিসেব কিছু নাই।

সমস্ত টাকা পয়সা কি আপনাকে দিয়ে দিতেন ?

হঁ্যা, আমার হাতেই দিত। তা টাকার কোনদিন খোঁজও রাখে নাই। এখানের,

সেখানের চ্যেক আইছে, আর করেছে, তা জমা দিতে দু-জনাতেই রিক্সা করে যেতাম। রবি সই করত, ই-করত, ই-সব করত। আর বাবু যেত আর আমি যেতাম। উ-ত ( রবি ) সব কথাটা জানে। রবি কেনে আসে না, এলো না কেনে, ব্যাপারটা কি ?

ঠিক আছে আমি বলব রবিদাকে।

বলবে, আমি উখানে না থাকলে টাকা আদায় হবে না। যা ব্যাপার।

আচ্ছা, আপনি যে ওখানে, কিঙ্করদার কাছে থেকে গেলেন, এ নিয়ে শান্তিনিকেতনে কোন কথা চালাচালি হয় নি ? লোকে কিঙ্করদাকে কিছু বলেনি ? আপনাকে কিছু বলেনি ?

হ্যাঁ, বলেছিলো। পেথম পেথম বলেছিলো। আমার এ-সব ইয়ে ( মডেল ) করতো তাতেই। বাবু বলেছিলেন যে, 'আমার সুবিধা-অসুবিধার জন্য করছি। এটা আমি সেবাদাসীর মতো রেখেছি। তা তোমাদের কি আপত্তি আছে ?' ওঁকেও বলেছিলো, আমাকেও বলেছিলো। তা ঐ 'জড়ামড়িতে' ( কোনরকমে একসাথে ) আমাদের থাকতে হতো। না থাকলে উপায় নাই। ভগমানের ন্যেখা।

আপনি যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন তখন তো ওখানকার পরিবেশ একরকম ছিল। এখনকার পরিবেশ আর একরকম। গোঁড়া আশ্রমিক যাঁরা, যাঁরা ঐ ভক্ত-টক্ত মানুষ তখন এই সংখ্যাটাই ওখানে ছিল বেশী। অর্থাৎ প্রথমে আপনি আর রামকিঙ্কর যখন ছিলেন তখন সম্পূর্ণ অন্যরকম পরিবেশ। আপনি যে একজন শিল্পীর কাছে থাকলেন বা থেকে গেলেন, শান্তিনিকেতনের অন্য কোন শিল্পীর কাছে এইভাবে আপনার মতো আর কাউকে আমরা থেকে যেতে দেখিনি। তা এই নিয়ে কিঙ্করদার উপর কোন চাপ আসেনি ?

আইছিল। চাপ আইছিল।

কারণ কিঙ্করদা তো বিয়ে-থা করেন নি, কোন মেয়ে নেই, কেউ নেই, একা। আর একটা বয়স্কা মেয়ে যাচ্ছে, আসছে, থেকে যাচ্ছে......

আপিসে একবার খুব চাপ হইছিল।

চাপটা কি জন্যে এসেছিল ?

যে, মেয়েটা রাখলে কেনে ? সেইজন্যে। বাবু বললেন, 'আমার সুবিধা-অসুবিধা, ভাত জল করবার জন্যও বটে। আর বেটাছেলে সব-সময় থাকে না।' বাগাল তো ছিল। বাগাল থাকলে কি, সবটা দেখতো না তো। চলে যেতো বাড়ী। রেঁধে দিয়ে চলে যেতো। তারপর ঝি-গিরি, খাবার-টাবার খাওয়া আর করা নানারকম বিষয়ে বললেন। আপিসে একবার ঝগড়া হলো আমার সম্বন্ধ নিয়ে। আমার বিষয় নিয়ে আপিসে একদিন মারামারি লাঠালাঠির মতো হইছিল। সেই হওয়াতেই একেবারে সেই যে বন্ধ হয়ে গেল তারপরে আর কেউ কিছু বলতো না।

ধরুন, বিদেশে অনেক বড়ো বড়ো শিল্পী আছেন, তাঁরা বিয়ে করেন নি অথচ একসঙ্গে থেকেছেন। আপনি তো কিঙ্করদার সঙ্গে দীর্ঘদিন ছিলেন, তা আপনাদের মধ্যে

**বিয়ের কোন কথাবার্তা হয়নি কোনদিন ?**

বলেছিলেন, তা আমার বেটা ছিল বলে…

**কার বেটা ?**

আমার ভিক্ষে বেটা। বেটার জন্য করি নাই। সেইজন্যে। তা আমি এখন বুঝছি যে সেটা করাই উচিত ছিল। আমি রাজী হই নাই। এখন ভবিষ্যৎ ভেবে আমি দেখলাম এটা রাজী হলেই ভালো হোত। বেটা তো মরে গেল। সবাই তো ওদের ঘরে রইছে। সবাই জানলো। এবং গোটা শান্তিনিকেতনের সব জানলে।

## দ্বিতীয় পর্যায়

**আচ্ছা, আগে ঐ ভেদিয়ায় যখন আপনার টেপটা করেছিলাম তখন আপনি ঐদিন আমাকে বলেছিলেন যে, 'একটা বড়ো গণ্ডোগোল হয়ে গেল তখন আমি স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এলাম।' গণ্ডগোলের পর তো আপনি শান্তিনিকেতনে চলে আসেন ? ঐ গণ্ডগোলটা কি, কি জন্য হোল ?**

আমার স্বামী একটা মেয়ে রেখেছিল। মেয়েটার স্বামীর সঙ্গে আমার স্বামীর বন্ধুত্ব ছিল। গঙ্গাজল পাতাইছিল। আমার স্বামীর দোকান ছিল। মুদিখানা। মেয়েটা দোকান করতে আসত আমাদের দোকানে। দোকান করতে এসে এইরকম ভাব হয়ে যায়। পরে প্রকাশ্য হোল । সেইটা জানতে পেরে বললাম, 'আমি তো তোমার সঙ্গে থাকবো না, মেটেদের মেয়ে রেখেছো।' তারপরে মেয়েটার স্বামী রেগে বললে, 'তোমাদের মেয়েকে আমরা নিয়ে যাব।' তখন আমি বললাম, 'তা আমি যাব কেনে। তার ভাব হইছে মনের ভিতরে, তা উ করেছে বলে কি আমি করব।' নিয়ে আমি বাপের ঘর চলে আসি। ঐ গুণ্ডগুল হইছিল। স্বামীর সঙ্গে ঐ গুণ্ডগুলেই তো আসা। আমি আসতাম না। ঐজন্যই চলে আসি।

**আমরা অনেক বড়োবড়ো শিল্পী দেখেছি তাঁদের অনেক গোঁড়ামি ছিল। যেমন নিজেই নিজের চুল-দাড়ি কাটা বা না কাটা ইত্যাদি ইত্যাদি—এইরকম কোন গোঁড়ামি দেখেছিলেন কি কিঙ্করদার ?**

চুল দাড়ি উনিও তো কাটতেন না। বকেবকে বলেবলে এইটা আরম্ভ করেছিলাম। নাপিত যখন আসত তখন যান যান করতাম, তা যেতেন না। ঘরকে নাপিত আসত, কামানো করাতাম। নখটখ কাটতেন না, ঠিক যেন পাখের (পাখীর) মত নখ, পাখের যেমন নখ থাকে সেইরকম। ঘসে ঘসে ঠিক করে দিতেন।

**ঠাকুর-দেবতার প্রতি কোন মনযোগ লক্ষ্য করেছিলেন কি ?**

না, ঠাকুর দেবতায় ভক্তিটা কম ছিল। ছবিটা, মূর্তিটা নিয়েই থাকতেন বলে

ঠাকুরই ভাবতেন ঐগুলো। ঐগুলোই ভাবতেন ঠাকুর। বলতেন, 'ঠাকুর তো রইছে আমার কাছে।' বলতাম, 'ঠাকুর কি করে রইছে?' বলতেন, 'ঐ যে মূর্তিটা, তার পিঠে যদি মন না থাকে তাহলে মূর্তিটা কি করে করতে পারি? আর আমার তো গুরু আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো আমার গুরু। আমার ঠাকুর রইছে। আমার গুরু রইছে। ঐ তো ঠাকুর।' যখন মূর্তি করতেন, ছবি আঁকতেন তখন একমনে, একধ্যানে। কারও পানে তাকাতেন না। কাজ করেই যেতেন, কাজ করেই যেতেন।

**কিঙ্করদাতো কলাভবনে কাজ করতেন, বাড়ীতেও এসে কি কাজ করতেন?**

বাড়ীতেও রেতে করত।

**রাতে কখন করতেন?**

আট-টা ন-টার সময় আসতেন। চানটান করে খেয়ে খানিক বিশ্রাম করে।

**কত রাত পর্যন্ত করতেন, কোন কোনদিন কি সারারাত করেছেন?**

কাজ অনেক রাত পর্যন্ত করেছেন। সারারাত করেন নাই। আমার ছবিগুলো আঁকতো রেতে।

**জাগতেন কখন? কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল কি?**

ভোরেই জাগতেন। একদিন দু'দিন বেলা হত। একদিন দু'দিন খুব ভোরেই জাগতেন।

**ভোরে উঠে কি আঁকাআঁকির কাজ করতেন?**

না, চা খেতেন। নিজেই চা করতেন। আমাকে বলতেন আমি উঠতাম না। চা করে আমার জন্য রাখতেন, নিজে খেতেন। চা খেয়ে খানিক বিশ্রাম করে কাজ করতেন।

**ছবি আঁকার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল কি?**

যখনই মনে আসত তখনই আঁকতেন।

**আচ্ছা কিঙ্করদা যখন আপনার ছবি আঁকতেন, তখন কিরকম দেখতেন?**

রেতে যে ছবিগুলো আঁকতেন আমার, বিরক্ত হতাম খুব। সেইগুলোতে সব বলতেন, 'এমনি করে কাত হও, এমনি করে বসো, এমনি করে হও।' এই করে করে রাত প্রায় দশ-বারোটা হয়ে যেত। দৈনিক এক-একবারে চারটা/পাঁচটা/ছটা/সাতটা করতেন। বলতাম, 'দিনে ছবি করবেন। রেতে ছবি করা কি ভালো লাগে।' বলতেন, 'তুমি ঘুমোও কেনে, তুমি ঘুমোও কেনে।' বলতাম, 'ঘুরতে বলছেন কেনে, পাশ ফিরতে বলছেন কেনে, উঠতে বলছেন কেনে, আমি কি করে ঘুমোবো।' বলতেন, 'না আর করবো না। আর করবো না। যা করলাম। আবার কাল করবো।' কাল করবো বলে আবার সেই আঁকতে আরম্ভ করতেন। বিরক্ত হতাম এইজন্য যে, রাতদিন মানুষকে এ্যাতো জ্বালাতে নাই। রাতদিন শুধু ছবি ছবি ছবি।

ন্যুড স্টাডি—৩ (১৯৫১)

ওগুলো কিসে আঁকতেন, ঐ ক্যানভাসে, যেটা তেল রঙে আঁকা হয়?

ক্যানভাসেও আঁকতেন আবার সাদা কাগজেও। হ্যাঁ, যখন মরে গেল তখন ক্যানভাসে কতক-গুলো ছবি ছিল, তা ওরা সব ছিঁড়ে খুঁড়ে কোথায় নিয়ে গেল কে জানে! আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাওয়াতে ঠিক করতে পারলাম না।

যেমন ধরুন একজন গান করছেন, করতে পারছেন না, বিরক্ত হচ্ছেন যে পারছি না, হচ্ছে না। কেউ ছবি আঁকছেন, পারছেন না, মূর্তি গড়ছেন পারছেন না, হচ্ছে না মনের মতো, মূর্তি গড়ছেন ভেঙে ফেলছেন বারবার, একটা যন্ত্রণার মধ্যে থাকছেন তিনি। এরকম কিছু কি দেখেছিলেন কিঙ্করদার?

তা দেখবো নাই কেনে। দেখেছি। ভাঙা গড়া, ভাঙা গড়া এই কাজ ছিল। কোন বেজার ছিল না। অন্য লোকে বেজার হতো। বলত—'কি ক্ষতি হলো ভাঙলেন?' বাড়ীতেও করতেন। একদিন দু'দিন স্টুডিওতে ডাকতেন আমাকে। স্টুডিওতে নিয়ে যেতেন। রেতেই নিয়ে যেতেন। রেতেই যেতাম। ঘুম পেত খুব। ঘর আসবার জন্য ছটফট করতাম। রাত নটা, দশটা পর্যন্ত স্টুডিওতে থাকতেন।

আপনি তো দীর্ঘদিন কিঙ্করদার সেবাযত্ন করেছেন, মডেল হিসাবেও কাজ করেছেন—তা ছবি আঁকা নিয়ে, মূর্তি গড়া নিয়ে তিনি কোন কিছু বলতেন কি আপনাকে? এই যেমন, এইরকম একটা মূর্তি গড়ছি, এইরকম একটা ছবি আঁকবো সেটা এইরকম হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোন গল্প করতেন না। শুধোতাম। তা হঠাৎ যদি খেয়াল হোত তো বলতেন। হয়তো বললেন, 'এই ছবিটা কি ছবি বলো তো, এই মূর্তিটা কি বলো তো?'—নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তা আমি কতকটা ধরতাম। শিখে, বলেছেন, বলতে কতকটা ধরতাম। বলতেন, 'ঠিক হইছে?' আমি বলতাম, 'ঠিক হইছে কিনা আমি কি করে জানবো। এ-তো আপনার হাতের গড়া। আমি কি করে জানবো।' তারপর

দিনেই দেখছি সেইটা ভেঙে দিইছে। তারপর দিনেই। বললে বলতেন, 'আবার করবো। হয় নাই। আবার করব। হয় নাই।' তাই বলতেন।

কিঙ্করদার এমন কোন জিনিস ছিল কি, যে জিনিসটা পছন্দ করতেন না?

সিনেমা টিনেমা দেখতেন না। সিনেমা পছন্দ করতেন না। যদি বলতাম, 'আমি যাচ্ছি, যাবেন তো চলুন?' বলতেন, 'হ্যাঁ, সিনেমা দেখবে, আমার ঘরেই সিনেমা হচ্ছে।' ছবি, মূর্তি নিয়েই থাকতেন তো তাই ওগুলোকেই সিনেমা ভাবতেন।

কি খেতে ভালোবাসতেন?

ছানা, কাঁঠাল, আম, ছানার মিষ্টি, ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ এইসব।

কি রকম জায়গায় থাকতে পছন্দ করতেন?

নির্জন জায়গা ভালোবাসতেন। কোলাহল ভালোবাসতেন না। নির্জন জায়গায় বসে থাকব, একা একা থাকব, ভাবব, কোন কাজ করব।

খাওয়া দাওয়া কি নিয়ম মেনে করতেন?

না, নিয়ম ছিল না।

আচ্ছা, মদ তো অনেকে অনেককিছুর জন্য খায়, কেউ দুঃখ ভোলার জনা, কেউ নিছক মজা করবার জন্য—এইরকম নানাকারণে, তা কিঙ্করদা কেন মদটা খেতেন? আপনি কিছু জানেন কি?

মদটা খেতেন মূর্তিটা ঠিক মতো আনবার জন্যে।

মদ যে খেতেন, তা আপনি কিছু বলতেন না যে এটা খাওয়া ভালো নয় এইরকম কিছু?

বারণ করতাম, তা শুনতেন না। কত ইয়ে হয়ে গেইছে, বলে বলে কত ইয়ে হয়ে গেইছে, কথান্তর হয়ে গেইছে। ঐ কথা বলতেন, 'মদটা না খেলে ছবি হবে কি করে? ছবিটা দাঁড়াবে কি করে? মদটাতেই আমার চোখটা ঐ দিকে থাকবে, ধীর হয়ে থাকবে, কোনদিকে যাবেনা।' ঐ জন্যই খেতেন। খেয়ে যে মাতলামো করা, কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করা, গালাগাল দেওয়া এসব করতেন না কখনো।

অনেকে তো নিয়ম মেনে খান, কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে, কিঙ্করদা কি এইরকম কোন নিয়ম মেনে মদটা খেতেন?

না, যখন মন যাচ্ছে তখনই। খাটের তলায় সবসময়ই বোতল ভরা থাকত।

কে এনে দিত?

ঐ রিক্সাওলাকে পয়সা দিত, ভাড়া দিত, নিজেও কোন সময়ে।

কোন ছাত্রটাত্র?

হ্যাঁ যাকে পেতেন, কোন ভয়ডর তো ছিল না, বলতে বাধা লাগত না মুখে।

আপনি তো কিঙ্করদার সঙ্গে দীর্ঘদিন ছিলেন, খুব ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন, তা একটা মানুষের দুটো দিক থাকে, ধরুন একজন গান করছেন, গান করার একটা দিক অর্থাৎ তাঁকে শিল্পী বলছি। আর একটি এমনি মানুষ, সাধারণ মানুষ এই একটা দিক। যেমন ধরুন আমি আপনার কাছে ইন্টারভ্যু নিচ্ছি, জিজ্ঞাসা করছি এই একটা দিক, এই একটা মানুষ।

আর একটা আমি হচ্ছি এসবের বাইরে সাধারণ মানুষ। কিঙ্করদার মধ্যে আমরা যদি দুটো দিক দেখি একটা হচ্ছে যে শিল্পী, যিনি ছবি আঁকছেন, মূর্তি গড়ছেন। আর একটা সাধারণ মানুষ অর্থাৎ ঘরের মানুষ, যিনি সংসারের মধ্যে জড়িয়ে আছেন, আপনার সঙ্গে থাকছেন। শিল্পী হিসাবে তো অনেক বড় কিন্তু মানুষটা কিরকম ছিলেন, মানুষটাকে কিরকম দেখেছিলেন ?

মানুষটা ভালই ছিলেন। মানুষ হিসাবে খারাপ ছিলেন না। আমি পেথম পেথম বুঝতে পারি নাই। আগে রাগী ছিলেন। পেথম পেথম ভয় পেতাম। একদিন দু'দিন বকতেন। বকলে পরে মনে করতাম বাস! ভারী তেজিয়ান তো তুমি। তারপরে আবার খুব ভাল হয়ে গেলেন। শান্ত, সুস্থ্য যেমন স্বাভাবিক মানুষ ঘরে থাকে, কথাবার্তা কয়, খাবার দাবার খায়। পেথম পেথম খারাপ লেগেছিল। তারপরে আবার ভালোই। পরের পর বুঝে এলাম। সঙ্গে থাকলেই একটা মানুষ বুঝা যায়। ব্যবহার ভালো দেখতাম। মন্দ ব্যবহার তো আমার সঙ্গে করেন নাই। খারাপ কিছুই দেখি নাই।

আচ্ছা কলাভবনের মাঠে যখন ঐ সাঁওতাল-মেয়েদের বড়ো বড়ো মূর্তিগুলো করছিলেন তখন কিঙ্করদাকে কেমন দেখতেন ?

পাগলের মত কাজ করতেন। খাবার খেতে আসতেন না। আমি হয়ত মিষ্টিওলার কাছে মিষ্টি, কি পাউরুটি, কি কলা নিতাম আর টিফিনকারী করে বাগালকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতাম। বলতাম, 'এখনো জল খায় নাই, দায় নাই, বোতল ধরে শুধু ঢকঢক করে খাচ্ছে আর ছবি করছে। এগুলো দিয়ে এসো গা।'

আচ্ছা যখন ঐ 'কলের বাঁশি' এইসব করছিলেন তখন তো ?

না, কলের বাঁশি হোক আর যাই-ই হোক, যখন ঐ মোষ করলেন, দুটো মোষ করেছিলেন, ওগুলোও তো পরিশ্রমের কাজ, পরিশ্রমের কাজ নয় ? এইরকম কাজ করে করেই তো শরীরটা এলে ( ভেঙ্গে ) গেলো। রোদ মাথায় লাগত কি লাগত না তা জানতাম না। মাথায় টোকা থাকত, গোটা গাটা রোদ পেত। খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো ছিল না। শরীরটা তাই এলে গেলো।

বাড়ীতে ফিরতেন কখন ?

খেয়ালী মানুষ তো যখন তখন আসতেন। কিছু ফুরিয়ে যেত তখন আসতেন।

আমরা শুনেছি কিঙ্করদা একটা সময়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন ?

হ্যাঁ চেয়েছিলেন, আবার মনটা ঘুরে গেল।

তা বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হয় নি, কি জন্য হয় নি আপনি শুনেছিলেন কিছু ?

কি করে জানব, কি যে হল সেই জানে।

আপনি জানেন না কিছু ?

আমাকে কিছু বলেন নাই।

আমার মনে হয় কিঙ্করদা যতদিন বেঁচেছিলেন দুঃখটাই পেয়েছিলেন বেশী। কিঙ্কর

**সবচেয়ে দুঃখের দিনগুলোর কথা কিছু মনে আছে আপনার ?**

দুঃখের দিন মনে আছে। চানও করতেন না, খেতেনও না, ঐ যা ধুলোমাটি মেখে থাকতেন, ঐ দুঃখের দিনটাই আমি দেখলাম বেশী।

**ধরুন কোন মানুষ কাউকে দুঃখ দিল, সেরকম কিছু দেখেছিলেন ?**

না, দুঃখ দেওয়া দেখি নাই, দুঃখ পেত এইটাই দেখেছি।

**কিরকম দুঃখ পেতেন। কোনদিক থেকে পেতেন ?**

মনের দুঃখু।

**সে দুঃখটা কিরকম ?**

কেউ ভালো দেখতে পারত না।

**কারা দেখতে পারত না ?**

এইসব পাশাপাশি বাবুরা।

**তাঁরা কিঙ্করদাকে কি চোখে দেখতেন, কিরকম খারাপ দেখতেন ?**

আমার ছবি করবার জন্য ডেকে নিয়ে গেলেন বাসাতে, দু'একদিন ছবি করতে করতে রাত হয়ে যেত। আসতে পারতাম না মীরা দেবীর বাসায়, নিয়ে ঐখানেই থেকে যেতাম। ভোরবেলায় বাবুদের সঙ্গে দেখা। বললে. 'কে আসে, কে যায় আমরা দেখতে চাই।' অনেক ভোরে উঠে যখন বাড়ী আসছি তখন তাঁরা হয়ত ঐ রাস্তায় চলে গেল, চিনবার জন্য তারপর কাছে কাছে ফিরল। সেইসব নিয়েই তো ওঁর সঙ্গে বিবাদ ঘটল। আপিসে দু-এক কথা হতে লাগল যে, 'এইরকম করছে, এইরকম করে।' তা কেউ ভালো, কেউ মন্দ আছে তো। যাঁরা ভালো তাঁরা বললেন, 'তা ঠিক করছে।' যাঁরা মন্দ তাঁরা মন্দই বললেন। এইরকমভাবেই দুঃখু পাওয়া। ঐ দুঃখু পাওয়া দেখলাম মনে যে এইরকম ভাবছে। নিজেও ভাবত। মন ভারী করে বসে থাকতেন। শুধোতাম। বলতেন না। কতক পরে বলতেন। তারপর উনি মূর্তি গড়তে লাগলেন, মূর্তি গড়ায় মত্ত হলেন। আমার ইয়েতেই তো অনেক মূর্তি গড়েছিলেন।

**কিঙ্করদার কাছে কারা বেশী আসতেন কিংবা কাদের সঙ্গে মিশতেন বেশী ?**

সাঁওতালদের সঙ্গে মেল ছিল খুব। মাঝিদের ভালোবাসতেন একেবারে প্রাণের মতো। ওরাও ভালোবাসত। ঢলকরার এক মাঝি বাবুকে প্রত্যেক বছর তাল এনে দিত। একবার এক মাঝি বন্ধু মরে গেল, তাকে দেখতে গিয়ে দরোয়ানদের দোর গোড়ায় (দরজার কাছে) পড়ে যান। আমি দেখতে পেয়ে দরোয়ানকে বললাম, 'তুমি ধর।' দরোয়ান আর আমি ধরাধরি করে তুললাম। সাঁওতালদের ছেলেমেয়ে আসত, ছোট ছোট বাচ্চা আসত, নেংটো করে ছবি এঁকে নিতেন। আর মেয়েগুলো, ওদের কাপড়পরা ছবি করতেন। ওরা তো আর ইয়ে হোত না। টাকা দিতেন।

**আপনি তো কিঙ্করদার কাছে দীর্ঘদিন ছিলেন তা স্মরণীয় কোন ঘটনা যা মনে দাগ**

কেটে আছে এইরকম কিছু কি মনে আছে আপনার ?

দিল্লী যখন গেলেন ঐ 'যখ-যখিনী' ( যক্ষ-যক্ষী ) করতে আর যখন দিল্লী থেকে ফিরে এলেন তখন বড়ো বড়ো পাথরগুলোকে বইয়ে নিয়ে আনলেন। হয়ত কাজ করতে করতে বেড়েছিল ওগুলো। ট্রাক ভাড়া করে পাথরগুলোকে বইয়ে আনছেন, 'কেনে এগুলোকে বইয়ে আনছেন, কোন কাজ করবেন নাকি ?' জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'ঐ আনলাম। দরকার হবে। এমনি।' ঐ পাথর কতকগুলো পড়েছিল শঙ্খ চৌধুরীর ঐখানটায়।

হ্যাঁ, কতকগুলো পাথর পড়ে আছে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে। বড়ো বড়ো পাথর। শঙ্খ চৌধুরীর ভিটেটায়। সেদিন দেখলাম পাশ দিয়ে যেতে যেতে। এছাড়াও অন্য আর কোন ঘটনা ?

একবার শ্রীনিকেতনের বাসে যাচ্ছেন, ছেলেগুলো বাবুর টুপীটা খুলে নিলে তামাশা করে। ছেলেগুলো বিনয় ভবনের কেউ হবে। ওরা বাসে যেত। বাসটা শ্রীনিকেতন আর শান্তিনিকেতন করত কেবল। শান্তিনিকেতনেরই বাস। নিয়ে কলাভবনের ছেলেরা খুব রেগে গেল, 'হ্যাঁ বাবুর মাথার টুপীটা কেড়ে নিলে, টুপীটা কেড়ে নিলে'- মারতে যায় আর কি। মারামারি হয় আর কি। আমি ঘর থেকে খুব কলরব শুনতে পাচ্ছি। নিয়ে নিজে না চটে তারপরে নিজেই থামালেন। ছেলেরা ভয় পেয়ে 'অন্যায় হইছে, অন্যায় হইছে'—এই বলে শেষকালে পায়ে ধরে মাপ চেইছিল।

যখন অসুখ হয়ে গেছে, কাজ করতে পারছেন না, কিঙ্করদার সেই শেষ দিনগুলো কেমন কেটেছিল ?

শেষের দিনের জীবনটা বলি, সারাদিন বসে শুয়ে কাটত। বলতাম, 'উঠুন কেনে, ওমন করে বসে থাকবেন ? পাগুলো কেমন হয়ে গেইছে, উঠুন পা চালি করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াই।' বলতেন, 'তা ধরো, ধরো।' আমি হাতটা ধরতাম আর ঘরের ভেতরেই এ-ঘর থেকে আর একটা ঘরে পা চালি করাতাম। কখনো বারান্দায় যেতেন। শুয়ে পাশ ফিরতে পারতেন না। শেষ বয়সটা একেবারে অথর্ব হয়ে গেলেন। হাঁটা চলা করতে পারতেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতেন বলে বোধ হয় বসে গেলেন তো একেবারেই। পা ফেলতে পারতেন না। ধরে ধরে গাড়ীতে ( রিক্সাতে ) চাপাতে হত আমাকে। রিক্সাওয়ালাকে বলতাম, 'ধর তুমি, একটা মোড়া দাও।' মোড়ার উপর পা-টা চাপিয়ে আমার হাত ধরে রিক্সাওলার হাত ধরে নিয়ে কায়দা করে বসাতাম। একেবারে অথর্ব হয়ে গেলেন শেষে। হাতে হাতে সব দিতে হত। বাবুর দিকে ঠিকঠাক নজর রাখবার জন্য ম্যানা[৮] ওদেরকে বলে হয়ত কিছু আনবার জন্য বোলপুরকে চলে গেইছি তা আমি যতক্ষণ না ঘরকে ফিরেছি ততক্ষণ কিছু খেতেন না, রাস্তার পানে তাকিয়ে বসে থাকতেন। তারপর

৮. ঐকজন পরিচারিকা

আমি বললাম, 'দিবাকরকে চিঠি লিখুন, দিবাকর আসুক আর সাধনকেও[১] লিখুন। আমি একলা কি করে রোগীটাকে সামলাবো।' নিয়ে চিঠি দেওয়া মাত্রই এসে গেল সব। সবাই সাহায্য করত। সবাই মিলে দেখাশোনা করত। ছাত্র-ছাত্রীরা আসত।

**উনি যখন অসুস্থ হয়ে ঘরে শুয়ে আছেন, কিছু করতে পারছেন না তখন নিজের মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বলতেন যে আমি মরে যাব, আমার মৃত্যু এগিয়ে আসছে এইরকম কিছু?**

না, মৃত্যু সম্বন্ধে বলতেন না।

**তাহলে কি বলতেন আমি এখনো বাঁচবো?**

হ্যাঁ, বাঁচবার শখও ছিল। পাগুলো অথর্ব হওয়াতে মনটা দেবে গেল।

**মনটা দেবে যাওয়াতে এরকম কিছু বলতেন যে আমি মরে যাব?**

মরব কোনদিন বলেন নাই। ধরে ধরে হাঁটাহাঁটি করাতাম তখন বলতেন, 'আমার পাগুলো কি হলো বলো তো?' মাঝিদের ঘর থেকে ১ টাকা, ২ টাকা করে শুয়োরের চর্বি এনে মালিশ করতাম। মালিশ করে করে পাগুলো ডলে দিতাম। তাও পায়ে আঁচ হল না।

**এমনি যখন বসে আছেন, কিছু করতে পারছেন না তখন ছবি সম্পর্কে কিছু বলতেন যে আঁকতে পারছি না, কষ্ট পাচ্ছি এইরকম কিছু?**

কষ্ট পাচ্ছি তা বলেন নাই আর ছবি আঁকতে পারছি না তাও বলেন নাই। আবার করব আমি, কাজ করব এইরকম মনের আগ্রহ খুব ছিল।

**আচ্ছা যখন একেবারে অথর্ব হয়ে গেছেন, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে, একটা মানুষ যখন মারা যাচ্ছেন বা মারা যাবেন অনেকেই তো বুঝতে পারেন যে আমার দিন শেষ হয়ে আসছে, আমি মারা যাব. অসুস্থ অবস্থায়, হাসপাতালে যাবার আগে কিঙ্করদা সেরকম কিছু বলেছিলেন কি?**

টেক্সী এসেছে নিতে, জামা-কাপড় পরাচ্ছি আর ফেলে ফেলে দিচ্ছেন—'যাব না। আমি কলকাতা যাব না। আমি কলকাতা যাব না। যাব না-যাব না'—করছেন। জোর করে নিয়ে গেলেন পেভাস বাবু (প্রভাস সেন)।

**যখন কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হলেন, আপনি তো সপ্তাহে ১/২ দিন দেখতে যেতেন, হাসপাতালে কিরকম দেখতেন কিঙ্করদাকে?**

সবসময় চলে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। হাসপাতালে যখন যেতাম, তখন বলতেন, 'তুমি এসেছো, যেয়ো না, যেয়ো না।' নিয়ে যাবার কথা বলতেন। বলতাম, 'ডাক্তারকে বলুন, আমার হুকুমে তো নিয়ে যাওয়া হবে না।' বলতেন, 'আমি কবে বাড়ী যাবো। আমি কালীতলার ঐদিকে চুপচাপ লুকিয়ে লুকিয়ে চলে যাবো।' শান্তিনিকেতনের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ২/৩ বার ছিলেন, এখানেও যেমন কালীতলা হয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসতেন, সেখানেও তাই মনে করতেন

১. সাধন বেইজ। নাতি। রামকিঙ্করের মামা আশুতোষ বেইজের পুত্র

যে ওখানেও কালীতলা আছে আর ঐদিকে চুপচাপ করে চলে যাবো। বলতেন, 'নিয়ে চলো, বলো আমার কথা।' বলতাম, 'ডাক্তার যখন আসবে আপনি নিজে বলবেন তবে হবে, আমি বললে তো হবে না।'

মারা যাবার আগে মনের ইচ্ছার কথা কিছু বলতেন, যে আমার শেষ ইচ্ছাটা এইরকম, কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কি?

পুতুলটা গড়ে গেলেন শেষ। বললেন যে, 'আমাকে একটু কাদা এনে দাও, আমি একটা পুতুল গড়ে দেবো'—সেই পুতুলটা গড়াই শেষ।

কাদা কে এনে দিলেন?

কাদাটা ছেলেরা এনে দিলো।

আচ্ছা, শেষ ইচ্ছাটা ছিল একটা মূর্তি গড়াব?

হ্যাঁ, নিয়ে ছেলেরা কাদা এনে দিলে পুতুলটা গড়লেন। আর তারপর দিনেই মরে গেলেন রেতের বেলায়। না, তারপর দিনে নয়, তারপর দিনে অপারেশন হল।

অপারেশনের আগে মূর্তিটা গড়েছিলেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাল অপারেশন হবে আজ চুলগুলো সব চেঁচে দিলে। সন্ন্যাসী বেশ ধরে সন্ন্যাস যায় যেমন তেমনি সাজিয়ে দিলে। আর সেই দেখে খুব দুঃখু পেলাম। এমন বেশ কে লিখলে! এমন করে কে অর্ডার দিলে? মরার পরে শান্তি-নিকেতনের লোক বলেছিল, 'ওরা লিখে দিয়েছে বটে কিন্তু রাধারাণী তো কোনদিন বলে নাই।' আমি তো বাধা দিইছিলাম। দিবাকর সই দিলে আর জ্যান্ত মানুষটাকে মেরে দিলে।[১০]

আপনি তো আর বেশীদিন বাঁচবেন না, এই তো শেষ জীবন, এতদিন একটা মানুষকে দেখলেন, একটা মানুষের সঙ্গে থাকলেন, তাঁর করা এত বড়ো বড়ো কাজ দেখলেন, তা এই জীবনের শেষদিকে এসে সেই মানুষটির করা বিখ্যাত-বিখ্যাত মূর্তিগুলো যেগুলোর টানেই অনেকেই শান্তিনিকেতনে ছুটে আসেন, হাজার হাজার মানুষ শান্তিনিকেতনে এলে যাঁদের এগুলি দেখতেই হয়, এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে সেই মূর্তিগুলো সম্পর্কে আর তাঁর স্রষ্টা অর্থাৎ যিনি করেছিলেন, সেই মানুষটি সম্পর্কে কিছু বলুন। যখন একা থাকেন, যখন দুঃখে থাকেন তখন তো কিছু চিন্তা করেন, তখন কি চিন্তা করেন, কি মনে হয় আপনার?

যখন একা থাকি, যখন ঠাকুরকে জল দিই তখন বলি, 'তুমি যেন আবার পেয়ো আমাকে। আমার অনেক কথা বলার আছে, সেগুলো প্রকাশ করা হয় নাই, সেগুলো বলব আর জন্মে।' আবার মনে হয় যে ছবিগুলো, মূর্তিগুলো আবার ফিরে এসে করবেন। ছবি, মূর্তি করবেন বলে গেলেন সে আশাটা রয়ে গেল, আমারও মনের কথা রয়ে গেল, বলা হল না, আবার একসঙ্গে হবো আর জন্মে। দুঃখের কথা নিয়ে সেদিন একটা গান বেঁধেছিলাম—'একলা ঘরে শুয়ে থাকি/ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখি/

১০. 'আমার কাকা রামকিঙ্কর'—পূর্ববর্তী এই প্রবন্ধে এ সম্পর্কে দিবাকর বেইজের মন্তব্য আছে। সঃ

পাশের বালিশ বুকে নিয়ে নয়ন জলে ভাসি।' দুঃখের মতন দুঃখ পেয়েছি, এমন দুঃখ আর কেউ পায় না। সেইজন্য কথাটা লিখেছিলাম। এ কথাটা দুঃখের কথা। যে কথা মনে জাগছে, এ জন্মে আর জানার নয়। মনে ভেতরের দুঃখটা কি আর জানাব ? তা আর বলার নয়। বলবারও কথা নয়। সেদিনই মনের দুঃখ জানালাম তাঁকে যে, 'তুমি আমাকে আর জন্মে পেয়ো আর আমি তোমার পাশে পাশে আছি। আমি তোমাকেই কামনা করছি। সব সময়েই কামনা করি। তুমি স্বর্গ থেকে আমাকে আশীর্বাদ করো। আমি তোমার আশাতেই বসে আছি।' খালি ঐটাই রাতদিন বলি। সবসময় বলি।

**প্রকাশ দাস**

R.K.

রামকিঙ্কর ও তাঁর শিল্পকাজ

নির্বাচিত প্রবন্ধ

## রামকিঙ্করবাবুর কথা

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

রামকিঙ্করবাবুকে অনেকদিন ধরেই চিনি, ওঁর কাজও দেখছি সেই কবে থেকে—প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চললো। তখন শান্তিনিকেতনে প্রভাতবাবু,[১] নন্দলালবাবুর উৎসাহে কারুসঙ্ঘের পত্তন হয়েছিল, কো-অপারেটিভ ভিত্তিতে কাজ হতো। মূর্তি গড়ার কাজের অর্ডার এলে রামকিঙ্করবাবু করতেন, পেন্টিং-এর কাজ পেলে হয়তো আমি করলাম, টাকা যাঁর যখন দরকার তিনি তখন নিতেন। এইভাবে বেশ কিছুদিন হয়েছিল। কিন্তু টিকলো না। রামকিঙ্করবাবু কারুসঙ্ঘের হয়ে কিছু কাজ করেছিলেন, তার মধ্যে মনে পড়ছে ও সি গাঙ্গুলীর বাড়ীতে কিছু রিলিফ কাজ করেছিলেন। সেই কাজ সব দোকানপাট হয়ে ঢাকা পড়ে গেলেও শুনেছি নাকি এখনো আছে।

রামকিঙ্করবাবু কলাভবনে কিছুদিন কাজ করার পরে যখন এখানেই মডেলিং শেখাতে লাগলেন তখন আমিও এখানে কাজ শুরু করেছি। সেই সময় ছুটিটুটিতে আমরা এখানেই থাকতাম, উনিও থাকতেন, কাজেই দেখা-সাক্ষাৎ প্রায়ই হতো। গ্রীষ্মের ছুটি, পুজোর ছুটিতে সারাদিন ধরে কাজ করেছি, উনিও করেছেন। তখনই অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত, উনি আমার কাছে এলেন, আমি ওঁর কাছে গেলাম, একসঙ্গে চা-টা খেলাম, সিগারেট খেলাম। কাজের এ্যাসোসিয়েশনটা আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ করে দিয়েছিল। আমার আর ওঁর কাজের মধ্যে একটা সময় সাদৃশ্য পাওয়া যাবে, এটা যখন উনি করছেন তখন আমি ওটা করছি—এইরকমভাবে বেশ চেনা যায়।

রামকিঙ্করবাবু যখন এখানে এসেছেন, তখনই তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ, তাঁর শুধু যা বদলেছে, তা হচ্ছে যাকে বলে গিয়ে 'রুচি'। আর্টিস্ট হিসাবে ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল ওঁর বাঁকুড়ায় থাকতেই। ওখানেই ছবি আঁকতেন, মূর্তি গড়তেন। রামানন্দবাবু ওঁকে যখন এখানে নিয়ে এলেন তার বছর পাঁচেক আগে থেকেই আমি এখানে আছি। এখানকার স্কুলে পড়তাম। ১৯১৯ সালে কলাভবন খুললো। তখন আমিও তাতে জয়েন করেছি। গুরুদেব ডিক্লেয়ার করলেন, 'এই কলাভবন হলো

১. প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

তোরা যে যে ছবি আঁকবি সব যা।' আমরাও চললাম ডরমেটারী ছেড়ে। আমার সঙ্গের দু'জন এখন জীবিত—ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন এবং সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলাভবন ওপেন হলো আমাদের দুজনকে নিয়ে—আমি আর ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন। তারপরে কলকাতা থেকে দুজন এলেন অসিতবাবুর[২] সঙ্গে—অর্ধেন্দু ব্যানার্জী আর হীরাচাঁদ দুগার। তখন আরো একজন ছিলেন মনে আছে—ভাগলপুরের কেষ্টকিঙ্কর ঘোষ। এখনো মনে হলে অবাক লাগে, কলাভবনে যোগ দেওয়াটা কেমন যেন ফেয়ারী টেলস্-এর মতো। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী, কলাভবন, সঙ্গীতভবন আর রিসার্চের শুরু ডিক্লেয়ার করলেন। একদিন খেলার মাঠে বললেন, 'কে কোনটায় যেতে চাও লাইন থেকে বেরিয়ে এসো।' আমি তখন লাইনে ছিলাম না, চোখ খারাপ ছিল বলে ড্রিল না করে বেড়াবার অনুমতি পেয়েছিলাম। পরদিন ইস্কুলে যাচ্ছি রাস্তাতে ধীরেনবাবু বললেন কলাভবনের কথা। ব্যস আমিও চললুম ইস্কুলের দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে।

রামকিঙ্করবাবু মডার্ন কাজ করেছেন, উনি করেছেন—আমিও জানি উনি তা করেছেন। তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব আলোচনা হতো। আমি, নন্দবাবু, রামকিঙ্করবাবু সবাই ন'টার সময় চা খেতে বসতাম, সেখানেই আলোচনা হতো। নন্দবাবু জিজ্ঞেস করতেন—'এটা কেন করছো, ওটা কেন ভালো'—এইসব কত কথা। এখানে স্কাল্পচারও উনিই প্রথম করেন। প্রথম শিক্ষকও উনি। সুধীর খাস্তগীর ছিলেন কনটেমপরারী। এখানে থেকে কলাভবনের ছাত্র হলেন ও'রা, রামকিঙ্করবাবু হলেন শিক্ষক। উনি প্রথমে শেখাতেন মডেলিং। রামকিঙ্করবাবুর কাছেই শুনেছি—ওসব উনি শিখেই এসেছিলেন। বাঁকুড়ায় প্রতিমা গড়তো এক কারিগর[৩] ও'কে ভালবাসতো খুব। সেই কারিগরই মডেলিং-এর কাজ হাতে ধরে শেখায়। এসব রামকিঙ্করবাবুর নিজের মুখে শোনা। এখানে রামকিঙ্করবাবু প্রথমে ছবি করেছেন—মিনিয়েচার, অবনীবাবুর মতো ওয়াশ-এ হাইলি ফিনিসড হতো। অয়েল পেন্টিংও এখানে প্রথম করেন রামকিঙ্করবাবু। তার আগে এখানে যেটুকু হয়েছিল স্থায়ী হয়নি। ফরাসী মহিলা আঁন্দ্রে কারপেলে কলাভবনে ট্রেনিং দিয়েছিলেন, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় রীতিমতো অয়েল পেন্টিং শিখেছেন। এটা ১৯২১—২২ সালের ঘটনা হবে, রামকিঙ্করবাবু তখনো আসেননি। এটা অনেকেই জানতে চান যে রামকিঙ্কর যখন কিউবিজম বা মডার্ন অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট নিয়ে কাজ করছেন তখন কিরকম রি-অ্যাকশন হয়েছিল। এটা বুঝে দেখুন—রি-অ্যাকশন যদি না হতো, লোকে যদি ভালো না বলতো, তবে উনি কাজ করতেন কি করে? কনজিনিয়াল এ্যাটমস্ফিয়ার ছিল বলেই না তা হয়েছে। তাছাড়া

২, অসিত কুমার হালদার (১৮৯০-১৯৬৪)
৩. কারিগরের নাম অনন্ত পাল বা সূত্রধর। স:

অবনী-নন্দলালের ধারা খুবই ইলাস্টিক, সেইজন্যেও এসব হতে পেরেছে। নন্দবাবুরই কয় ছাত্র দেখুন—ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন, এ'র কাজ হাইলি ফিনিসড সফিস্টিকেটেড। প্রথম শ্রেণীর কাজ। আবার রমেন চক্রবর্তী, তিনি গ্রাফিক করলেন, লিথো, উডকাট, এ'চিং তাঁর স্পেশালিটি। এইখানেই তো তা করতে পারলেন। নন্দ-বাবুই নানা সুযোগ দিলেন—মেটিরিয়ালস্ দিলেন, রবীন্দ্রনাথ বই আনিয়ে দিলেন। সেই যে কথা আছে না—'হাঁচড়ে পাঁচড়ে শেখা'—এখানেও তাই হতো। যে দুজনের কথা বলা হলো তাঁরা হচ্ছে গ্রেয়ান্নিং একজাম্পেল। আমি করেছিলাম ইটালিয়ান ফ্রেসকো—সেটাও তো এখানে হলো। স্বীকার করতেই হবে ইণ্ডিয়ার মধ্যে প্রথম ফ্রেসকোর চর্চা এখানেই হয়েছে। ইটালিয়ান প্রসেস পাওয়া গেল প্রথম, তখন তাই করা হলো। তারপর মনে হলো—জয়পুরে তো ফ্রেসকো করা হতো, তা সেই মিস্ত্রী-টিস্ত্রী আছে নাকি বেঁচে? শৈলেন দে জয়পুর থেকে ফার্স্ট ক্লাস মিস্ত্রী পাঠালেন,[৪] সুন্দর কাজ হলো। সুতরাং অবনী-নন্দবাবুদের ধারার সঙ্গে পরবর্তী যুগের মডার্ন ধারার বিরোধের কথা লিখবেন না। ওটা ঠিক নয়। রামকিঙ্করবাবু নন্দবাবুর মৃত্যুর পরে এখানকার শোকসভাতে বলেছিলেন—'অনেকে মনে করেন, নন্দবাবু মডার্ন আর্ট সম্বন্ধে অল্প কিছু লিখলেও আমরা বুঝি আলাদা। কিন্তু বলছি তিনি না থাকলে আমি কাজ করতে পারতাম না।' পুরোনো গেস্টহাউসের সামনে যে কাজটা, ওটা যখন হচ্ছে তখন আমরা তিনজনে একসঙ্গে বসে চা খেয়েছি। উনি কাজ করেছেন। নন্দবাবু বললেন—'এটা কি করলে? ওটা করে দাও'—এইসব। সাজেসশনও দিলেন। সুতরাং এটা কখনোই ঠিক নয় যে ও'দের সঙ্গে ফাইট করে আমাদের কাজ করতে হয়েছে। মনে রাখবেন ১৯২১-এ স্টেলা ক্রামরিশ আপ টু ডাডাইজম লেকচার দিয়েছেন। সেই লেকচার ওয়াজ কম্পালসারী ফর টীচার এ্যাণ্ড স্টুডেন্টস। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক নন্দলাল। এটা তোমাদের এ্যাটেণ্ড করতেই হবে।' স্টেলা ক্রামরিশ লেকচার দিয়েছিলেন সমস্ত পাশ্চাত্য শিল্প সম্বন্ধে—তাতে ডাডাইজম, কিউবিজম, সুররিয়ালিজম সবই ছিল। শুধু যেটা হয়নি সেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট। আর হয়নি কোলাজ প্রভৃতি আমেরিকান ধারা। ক্রামরিশ তখন যেরকম শিখিয়েছিলেন তাতে এখনো কাজ চলে যায়। ইণ্ডিয়াতে তখন ডাডাইজম-এর নাম এই শান্তিনিকেতনের মুষ্টিমেয় ছাত্র ও শিক্ষক ছাড়া আর কেউ জানতো না।

কাজেই মডার্ন অ্যানালিসিস অফ পেণ্টিংস ইত্যাদি সব শান্তিনিকেতনে শেখানো হয়েছে রামকিঙ্করবাবু আসার আগেই। উনি এখানে আসেন ১৯২৫ সালে। তখনি আমরা পারি বা না পারি মুখে তো কপচাতে পারি। অর্থাৎ আবহাওয়া তৈরী ছিল। আর্টের উপর বইও পাচ্ছিলাম লাইব্রেরীতে। ছবির কপি, প্লেট ছিল। বা এখনো

৪. মিস্ত্রীর নাম নরসিংহ লাল

হয়তো কলাভবনে আছে।

কিউবিজম সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে—ইট ইজ নট দ্য টেকনিক, ইট ইজ দ্য এ্যাপ্রোজ। এ্যাপ্রোজটা হলো ইনটেলেকচুয়াল। টেকনিক তা নয়। ওয়েস্টার্ন এলিমেণ্টস্ বা মডার্ন এলিমেণ্টস্ সবাই নিয়েছেন যে যেভাবে পেরেছেন। যেটুকু তাঁর দরকার। আমরা ওয়েস্টার্ন এলিমেণ্টস্‌কে কপি করতে যাচ্ছি না। একটা ফোক আর্ট, ধরুন প্যাঁচা—দেখতে দেখতে মনে হবে, 'আরে এটা কেটেছে কেমন দেখছো! ঠিক যেন কিউবিজম।' আমরা যেমন বুঝেছি, যে কট্টর কিউবিস্ট সে হয়তো বলবে, 'না এটা হয়নি। শুদ্ধ হয়নি। কৌলিন্য নেই। ব্রাহ্মণত্ব বজায় রইল না।' আমরা কৌলিন্য রাখবার চেষ্টা করি নি। আমরা তো বর্ণসংকরের যুগের লোক। তবে এটা জানবেন এখন যেসব পণ্ডিত আছেন, কিউবিজম ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা স্কীনডীপ। ক্রামরিশ আমাদের যা শিখিয়েছেন, কষ্ট করে এ্যানালিসিস শিখিয়েছেন, তাতে এখনকার—ধরুন বরোদা ইত্যাদিতে যা শেখানো হয় খুবই সুন্দর শেখানো হয়। কিন্তু দেখি যে আমরা বুড়ো হলেও খুব ব্যাকডেটেড নই। দু/পাঁচটা রেফারেন্স হয়তো আমাদের জানা নেই। কিন্তু মোটামুটি ফাণ্ডামেণ্টাল যা, তা ক্রামরিশ আগেই শিখিয়েছেন।

আর যেমন পেয়েছি তেমন করেছি। রামকিঙ্কর দেখুন—এও করেছেন, ও-ও করেছেন। একটা লোকের ইলাস্টিসিটি না থাকলে এত বড় হয় না। তাঁর যেটা গ্রেটনেস সেটা বলি—পাশাপাশি দেখুন, গেস্টহাউসের সামনে আছে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্কিটেক্ট, তারপরে সাঁওতাল, সাঁওতাল মেয়ে দৌড়াচ্ছে—গ্রেকো-রোমান রিয়েলিটির দারুন কাজ, তারপরেতে 'বুল', সেটা তো আমি চোখে দেখিনি, মোটামুটি শুনেছি। একটা লোক যে এইরকম করতে পারে—এছাড়াও আরো কাজ আছে, স্কাল্পচার আছে, ছোট ছোট কাজ আছে কলাভবনের গায়ে, দিল্লীতে বড় কাজ করেছেন 'যক্ষ-যক্ষী'—একটা লোকের খুব একটা ফ্রী ইয়ে না থাকলে, চিন্তাভাবনায় ফ্রী ও ফ্রেসনেস না থাকলে সে এটা করতে পারে না। রামকিঙ্করবাবু পরে আমায় বলেছেন, 'বিনোদ-বাবু ইচ্ছে হলো একটা রিয়ালিস্টিক করি। কি আপত্তি তাতে? কি আর লোকসান? কথাটা বলছিলেন সাঁওতাল পরিবারের সেই কাজটা 'মিলকল' করবার সময়। কিউবিজম তাঁর একটা ফেজ, অমুক একটা ফেজ কিন্তু তাঁর কনসিসটেন্সী? সেটা হচ্ছে স্কাল্পচারাল এলিমেণ্ট, তার স্ট্রাকচার, তার ভল্যুম—এগুলো রামকিঙ্করবাবুর, এইটারই এভোলিউশন। আর থেকে থেকে স্ট্রাগল করেছেন, নানাদিক দিয়ে দেখেছেন, এ্যাপ্রোচ করেছেন—এতে হয় কিনা, না হলে ওতে হয় কিনা। যেমন একটা রচনা লিখবেন—শুরু করলেন রাবীন্দ্রিক ভাষাতে, তাতে হচ্ছে না, তারপরে ধরলেন গুরুচণ্ডালীতে, তাতে হয়তো হলো। এইরকম হয়। আমরা তো গুরুচণ্ডালী যুগের লোক। বর্ণসংকর। রামকিঙ্করবাবু এটা অস্বীকার করেন না। তাঁর হয়েও আমি এটা বলতে পারি।

রামকিঙ্করবাবুকে বলবেন, উনি একটা লেখা লিখেছিলেন, কার জন্য লিখে-ছিলেন ভগবান জানে। সেই লেখাটি কোনরকম সংগ্রহ করে বাংলাতেই তাঁর যে ভাষা আছে ঠিক সেই ভাষাতেই ছাপাবেন। নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে এমন অনবদ্য তাঁর রচনা—আমি কেন পেণ্টিং করি, কেন স্কাল্পচার করি—কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উনি তাঁর উত্তর দিয়েছিলেন। আমি আপনাদের আবার বলছি—এরকম একটি রচনা খুব কমই দেখা যায়। প্রভাস সেন আমাকে লেখাটা এনে শুনিয়ে-ছিল। ওর যা আছে—তার বানান ভুল, ভাষা ভুল সব নিয়েই ছাপাতে হবে। প্রভাস বলেছিল—'এরকম লেখা রঁদার সঙ্গে কমপেয়ার করা যায়।' সত্যি অসাধারণ লেখা। ও'র কাছে থাকলে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। প্রভাসকেই আমার নাম করে বলুন। ওই লেখাটি পেলে রামকিঙ্করবাবুর আর জীবনচরিত লেখাবার দরকার হবে না। রচনার কিছুটা আমার মনে আছে—সঠিক হয়তো নেই, 'জীবনের উদ্যানে আমি ঘুরে বেড়াই। যা দেখি হাসি, কান্না, ছোট শিশু, ফুল বা অমুক তা আমি ছবিতে আঁকি। আর অন্ধকার রাত্রে আমার ছেলে যখন আমার বুকের ওপর এসে পড়ে তাকে যখন আমি জড়িয়ে ধরি সেই অভিজ্ঞতা আমি স্কাল্পচারের মধ্যে রাখি।' আপনি পাবেন না, পৃথিবীতে পাবেন না এই জিনিস। কাজেই তিনি কিউবিজম করছেন, কি কি করছেন, তাতে কি এল গেল! যাঁর এরকম কনসিসটেন্সী তিনি সবই করতে পারেন। কিউবিজম দেখুন না—সেটা তিনি এ্যাসিমিলেট করে দিয়েছেন। এখন যাঁরা স্কাল্পচার, যাঁরা কিউবিজম দ্যাখে, একবার তাঁদের রামকিঙ্কর বেইজকে দেখতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ কবে কালিদাস পড়েছিলেন বা অমুক পড়েছিলেন তাতো আমরা হিসেব রাখছি না কাব্য রসাস্বাদনের সময়। সেগুলো এ্যানালিসিস শিখতে দরকার হতে পারে। তার এভোলিউশন তো অন্যরকম। রামকিঙ্করবাবুর বেলাতেও তাই।

স্কাল্পচার হয় দু'রকমের—এক, ফ্রম নাথিং টু সামথিং। কিছু ছিল না ক্লে লাম্প এখানে বসিয়ে দিলাম। ক্লে থেকে এ্যাড করে করে ফর্ম তৈরী হলো। দুই, বাই কাটিং অ্যাণ্ড এলিমিনেটিং ইউ গেট সামথিং। রামকিঙ্করবাবুর মধ্যে দুটোই আছে। শান্তিনিকেতনে যে বড় বড় কাজ তা নট বাই এলিমিনেটিং, বাই এ্যাডিং। এলি-মিনেট করেছেন বৈকী। কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টাল প্রসেস হলো—বাই এ্যাডিং। কিছু ছিল না, একটা আর্মেচার তৈরী করে বাই এ্যাডিং মেটিরিয়ালস জিনিসটা তৈরী হলো। আবার 'যক্ষ-যক্ষী' করেছেন বাই এলিমিনেটিং। একটা ব্লক অফ স্টোন তিনি পেলেন তার থেকে কেটে কেটে বার করলেন।

শান্তিনিকেতনের কাজগুলোর মধ্যে প্রথম করেছেন 'সুজাতা', তারপর মাটির বুদ্ধ ভেঙে যাওয়ায় বর্তমান মূর্তি অনেক পরে তৈরী হয়, তারপর সাঁওতাল দম্পতি, গেস্টহাউসের সামনে অ্যাবস্ট্রাক্ট, ধানঝাড়া, মিলকল, এবং তার ফাঁকে ফাঁকে কলা-ভবনের কালোবাড়ীর কাজগুলো।

রামকিঙ্করবাবুর এই গুণগুলো পেণ্টিংস-এও এসেছে। শেষের দিকের পেণ্টিংস আমি দেখিনি। আগেরগুলোতে মনে হয়েছে ওর পেণ্টিংস-এ কালার খুব প্রধান করে দিয়েছেন বলে পেণ্টারলি কোয়ালিটি আছে। তাই তাতে টাচ অপেক্ষা ভিস্যুয়াল এফেক্ট বেশী। সর্বত্রই এটা স্ট্রিক্ট বা রিজিডলি ভাববেন না। ঐ যে বলেছেন—'জীবনের উদ্যানে যেটা দেখি, চোখের সামনে দিনের আলোয় তা ছবিতে আঁকি। আর যা টাচ করি অন্ধকারে, তা স্কাল্পচারে ধরি।'

### সংযোজন

............

অনেক ক্ষেত্রে শ্রীরামকিঙ্করকে আধুনিকতার প্রবর্তক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। সামাজিক জীবন থেকে নেওয়া বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর করা ভাস্কর্যগুলি যেমন 'সাঁওতাল পরিবার', 'কলের বাঁশি' প্রভৃতি হলো আধুনিক ভারতীয় শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে অভিব্যক্তিময়।

রামকিঙ্কর দীর্ঘদিন ধরে শান্তিনিকেতনেব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যখন তিনি কলাভবনে যোগ দেন তখনই তিনি মডেলিং, অয়েল পেণ্টিং-এ রীতিমতো ভালো অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একজন দক্ষ শিল্পী। ছাত্র হিসাবে গোড়ার দিকে তাঁর কাজ ছিল অনুচিত্ররীতির।

১৯২৫—৩০-এর মধ্যে রামকিঙ্কর মিসেস মিলওয়ার্ড-এর কাছাকাছি আসেন। এবং তাঁর শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালীন তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেন। যখন তিনি মডেলিংকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন তখন তা তাঁর চিত্রশিল্পের দৃষ্টিভঙ্গীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। জলরঙ এবং তেলরঙকে তিনি তাঁর মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। গোড়ার দিকের তাঁর বেশীরভাগই জলরঙ এবং কালির ড্রয়িং-গুলি হলো ভাস্কর্যের জন্য করা প্রাথমিক খসড়া। এখান থেকেই তাঁর বিমূর্ত পর্যায়ের শুরুর সময়সীমা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৩০—৩৫-এর মধ্যে তাঁর করা পোট্রেট এবং কম্পোজিশনগুলিকে গাঠনিক-গুণ সমৃদ্ধতায় এবং বিমূর্ততায় নিয়ে যাবার জোরাল প্রকাশ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৩৫—৪০ হল রামকিঙ্করের জীবনের সবচেয়ে ফলবান সময়। মুক্তাবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা ভাস্কর্য 'সুজাতা' ও 'সাঁওতাল পরিবার' এবং তৈলচিত্র 'লেডি উইথ ডগ' ও তাঁর আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ পোট্রেট এই সময়সীমার মধ্যে করা।

১৯৪০—৫০-এর মধ্যে তিনি বিমূর্ততার সমস্যা, সুররিয়ালিস্টিক আকার এবং

রিয়ালিজম-এর দিকে নতুন পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার জন্য নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। চিত্র অথবা ভাস্কর্য যাই হোক না কেন তাঁর প্রত্যেক কাজের পেছনে থাকত প্রচুর পরিশ্রম। এবং এইভাবে সেপ ও ফর্মের প্রকাশ ক্রমশঃ হয়ে উঠত জৈব, ধীর এবং যথাযথ। এর একটি কৌতূহলী উদাহরণ হল 'লেডি উইথ ডগ'[৫]। প্রথমে তিনি খোলাখুলিভাবে মূর্ত ধ্যানধারণায় আরম্ভ করেন, এরপর পটশৈলীতে রূপান্তরিত হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি বর্তমান রূপ নেয়। এর প্রত্যেক পর্বই চূড়ান্ত দক্ষতা এবং একটা সামগ্রিকতার ছাপ দ্বারা চিহ্নিত ছিল।

তাঁর জলরঙের কাজগুলির প্রত্যেকটিই স্বকীয় এবং প্রায় বিস্ময়কর। এই সমস্ত জলরঙের কাজগুলি কখনও কখনও তাঁর পরবর্তী কাজের উপাদান বা অপরিহার্য অংশকে ধরে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও, গুরুত্বের সঙ্গে এটা মনে করা যেতে পারে যে তাঁর অন্যান্য কাজ থেকে আলাদা এই জলরঙের কাজগুলিতে কখনোই শৈলীর পরিবর্তন না দেখিয়ে অভিগমনগত পদ্ধতি ( method of approach ) বরাবরই বজায় রেখেছেন অনুরূপ।

পি, রামচন্দ্র, রাউ-এর 'দি মডার্ন ইণ্ডিয়ান আর্ট' থেকে নেওয়া নীচের অংশবিশেষ থেকে শিল্পের ক্ষেত্রে রামকিঙ্করের উচ্চ আসন সম্বন্ধে সম্ভবতঃ আমরা একটা ধারণা করতে পারি।

'চিত্র ও ভাস্কর্য উভয়ক্ষেত্রেই রামকিঙ্করের দক্ষ সৃষ্টিক্ষমতা চমকে দেয়। তা সত্ত্বেও, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে প্রত্যক্ষতার আলোকে প্রতিফলিত করা যায়। এই প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণতার কারণ হলো আঙ্গিকধর্মী চেতনাকে বর্ণান্তরিত না করে তিনি যেমন ভেবেছিলেন সরাসরি সেই মাধ্যমেই কাজ করেছেন। তাঁর নিজস্ব অভিব্যক্তির নির্মমতার মধ্যে প্রাক-সচেতন আদিমতা লক্ষ্য করা যায়, যা ক্যাণ্ডিনেস্কি অথবা ক্লীর দুর্দান্ত বিমূর্ততার মতো।'

৫ ছবিটি 'প্রোট্রেট অফ সোমা যোশী' নামেও পরিচিত। সঃ

## কিঙ্করদাকে যেমন দেখেছি

..................................

### শঙ্খ চৌধুরী

কিঙ্করদাকে যখন প্রথম দেখি, তখন 'পশ্চিম তোরণ'-এর উপর তলার ঘরটা ছিল মাটির কাজ করার ঘর। কলাভবনের ছবি আঁকার দল শ্রীসদন পার হয়ে তাদের নতুন এলাকায় 'নন্দন'-এ। উপরতলায় 'বিদ্যাভবন'। তার বারান্দায় করা ভিত্তিচিত্রে জয়পুর পদ্ধতিতে ইজিপ্টের প্যানেল, নীচে নটীর পূজার নটী, চৈতন্যের জন্ম, শান্তিনিকেতনের ল্যাণ্ডস্কেপ—সবার দেখার জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিঙ্করদা সবে শ্যামলীর কাজ শেষ করেছেন। ওঁর করা সাঁওতাল আর মেঝেনের রিলিফপ্যানেল বলিষ্ঠ গড়নে আর সারফেস ডিটেল বাদ দিয়ে কাজের দিকে আমাদের চোখে খুবই নতুন ধারার সূত্রপাত করে। তখন কলাভবনে বুর্দেলের একটা ছোট প্লাস্টার কাস্ট ছিল, ওঁর কাজ কিঙ্করদাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল বলা যায়। কলেজের ক্লাসের মধ্যে সময় পেলে ওখানে যেতাম। রুদ্র হাঞ্জী তখন পুরোনো ছাত্রদের মধ্যে। আর কিঙ্করদার মডেলিং-এর প্রথম ছাত্রও বলা যেতে পারে। আর আসত ইন্দোনেসিয়ার বুসলী। দু' একটা প্লাস্টার কাস্ট ছিল, তাতেই স্কেচ করে সবাই হাত পাকাত।

স্টেশন থেকে গোয়ালপাড়ার রাস্তার পূব দিকটা খোলা মাঠ। বাড়ীর মধ্যে পান্থশালা আর শৈল বৌঠানের পুরোনো বাড়ী। সেখানে তখন আদ্দেকটায় গুজরাটীদের মেস। কয়েকজন থাকত। খাবারও খেত। আর অন্য দুটো ঘরে কিঙ্করদার আস্তানা।

তখন উনি সিল্কের উপর সোনালী রুপোলী ব্যাকগ্রাউণ্ডে মোটা জাপানী তুলি দিয়ে ছবি আঁকতেন। ঐ সময়টায় চীন, জাপানের প্রভাব চারিদিকে। ওঁর ছবিতেও তার আমেজ বেশ ছিল। আমার এখনও মনে পড়ে, সোনালী ব্যাকগ্রাউণ্ডে হরিণ নিয়ে খেলায় মত্ত শকুন্তলার ছবি। কাপড়ে লাল প্রজাপতি। কোথায় যেন জাপানী আমেজ। আর মনে পড়ে জলরঙে কাগজে আঁকা রাস্তার ধারের শিরীষগাছের তলায় চায়ের দোকান। ঐ চায়ের দোকান ক্রমে বিনোদদা, কিঙ্করদা, মৌলানা (জিয়াউদ্দিন) গণি আর রুদ্র হাঞ্জীর প্রায় ক্লাব ঘর হয়ে উঠল। যোগীনের চা খাওয়াটা একটা বিশেষ গৌরবের জিনিস ছিল। তার একটা কারণ যোগীন যাঁদের পছন্দ করত না তাঁদের নগদ পয়সা ফেললেও চা দিত না। আর পছন্দ হলে যত ইচ্ছে বাকী রাখা যেত। বহুদিন পরে যোগীনের মৃত্যু নিয়ে কিঙ্করদা একটা অয়েল

পেণ্টিং করেছিলেন। প্রত্যক্ষ দেখা ঘটনা নিয়ে এধরণের ছবি বোধ হয় আর নেই।

তখন সকালটা প্রায়ই মাটির কাজের ঘরেই থাকতেন। মাটি দিয়ে প্রথম মানুষের চেহারা করা দেখি গাঙ্গুলী মহাশয়ের। আমরা মডেলিং করা দেখেছি ছোট ছোট কাঠের বা বাঁশের নানান গড়নের মডেলিং টুল দিয়ে আস্তে আস্তে টিপে পালিশ করে। কিঙ্করদার কাজ লোহার বড়ো স্প্যাচুলা বা প্লাস্টার টুল দিয়ে মাটির তাল পাকিয়ে বা ব্লক করে তার থেকে কেটে মুখ বের করা বা মূর্তি করা। ওতে একটা সুবিধা হত ভাঙার বা ফাটার ভয় কম। কারণ সবটা মাটিই একই রকমের হত।

পোট্রেট করা দেখে বুঝেই উঠতে পারতাম না একটাই মুখ এত বার তৈরী হচ্ছে তো আবার ভাঙার কি দরকার! মাস্টার মশাইয়ের ( নন্দলাল ) কাছে শুনেছিলাম একটা কথা। উনি বলতেন, 'অন্য ছেলেদের যেখানে চার বছর শিখতে লাগে, শহুরে ছেলে আর গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে পড়া ছেলেদের সেখানে ছ'বছর লাগবে। প্রথম দু-বছর পুরোনো শেখা ভুলতেই লেগে যাবে।' ব্যাপারটা যে খুব বুঝতে পেরেছিলাম তা বলতে পারি না।

ছেলেবেলায় দাদার দেওয়া অনেকগুলো বিলিতি ছবির বই দেখে বড়ো হয়েছি। মনে প্রাণে ঐ যাকে বলা যায় রোম্যাণ্টিক। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের রুচিবোধ তাতেই আকৃষ্ট। মসৃণ মুখকে এতো কাটাকুটি করে চেনা লোককে অচেনা করে দেওয়া বা মুখের আদল থেকেও মুখকে ডিজাইনে পরিণত করার মাহাত্ম্য মনে ধরতে চাইত না। ঐ সময়টায় এদিকে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের জের তখনও বর্তমান। স্বদেশী ছবি আর স্বদেশী মনোভাব গড়ে তোলার আদর্শ, খদ্দর পরা, খালি পায়ে চলা, বিদেশী সাবান, তেল বর্জন করা—এসবের মধ্যে মানুষ। কিন্তু চোখে দেখা জিনিসের পুনরাবৃত্তির চেষ্টা যে অনুকরণ করা আর তাতে কৃতিত্ব নেই, ওটাও বিদেশী মনোভাবের পরিচয় দেয়, সেটা বুঝতে বেশ সময় লাগল।

কিঙ্করদা এককালে খুব প্যানেলে পোট্রেট আঁকতেন। আর তাতে চোখে দেখা রঙের বদলে খানিকটা ইমপ্রেশেনিস্টদের মতো আর কতকটা গগন ঠাকুরের ছবির মতো রঙ। অবাক হয়ে দেখতাম।

পেনসিল দিয়ে আঁকার সময়ও দেখেছি খুব সহজেই লোকের মুখ এ'কে ফেলতেন। কিন্তু ওটা নিয়েই নানারকম ভাঙাচোরা করা নেশার মতো পেয়ে বসতো। উনি বলতেন, 'এ হল প্লেন স্টাডি। ছবিতে যেমন লাইন, স্কাল্পচারে তেমনি প্লেন।'

মডেলিং-এর মধ্যে তখন গাঙ্গুলী মহাশয়ের মাথা নিয়ে কুস্তি চলছে। 'কুস্তি' কথাটার অর্থ, ওঁর এই মূর্তি করা নিয়ে কতটা যে খাটুনি যেত সেটা বোঝানো। তখন গাঙ্গুলী মশাই গেরুয়া পরে দাড়ি-গোঁফ আর এক তালপাতার খড়ম পরে চলাফেরা করতেন। কিঙ্করদার পোট্রেট শেষ হতে হতে দাঁড়ি গোঁফ ও গেরুয়া বস্ত্র পরিত্যাগ হয়ে গেছে।

আমার যাবার বছরই আলাউদ্দীন খাঁ, তাঁর অল্প বয়সের ছেলে আলি আকবর

যাঁকে নিয়ে পান্থনিবাসে মাসখানেক ছিলেন[1]। আমরা তখন মাঝে মাঝে দুপুরবেলা ওঁর সরোদ বাজানো অভ্যাস করা শুনতে যেতাম। কিঙ্করদার তখন খুব ক্ল্যাসিকাল গানে মন। উনি ওস্তাদজীকে পান্থশালায় দেখে মডেলিং ঘরে গিয়ে প্যাস্টেল দিয়ে ওঁর মুখ করেন। তারপরই মাটি দিয়ে মাথা আরম্ভ করলেন মন থেকেই। দু-একদিন সামনে বসিয়েও তুলনা করেছেন। যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'উনি যখন বসতে রাজী হচ্ছেন, দেখে করছেন না কেন?' বললেন, 'ওস্তাদজীর আসল ইম্প্রেশন হল, যখন উনি সরোদে আলাপ করেন বা তান দিচ্ছেন। এমনি বসে থাকলে কেমন যেন ম্রিয়মান দেখায়।' ওঁর সিটারদের একদিকে তাকিয়ে থাকা বা চুপচাপ বসে থাকার দরকার করত না। উনি কাজ করার সময় মডেলদের সঙ্গে নানানরকম আলাপ আলোচনা জুড়ে দিতেন। বলতেন, 'কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাতে মুখের মাসলগুলো হাইটন্‌ড্ হয়ে মুখ ভরে যায়। ঐ তো ধরার জিনিস!' আর খুব বলতেন চামড়ার রঙ বা কোয়ালিটির কথা। সাধারণতঃ মানুষের চেহারার থেকে একটু বড়ো করেই বানাতেন। বলতেন, 'মুখে আলো পড়ে মুখ মাপ অনুযায়ী যা আকৃতি তার থেকেও বড়ো দেখায়। অবিকল মাপ অনুযায়ী করলে কেমন যেন মুষড়ে পড়া লাগে। চেহারা র‍্যাডিঅ্যান্ট হওয়া চাই।' এ ধরণের পোট্রেট অনেকের কাছেই একটু বাড়াবাড়ি আর হাসিঠাট্টার বিষয় মনে হলেও আস্তে আস্তে ও কাজের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়ে গেল।

কিঙ্করদার মাটির কাজের মধ্যে যেটা সবচাইতে নজরে পড়ে সেটা ওঁর রিদমিক স্ট্রাকচারের বাঁধন আর তেজস্বী ছন্দের গড়ন। এর অনেক কিছুই যেন ঐ পোট্রেট করা দিয়েই আয়ত্ত করেছেন। ওঁর প্রোপোরশন নিয়ে খেলা, ইম্প্রেশন আর ডিসটরশন—এও পোট্রেটকেই কেন্দ্র করে।

পোট্রেটের সঙ্গে সঙ্গেই মাটি দিয়ে ঐ কাটা পদ্ধতিতে ছোট ছোট নানারকম স্কেচ করে যেতেন। তখন প্লাস্টার অফ প্যারিস দুষ্প্রাপ্য। কলকাতা থেকে আনতে হত বিলিতি আমদানি করা টিন। সাত টাকায় পাঁচ রাউণ্ড। পঁচাত্তর টাকা মাইনেতে ওসব বেশী খরচ করা সম্ভব হত না। আর তখন ফটো নেবারও বিশেষ চল ছিলনা। আদ্দেক কাজ মাটিতেই থেকে যেত যতক্ষণ না ছাদের টালির ফাটল দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে ধুয়ে না যেত। পেন্সিলে স্কেচ করার মতো যে মাটিতেও স্কেচ করা যায় প্রথম দেখলাম। আমার বিশেষ মনে আছে, গুরুদেব গান্ধীজির সংবর্ধনা করার ছোট মাটির স্কেচ। ওটা বহুদিন সামলে রেখেছিলাম। মেহের আলিজীর ইচ্ছে ছিল দেশ স্বাধীন হলে বড়ো করে ঐ মূর্তি দিল্লীতে করাবেন। আর আমার কাছে ছিল গুরুদেবের দাঁড়ানো মূর্তির স্কেচ। সেটা মল্লিকজী নিয়েছিলেন।

১ ১৯৩৫-এ মাইহার রাজদরবার থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব। এ যাত্রায় থাকেন পনের দিন। সঃ

এ সময়টা কিঙ্করদার সঙ্গে কলাভবনের কাজের দিক দিয়ে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। আর অন্য কেউ এদিকে আসত না। ওঁর কাজ নিয়ে পূর্বপল্লীর মাঠের বাড়ীতে প্রায় আলাদাই থাকতেন। কলাভবনের বা আশ্রমের সাধারণ উৎসব, কাজ-কর্মেও বড়ো একটা দেখা যেতনা। এরপরেই নতুন কলাভবনে স্কাল্পচারের স্টুডিয়ো হল। কিঙ্করদাও ঐ শৈল বোঠানের বাড়ী ছেড়ে সঙ্গীতভবনের কাছে জমাদারের পরিত্যক্ত মাটির বাড়ীতে এলেন।

এখানেই ওঁর সবচাইতে ফলপ্রসু সময়। প্রথম সিল্কের উপর আঁকা সোনালী ব্যাকগ্রাউণ্ডে মোটা তুলি দিয়ে (দরকার মতো জুতোর ব্রাসও ব্যবহার করতেন) 'সাঁওতাল দম্পতি'। বোধ হয় ওঁর সবচাইতে বিখ্যাত ছবি। আর রুপোলীরঙের উপর গরুর গাড়ী। 'কোনার্কের পথে'[২]। বন্ধু সুধীর খাস্তগীরের একটা ঐরকম কাপড়ের উপর ড্রেসিং গাউন পরা পোর্ট্রেট করেছিলেন।

এরপর অয়েল পেণ্টিং আরম্ভ পোর্ট্রেট আঁকা নিয়ে। আমি তখন শান্তিনিকেতনের চোখে একটু সাবালক হয়েছি। এবং কলেজের ছাত্র হলেও কলাভবনে থাকার অধিকার হল। আর কিঙ্করদার ঘরে ছবি আঁকার সময় ঢোকার অনুমতি পেয়েছি। উনি কাজ করার সময় কতকগুলো কথা এক্কেবারে অপছন্দ করতেন। যেমন 'সুন্দর হয়েছে'। প্রায়ই মাটির কাজ তাই শুনে ভেঙে ফেলতেন। না হলে বদলে দিতেন। ছবি হলে ওর উপরেই আবার আঁকতেন। উনি বলতেন, 'সুন্দর হলে হবে না। ক্যারেক্টার আনা চাই।'

'সোমা যোশী'র ছবিই অয়েল পেণ্টিং-এর প্রথম পোর্ট্রেট বলে আমার ধারণা। প্রায় রোজই ওর রূপ বদলাচ্ছে। আর স্তরে স্তরে রঙ লেগে উঁচু হয়ে উঠছে। শেষ-মেশ লেপেমুছে গোলগাল পুতুলে পরিণত হল। কে যেন বললো, 'এ-তো পুতুল হয়ে গেল।' তখন খুব খুশী। 'তাহলে হয়েচে'—বলে একটা কুকুর লাগিয়ে দিলেন।

পোর্ট্রেট তো লোক বিশেষের আকৃতি। কিন্তু এযে রঙ লাইনের খেলা আর ছবির মতো হওয়া উচিত এটাই ওঁর কাজে প্রথম দেখা গেল। কিন্তু এইসব অয়েল পেণ্টিং করা নিয়েই একটু মনোমালিন্য দেখা দিল। শান্তিনিকেতনে এতদিনের গড়ে তোলা নিজেদের জীবন পদ্ধতি, ছবি আঁকা, হাতের কাজ সবটাতেই একটা চেষ্টা ছিল বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে নিজস্ব ছাপ বজায় রাখা। আমরা প্রায়ই শুনতাম, 'বাইরের কাজ' আর 'আমাদের কাজ' নিয়ে বাদবিবাদ। নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে ছিল অয়েল কালারে পোর্ট্রেট করা। মন গড়া জিনিস না করে প্রত্যক্ষ দেখে স্টাডি করা। এসবই রিয়্যালিস্টিক কাজের পর্য্যায়ে পড়ত। এসব বিদেশী আদর্শ প্রণোদিত কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে চলতে পারে—শান্তিনিকেতনের আলো বাতাসে অশোভনীয়, উৎকট হয়ে দাঁড়ায়। এসব না-লেখা আইনের উল্লঙ্ঘন করার মনোবৃত্তি

২. ছবিটি প্রয়াত প্রতাপদয়াল দাসের সংগ্রহভুক্ত। সঃ

বা সাহস খুব কম লোকেরই ছিল।

কিঙ্করদা নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে আপন মনে, বাজারে কেনা শুকনো রঙ তিসির তেলে গুলে চটের উপর অথবা সাঁওতালী দু-সুতি চাদরের উপর মোটা মোটা রঙ লাগিয়ে কাজে মত্ত। অমন পর পর অনেকগুলো পোট্রেট করলেন। তারপর তেলরঙের ছবির পালা শুরু। তখনকার করা শিরীষ ফুল আজকালও একেবারে অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি বলে মনে হবে। 'ভলিবল খেলা', 'পিকনিক,' 'প্রসাধন'—এর সবই বিষয়বস্তু আধুনিক। আর প্রায়ই শরীরের গড়ন কাপড়ের থেকেও বেশী দ্রষ্টব্য হয়ে উঠল। এ-সব শান্তিনিকেতনে কেন, এ দেশেই অপরিচিত। আমরা যতই নতুনের ভক্ত হতে চাই, নতুন যদি নির্ধারিত পরিধি অতিক্রম করে—সে অপরিচিত অভিনব রূপ সকলের মনে সহজে রেখাপাত করে না। কিঙ্করদার ছবি ও মূর্তি তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

তখন বড়ো একটা বাঁধা ধরা নিয়ম করে ছবি আঁকানো হত না। যে যার মতো এক-একজনের তত্ত্বাবধানে কাজ করে যেত। বছর গোনা বা পাশ ফেল করার বালাই ছিল না। আমার প্রায় সব শিক্ষাই কিঙ্করদাকে কাজে সাহায্য করা নিয়ে।

শান্তিনিকেতনে প্রতিবছর দল করে যেমন সবাই এক্সকার্সনে যেত আর স্কেচ করত, তেমনিই দল ধরে এক এক বাড়ীর দেয়ালে ছবি আঁকা হত। সব সময়ই যে বেছে বেছে সিনিয়রদেরই নেওয়া হত তা নয়। 'শ্যামলী' আমাদের আগের সময়েই হয়ে গেছে। ওখানেই কিঙ্করদা পোড়ামাটির সাঁওতাল করেছিলেন। আরো অনেকেই রিলিফ প্যানেল করেছেন, তার মধ্যে মাস্টারমশাইও ছিলেন।

আমাদের দ্বিতীয় বছরে কালোমাটির হোস্টেলের দেয়ালে সব মাস্টারমশাইয়ের ফর্মুলায় গোবর, আলকাতরা আর মাটির মশলা দিয়ে কাজ হল[৩]। এক-এক প্যানেল এক-একজনকে দেওয়া হল। বিষয়বস্তু কোচিনের দেয়ালের ছবি, শিবের বিয়ে। স্কাল্পচার আর পেণ্টিং-এর ছাত্রছাত্রীর বাদবিচার ছিল না। কয়েকজনের তত্ত্বাবধান মাস্টারমশাই করলেন। আর দেয়ালের বাইরের কাজ কিঙ্করদার সঙ্গে করা। 'সঙ্গে' কথাটা ব্যবহার করাই উচিত। কারণ 'আসিরিয়ান সিংহ' থেকে 'সাঁওতাল নাচ' পর্য্যন্ত কাজগুলোতে কিঙ্করদার হাত স্পষ্ট। ঐ মাটির মশলা একটু একটু করে লাগাতে হত, না হলে ফেটেও যেত আর খসে পড়ত। ঐ সময়েই ঠাকুর গড়ার মতো বাঁশ আর খড় দিয়ে সাধারণ কাঠামো আর ধাঁচ করার উপর ঐ গোবর আলকাতরা দিয়ে রুদ্র হাঞ্জী সিলোনের অনুরাধাপুরমের ভঙ্গীতে বুদ্ধ গড়েন। পরে সেটায় ফাটল দেখা দিলে কিঙ্করদা সিমেণ্ট লাগিয়ে তার নতুন রূপ দেন।

তখন একটা ছবি খুব প্রিয় ছিল বলে উনি আমায় দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে

৩. 'কালোবাড়ী' বা 'Black House'-এর মাটির দেওয়ালের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৩৬ সালে, শেষ হয় ১৯৩৭ সালে। সঃ

ওটা হারিয়ে গেছে। ক্ষীণকায়া আশ্রম বালিকা। দুদিকে বেণী দোলানো। হাতে একটি আসন। পিছনে আমলকীর সারি। উপরের দিকটা ক্রমেই পাতলা হয়ে গেছে। এরপরই ছোট্ট মাটির স্কেচ হল ক্ষীণকায়া একবেণী। আর আসন হাতে। যেটার কংক্রীটের রূপ নিল 'সুজাতা' বলে। ইউক্যালিপ্টাস গাছের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে।

এই সিমেণ্টের আর খোয়াইয়ের কাঁকড়ে মূর্তি গড়া খোলা জায়গায় অর্থাৎ যেখানে বসানো হবে সেখানেই করা। এধরনের কাজ এর আগে আমাদের দেশে বা আর কোথাও হয়েছে বলে আমি জানি না। এই পদ্ধতি আমাদের আজকালকার জগতে সবচাইতে মূল্যবান টেকনিকের সূত্রপাত করে। যে দেশে পাথর নেই, সেখানে বাইরে রাখার পক্ষে এর মতো উপযুক্ত মিডিয়াম নেই বললেই হয়। মূর্তি ঘরের বাইরে হলে সূর্যের আলো বদলানোর সঙ্গে সেটা কত অন্যরকমের দেখায়, দুপুরবেলা খাড়া রোদে চোখের তলা, গলায় কতটা কালি মাখা লাগবে—এইসব বাছবিছার আর তারই পরখ চলত। তাই দিনের শেষের কাজ অনেক সময়ই পরের দিনের প্রথম আলোর পরীক্ষায় পাশ করত না। কোথাও একটু খুঁত নজরে এল—হাতুড়ি দিয়ে ভাঙতে আরম্ভ করলেন তো সবটাই বাদ দিয়ে আবার প্রায় সবটাই করতে হল। উনি একটা কথা বলতেন, 'অত বড়ো কাজ টুকরো টুকরো করে ফিনিস করলে এক-এক অংশের ট্রিটমেণ্ট ড্রইং ঠিক নাও মিলতে পারে। বেখাপ্পা লাগার ভয়। তাই সবটা একহাতে শেষ হওয়া চাই।' পোট্রেটও তাই। এ ক্ষেত্রেও ঐ এক আদর্শ প্রণোদিত হয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে পারতেন। তখন যেমন শরীর তেমনিই মনের জোর। এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে এতো খুঁতখুঁতে ছিলেন আর এতোই আনকম্প্রমাইজিং ছিলেন যে তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, সময় ও বহুমূল্য সিমেণ্ট—কোনো কথাই মনে আসত না। একটা কথা খুব প্রিয় ছিল। বলতেন, 'আমরা হচ্ছি চাপাইচ্চি কি নামাইচ্চির দেশের লোক। খাটনীতে ভয় পাই না[৪]।'

টেক্সচার বা সারফেস ট্রিটমেণ্ট ওঁর পোট্রেট করার সময় থেকেই খুব প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কংক্রীটের কাজের সময় ওরই এক নতুন ধরন হল। কাঁকড়, বালি আর সিমেণ্টের মশলা ছুড়ে লাগাতেন। আর্মেচারে যেটুকু লেগে থাকত তারই মধ্যে থেকে স্প্যাচুলা দিয়ে হাত মুখ বের করতেন। বাকীটা ঝেড়ে ফেলতেন। অত বড়ো মূর্তি করা আর মনোমত না হলে ভাঙাচোরা নিয়ে মাসের পর মাস কাটিয়েছেন। এর কুলি মজুরের খরচ জুগিয়েছেন নন্দলাল। ওঁর কাজ যেখানে হত সেখানেই একটা তাঁবু লাগিয়ে একটা চা খাবার জায়গা হত। আর সেখানে মাঝে মাঝে বিনোদদা, মাস্টারমশাইদের আড্ডা বসতো।

৪. বাঁকুড়ার বাঁধুনী বামুনদের নিয়ে এই ঠাট্টা। সঃ

এরপর আমি পাকাপাকি কলাভবনে কিঙ্করদার ছাত্র হয়ে কাজ করি আর কলেজে ক্লাস করতে যাই। প্রভাস সেন, সন্তোষ রায়, কমলনয়ন-এরা সবাই মিলে নতুন মেয়েদের স্টুডিওতে ঔরঙ্গাবাদ গুহার ডানসিংগ্রুপ স্টাকো করা হল। এককালে ইলোরা দেখতে গিয়ে ওটা দেখেছিলাম। কিন্তু খুব একটা কিছু মনে ছিল না। কিঙ্করদা তো দেখেনই নি। আকারে ছোট হলেও যে ট্রিটমেন্টের জন্যে কত বড়ো দেখায় আর ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল ট্রিটমেন্টে কি ধরণের সারফেস ডিটেল বাদ দেওয়াতে মনুমেণ্টাল রূপ নিয়েছে—কাজ করে তার সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ হল। আরেকটা দেখেছি, সেও ঐ আলোর ব্যাপার। গরমের সময় ঠিক হল আলো জ্বালিয়ে রাতে কাজ করা। রাতের আলোয় ছায়া পড়ে মূর্তির যে রূপ দেখা যায়, দিনের ডিফিউসড আলোতে তা সম্পূর্ণ অন্য ভাব এনে দেয়। এই নৃত্যমগ্ন সুন্দরী ও তাঁর বাদ্যবৃন্দের গ্রুপ ইদানিং উইয়ের ঢিপি হয়ে এখনও টিঁকে আছে। হাই রিলিফ এবং প্লাস্টার দিয়ে গড়ে তোলা রিলিফের এই হল নমুনা। ওটাতে শেষ পর্য্যন্ত গুরুদেবের 'নৃত্যের তালে তালে' গান লিখে গুরুদেবের ও শান্তিনিকেতনের পরিবেশের অঙ্গ করে নেওয়া হল।

কিঙ্করদার তখন অদম্য উৎসাহ। আর সেই উৎসাহে অনুপ্রাণিত আমরা চেলা-চামুণ্ডার দল। কথা হল যে ঐসব বারে বারে ভাঙা গড়া না করে ওর মাটির বা প্লাস্টারের স্কেচ ( ম্যাকেট ) কাঠের কাঠামোতে এনলার্জ করে, তার উপর পাতলা সিমেণ্টের প্লাস্টার লাগানো হবে। আর ওটা পালিশ করা হবে।

প্রভাস সেন, কমলনয়ন, সন্তোষ আমরা সবাই ও'র কর্মীর দলে। এক সেট হাতুড়ি, বাটালি কিনতে হল। মাস্টারমশাই অনেক চিন্তা করে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক দিলেন। বললেন, 'হিসেব করে যা না হলেই নয় তাই কিনো।' অনেক মাথা ঘামিয়ে আমরা কুড়ি টাকা দিয়ে করাত, হাতুড়ি, বাটালি, প্লায়ার্স ইত্যাদি কিনে স্টুডিয়োতে ঠোকাঠুকি করে এনলার্জমেণ্ট শুরু করি। প্রথমেই বই দেখে এনলার্জিং কম্পাস তৈরী হল। আমাদের এই আর্মেচার বা কাঠামোর আদর্শ হল সারজেণ্ট জ্যাগারের ওয়র মেমোরিয়াল মূর্তির ছবি। ওসবের হিসেব কর্তা হলেন প্রভাস সেন। তখন প্লাস্টার মোল্ড নেওয়া পর্য্যন্ত একটা ভীষণ ব্যাপার ছিল। প্রথমটায় তো ল্যানটেরির বই পড়ে গরম হলে প্লাস্টার গোলা, প্রত্যেকবার সে পাত্র ধুয়ে মুছে আবার করা—কত কাণ্ডই না হত।

একবার কিঙ্করদা আলাদা করে দুভাগের ছাঁচ না নিয়ে ঠিক করলেন মাটির মূর্তির গায়ে শক্ত (twine) সুতো আটকে দেওয়া, তারপর প্লাস্টার লাগানো। আর ঐ সুতো দুদিক থেকে টেনে নেওয়া। তাহলেই দুভাগ হয়ে যাবে। প্লাস্টার যখন লাগানো হল, সুতো ধরে টান দিতে সুতোই ছিঁড়ে গেল! এসবে মোটেই দমতেন না। বলতেন, 'থাকগে আবার অন্যভাবে করা যাবে।'

শেষ পর্য্যন্ত রাতদিন খেটে ঐ কাঠের কাঠামো নিয়ে আমরা সবাই হৈহৈ করে

গেস্টহাউসের সামনে ওটাকে বসালাম[৫]। কাজ প্রায় নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। প্রায় মানে খালি দু-তিন জায়গায় ওসব অদল-বদল করা যা কিঙ্করদার কাজের পক্ষে অভাবনীয়। মাস্টারমশাইয়েরও খুব উৎসাহ। রঙীন সিমেণ্ট এল। মার্বেলের গুঁড়ো মিশিয়ে ঐ সিমেণ্ট একজায়গায় নীল আর সবুজ মিশিয়ে সিমেণ্টের উপর পালিশ হল। এরই মধ্যে ওটার ভিতর আলো জ্বালাবার কথা মনে হল। উত্তরায়ণের মিস্ত্রীদের সাহায্য তার জন্যে পাইপও কাঠামোর ভিতর লুকোনো হল। আমরা মহাউৎসাহে নানারকম পালিশ করা পাথর দিয়ে রাতদিন ঘষছি। মার্বেলে তো কোনদিন হাত দিইনি। এই আমাদের দইয়ের সাধ ঘোলে মেটানো।

গুরুদেব অসুখে পড়ার ঠিক আগেই কিঙ্করদা গুরুদেবকে দেখে মাটি দিয়ে মূর্তি করেন। গুরুদেব উত্তরায়ণের বড়ো ঘরটার পশ্চিমদিকে জানালার সামনে বসে লিখছেন। আর কিঙ্করদা জানালার বাইরে মাটির কাজ করে যাচ্ছেন। সিটিং দেওয়া বলতে আমরা যা মনে করি তা মোটেই নয়। কদিন করার পর এটা ঢেকে রাখা হয়। স্টুডিওতে এসে উনি মনগড়া দুই হাত সমেত কাজে ব্যস্ত গুরুদেবের টবসো পর্যন্ত একটা মূর্তি করেন। এটাই বোধহয় ওঁর করা সবচাইতে রিয়ালিস্টিক ট্রিটমেণ্ট। লাইজ সাইজ থেকে বেশ খানিকটা বড়ো। মাস্টারমশাই দেখে খুবই খুশী। বললেন, 'বম্বের কার্মারকারকে লিখে ওটা মার্বেলে করাতে হবে।' তখন প্লাস্টার কাস্ট থেকে মার্বেলে কপি বম্বেতেই বেশী হত।

আমাদের দল রাতদুপুর পর্যন্ত খেটে ওটার কাস্ট শেষ করল। তখনকার দিনে ওটাই আমার সবচাইতে বড়ো কাস্টিং। বাকি সবই তো সিমেণ্টে ডাইরেক্ট করা কাজ।

সকালে স্টুডিয়ো থেকে হাতুড়ির শব্দ! যখন ঢোকার অনুমতি পেলাম তখন সে মূর্তি চৌচির করে স্টুডিয়োর পিছনে সমাধি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে! কাউকে বলা মানা। মাস্টারমশাইদের বলা হল ওটা যত্ন করে স্টুডিয়োর ছাদের উপর রাখা আছে।

পরে ঐ প্রথমে করা স্কেচটাই কাস্ট করলেন। সেই মূর্তি নিয়েই বঙ্গ সরকারের মন্ত্রীর আক্ষেপ থেকেই বোঝা যায় দেশের রুচিবোধ। ঐ সময় করা রবীন্দ্রনাথের অ্যাবস্ট্রাক্ট মূর্তিই কিঙ্করদার কাজের এক নতুন পর্যায় এনে দিল। রবীন্দ্রনাথের নিজের করা সেলফ পোট্রেট আর বিভিন্ন ভঙ্গীতে আঁকা কাল্পনিক মুখমণ্ডল তখনকার শান্তিনিকেতনের সব তত্ত্ব, সব আদর্শেরই বাইরে। নেহাৎ এ মূর্তি মনগড়া আর রেখাপ্রধান হওয়াতে জোড়াসাঁকো উদ্ভুত পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নেওয়া হল। যেমন তখন অবনীন্দ্রনাথের কুটুম-কাটামের নতুনত্ব বা গগন ঠাকুরের ছবিতে কিউবিস্ট ভাবনার আমেজ মেনে নেওয়া হয়েছিল। তবে জোড়াসাঁকো আর উত্তরায়ণে যা সম্ভব শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অতটা আশা করা যেত না।

গুরুদেবের ছবির সুন্দর অসুন্দরকে কেন্দ্র করে চল্লিশের শান্তিনিকেতন এক

৫. কাজটির নাম 'ল্যাম্প স্ট্যাণ্ড' বা 'বাতি দান'। এটি হয় ১৯৪০ সালে। সঃ

নতুন অনুভূতির মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি তখনকার শান্তি-নিকেতন গ্রাহ্য ছবির মাপকাঠিতে সবার কাছে প্রিয় হয়নি। গুরুদেবের সৃষ্টি বলে অবাক ভক্তিভরে দূর থেকে প্রণাম করেছে। তাঁর কাজে আকৃষ্ট হয়ে প্রভাবান্বিত হয়েছে—এর দৃষ্টান্ত শান্তিনিকেতনে বা বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায় না। তেমনিই কুটুম-কাটামে আর তার অভিনব রূপ মাধুর্যে বা নতুন রসে আমাদের ভাস্করদের মনে রেখাপাত করেছে—এর নিদর্শন পাওয়া যায়না। এ বিষয়ে রামকিঙ্কর ছবি ও মূর্তিতে ওঁদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত।

কিঙ্করদার এই-ই কনস্ট্রাকটিভিসমের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কাজ। চারিদিকে আবার টেকসচারের মতো লেখা হল ঃ অসীম অনন্ত। গুরুদেবের প্রতি ভক্তিভরে করা জিনিস অশ্রদ্ধার হতেই পারে না। তাই ওটাকে তখনকার মিউজিয়ামের উপরেই রাখা হল। যার ইচ্ছা দূর থেকে দেখতে পারবে। ঐ দেখে করা এক্সপ্রেসনিস্ট বলিষ্ঠ কাজটাই সিমেণ্ট কাস্ট করে স্কাল্পচার স্টুডিয়োর পাশে স্থান পেল।

কলাভবনে দল করে কাজ করার সবচাইতে মনে রাখার মতো ঘটনা চীনাভবনে বিয়াল্লিশ সালেব ফ্রেস্কো আর রিলিফ করা। অমনভাবে অতগুলো আলাদা দল একসাথে আনন্দে কাজ করা আমরা আর দেখিনি। সবাই নিজের নিজের সহায়ক দল নিয়ে জায়গা ভাগ করে নিলেন। গৌরীদির[৬] দল করলেন মধ্যের বড়ো ঘরটায় ধ্যানীবুদ্ধের 'মার'। বাইরের দেয়ালে বিশুদা[৭], মাসোজী—কেউই বাদ যাননি। দোতলায় সিঁড়ির উপর বিনোদদা চীনাভবনে লাইব্রেরীর ছোট ছোট বিষয়ে নিয়ে ছবি আর ছবির সঙ্গে লেখা। বিনোদদার সোজাসুজি তুলি দিয়ে স্কেচ করার সময় চলছে। যেকেউ একটা কাগজ মাউণ্ট করে আনলেই তাতে এঁকে দিতেন। দেয়ালে আঁকার জন্যে ডালের ডগা থেঁৎলে যেমন দাঁতন হয়, অমনি করে তুলির বদলে বালির প্লাস্টারের উপর আঁকলেন। সবার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মাস্টারমশাই তখনও কাজ শুরু করেননি। শেষে একদিনেই সবটা সামনের দেয়াল জুড়ে তুলির বদলে কাপড়ের পুঁটুলিতে রঙ দিয়ে আঁকলেন। ওঁর করা শান্তিনিকেতনের সব কাজের মধ্যে তাক লাগানো কাজ।

কিঙ্করদা ওঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুরুদেবের এক একটি নাটক নিয়ে প্যানেল করা ঠিক করলেন বাইরের দেয়ালে। ঠিক হল সুরকি আর সিমেণ্ট মিশিয়ে, প্লাস্টার লাগিয়ে, সেটা কেটে নতুন ধরণের স্টাকো করা হবে। নানারকম স্কেচ আর মাটিতে তার নক্সা তৈরী হল। সুরকি আর সিমেণ্টের প্রোপোরশন নিয়ে পরীক্ষা হল। আমরা আবার ছোট ছোট টাইল করে তাতেই কাটার অভ্যাস করলাম। কিন্তু কাজ

৬. গৌরী বসু (ভঞ্জ), নন্দলাল বসুর কন্যা

৭. বিশ্বরূপ বসু, নন্দলালের পুত্র

আদ্দেক এগোনোর পর সবই বদলে গেল। সব ভেঙে ফেলে আবার নতুন প্লাস্টার। আমরা তো হতাশ! কিঙ্করদা বলতেন, 'এ হল পাঠ মুখস্থ করে আবৃত্তি করা আর স্টেজে রঙ মেখে পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার মতো। দুই-ই কি এক জিনিস হয়? এখানে সব কাজগুলোই এক হাতের মতো হতে হবে।' শান্তিনিকেতনে এ-ধরণের কাজের উৎসব আর হয়নি।

গুরুদেবের মৃত্যু। বিয়াল্লিশের রাজনৈতিক উত্তেজনায় ছেলেদের মধ্যে চাঞ্চল্য। আর মাস্টারমশাইয়ের গুরুদেবের অবর্তমানে শান্তিনিকেতনের ট্র্যাডিশন রক্ষা করা নিয়ে দুশ্চিন্তা-এসে দাঁড়াল বাধা তুলে।

মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কিঙ্করদার সম্বন্ধ শুধু গুরুশিষ্যের ছিলনা। ছেলেবেলা থেকে প্রায় এক পরিবারের মতোই বড়ো হয়েছেন। কিন্তু বয়সকালে সহকর্মীর সম্মান সব জায়গাতেই দিয়েছেন। ওঁর ড্রইং-এর দক্ষতার গুণগ্রাহী ছিলেন। আমাদের সঙ্গে কথাচ্ছলে এসব প্রকাশ পেত। কোনো কাজের মধ্যে ড্রইং-এর অভাব বা ডিসটর্শনের প্রভাব দেখলে বলতেন 'আগে কিঙ্করের মতো আঁকতে শেখো। চোখ তৈরী হোক, তারপর যা কর মেনে নেব।'

ওঁর একটা খুব প্রিয় উদাহরণ ছিল, 'যে খুঁড়িয়ে চলে, সে যদি বলে আমি খুঁড়িয়ে চলছি না, এটা আমার নাচের ছন্দ তা হলে মানবো কি করে। জানি, নৃত্যের ছন্দ আয়ত্ব করা হাঁটা থেকে অনেক উঁচু স্তরের জিনিস। আমি বলব, আগে কয়েক পা সোজা হেঁটে দেখাও। তারপর মেনে নেব তুমি খোঁড়া নও, সত্যিই নৃত্যে পারদর্শী। কিঙ্করের কাজে হাঁটাও আছে, আবার নাচার ভঙ্গীও আছে।'

আবার একসময় বলতেন, 'যারা আমার কাছে এসেছে, আমার সঙ্গে এতদিন কাজ করেছে তাদের সঙ্গে অনেক সময় একমত না হতে পারি। আমার ছেলের সঙ্গেও আমার অনেক বিষয়ে একমত হয় না। তাই বলে তাকে তো ঘরছাড়া করতে পারি না। আমার পুরোনো ছাত্রদের সঙ্গে ঐরকমের সম্পর্ক হয়ে গেছে।'

তবে সবসময় প্রকাশভঙ্গী ধরা-বাঁধা সমাজগ্রাহ্য সীমা অতিক্রম করলে দুঃখ পেতেন। বাইরে তা প্রকাশ না করলেও শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠিত পরম্পরা অমান্য করা সম্বন্ধে দৃঢ় মত ছিল।

কিঙ্করদার করা ছোট ছোট স্কেচ দু-একটাতে রূপরেখা আর ছন্দের অন্তরালে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমালিঙ্গন বা মিথুনও মনে হতে পারত। তবে ওগুলো স্কাল্পচার হিসেবে স্পন্দিত প্রাণের ছন্দোময় রূপই দর্শনীয় হয়েছিল। প্রকাশ্য, খোলা জায়গায় এ অর্ধনগ্নতা অ্যাবস্ট্রাক্শন বা সিম্পলিফিকেশনের উদাহরণ হলেও শান্তিনিকেতনের ট্র্যাডিশন বিরোধী। পরে কিঙ্করদার কাছে শুনেছি ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগঃ 'তাহলে তুমি ট্র্যাডিশনে বিশ্বাস কর না।' কিঙ্করদা বললেন, 'আমি কি করে বোঝাই, এযে স্কাল্পচার। এতো ঠাকুর গড়া নয়, আল্পনাও নয়। এর ট্র্যাডিশনই যে আলাদা হবে।' একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই-ই কিঙ্করদার মূর্তির কাজের জেনিথ।

এরপর কিঙ্করদার বাইরে মূর্তিগড়ার আর উৎসাহ রইল না। বহু বছর পর, ১৯৫২ সাল হবে, এক বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা হয়—'আন্‌নোন্‌ পলিটিক্যাল প্রিসনার'। কিঙ্করদাও আমন্ত্রিত। উনি ধানঝাড়ার একটা মস্তকহীন ছোট মডেল করে বোম্বেতে পাঠালেন। পরে উনি বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কলাবিভাগের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে আসেন। সঙ্গে ঐ স্কেচ—আমায় দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'Unknown political prisoner-এর প্রতীক আপনি কি করে বলছেন?' ওঁর উত্তর, 'যখন ওদিকে লড়াই চলছে। বিয়াল্লিশের উত্তেজনায় গুলি চলছে। দুর্ভিক্ষ হল। তখন আসলে ভুক্তভোগী কারা? পোলিটিসিয়ানরা তো জেলে গিয়ে বসে আছেন। এই মাঠে কাজ করা কুলি-মজুরই তো আসল প্রিসনার!'

বিয়াল্লিশের আন্দোলন আর তারপরের দুর্ভিক্ষ কিঙ্করদার কাজের দিকে ও মনে বিশাল পরিবর্তন এনে দিল। চারদিকের হুজুগের মধ্যে আমরাও মেতে উঠলাম। কাজের দিকে মন নেই। মাস্টারমশাই চিরকালের খদ্দরপরা গান্ধীভক্ত। কিন্তু প্রকাশ্যে কাউকে কিছু বলতেন না। কিঙ্করদা বলতেন, 'সবার সব কাজ খাটে না। আমাদের এসবের জবাব আমাদের মতো করে দিতে হবে।'

হিড়িকে জুটে গিয়ে বছরখানেক পর যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে আসি, দেখি কিঙ্করদার করা প্রথম মর্মান্তিক ছবি। কঙ্কালসার মৃতদেহ গাছের ডালে ঝুলছে। নীচে অনাহারক্লিষ্ট মা ও ছেলে। হাতে শূন্য পাত্র। গাছের গায়ে এক পোস্টারের অংশ দেখা যাচ্ছে 'Support war effort'.

এই হল কিঙ্করদার বিয়াল্লিশ সালের যুদ্ধবিরোধিতার, দুর্ভিক্ষের জবাব। আমাদের দেশের সোশ্যাল রিয়ালিজমের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এধরনের ছবি শান্তি-নিকেতনের এক অভিনব ঘটনা। বিশেষ করে তখন আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে শান্তিনিকেতনে কোনোরকম উত্তেজনায় যোগ দেওয়া নিষেধ ছিল। অবশ্য ওঁর করা কোনো ছবিই ঘরের বাইরে বড়ো একটা আসত না। কলাভবনেও দেখানো হত না। তাই নিয়ে কোন আলোড়নও হয়নি। তবে তখনও ওঁর বন্ধুমহলে ও গুণগ্রাহীদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা হয়। স্কাল্পচারেও তখন কঙ্কালসার মূর্তি, হাতে খালি বাটি, এ সবই তখনকার দুঃখকষ্টের মধ্যেই নিবন্ধ। এ সময়ের আর একটা উল্লেখযোগ্য ছবি 'যোগীনের মৃত্যু'। ঐ চায়ের দোকান যে কিঙ্করদার জীবনে কত মূল্যবান ছিল আর যোগীন তার প্রাণ—এও তখনকার এক পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকবে। এরপর আর আগের মতো সেন্টিমেন্টাল বস্তু ওঁকে আকৃষ্ট করেনি।

কলাভবনের টাইম টেবিল হল। নতুন পদ্ধতি অনুসারে সবাইকে সবকাজ করতে হবে ব্যক্তিগত শিক্ষকের দলের সঙ্গে। কিঙ্করদার কাজ করার দলও ভেঙে গেল। আর নিজের ইচ্ছামত স্কাল্পচার করার উৎসাহও ক্রমে থেমে এল। তখন বাইরের ক্ষেতখামারের স্কেচ আর তারই ছবি করে বেরিয়েছেন। ধানকাটা, সাঁওতাল মজুরদের জীবন, মধ্যাহ্নভোজন—এসব ছবি এই সময়ের।

এরপর ওঁর আর একটাই নিজের ইচ্ছে মতো করা কাজ, সেও সাঁওতাল মেঝেনদের প্রাণদীপ্ত হালকা চলা। হাওয়ায় আঁচলের দোলা কংক্রীটেও যে সম্ভব, তাও দেখলাম। তবে কাজের দিকে এই ওঁর প্রথম বারোক ঢঙের মতো বেশবিন্যাসের আধিক্য। শান্তিনিকেতন ও কলাভবনের মাটিতে যতই বাঁধাধরা পড়াশুনা-শৃঙ্খল চাপানোর চেষ্টা হল, ততোই এর এতদিনে গড়ে তোলা জীবনপ্রবাহ ও কাজের আদর্শের ব্যাঘাত হতে লাগল।

বেশ কয়েক বছর পর মাস্টারমশাইকে ললিতকলার ফেলো পদে আসীন হবার জন্য সংবর্ধনা করতে এলাম। স্টেশনে রিক্সাওয়ালা গেস্টহাউসে যাব শুনে জিজ্ঞাসা করল 'কোন গেস্ট হাউস ?' অনেক বোঝানোর পর বলল, 'তবে পূর্বপল্লীতে চলুন।' ভুবনডাঙার মাঠের উল্টো দিকে পথ ঘুরল। ওদিকেও বাড়ী ঘর হয়ে গেছে। যখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় চলেছ ?' উত্তর এল, 'এখন সেই শান্তিনির লাল রাস্তা কালো হয়ে গিয়েছে। এখন আর সেই আশ্রম পাবেন নাকো।'

বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি হল। পূর্বপল্লীর মাঠে মফঃস্বলের সিনেমা ঘরের মতো C.P.W.D-র করা বিরাট সৌধমালা। ভাইসচ্যান্সেলার গাড়ী করে যাতায়াত করছেন। পাবলিক রিলেশন্‌স অফিসার গেস্টহাউস দেখাশুনা করছেন। অধ্যাপকদের আয় বাড়ল। নতুন পদমর্যাদা হল। লেকচারার, রীডার আর প্রফেসর পদে মণ্ডিত হয়ে নতুন আইন অনুসারে মাস্টারমশাইয়ের বয়স হিসাবে তিনি কাজের বাইরে গেছেন। বাইরে থেকে নতুন অধ্যক্ষ আনা হয়েছে। বিনোদদা, কিঙ্করদা নতুন সোপানের নিম্নস্তরেই লেকচারার হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সেই মনের সুখে গলা ছেড়ে গান করা বা দুপুর রোদে মাথাল মাথায়, ঘর্মাক্ত কলেবরে কাজ করার শাস্তি থেকে রেহাই মিলেছে!

মাস্টারমশাইয়ের শ্রাদ্ধের সময় পুরনো কলাভবনের শেষ দৃশ্য। কিঙ্করদার ধানঝাড়া মূর্তি বিসদৃশ বলে কবে যেন সরিয়ে ফেলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাধ করে নাম দেওয়া নন্দন-এর সামনেটায় গোয়েঙ্কার টাকায় মেয়েদের নতুন হোস্টেল সম্প্রসারিত। মাস্টারমশাইয়ের করানো বাঘগুহার ছবির ঘর মেয়েদের রোগী থাকার ঘর ও স্নানঘরে পরিণত।

কিঙ্করদার দেখা পেলাম ওঁর এক ছাত্রের দেওয়া মাটির ঘরের বারান্দায়। চারিদিকে গরু, বাছুর, ঘরবাড়ী। বেশ পাড়াগাঁয়ের বস্তীর মতো। ভাঙা চাল। কি কাজ করছেন জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জা করে। 'কেমন আছেন ?' জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'ওসব কথা ছেড়ে দাও। মোড়াটা নিয়ে বসো। একটা গান গাও দিকি।'

আমার মা বলতেন, জীবনের পূর্ণতার লক্ষণ নিরানন্দ-নিরাসক্ত হওয়া।

তাই হয়ে গেল। এখন খালি পড়ে রইল শূন্যভিটে আর কতকগুলো সাঁওতালদের মূর্তি। ঐ মূর্তিই এই জীবনের নিদর্শন। যা ভারতবর্ষের আধুনিক ভাস্কর্যের আদিপর্ব হয়ে থাকবে।

## শিল্পী-মানুষ রামকিঙ্কর

................................

জয়া আপ্পাস্বামী

স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চারিত কিছু কিছু শিল্পী জন্মগ্রহণ করেন। রামকিঙ্কর ছিলেন সেইরকম একজন। তাঁকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা যাবে না। এবং তিনিও তা অস্বীকার করবেন। কারণ তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী।

রামকিঙ্কর এমন একটা সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন শিল্পীরা ছিলেন এক একটি শিল্পীগোষ্ঠীর ( school ) অধীনে। কিন্তু তিনি একটি শিল্পীগোষ্ঠীর ভিতরে থেকেও ছিলেন বাইরে। যাকে বলা যেতে পাবে এক প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। যদিও তিনি তাঁর সময়, তাঁর পরিবেশ, তাঁর সংস্কৃতির ভিতরে ছিলেন তবুও তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন সেইসব। বস্তুতঃ তিনি যে সংস্কৃতির মধ্যে লালিত হয়েছিলেন, যে সংস্কৃতি তাঁর অভিজ্ঞতায় ছিল, তিনি তৈরী করেছিলেন তারও থেকে বিশাল, ব্যাপক এক সংস্কৃতি। তাঁর নিজস্ব শৈলী এবং রূপকল্পের মধ্য দিয়ে তাকে তিনি নিয়ে যেতে পেরেছিলেন এক উন্নত ধাবায়। তাঁর সময়ের প্রাণহীন, অ্যাকাডেমিক-সর্বস্ব চর্চা থেকে সরে এসে বিশেষভাবে তাঁর সমকালীন ভাস্কর্যে তিনি এনে দিয়েছিলেন এক নতুন প্রাণশক্তি।

বাঁকুড়ার এক দরিদ্র পরিবারে রামকিঙ্করের জন্ম হয়। যখন শিশু তখনই ছিলেন দরিদ্র। সুতরাং কাজ আরম্ভ করা ছাড়া নিজের পছন্দ-অপছন্দের কোন প্রশ্নই ছিল না। তিনি নাটকের দলে যোগ দেন। এবং মঞ্চ অলংকরণ ও দৃশ্যপট আঁকেন। সম্ভবতঃ রামকিঙ্কর রঙ ব্যবহার করবার অভিজ্ঞতা সর্বপ্রথম রপ্ত করেন এখান থেকেই। এটাও মনে করা যেতে পারে যে এই ধরনের কাজই দুর্দান্ত, আবেগীয় এবং নাটকীয়ভাবে রঙ ব্যবহার করবার সুযোগ এবং ক্ষেত্র দুটোই এনে দেয় তাঁকে।

১৯১৯ সালে কলাভবনের শিল্প শিক্ষা ছিল ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে এবং পরীক্ষামূলক। যেহেতু তখন ছিল প্রস্তুতিপর্ব, যখন কবি তাঁর নতুন শিক্ষা কল্পনা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন। পরিবেশও ছিল পরীক্ষামূলক এবং স্বাধীন। তখন ছাত্ররা শিল্পের আইন-কানুন যত না শিখত তার চেয়ে নিজেদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলার দিকে জোর দিত বেশী। আর নিজের নিজের ক্ষমতা বা প্রকৃতি অনুযায়ী শিল্পকলার প্রকাশ হত সাবলীল ও অনায়াস। শান্তিনিকেতনের গোড়ার দিকে এটাই ছিল প্রাথমিক প্রয়োজন এবং রীতিনীতি। ছাত্ররা এই পরীক্ষামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে লালিত হত। প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা বিজ্ঞান ও শিল্পকে গুরুত্ব

দিয়ে তারা প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে উঠত এবং জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে জারিত করে জীবনকে করে তোলা হত সৃষ্টির অংশ।

রামকিংকরের মানস প্রকৃতিও তাঁর শিল্পধারাকে বোঝবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। গতিময়তা, আবেগপ্রবণ, বোহেমিয়ান এবং আদিম শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন তিনি। পার্থিব নিয়মেই তিনি জীবনকে, প্রকৃতিকে আর তার রূপকে ভালবেসে বাধা-বন্ধনহীন শক্তিতে রূপের আলোকে বেঁধেছিলেন তাদের। রামকিংকর ছিলেন মাটির এবং প্রকৃতির মানুষ। শিল্পকলায় তাঁর দীর্ঘ শিক্ষানবীশি এবং স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তার সহাবস্থান তাঁর মৌলিক এবং আবেগীয় প্রকাশকে কখনোই ম্লান ও অনুজ্জ্বল করে দিতে পারে নি। যে রোমাণ্টিকতা তাঁর ভবঘুরেপনার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল তা ছিল স্বাভাবিক। এবং যার জন্ম হয়েছিল তাঁর আটপৌবে জীবনধারা থেকে।

রামকিংকরের শক্তি বহুধারায় ধাবিত হয়েছিল। প্রথমতঃ তিনি প্রকৃতিকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। বাইবের খোলা জগৎ ছিল তাঁর প্রকৃত ঘর। ছোট ছোট সাওতাল পল্লী ঘেরা রৌদ্রস্নাত এবড়ো-থেবড়ো নিসর্গ পথে পথে দীর্ঘ পর্যটনে বহুসময় কাটিয়ে দিতেন তিনি। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আসা সেইসব দৃশ্যাবলী, মেষপালক সেইসব মানুষজন, তাদের কুকুব আর জীবজন্তু, শুকিয়ে আসা শীর্ণ মরা নদী, ছিন্নপত্র বৃক্ষরাজী আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়—এসবই ছিল তাঁর সবচেয়ে ভালো কাজের বিষয়। নাটক এবং গানে ছিল তাঁর স্বাভাবিক ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়াও মাঝে মাঝে উদাত্ত গলায় গেয়ে উঠতেন বাউল সঙ্গীত। তিনি গাইতেন কারণ অনুভূতি আর স্বাদ-বৈচিত্রে ভরা সেই গানের কথা ও সুর অন্য এক জগতে নিয়ে যেত তাঁকে। গাইতে গাইতে তিনি আবিষ্কার করতেন তাঁর হৃদয়ের ব্যথা আর আত্মার ক্লান্তি যেন এই গানগুলির ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। নাটকও ভালো-বাসতেন রামকিংকর। প্রায়ই নাটক নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতেন। কখনো কখনো নিখুঁতভাবে কিছু নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন তিনি। নাটক নির্বাচন এবং উপস্থাপনা উভয়ক্ষেত্রেই ছাত্রদের কাছে সেগুলি ছিল রীতি বহির্ভূত সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতার ফসল। তাঁর করা সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল এব একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যেতে পারে। এইসমস্ত কাজকর্ম একজন শিল্পীর বহুমুখিনতা এবং বিরামহীন সৃষ্টির ইচ্ছাকেই নির্দেশ করে।

চিত্র ও ভাস্কর্য উভয়ক্ষেত্রেই রামকিংকরের শিল্প সৃষ্টির স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। গোড়ায় তাঁর শিক্ষা ছিল বাংলা কলমের ধারায় ( style of Bengal Schools)। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই তিনি সেই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এক স্বতন্ত্র ধারায়। ইমপ্রেসনইজম এবং এক্সপ্রেসনইজম উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর নিজস্ব ধারা নিহিত আছে। পশ্চিমী থেকে আমদানি বলতে যা বোঝায় সেই টার্ম কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবহার করছি না। কিন্তু আমি বলতে চাইছি সেই শিল্পগুণের কথা যা রামকিঙ্করের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই এসেছিল।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদানের জন্যই আমরা অনেকক্ষেত্রেই চিত্রকর রাম-কিঙ্করকে এড়িয়ে যাই। এটা জোর দিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে যে চিত্রকর হিসাবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে এখানে সেইসময়ের কথা মনে রাখা দরকার যখন ডেকোরেটিভ এবং নস্টালজিক স্টাইলসর্বস্ব চিরাচারিত প্রথার বাইরে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ এক নতুন ধারার সূচনা করে। ওয়াশ ও টেম্পারায় যদিও তিনি হাত পাকান তবুও বলা যেতে পারে রামকিঙ্কর ছিলেন প্রথম দিককার এমন একজন চিত্রকর যিনি পশ্চিমী কোন চিত্র শিক্ষকের কাছে শিক্ষা না নিয়েও জল এবং তেলরঙের ব্যবহার করেন। এবং স্বকীয় চিন্তা ও মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখেন দুটি ক্ষেত্রেই। সবশেষে ড্রইং-এ তাঁর দক্ষতার কথা বলা যেতে পারে। তাঁর স্কেচের বেশীরভাগটাই ছিল শান্তিনিকেতনের চারপাশের জীবনধারাকে কেন্দ্র করে। যে জীবন তিনি খুব কাছ থেকে যত্নের সঙ্গে অসীম মমতায় লক্ষ করেছিলেন। এবং এঁকেছিলেন সংক্ষিপ্ততায় আর কবির যথার্থ উদ্দীপনায়।

রামকিঙ্করের গুরুত্বপূর্ণ ছবিগুলির সময়সীমা ১৯৩০ থেকে ধরা যায়। এবং তাঁর সামগ্রিক চিত্রধারাকে তিনটি পরিষ্কার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ পোট্রেট। দ্বিতীয়তঃ ল্যাণ্ডস্কেপ, যার বেশীরভাগই জলরঙের। এবং তৃতীয়তঃ তেলরঙে করা কম্পোজিশন।

পোট্রেট আঁকিয়ে হিসাবে বিখ্যাত সেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর রামকিঙ্করই হলেন একমাত্র শিল্পী যিনি নব্য-ভারতীয় ধারায় উৎসাহের সঙ্গে পোট্রেট করেছেন। এইসব কাজের বেশীরভাগই হল তেলরঙের। এবং কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির স্টাডি যাঁরা তাঁর মডেল হিসাবে এসেছিলেন। বলা যেতে পারে. এইসব কাজের কোনটাই তেমন কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির উৎসাহ বা ইচ্ছায় হয়নি। হুবহু মুখের আদলে. চেহারার আদলে আঁকায় তাঁর উৎসাহ ছিল না একদমই। যদিও তাঁর করা পোট্রেট রিয়েলিটির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল তবুও রিয়েলিটি বলতে যা বোঝায় তারা তা নয় মোটেই। বরং সেগুলি মডেলের এক প্রকার ব্যাখ্যা হিসাবেই ধরা যায়। এই ব্যাখ্যাময়তা মূলতঃ গড়ে উঠেছিল মডেলের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্বকে নির্ভর করে। এইভাবে আমরা পেয়ে যাই এক একটি ব্যাখ্যাময় ছবি। অ্যাকা-ডেমিক পদ্ধতিতে তেলরঙ ব্যবহার করার শিক্ষা পাননি রামকিঙ্কর। সাধারণ রঙ হিসাবেই ব্যবহার করেন তেলরঙের। সাধারণতঃ পুরু রঙের আঘাতের ( Impasto Strokes ) সাহায্যেই গড়ে উঠেছে পোট্রেটগুলির পটভূমি। আর এইভাবে অবয়ব পরস্পর দৃঢ়বদ্ধভাবে কাছাকাছি এসে এক শক্তিশালী রেখাময় ছন্দে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে যে তাঁর করা অবয়বচিত্র-গুলির কোনটাই হেডস্টাডি বা আবক্ষ না হয়ে সমস্তই হল পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। রামকিঙ্করের রঙ ও তুলির ব্যবহার খুব উন্নতমানের। শিল্পীর গুণ এবং দক্ষতার অন্য আর একটি দিক হল সারফেস ট্রিটমেণ্ট। যেখানে ছন্দ এবং শৈলীর উপর

জোর দেওয়া সত্ত্বেও আঙ্গিকের খেলায় মেতে উঠতে দেখা যায় তাঁকে। এইরকম একটি কাজের উদাহরণ হল 'বিনোদিনী' এবং 'সোমা যোশী'র পোট্রেট ( যেটি সাধারণতঃ 'লেডি উইথ ডগ' নামে পরিচিত )।

রামকিঙ্করের বেশীরভাগ ল্যাণ্ডস্কেপই হল জলরঙে করা বীরভূমের খোলামেলা এবড়োখেবড়ো রুক্ষভূমির দৃশ্য। আবার এখানেও চিরাচারিত প্রথার বাইরে জলরঙকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। তাঁর আগের একটি শৈলীতে লক্ষ করা যায় তুলির আঁচড়গুলি পরিস্কারভাবে দেখা দিচ্ছে এবং রঙ একসঙ্গে মিশে না গিয়ে আলাদা-আলাদা নিজস্ব চেহারায় জেগে উঠছে। এইভাবে রঙ এবং তুলির ব্যবহারের জন্যই তাঁর কিছু কিছু ছবিতে সেজানীয় গন্ধ অনুভব করা যায়। কোপাই-এর শুকনো মরা চর, তালগাছ ঘেরা এবড়োখেবড়ো লাল মাঠ এবং আলোছায়া ঘেরা শান্তিনিকেতনের শালবীথি—এগুলিই হল তাঁর পরিচিত আর ধরাবাঁধা বিষয়। রামকিঙ্করের জলরঙ ব্যবহারের দ্বিতীয় আর একটি দিক হল যেখানে রঙ আলাদা-আলাদা অস্তিত্বে জেগে না উঠে একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে এক রহস্যময়তায় শুয়ে থাকে।

রামকিঙ্করের তেলরঙে করা বিশিষ্ট কম্পোজিশনগুলি এক নতুন ধারার সূচনা করে। এইসমস্ত কাজের অনেকগুলিই সমকালীন স্রোত কেটে অনেক অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। এখানে আমি তাঁর সেই সমস্ত কাজগুলির কথাই জোর দিয়ে বলতে চাই যেগুলির ব্যাখ্যাময় বিষয়মূল্য অপেক্ষা আঙ্গিক এবং রঙের দিক দিয়ে যাদের বিমূর্ত মূল্য ছিল বেশী। এবং রামকিঙ্করই হলেন গোড়ার দিককার এমন একজন ভারতীয় শিল্পী যিনি ছবি ও ভাস্কর্যকে একটা বিমূর্ত মূল্য দিতে পেরেছিলেন।

তাঁর কিছু কিছু ছবিতে ইমপ্রেসেনিস্ট অনুভবের বিচ্ছুরণ লক্ষ করা যায়। এবং স্বতঃস্ফূর্ততাই হল এর প্রধান গুণ। বিশাল ছবি 'কোনার্কের পথে' এই ধারার অন্যতম একটি বিশিষ্ট কাজ। এখানে আমরা দেখতে পাই একটি গোরুর গাড়ী দ্রুত গতিতে চলে যেতে যেতে ক্রমশঃ দর্শকের দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। যার ভিতরে বসে থাকতে দেখি কয়েকটি মানুষজন। যেখানে মেয়েদের রঙ লাল এবং কমলায় মাখামাখি। গুঁড়ো গুঁড়ো অস্পষ্ট রুপোলী ধারায় ঢাকা আছে যার পটভূমি। এখানে আমরা আবিষ্কার করি এমন একজন শিল্পীকে মুহূর্তের গতিকে চুরি করে ছবির ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়াই যাঁর প্রধান এবং একমাত্র কাজ। এই ধারার তাঁর অন্যতম কাজ হল 'সাঁওতাল দম্পতি' এবং 'ছাগল নিয়ে মেয়ে'। 'সাঁওতাল দম্পতি'তে আমরা দেখি কালচে বাদামী এবং উজ্জ্বল রঙ ব্রাসের অবাধ ও পরিষ্কার যাতায়াত তাকে বিমূর্ততার আলো আঁধারিতে পৌঁছে দেয়। 'ছাগল নিয়ে মেয়ে' সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া নীলরঙের এই ছবির ভিতরে আমরা দেখতে পাই যৌবনাবতী একটি মেয়ে খুব জোরে জোরে দুটি ছাগল টানতে টানতে ক্রমশঃ সামনের দিকে সরে এসে যেন ক্যানভাসের বাইরে চলে আসছে। এখানে মুহূর্তের গতিকে ধরার জন্য নিসর্গ বা

ফাঁকা জায়গায় ব্রাসের ব্যবহার হয়েছে ডাইগোনাল।

অন্য একধরনের কম্পোজিশনে আমরা লক্ষ করি যেখানে রামকিঙ্কর অনেক বেশী প্রথানুগ। এই ধারার একটি সুন্দর উদাহরণ হল 'প্রসাধন'। যেখানে আমরা দেখতে পাই, একজন বয়স্কা মহিলা একজন যুবতীর চুল বাঁধায় সাহায্য করছে। সেইসময়ে এটা ছিল ছবির খুব সাধারণ বিষয়। কিন্তু সেণ্টিমেণ্টকে এড়িয়ে গিয়ে আকৃতি, ভল্যুম এবং গতিময় রেখার কারিকুরির দক্ষতায় একেই নতুনভাবে ব্যবহার করলেন রামকিঙ্কর। আলো, ছায়া এবং রঙের খুব সংযত ব্যবহারে এটি তাঁর খুব শক্তিশালী একটি কাজ।

ভাস্কর হিসাবেই রামকিঙ্করের পরিচয় সবচেয়ে বেশী। মাধ্যম হিসাবে ভাস্কর্য ছবির থেকে অনেক বেশী দুরূহ, অনেক বেশী কষ্টসাধ্য। বিশেষভাবে এক্ষেত্রে সেই যুগের কথা মনে রাখা দরকার যখন ভাস্কর্য বলতে বোঝাত খুব ঝাড়পোছা আর ভাবালু কাজ। এটা মনে করা যেতে পারে যে অপেক্ষাকৃত বেশী আবেগ এবং উৎসাহের সঙ্গে রামকিঙ্কর এমন একটা মাধ্যমকে আঁকড়ে ধরেছিলেন যা মাধ্যম হিসাবে ছিল খুব শক্ত আর দুরূহ। এবং রামকিঙ্করই হলেন গোড়ার দিককার এমন একজন শিল্পী যিনি একাই সেই কুয়াশাজটিল পথে যাত্রা করেছিলেন। যেখানে এমন কোন একজনও ছিলেন না যিনি তাঁর ঐ কঠিন যাত্রাপথের থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারেন। তখন সেটা ছিল এমন একটা যুগ যখন কল্পনা, রঙ এবং ইলিউসন সব মিলেমিশে ছবি অপেক্ষাকৃত সহজ। এবং কাব্যিক ও সাহিত্যিক অনুভবে গড়ে উঠত এক একটি ছবির সাংগীতিক গুণ। তুলনামূলকভাবে ভাস্কর্য ছিল আরো কঠিন। এক্ষেত্রে শিল্পীকে তার ওজন এবং মাপ, মাত্রা এবং শক্তি— ভাস্কর্যের এইসমস্ত গুণগুলির মুখোমুখি হতে হয়। যেখানে একটা স্থায়িত্বে পৌঁছানোর জন্য চলে অবিরাম অনুসন্ধান। এবং উপায় ও উপাদানের নিপুণতার মধ্য দিয়েই একমাত্র যার বাস্তব স্থায়িত্বে পৌঁছান যায়। ছবি থেকে এটা খুব পরিষ্কার যে ভাস্কর্য শুধু জীবনেরই অনুকরণ নয়, যা সম্পূর্ণ এক নতুন নিয়মের সৃষ্টি। এক্ষেত্রে রামকিঙ্করের বৈশিষ্ট্য হল যে বছরের পর বছর অমানুষিক পরিশ্রমে শোধনহীন এই ধারাটিকে আয়ত্তে এনেছিলেন তিনি। মাত্র অল্প কিছু পরেই তিনি এমন এক ধারার সূচনা করেন, যা ব্যক্তিত্ব, স্থায়িত্ব, শৈলী এবং প্রাণপ্রাচুর্যতায় মিলেমিশে সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের সৃষ্টি।

বিশ-এর দশকে রামকিঙ্কর এমন কিছু প্রগতিশীল ইউরোপীয়ান ভাস্করের কাছে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন যাঁরা সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। ফন লিজাপট নামের একজন অস্ট্রিয়ান ছিলেন ভাস্কর্যের সর্বপ্রথম অধ্যাপক। পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত বুর্দেল-এর ছাত্রী ম্যাডাম মিলওয়ার্ড নামের একজনও ভাস্কর্যের ক্লাস নিয়েছিলেন। এরপরে বের্গম্যান নামের একজন ইংরেজও ছিলেন কিছুদিন। যদিও এই সমস্ত শিল্প-শিক্ষকেরা আধুনিক শৈলীর কিছু কিছু

সূচনা করেছিলেন তবুও বলা যায় তাঁরা নব্য-ধ্রুপদী ধারা বা শিক্ষার কোন বাধ্য-বাধকতা এ'দের উপর চাপিয়ে দেন নি। অর্থ ও সুযোগের অভাবে তখন এছাড়া উপায়ও ছিল না কোন।

কোনরকম ভাত-রুটির আশা না করেই রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে ভাস্কর্যের শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। কারণ আর্থিক লাভ-ক্ষতির কথা মাথায় না রেখেই একরকম আদর্শের তাগিদেই সেখানে শিক্ষকেরা একসঙ্গে জড়ো হয়েছিলেন। শিল্পের প্রকৃতি ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে তখন কলাভবনের কোন বাঁধাধরা নিয়ম না থাকায় তাঁর ভাস্কর্যগুলি হতে পেরেছিল পরীক্ষামূলক। আর এজন্যই তিনিই এমন কিছু করার সাহস দেখিয়েছিলেন যা আর অন্য কেউ-ই তা করতে সাহস পান নি। বস্তুতঃ তিনি তাঁর মন ও জ্ঞানকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই তাঁর শিল্পগুলির জন্ম দিয়েছিলেন। বছরের পর বছর ধরে তিনি পোট্রেট করেছেন, করেছেন স্থাপত্যের জন্য মনুমেণ্টাল রিলিফ, ছোট ছোট বিমূর্ত কাজ আর খোলা আকাশের নীচে বিশাল মূর্তিশিল্প। পোট্রেট আর খোলা আকাশের নীচে এইসব মূর্তিই হল তাঁব ভাস্কর্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

রামকিঙ্করের কাজগুলি দ্বৈতসত্তার অধিকারী। গাঠনিক গভীরতা আর জৈবতার মধ্য দিয়ে ফর্মের মত্ততায় মেতে উঠতে দেখা যায় তাদের। দ্বিতীয়তঃ তাঁর কাজের এক্সপ্রেসোনিস্টিক গুণ। কাজ হিসাবে যা দুঃসাহসী, সেরা এবং বয়ানট। যদি কেউ সচেতনভাবে রামকিঙ্করেব কোন কাজের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক কাবো নিম্ন বা খুব উন্নতমানের কাজের তুলনা করেন তবে তাঁর শিল্পকর্মের ভেতরে একটা আনন্দ খুঁজে পাবেন কেউ কেউ। দেখা যাবে সেখানে আছে জীবনের, যৌবনের আর প্রকৃতির জয়গান। কাজ নয় একপ্রকার খেলা হিসাবেই তিনি বেছে নিয়ে-ছিলেন শিল্পকে। অনুভব করা যাবে নানা বর্ণবৈচিত্রের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে তাঁব আনন্দধারা। তাঁর সমস্ত মূর্তি ও সমষ্টির মধ্য দিয়ে অনুভব করা যাবে খোলা আকাশের প্রশান্তি আর নিশ্বাস প্রশ্বাস, প্রাণের গভীর রস আর বিকশিত পুষ্পের কলতান। দেখা যাবে বারংবার আঘাতে আঘাতে ভরে ওঠা উপরিতল, অনসৃণ টেক্সচার যা আর্ট স্কুল থেকে উৎপন্ন হয়ে আসা ঘসা মাজা, মসৃণ শিল্পের সঙ্গে মেলে না মোটেই। প্রকৃতির আদিমতার সঙ্গেই আছে যার একমাত্র মিল। যা আলো প্রতিফলিত করে না কিন্তু শুষে নেয়, গভীব ঘন অরণ্যে আলো পাতায়পাতায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে যেমন নেমে আসে ভিতরে কিংবা লাল লেটেরাইট নুড়ি ও পাথবের ভিতরে আলো খেলায় মেতে ওঠে যেমনভাবে।

একজন শিল্পীর কাজের সময় শেষ হয়ে যায় না কখনোই। অতীতের অমূল্য শ্রম উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর জন্য বয়ে আনে ক্ষমতা, স্বাধীনতা আর আত্মবিশ্বাস। কোন একজন যিনি সবসময়ই সৃষ্টিশীল তাঁর সৃষ্টিশীলতা শেষদিন পর্যন্তই অব্যাহত থাকে। পৃথিবী নবনব রূপে এসে ধরা দেয় তাঁর কাছে। ফর্মের ঘরে এসে জমা হয়ে থাকে তাঁর শেষহীন সঞ্চয়।

## রামকিঙ্কর ও তাঁর শিল্পকাজ

কে. জি. সুব্রামনিয়ম

রামকিঙ্করের শিল্পকাজ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁর পূর্বস্মৃতি এড়িয়ে যাওয়া খুবই শক্ত। শিক্ষক এবং বন্ধু হিসাবে তাঁর প্রচুর প্রভাব ছিল আমাদের কারো কারো উপর। কারণ আমাদের নৈপুণ্যতাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি। প্রবল প্রাণশক্তি নিয়ে কাজ করবার জন্য আমাদের উৎসাহিতও করেছিলেন তিনি। এসব বাদ দিয়েও তিনি ছিলেন আমাদের কাছে এক উজ্জ্বল আদর্শের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

শিল্পের একজন তরুণ ছাত্র হিসাবে রোমাণ্টিকতায় টইটম্বুর আমাদের হৃদয়ে তখন এসে পড়ছে আপাদমস্তক শিল্পভাবনার গভীরে ডুবে থাকা ভূতগ্রস্ত আর তন্ময়ী শিল্পীদের ছায়া। বাস্তবে খুঁজে চলেছি অবিকল সেইরকমেরই কোন একজন। খুব অল্প শিল্পীর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি তা। কারণ তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন খুব বেশীরকমভাবে পরিকল্পিত, ভদ্র পেশাদারী, মেয়েলি আর নাটকীয়তায় ভরা ছিল তাঁদের ভবঘুরেপনা। কিন্তু যখন শান্তিনিকেতনে এলাম তখন সত্যিকারের তিনজন শিল্পী আমাদের নজরে এলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে রামকিঙ্করই আমাদের তরুণ বয়সের রক্তে কিছুটা তরঙ্গ তুলতে পেরেছিলেন। কারণ নন্দবাবু এবং বিনোদবাবুর চেয়ে নিভৃতচারিতায় তিনি ছিলেন অনেক কম, ছিলেন বহির্মুখী আর কাছাকাছি আসার মানুষ। কোনরকমের ভান ছিল না তাঁর, সম্পূর্ণভাবেই ছিলেন একজন খাঁটী শিল্পী। সমস্তকিছুই উদ্দীপিত করত তাঁকে আর সেই উদ্দীপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার খোরাক জুগিয়ে যেতেন ক্রমাগত।

তাঁকে কাজ করতে দেখা এবং সঙ্গে স্কেচ করতে যাওয়াটাও ছিল আমাদের কাছে বড়োরকমের শিক্ষা। মধ্যাহ্নের ভরা সূর্যের মধ্য দিয়ে 'খোয়াই' পার হয়ে যেতে যেতে আমরা কেউ কেউ সেই শিক্ষা পেয়েওছিলাম। আমার মতো একজন তরুণ ছাত্রের শৈশব কেটেছে কেরালায় আর পরবর্তী সময় কেটেছে শান্তিনিকেতনের অসম্ভব রিক্ত নিসর্গতায়। আর যেখানে নিসর্গের এমন রিক্ততা তাকে আর ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যাবে কিভাবে? সুতরাং নিসর্গের এই বিপুল রিক্ততা বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আমার আর উপায় ছিলনা কোন। পরে আমি দেখেছি এবং ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশও করেছি তাকে। কিন্তু যখন রামকিঙ্কর স্কেচ খাতা নিয়ে এইসব নিসর্গমালার মুখোমুখি বসলেন দেখলাম একই দৃশ্যাবলী, একই জায়গা কেমনভাবে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। দেখলাম, প্রত্যেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ

স্পন্দিত জীবনের মধ্যে ফিরে আসছে। পাতায় পাতায় উজ্জ্বলতা আর উৎফুল্লতা নিয়ে নম্র গাছ কেমন আদিম প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠছে। স্বচ্ছ আকাশ উষর মাটির সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এইমাত্র একরাশ নীল মেঘ এসে দ্রুততায় ঢেকে দিল তাকে, আবার এইমাত্র তারা ধূসর মেঘের ঘোমটায় গিয়ে মুখ লুকালো দ্রুত। এইভাবে ঋতুরা তাঁর ছবিতে এল খুব প্রামাণিকভাবে। এইভাবে তাঁর ছবিতে আমরা প্রকৃতিকে আবিষ্কার করলাম নতুনভাবে। এই রূপান্তর যা আমাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তুলল। শিল্প ও জীবন সম্বন্ধে, সৃষ্টি পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি আর উদ্দীপনা আর অবসাদ যেন আমাদের চোখ খুলে দিল। এই সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের মধ্যে একটি জীবন দর্শনের সীমারেখা টেনে দিলেন। এবং যা ব্যক্তিগত হয়েও এক উন্নততর চেতনার শিখরপুঞ্জে নিয়ে যেতে সাহায্য করল।

### রামকিঙ্কর ও তাঁর ড্রইং

ড্রইং করাটা প্রতিদিনের রুটিনমাফিক কাজ ছিল তাঁর। চার বছর ধরে আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে জেনেছি যে তিনি গড়ে একটি করে জলরঙের ড্রইং করেছেন প্রতিদিন। গোড়ার দিকে ইতিমধ্যেই প্রচুর ড্রইং করেছিলেন। এবং আমার বিশ্বাস তাঁর এই ধারা মধ্যপঞ্চাশ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ছুটি কিংবা অল্পসময়ের জন্য যখনই তিনি শান্তিনিকেতনের বাইরে কোথাও গেছেন—কাঠমুণ্ড, শিলং, রাজগীর, ভীমবাঁধ কিংবা বৈজনাথ, গয়া, পুরী প্রভৃতি জায়গা থেকে সঙ্গে করে বয়ে এনেছেন গাদা গাদা ড্রইং এবং জলরঙের কাজ। এগুলি রোজনামচা (diary) লেখার মতো ছিল তাঁর কাছে। যেগুলির মধ্য দিয়ে তিনি চিহ্নিত করে রাখতেন তাঁর আবেগ, তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। এবং বিবেচনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কাজ করতে করতে এগিয়ে যাবার কথা। সেগুলির খুব অল্প কয়েকটিই একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় আজ। তাদের বেশীরভাগই সময়ের ছোবলে কোথাও মিলিয়ে গেছে, কিছু কিছু দান করা হয়েছে অথবা বিক্রী হয়ে চলে গেছে অন্য কোথাও। যদি সেগুলি জড়ো করে একসঙ্গে আনা যায় তবে তার মধ্যে পাওয়া যাবে শক্তিশালী একটি শিল্পাবয়ব।

এমনকি ক্রেয়ন এবং পেন্সিলে আঁকা তাঁর একেবারে প্রথম দিককার ড্রইংগুলিতে এক শক্তিশালী ছন্দময়তায় জেগে উঠতে দেখেছি তাদের। একজন স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পী হিসাবে কোন জিনিসের উপর তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল তাৎক্ষণিক। শিকারী যেমনভাবে তাঁর শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেইভাবে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাঁর কাজের উপর। এখানে একটি উপমার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, এটা হয়ত তাঁর নিজেরই অথবা তিনি প্রায়ই যাঁর কথা বলতেন হতে পারে সেই রবীন্দ্র-নাথেরও, একবার যিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'কোন কাজ একহাতে, একমনে করা

প্রয়োজন।' সেই কথা ছন্দবদ্ধতায় সুসংগঠিত হয়ে তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। এটা অনেকেরই জানা যে নন্দবাবুর ড্রইং-এর প্রধান গুণই হল টানটান ছন্দ এবং যা ক্যালিগ্রাফির স্বাদ এনে দিয়েছিল তাঁর অনেক কাজে। রামকিঙ্কর এই ছন্দ কাঠামোকেই পুনরায় ব্যবহার করলেন নতুনভাবে, যা কিউবিস্টদের কাছাকাছি নিয়ে যায় তাঁকে। একেবারে প্রথমদিককার, সম্ভবতঃ মধ্য তিরিশের, কালিতে করা তাঁর কিছু কিছু সাদা ও কালো ড্রইং-এ এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেখানে এক ঝাঁক পাখীদের উড়তে দেখা গেল। এবং যাদের গতিকে ধরবার জন্যই যেখানে পাখীদের থেকেও জোর দেওয়া হল তাদের ওড়া এবং তাদের উড়ে যাবার ছন্দময় ধ্বনি প্রতিধ্বনিকে। তাদের গতিকে আরো গভীরভাবে মেলে ধরবার জন্য সেখানে কিছু কিছু পাখীকে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ীঘরের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হল। অন্য আরো কিছু কিছু ড্রইং-এ দেখা গেল গাছগাছালির ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ীঘর। ড্রইং, চিত্র, ভাস্কর্য যাই হোক না কেন পরবর্তী তাঁর সমস্ত কাজেই কিউবিজমেব প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু এই প্রভাব ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যতায় সমুজ্জ্বল। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তা কেমন? তাহলে বলব যে তা মূল কিউবিস্ট এথিকস্‌কে এড়িয়ে গিয়ে অবজেক্ট এবং স্পেসের সঙ্গে একটা স্টিরিও ভিউসিয়াল সম্পর্ক তৈরী করে। এবং অবজেক্ট স্পেস কমপ্লেক্সের ইমেজকে বিশ্লেষণ করতে করতে যা পুনর্গঠিত করে অবজেক্ট ইমেজ অথবা স্পেস ইমেজ, যা পূর্বাপর সমস্ত ভিউসিয়াল লজিককে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ এক নতুন ধারার সৃষ্টি করে। এবং মাত্রা ও অভিব্যক্তিকতায় তাকে এক নতুন জায়গায় পৌঁছে দেয়। যদিও রামকিংকর পিকাসোর মতো শক্তিশালী কিউবিস্ট-এর কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং রামকিংকরের অনেক কাজে গঠনের বা আকৃতির ভাঙন লক্ষ্য করা যায় তবুও তাঁর বেশীরভাগ কাজ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তিনি কিউবিজমের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই তবুও তাঁর সেইসমস্ত কাজ যা একমাত্র তাঁর কাজের সঙ্গেই তুলনীয়। এবং তা মৌলিকতায় উজ্জ্বল।

### আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলন ও রামকিঙ্কর

এখানে বিশেষভাবে জানার প্রয়োজন যে আধুনিক শিল্প আন্দোলনের কোন-দিকগুলি শান্তিনিকেতনের একেবারে প্রথম দিককার ছাত্ররা কখন ও কিভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। প্রাপ্ত নথিপত্র থেকে জানা যায় যে বিশ-এর গোড়ার দিকে ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ শান্তিনিকেতনে আসেন এবং গড়ে তোলা নতুন ছাত্রদের সঙ্গে ইউরোপীয় শিল্পধারার একটা আত্মীয়তা ঘটান। প্রায় সেই সময়েই কলকাতায় আধুনিক জার্মান শিল্পের একটি প্রদর্শনী হয়, যার থেকে শিল্পীর স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যতার একটা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা করতে পেরেছিলেন সেই সময়ের শান্তিনিকে-

তনের শিল্পের ছাত্ররা। এই প্রতিক্রিয়া ছিল সবিশেষ, যেহেতু তখন শান্তিনিকেতনের শিল্পের ছাত্ররা অন্যান্য কেতাবী শিল্প বিদ্যালয়ের মতো কোন বাঁধধরা নিয়মের পথে চলতো না। সুতরাং সেখানে কোন বিরোধী চেতনার সম্মুখীন হতে হত না তাঁদের। এবং সেই কেতাবী সীমাবদ্ধ শিক্ষার অনুপস্থিতির জন্যই বাস্তবপরবর্তী ইমপ্রেসেনিস্ট বা কিউবিস্ট কোন বিশেষ ঢঙ তাঁদের চেতনার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি। বরং তাঁদের শিল্পের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যই, বিস্ময়কর কিছু সৃষ্টি করবার জন্যই তাঁরা ইমপ্রেসেনিস্ট এবং কিউবিজমের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। ইপ্রেসেনিস্ট কাজের সঙ্গে এই যোগাযোগ তাঁদের খুলে দিল এক নতুন পথ ও উদ্দীপনায় ভরা এক নতুন জগৎ। পোস্ট-ইমপ্রেসেনিস্ট কাজের সঙ্গে যোগাযোগ পরম্পরাগত দৃশ্যভাষার সূক্ষ্ম তারতম্যের দিকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করল তাঁদের। বিভিন্নরকম কিউবিস্ট কাজের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁদের মনোযোগী করে তুলল ছবির ইমেজের একটা ক্রম-পরিবর্তন এনে দেবার। সেজান এবং ভ্যান গগ-এর মতো শিল্পীর কাজের সঙ্গে যোগাযোগ গঠন এবং রঙ ব্যবহারের ধারণায় নিয়ে এল নতুনত্ব। এইভাবে ভারতীয় পূর্বসূরীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন না হয়ে পুর্নবিবেচনার ভিতর দিয়ে এবার তাঁরা একেই ব্যবহার করলেন নতুনভাবে। এবং এটা নিশ্চিত যে এই অনুপ্রেরণা যেমন বিভিন্ন শিল্পীর ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম ঠিকর তেমনি একে ধরবার বা আত্মসাৎ করবার ক্ষমতাও পরস্পর পরস্পরের থেকে আলাদারকমের।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের প্রতি রামকিঙ্করের আগ্রহ ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। এবং যার ফলে তাঁর এই অনুপ্রেরণা অক্ষম অনুকারকের দলে চলে যেতে পারে নি। তাঁর ছন্দময় ড্রইংগুলিতে, যেগুলি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, দেখা যায় যে কিউবিস্ট ধারণার পাশাপাশি তিনি সেগুলিতে নিয়ে এসেছেন ইমপ্রেসোনিস্টিক বা পয়েন্টোলিস্টিক রঙের প্রয়োগ। এর একটি সুন্দর উদাহরণ হল তাঁর করা একটি বিরাট জলরঙের ছবি, যেটি খুব সম্ভবতঃ দিল্লীর কলেজ অব আর্টের সংগ্রহে আছে, যেখানে দেখা যায় পাখার মতো একটি গাছের নীচে চা পানরত কতকগুলি মানুষ। এই পথ ধরেই পরবর্তী কতক-গুলি বছরে ওয়াস এবং বুদ্ধিদীপ্ত রঙের প্রয়োগে বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি গঠনসমৃদ্ধ ছন্দপ্রধান অনেকগুলি ল্যাণ্ডস্কেপ করেন। যেখানে মুহূর্তকে ধরে রাখার জন্য জোর দেওয়া হয়েছে বিভিন্নরকম সারফেস এবং ডেনসিটি ট্রিটমেন্টের উপর। বিষয়বস্তু হিসাবে তাদের বেছে নেওয়া হয়েছে শান্তিনিকেতনের চারপাশের দৃশ্য, নেপালের প্রাকৃতিক দৃশ্য আর শিলং-এর হ্রদ ও পার্বত্য অঞ্চল। সাবজেক্ট এবং লোকেশনের ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখানে টেকনিক হয়েছে কিছু পরিমাণে সেজানীয়। এক একটি জায়গাকে সামগ্রিকভাবে তুলে আনার জন্য মাধ্যম হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে বিশুদ্ধ ওয়াস এবং দুটি জায়গার মধ্যবর্তী স্থানে

পশ্চাৎ এবং সম্মুখগামী রঙ প্রয়োগের উপর ঝোঁক ও তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রঙের সামন্তরাল প্রয়োগই স্পষ্টভাবে ধরা দেয়।

বছরের পর বছর ধরে তিনি এই টেকনিকেই অনেক অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য হয়েছেন। বীরভূমের রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া গরুর গাড়ী অথবা খেজুর গাছের সারির ভিতর দিয়ে ছুটে যাওয়া ধোঁয়াময় ট্রেন অথবা রাজগীর বাজারের মালবোঝাই ঘোড়ার গাড়ী অথবা কোপাই-এর ঢালু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি শিমূল প্রভৃতি যে কোন বিষয়ই হোক না কেন একজন অনুশীলনরত ভোজবাজীকর বা একজন ভারসাম্য পটু খেলোয়াড় বা একজন দড়ি হাঁটিয়ে (rope walker) দড়ির উপর দিয়ে স্বাচ্ছন্দতায় হেঁটে যাওয়াকে যেমনভাবে সহজেই আয়ত্ত করেন তিনিও ঠিক তেমনিভাবেই অনায়াসেই আয়ত্তে এনেছিলেন এইসব। এই স্বাচ্ছন্দতা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য, যা দেখতে দেখতে আমাদের উৎপীড়িত স্নায়ুতন্ত্রীগুলি টনটন করে ওঠে। এবং একসময় ছবির উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য করে আমাদের। জলরঙ বা তেলরঙ বা ভাস্কর্য যাই হোক না কেন, তাঁর সবচেয়ে ভালো কাজগুলির একটি স্থির বৈশিষ্ট্যই হল আবেগময় উত্তেজনা এবং গঠন বিন্যাসের মধ্যে একটি ডায়নামিক ব্যালেন্স। কিন্তু মাঝে মাঝে গভীর আবেগময়তা তাঁর ছবিকে শক্তির প্রাচুর্যতায় ভরে দিতে দেখা যায়। সেখানে রঙ হয়ে ওঠে বাধ্যবাঁধনহীন, রেখা বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে যায় চারদিকে আর খুব বেশীরকম নাটকীয়তায় ভরে ওঠে তাদের ভঙ্গীমা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কদাচিৎ গাঠনিক মালিকানার সীমা ছড়িয়ে যেতে দেখা যায় তাদের।

**রামকিঙ্কর ও তাঁর ছবি**

তুলনামূলকভাবে রামকিঙ্করের ছবি, ড্রইং অপেক্ষা মোটেই ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়নি। তিনি তো বটেই, তাঁর নিকটতম কেউ-ই এদিকে নজর দেননি কোনদিন। এ ব্যাপারে তাঁর দোষই ছিল বেশী। কারণ কোন কাজ শেষ করার পর ভালোভাবে সংরক্ষণ করা তো দূরের কথা খুব অল্পই তাকিয়ে দেখতেন তা। সেই সমস্ত কাজের সম্পূর্ণ কোন তালিকা আজ পর্যন্ত তৈরী হয়নি। এইভাবে তাঁর অনেক কাজ অদৃশ্য হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর সমস্ত ছবির সম্পূর্ণ কোন তালিকা প্রস্তুত করা সহজসাধ্য কাজ নয় আজ আর।

তাঁর শান্তিনিকেতন জীবনের প্রথম পর্বের ছবিগুলিতে, অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে, পদ্ধতি হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ওয়াস এবং টেম্পারা। যদিও সূচনায় তিনি পুরাণাশ্রিত বিষয়ের উপর কিছু কাজ করেছিলেন তবুও নিসর্গদৃশ্য, গ্রামের নারী ও পুরুষ, কর্মমুখর মাঠ, চারণরত গরু-ছাগল, গোরুরগাড়ীর উপর চেপে যাওয়া মানুষজন—চারদিকে ছড়িয়ে থাকা এইসব দৃশ্যাবলীই তাঁকে টানত বেশী। মোহিত করা আদিবাসী সাঁওতালের রূপ, তাদের অদম্য আনন্দ উল্লাস, তাদের পরিবেশ আর আশ্রমের চারদিক ও আশ্রমবাসী মানুষ—তাঁর উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে-

ছিল। কিন্তু যখনই তিনি কোন উত্তেজক দৃশ্যের মুখোমুখি হয়েছেন তখনই তাঁর ছবি নন্দনতাত্ত্বিক অথবা আবেগীয় অনুষঙ্গকে ছাড়িয়ে গেছে। এভাবেই তাঁর তেলরঙের কাজ জলরঙের কাজ থেকে ভিন্নধরনের হয়ে গেছে। তাঁর প্রত্যেক তেল-রঙের ছবিই নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে নিশ্চিতভাবে আরম্ভ করে প্রায়ই কিছুদূর এগিয়ে তা আবেগের ভারে নুয়ে এসেছে। তবুও ছাড়বার পাত্র নন তিনি। দিনের পর দিন অসীম পরিশ্রমে অন্য অভিজ্ঞতার আলোকে জারিত করে স্বাধীনসত্ত্বায় ফিরিয়ে এনেছেন তাদের। তবে তা সময় নিয়েছে। এবং তা রূপান্তরিত হতে হতে ছবির মূল বিষয় থেকে সরে গেছে। তিনি যেন বাধ,বাঁধনহীন কাউকে তাঁর খাঁচায় পুরতে চেয়েছিলেন, এ যেন ঠিক সেই প্রবাদের সোনার হরিণ ধরা। এক্ষেত্রে আপোসের কোন দাসখত লিখে দেননি তিনি। প্রত্যেকদিন একটি তেলরঙের ছবি সম্পূর্ণ করেছেন আবার প্রত্যেকদিন তিনি তা মুছেও ফেলেছেন। কারণ হিসাবে তিনি যা বলতেন, তা ছিল খুব টিপিক্যাল, যেমন—'কাজটা ছিল খুব বেশী সেণ্টিমেণ্টাল', 'খুব বেশী চমৎকার', 'খুব বেশী ফ্যাকচুয়াল।' কিন্তু এগুলি আমাদের কাছে খুব বেশী জীবন্ত বলেই মনে হত। এই ভেবে হয়ত কেউ কেউ দুঃখিত হবেন যে সেই সমস্ত ছবির মধ্যবর্তী পর্যায়গুলি, যে সমস্ত ছবির প্রত্যেক অংশই ছিল অপূর্ব, কেন নথিভুক্ত বা সংগ্রহ করে রাখা হয়নি যেমন করা হয়েছিল পিকাসো বা মাতিসের ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত বেশীরকমের নির্দয়। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছড়িয়ে পড়া আবেগের ঝরনাধারাকে সুবিন্যস্ততায় বেঁধে ফেলে তাকে পুরোহিতের মতো শাসন করতে। কিন্তু হায়! যাঁর আবেগ তাঁর মতোই শক্তিশালী তাঁকে দেবতা ও দানব দুজনের সঙ্গেই সমানভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়।

রামকিঙ্করের ছবিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। তাদের কিছু কিছু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি। প্রত্যেকটিই স্বকীয় এবং অপূর্ব। 'স্বপ্নময়ী', 'সোমা যোশী', 'বিনোদিনী', 'নীলিমা দেবী'—এগুলির প্রত্যেকটিই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতায় অনন্য। পেশাদারী ছবির মতো এদের কোনটাই ঘসে মেজে পরিষ্কার করা ঝকঝকে মুখোশ নয়। আবার এগুলিকে ঠিক ক্যারেক্টার স্টাডিও বলা যাবে না। প্রত্যেকটি বিষয় বদলে গেছে প্রতিমায় এবং যার সঙ্গে মিলে মিশে গেছে ব্যক্তিগত নিরিখ। 'স্বপ্নময়ী' যেন দীর্ঘ চোখের অভিসারিকা, 'বিনোদিনী' চকিত বিহ্বলতার ছবি—যেন নারী হ্যামলেট, 'নীলিমা দেবী' চৌকোমুখের আদিবাসী দেবীর কাছা-কাছি, 'সোমা যোশী' হৃষ্টপুষ্ট সুগোল অবিকৃত যেন একটি পুতুল।

এগুলির পাশাপাশি আরো কিছু ছবি আছে যেগুলির বিষয়বস্তু স্থানীয় পরি-বেশ। যেমন ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাম, সান্ধ্য বাতাসের মধ্যে দিয়ে ছাগল টেনে নিয়ে যাওয়া একটি মেয়ে, খামার বাড়ীর শ্রমরত আর বিশ্রামরত মজুর, ঘরামী, ফসলকাটা এবং এইরকম আরো কিছু। কিন্তু এইসব সাধারণ বিষয়বস্তুর প্রত্যেক-

টিতেই একটি প্রতীক বা মিথিক্যাল বিমূর্ততার মাত্রা যোজনা করেছেন তিনি। 'ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাম'—এক গভীর বিমূর্ততার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে দেখি। যেখানে ঝলকে ওঠা আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎরেখার ভিতর দিয়ে রাত্রি ঘেরা বাড়ীগুলির চাল আলোকিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। মেয়েটির ছাগল টেনে আনার মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে বীরাঙ্গণার ভাবভঙ্গী। ঘরামী বা বিল্ডার্স-এ দেখা যায়—নারী, পুরুষ, শিশুসহ খুঁড়ে বার করা একটি কঙ্কাল। জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু নিয়ে ঠিক যেন মধ্যযুগীয় প্রতীক এটি। এমন কি 'ধান কাটা' এবং 'ধান ঝড়া'র মধ্যেও একটি এপিক মাত্রা যোজনা করেছেন তিনি।

এছাড়াও তাঁর অনেকগুলি ছবিতে চিত্রকল্পের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন শিরীষ গাছের নিসর্গ দৃশ্য অথবা কিউবিস্ট ধাঁচের উদ্ভট নারী এবং মা ও ছেলে অথবা বৃক্ষ এবং আঁটো সাঁটো যৌবনাদীপ্ত একদল রোমাণ্টিক মেয়ে ( ছবিটির নাম পিকনিক )। এই যে আঁটোসাঁটো যৌবনদীপ্ততা এখানে তা সেক্স সিম্বলকে তুলে না ধরে বরং পরোক্ষভাবে তাঁদের শারীরিক উর্বরতাকেই মেলে ধরে।

মহিলা বেষ্টিত ছবিগুলিতে রামকিঙ্করের বিশেষ এক মানসিকতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। এখানে তাঁর দুটি বিপরীতধর্মী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায় মেয়েরা যেমন তাঁকে আকর্ষণ করছে তেমনি ভয় বিজড়িত উৎসাহও দিচ্ছে তাঁকে। তিনি যেমন মনোরম ও সুন্দর প্রতিকৃতি আঁকছেন তাদের তেমনি কলহ ও শঙ্কায় ভরিয়ে দিচ্ছেন তাকে। তাঁর অনেক ছবিতে, এমন কি ভাস্কর্যেও, লক্ষ্য করা যায় তারা তাদের মনোরম সৌন্দর্য নিয়ে জেগে উঠে আবার কেমন হারিয়ে যাচ্ছে আসন্ন আতঙ্কের অপচ্ছায়ায়। মোহময় হাসির মধ্য দিয়েই কেমন বেরিয়ে আসতে তাদের সারিবদ্ধ বিপদজনক দাঁত। তাঁদের সুন্দর দেহ আস্তে আস্তে কেমনভাবে ভরে যাচ্ছে নাটুকেপনায়। এসমস্ত কিছুই তাঁর ছবিকে ক্রমশঃ করে তুলেছে রহস্যময়। আর রক্ত-মাংসে ভরা নারী ক্রমশঃ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়ে তা হয়ে উঠছে মাতৃরূপী দেবী। এইভাবে যা তাঁর ছবিকে ক্রমশঃ করে তুলেছে সুন্দর ও ভয়াল। বলা বাহুল্যই এখানে দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিত্রকল্প উভয়ক্ষেত্রেই সাবেকী চিন্তা-ধারার সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তী সময়ে লক্ষ্য করা যায়, তাঁর কিছু ছবি খুব বেশী বিষয়মুখিনতার দিকে সরে গেছে। সামাজিক প্রশ্নে তিনি সবসময় ছিলেন অনুভূতিপ্রবণ। মানুষের সঙ্কট খুব তাড়াতাড়িই তাঁর মধ্যে প্রতিক্রিয়া নিয়ে এসেছে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, দারিদ্র্য অথবা মৃত্যু প্রভৃতির বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিয়েছেন তিনি। এইভাবে সমাজবাস্তববাদীদের একটা ছোট গোষ্ঠী এবং কাগজের কিছু সমালোচকদের সুনজরে পড়েছিলেন তিনি। এবং প্রতীক-বৈভবের চেয়ে সাময়িক ঘটনাপ্রবাহের চিত্রমত্ত রূপকেই অধিকতর সুবোধ্য মনে করেছিলেন তাঁরা। এঁদের স্তুতিবাদে রামকিঙ্কর একধরনের সাহিত্যধর্মী বা বিষয়মুখী ছবি করেছিলেন বটে কিন্তু সেগুলিতে যতই

গ্রাফিক বেগ আর গাঠনিক সংবদ্ধতা থাকুক না কেন তাতে পাওয়া যায় না পুরানো অনুষঙ্গবহ সেই আমেজ।

### আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্য ও রামকিঙ্কর

রামকিঙ্করের ছবি এবং অন্যান্য নানা কাজ অপেক্ষা তাঁর ভাস্কর্য আরো অনেক বেশী স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কোনরকম বিরোধের অপেক্ষা না রেখে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে তিনিই প্রথম শক্তিশালী শিল্পী। তাঁর আগে পৃষ্ঠপোষকের পৃষ্ঠপোষণার বাধ্যবাধকতায় বাঁধা ভাস্কর্য ছিল খুব বেশীরকমের পেশাদারী। তা সত্ত্বেও, হয়তো, যোগ্য ছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু তাঁরা মূলতঃ ছিলেন পৃষ্ঠপোষকের রুচি এবং নির্দেশেরই দাস। সুতরাং ভারতীয় শিল্পমঞ্চে, সম্ভবতঃ, রামকিঙ্করই হলেন এমন একজন প্রথম ভাস্কর যাঁকে 'ক্রিয়েটিভ স্কাল্পটর' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যিনি কোন পৃষ্ঠপোষকের তাঁবেদারী না করে সম্পূর্ণ নিজের সন্তুষ্টির উপরেই কাজ করে গেছেন। বস্তুতঃ কয়েকটি অর্ডারি কাজে তাঁকে দুর্দশায় পড়তে দেখা যায়। সেইসব অসমাপ্ত কাজ তিনি শেষপর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁর সহকারীদেব হাতে। তিনি পৃষ্ঠপোষকের পৃষ্ঠপোষণার অত্যাচার সহ্য করেন নি কোনদিন। তাঁর করা সেইসব আবক্ষ প্রতিকৃতিগুলির, যেগুলির কিছু কিছু এসময়ে একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোজনা করেছে, কোনটিই অর্ডারি কাজ ছিল না। তিনি সেগুলি করেছিলেন কারণ সেইসব বিষয়গুলি কোন কারণে অথবা অন্য কোনভাবে তাঁর ভালো লেগেছিল।

যদিও তিনি রঁদা এবং এপস্টাইনেব কাজেব সঙ্গে পবিচিত ছিলেন তবুও তিনি আঙ্গিকগত উদ্ভাবনীর দিক দিযে আরো বড়ো কোন এক সীমানার দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তাকে। তাঁব আঁকা প্রতিকৃতিগুলিতে যেমন তেমনি এক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি মডেলের মধ্যে আবেগের অলৌকিক আভা ছড়িয়ে দিয়ে এক বিশেষ দৈবী মহিমায় রূপান্তরিত করেছিলেন তাদের। এখানে একজন তাঁর করা আবক্ষ প্রতিকৃতিগুলিকেই তুলনা হিসাবে উপস্থিত করতে পারেন। যেমন 'গাঙ্গুলী মশায়', 'প্রীতি পাণ্ডে', 'মীরা চ্যাটার্জী', 'মধুরা সিং', 'ইরা ভাকিল' এবং 'রবীন্দ্রনাথ'। এদের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন উপায়ে জীবন্তভাবে উপস্থিত করেছেন তিনি। এবং মডেলের গঠন ও চরিত্র অবিকল রেখে এদের প্রত্যেকটিই দৃশ্যবস্তুকে ছাড়িয়ে গেছে। এদের মধ্যে কিছু কিছু নারীর চোখ হয়েছে দীর্ঘ এবং তারা রোমাণ্টিক। যেমন 'প্রীতি পাণ্ডে'। অন্যরা কেউ কেউ ফুটন্ত আর পার্থিব, যেমন 'মধুরা সিং'। 'ইরা ভাকিল-এর' মাথা, যার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না এখন, ঠিক যেন রোমান বালক। 'আলাউদ্দিন খাঁ'র মাথা সন্তের বৈশিষ্ট্যতায় উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি তাঁর করা একটি অত্যন্ত দক্ষ কাজ। যেটিকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনের একেবারে শেষের দিকে তাঁর দক্ষতা নিয়ে নানা বিতর্ক উঠতে দেখা যায়, অথচ যেখানে সমস্ত জনপ্রিয়

নকল মূর্তিকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁর সমস্ত শক্তি ও অনুভূতিকে একসঙ্গে নিয়ে এসে কবিকে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন তিনি। ভক্ত উপাসকের কুলঙ্গীতে রাখা খেলনা পুতুলের সঙ্গে একে মেলানো যায়না কখনোই। রক্তমাংসে ভরা সর্ব অর্থে সজীব মানুষেরই জীবন্ত দলিল এটি। যেখানে তাঁর মুখ, তাঁর একেবারে শেষের কবিতার মতোই ভেসে আসে আমাদের কাছে। সমস্ত সাধ-ইচ্ছার মোহভঙ্গ আর যন্ত্রণাকাতর কবির মুখই দেখা যায় সেখানে।

এইসব প্রতিকৃতিগুলি তাঁর ভাস্কর্যের সামান্য অংশ মাত্র। তিনি এর চেয়ে আরো অনেক বেশী কাজ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যার খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে, এমনকি তা ফটোগ্রাফেও ধরে রাখা হয়নি। একেবারে প্রথম দিকে চারপাশের দৃশ্যমান ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু কাজ করেছিলেন তিনি। যেমন—ঘাসের মধ্যে চরে বেড়ানো খরগোশ, ঠেলাগাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাওয়া মেয়ে, এছাড়াও রঁদার টোনে করা আরো কিছু রোমান্টিক কাজ। বছরের পর বছর কাজ করে তিনি সরাসরি এই রোমান্টিক বিবরণধর্মিতাকে পেছনে ফেলে যেতে পেরেছিলেন। এবং তাঁর কাজ ক্রমশঃ হয়ে উঠেছিল অনেক বেশী কিউবিস্টিক, অনেক বেশী এক্সপ্রেসোনিস্টিক। প্রত্যেকটি কাজই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবার আগে অনেকগুলি রূপান্তরিত পর্যায় অতিক্রম করে যেতে হয়েছিল তাদের। পরীক্ষার পর্যায়েই হয়তো বা রয়ে গিয়েছিল কেউ কেউ। যেমন 'মা ও ছেলে' কাজটি প্রথমে সৌন্দর্যময়ী ম্যাডোনার মতো আরম্ভ করে কিছুদূর এগোবার পরই স্নেহময়ী মা হয়ে যায়, একজন উৎপীড়িতা রাক্ষসী আর তার স্নেহময় পুত্রটি রূপান্তরিত হয়ে যায় নিষ্ঠুর এক অপদেবতায়। এইভাবে প্রেম আর ভালোবাসা পরিবর্তিত হয়ে যায় অপ্রচ্ছন্ন হিংসায়। আর যার মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ মূর্ত হয়ে ওঠে গ্রাস করতে উদ্ধত নতুন পুরাতনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। প্রেমদীপ্ত একটি মিথুন মূর্তিকে 'বাই-ভালভ' এর মতো প্রকাশ করেছেন তিনি, যার মাঝ বরাবর তুলে দেওয়া হয়েছে লিঙ্গের মতো একটি থাম। শস্যদানা ফেটে বেরিয়ে পড়া অঙ্কুরিত গাছ বলে মনে হয় যেন। এইভাবে অনুভূতিময় মেয়ে মূর্তিগুলি আবেগ উদ্দীপনায় ভরা ধাবমান মেঘের মতো সুন্দর আর ভয়ঙ্করতার মধ্য দিয়ে ভেসে যেতে থাকে। এখানে তাঁর কল্পনা কিছুটা পারম্পর্যতার মধ্যে দিয়ে এসে তা হয়েছে কাব্যিক আর মৌলিক। এই সমস্ত কাজগুলিতে একজন কিউবিষ্ট-এর সব কলাকৌশলই ব্যবহারই করেছেন তিনি। প্রত্যেকটি ইমেজকেই গঠনবিন্যাসের মধ্যে আছড়ে ফেলে আবার নতুন অভিব্যক্তির অস্তিত্বে ফিরিয়ে এনেছেন তাদের। এদের অনেকগুলি নিঃসন্দেহে নাটকীয়। কিন্তু এই নাটুকে ভঙ্গীমাই ভালোবাসা বনাম ঘৃণা, সৃষ্টি বনাম ধ্বংস, পাপ বনাম পুণ্য এবং এইরকম আরো কিছু বিরোধিতার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে রহস্যময়তার প্রতিধ্বনি নিয়েই যেন বার বার ঘুরে আসে আমাদের কাছে।

রামকিঙ্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ভাস্কর্যের একটা বড়ো অংশই হল শান্তি-

নিকেতনের মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা সিমেন্ট-কংক্রীটের বিশাল আর প্রভাবশীল ভাস্কর্যগুলি। এই পর্যায়ে তাঁর করা প্রথম ভাস্কর্য হল ছিপছিপে লম্বা 'সুজাতা' (যখন আমি এটিকে প্রথম দেখি সারিবদ্ধ লম্বা ইউক্যালিপ্টাসের ভিতর রহস্যজনকভাবে আবিষ্কার করি একে)। তারপর কলাভবন এলাকায় একে একে আসে 'সাঁওতাল পরিবার' (তখন খুব সুন্দরভাবে লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে এর অবস্থান ছিল), শান্তিনিকেতনের প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে সবুজবর্ণের খোদিত মণির মতো উজ্জ্বল ও রঙীন সিমেন্টের ভাস্কর্যটি (যাকে সাধারণতঃ 'বাতিদান' নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে), বিতর্কিত 'ধান ঝাড়া' (যেটি এর উন্মুক্ত শারীরিক গঠনের জন্যই গোঁড়া আশ্রমিকদের কাছে রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গ্রামবাসী সাঁওতালদের ভালোলাগার কারণ ছিল এর পরিষ্কার খোলামেলা ছন্দ) এবং হাসিখুশী আর প্রাণচাঞ্চল্যতায় ভরা 'কলের বাঁশি'। এই জনপ্রিয় মূর্তিগুলি ছাড়াও আছে 'বুদ্ধ' এবং 'গান্ধী' মূর্তি। তাঁর অন্যান্য কাজের মতো এগুলিও পরিবেশের সাধারণ ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে তা আরো কোন এক গভীর সম্পর্কের মধ্যে চলে গেছে। প্রবেশদ্বারের কাছে মহিলা ও উড়ন্ত পাখীর আদলে করা সিমেন্টের ভাস্কর্যটিকে মনে হয় যেন আঁকাবাঁকা তরঙ্গে উড়ে আসা নব্যপ্রস্তর যুগের ভেনাস। জীবন্ত মানুষী মূর্তি অথবা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা লম্বা গাছের মতো মনে হয় 'সুজাতা'কে। মাধুর্য, বলিষ্ঠতা আর নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে ভেঙে না পড়া ভারতীয় গ্রামজীবনের স্থায়ী প্রতীক 'সাঁওতাল পরিবার'। সমৃদ্ধের দেবীর খুব কাছাকাছি চলে আসে 'ধান ঝাড়া'। 'কলের বাঁশী' গ্রামবাসী সাঁওতালদের অদম্য জীবন উচ্ছ্বাসের কথাই মেলে ধরে, আনন্দ-কলতান যখন দূরে দূরে রয়ে যায় তখন গানের মধ্য দিয়েই যাঁরা খুঁজে পায় জীবনের গভীর তলদেশ। দৃশ্যময়তা, অবস্থান, মাত্রা সমস্ত কিছুর বিচারেই এইসমস্ত মূর্তিগুলি তাঁর নিখুঁত সৃষ্টি। এইরকম আরো কিছু কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তিনি, যেমন—পিয়ার্সন পল্লীর পটভূমিকায় 'ঠাকুর-গান্ধী'র বিশাল মূর্তি। এবং একেবারে নতুনভাবে 'গান্ধী' মূর্তি, যেখানে ভেঙে পড়া টুকরো পৃথিবীর উপর দিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে বিজয়ীর উন্মত্ততায় হেঁটে যাবেন তিনি। পরিকল্পিত এই কাজের খসড়া স্কেচটিও ছিল তাঁর করা একটি শক্তিশালী কাজ। কিন্তু এর কোনটিও আর করা হয়ে ওঠেনি।

### মানুষ রামকিঙ্কর

এটা রামকিঙ্করের কাজের একটা দ্রুত আলোচনা বলা যায় মাত্র। তাঁর ক্ষমতা, ভিন্নতা এবং কাজের ভিতরের জটিলতা আরো অনেক বেশী বিচার এবং বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। ভারতীয় শিল্পমঞ্চ থেকে তিনি খুব দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিদায় নিয়েছেন। এত বহুমুখী প্রতিভা এবং চরিত্র নিয়ে এইরকম শিল্পী আমরা আর সহজে ফিরে পাবো না।

তাঁর অবদান ছিল প্রচুর কিন্তু তিনি তা কোনদিনই প্রচার করেননি চারদিকে। তিনি তাঁর কাজে একনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু উদাসীন দার্শনিকের মতো গ্রহণ করতেন তার ফল। অর্থ, মান ও যশের প্রতিধ্বনিময়তার ভিতরে তিনি ছিলেন একক, অসংসারী আর খেয়ালী। পার্থিব সুখভোগে উদাসীন কঠোর তপস্বীর মতো ছিল তাঁর জীবনযাপন। পৃথিবীর ঘ্রাণ, মুক্ত আকাশের আলো আর প্রকৃতির চলমান দৃশ্যাবলীই ছিল তাঁর জীবনের প্রিয় সঞ্চয়।

পরস্পর বিরোধী নানান ভাবের সমন্বয়ে তিনি ছিলেন একজন বৈচিত্রময় মানুষ। গ্রামের মানুষ হিসাবে একদিকে যেমন ছিলেন গর্বিত, অন্যদিকে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন একটি পরিশীলিত মন ছিল তাঁর। জেমস জয়েস-এর 'ইউলিসিস'-এর কোন কোন অংশ কিংবা লোকসঙ্গীতের ভিতর দিয়েই তিনি খুঁজে পেতেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি আর অনুভব। অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরা ছিলেন তিনি কিন্তু বাকসংযমেরও গভীর বোধ ছিল তাঁর। যদিও তিনি প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি মনোযোগী ছিলেন না তবুও সংযত রুচিবোধের বাইরে চলে যাননি কখনোই। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ যেমন ছিল তীব্র, তার প্রতি বিদ্রোহও ছিল ঠিক সেইরকমেরই। তাঁর দার্শনিক সহিষ্ণুতাই এই বিদ্রোহকে করে তুলেছিল সংযত। তিনি ভবঘুরে ছিলেন কিন্তু সন্তের মতো ছিল তাঁর সেই ভবঘুরেপনা। তিনি ছিলেন খুব বেশীরকমভাবে অনুভূতি আর আবেগপ্রবণ কিন্তু সেই অনুভূতি আর আবেগকে শাসন করেছিলেন তিনি। এইভাবে তাঁর কাজ এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরতা আর জটিলতা ক্রমাগত পরস্পর বিরোধীতায় ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে আসতে থাকে। কারণ তিনি খুব বেশীরকম-ভাবে মানুষই ছিলেন কিন্তু চিরাচরিত পার্থিব মানুষের একটু উপরেই চলে গিয়েছিলেন তিনি।

## রামকিঙ্কর ও ছাপচিত্র

.......... ..... ......

নির্মলেন্দু দাস

স্রষ্টা ও সৃষ্টি, এ দু'য়ের মাঝে উপাদান ( material )। বস্তুগত উপাদানের আধারে শিল্পীর স্বজ্ঞালব্ধ (intuition) যে চিন্তাটি ভ্রূণাকৃতি লাভ করল, তা প্রযুক্তি (technique) ও শৈলীর (style) সহযোজনে আত্মপ্রকাশ করে রূপাকৃতিতে। যা ছিল শিল্পীর মনে একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনা হিসাবে, তা দৃষ্টিলব্ধ হল উপাদান, প্রযুক্তি প্রয়োগ (application), করণকৌশল ( treatment ) ও শৈলীর স্তর অতিক্রম করে। অর্থাৎ ভাবনা যখন বস্তুবাদী সৃষ্টিতে এল, তখন তার গুণীয় পরিবর্তন ( qualitative change ) ঘটল। স্বজ্ঞা থেকে বস্তুগত উপাদানে সৃষ্টির এই স্তরবিন্যাসের একটি প্রথাগত ব্যাকরণ আছে। বিশেষভাবে প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রয়োগকৌশল এবং ব্যবহৃত সামগ্রীর রাসায়নিক ব্যবহার্যাদিকটি এই ব্যাকরণ বা নির্ধারিত রীতি অনুসরণ করে চলে। ফলতঃ বিশেষ বিশেষ উপাদানের স্ব-স্ব চরিত্র ও গুণাবলী সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয় শিল্পীকে। ধাতুকে বিশেষ আধারে ঢেলে তবেই হল ব্রোঞ্জের মূর্তি। কাঠ ও পাথরে মূর্তি গড়ার সময় ধাতুঢালাই পদ্ধতি অচল ; তার জন্য আবার অন্য প্রক্রিয়া। তেমনি আবার জলরঙ যে সম্ভাবনার কথা বলল, রঙের সঙ্গে তেলের মিশ্রণ নিয়ে গেল ভিন্ন পরিবেশে। সেইরকম ছাপচিত্রে 'ইণ্টালিও' পদ্ধতি লিথোগ্রাফিতে সম্ভব নয়। অর্থাৎ উপাদানের সহজাত গুণ ও শিল্পভাবনার আপস-প্রবণতায় শিল্পসৃষ্টি অভীষ্টের লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। শিল্প-সৃষ্টির এই প্রথাগত ধারণা সম্পর্কে বেশীরভাগ শিল্পীই সচেতন।

রামকিঙ্কর সেই বিরলদের একজন যিনি শিল্পপ্রযুক্তির প্রথাগত রীতি ও রাসায়নিক ব্যবহারবিধি নিয়ে খুব বেশী সজাগ ছিলেন না। কালবৈশাখী ঝড়ের বেগে তার মানসিক আবেগ, অনুভূতি ধাবিত হয়েছে সৃষ্টির দিকে। স্বজ্ঞা যখন উদ্দীপক, রূপ পেতে চাইছে আকার আকৃতিতে, সৃষ্টির এই সন্ধিক্ষণে রামকিঙ্করের মনে প্রয়োগরীতির বিধি-নির্দেশ গৌণ হয়ে যেত। কত তাড়াতাড়ি সৃষ্টির পূর্ণ-রূপটি দৃষ্টিগোচর হয়, সেই প্রেরণা তাঁকে চালিত করেছে বারংবার। অর্থাৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাঝে সৃষ্টির মূল অভীষ্ট ও শৈলী সম্বন্ধে অতি সজাগ থাকলেও আবেগের তাণ্ডব-নৃত্যে শিল্পপ্রযুক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রয়োগবিধি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। ফলে রামকিঙ্কর সৃষ্ট বেশীরভাগ কাজই পরবর্তী সময়ে শিল্প সংস্কারকের কাছে সমস্যার সৃষ্টি করলেও ঝড় তৎক্ষণে থেমে গেছে।

পূর্বোক্ত প্রস্তাবনার মূল উদ্দেশ্য হল রামকিঙ্করের মানসিকতার কেন্দ্রীয় সুরটি লক্ষ্য করা। ছাপচিত্রের সঙ্গে প্রযুক্তির যোগ চিত্রশিল্পের তুলনায় অনেকবেশী প্রলম্বিত এবং প্রয়োগগত একাধিক ক্রমিক স্তর অতিক্রম করেই সর্বশেষ ছবিটি ছাপা হয়। স্তর অতিক্রমের এই ধারাবাহিক বিবর্তনের পর্যায়কাল যেহেতু জটিল প্রক্রিয়ায় পূর্ণ ফলতঃ তা সময় সাপেক্ষ এবং যেহেতু প্রক্রিয়াগুলি একে অন্যের সঙ্গে একটি নির্ধারিতরীতিতে পরস্পর সংযুক্ত সেইজন্য প্রতিটি পর্যায় সঠিকভাবে অতিক্রম করতে হয়; ফলতঃ সম্পূর্ণ ক্রিয়াটি যেহেতু শ্লথ সেজন্য ধৈর্য্যসাপেক্ষ।

রামকিঙ্করের মানসিকতায় ছাপচিত্রচর্চায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা ছিল প্রবল; তবুও রামকিঙ্কর কৃত ৪৫—৫০টির মত ছাপচিত্রের সন্ধান পেয়েছি।

এই তথ্য আমাদের নিয়ে যাবে প্রসঙ্গান্তরে রামকিঙ্করের ছাপচিত্রের উৎস সন্ধানে।

১৯১৯ সালে কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে নন্দলাল বসু কলাভবনের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে রামকিঙ্কর যখন কলাভবনে ভর্তি হলেন তখন এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি সদ্যফোটা ফুলের মত রবিকিরণে উদ্ভাসিত। দিনে দিনে অঙ্কুরিত হচ্ছে সম্ভাবনার এক একটি দিক। নন্দলাল বসুর সযত্ন প্রচেষ্টায় কলাভবনে এক একটি নতুন শাখা উন্মেষিত হচ্ছে। ভারতীয় ভাবধারার উপর পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পের সচেতন সংমিশ্রণের স্রোতটি ঝর্ণা থেকে নদীতে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে মোটামুটি এই সময় থেকে। ১৯২৫ সালে রামকিঙ্কর যখন কলাভবনে ভর্তি হলেন, তার আগেই কলাভবনে ছাপচিত্রচর্চার সচেষ্ট প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। পিয়ার্সন, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তকে কাঠ খোদাই যন্ত্র (Tool) ইংলণ্ড থেকে আনিয়ে উপহার দেন। মণীন্দ্রভূষণ কলাভবনে ভর্তি হওয়ার আগেই শ্লেট এনগ্রেভিং জানতেন। পিয়ার্সনের এই উপহার তিনি পূর্ণমর্যাদায় কাজে লাগালেন, কলাভবনে কাঠখোদাই শুরু হল; ১৯২৫ সালে তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। ১৯২৩ সালে ফরাসী শিল্পী আঁদ্রে কারপেলে কলাভবনে কাঠখোদাই সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা দেন। রামকিঙ্কর কলাভবনে ভর্তি হয়ে লক্ষ্য করলেন আঁদ্রের সুযোগ্য ছাত্র রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আঁদ্রে অনুসৃত শিল্পমাধ্যমটিকে পরিণত রূপদানের প্রচেষ্টায় মগ্ন। একবর্ণের কাঠখোদাই ছাড়াও রঙীন কাঠখোদাই নিয়ে রমেন্দ্রনাথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ঐ সময় সুরেন্দ্রনাথ কর লণ্ডন থেকে লিথোগ্রাফি ও এচিং শিখে এসেছেন; কলাভবনের শিল্পশিক্ষায় কাঠখোদাই ছাড়া আরো দুটি মাধ্যমের প্রাথমিক স্তর সূচিত হল। কলাভবনে ছাপচিত্রচর্চার এই প্রাথমিক স্তরের সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিরীক্ষণ করেছেন রামকিঙ্কর। ১৯২৯ সালে রমেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। তৃতীয় দশকে কলাভবনে ছাপচিত্রচর্চার অগ্রভাগে এলেন শ্রীবিশ্বরূপ বসু। শ্রী বসু, কাঠখোদাই-লিনোকাট, এচিং, ড্রাইপয়েন্ট প্রভৃতি বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

মোটামুটি দ্বিতীয় দশকের শেষভাগ থেকেই নন্দলাল বসু ছাপচিত্রের প্রতি যত্নবান হন। নন্দলাল বসু কৃত একবর্ণে ছাপা কাঠ ও লিনোখোদাই, এচিং ও ড্রাইপয়েন্ট ভারতীয় ছাপচিত্রের ধারাকে সৃজনের (creative) পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করল। ছাপের ছবি যে কেবলমাত্র প্রতিলিপিধর্মী নয় বরং সৃজনশীলমাধ্যমরূপে একটি শক্তিশালী সম্ভাবনাপূর্ণ উপাদান তা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করল নন্দলাল সৃষ্ট ১৯৩০ সালে 'সহজপাঠ'-এর জন্য করা একবর্ণের লিনোখোদাইগুলি থেকে। ছাপচিত্রের এই অভিনব দৃষ্টান্তে আকৃষ্ট হলেন বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর।

কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই লক্ষ্য করা যায় শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে উদার মনোভাবের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে মুক্ত পরিবেশ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার গ্রহণ-বর্জনের পথে মিলনের পক্ষপাতী ছিলেন। নন্দলাল, রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্বাসী ও আস্থাবান ছিলেন। শিল্পক্ষেত্র থেকে ভিন্ন-ভিন্ন রসদ সংগ্রহ করে আপন পথটি খুঁজে নিতে তাঁর শিক্ষার্থীবন্ধুদের অনুপ্রাণিত করতেন তিনি। কেবলমাত্র ভাব ও রূপের পথে নয়, বিভিন্ন রীতি-প্রকরণ, ভিন্ন ভিন্ন পরম্পরা ও নানা উপাদান হাতে-কলমে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিল্পশিক্ষার পূর্ণাঙ্গরূপটি শিল্পীরা যাতে পেতে পারেন তার সকলরকম পথ তিনি উন্মুক্ত রাখতেন। তিনি নিজেও সেইভাবে তাঁর শিল্পকর্মের পথটি খুঁজে নিতেন। নন্দলাল অনুসৃত এই অনুপ্রেরণা কলাভবনের শিল্পীদের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম নিয়ে কাজ করার সক্রিয় একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। ফলে তদানীন্তন শিল্পীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাধ্যম থেকে মাধ্যমান্তরে যাতায়াত করেছেন।

পূর্বেই শ্রীবিশ্বরূপ বসুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি। ঐ সময় যাঁরা ছাপচিত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাঁদের পথ-নির্দেশক ছিলেন শ্রীবসু। ধাতুপাতে এচিং গ্রাউণ্ড মসৃণ করে লাগিয়ে দিতেন তিনি। তার উপর সূচীমুখ শলাকা দিয়ে ড্রইং করতেন শিল্পীরা। এরপর সেই ধাতুপাতকে অ্যাসিড্-এ বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ছাপ তোলার উপযোগী করে ছাপ নিতেন শ্রীবসু। অর্থাৎ ছাপচিত্রের অতি প্রাথমিক স্তর থেকে সমগ্র জটিল প্রক্রিয়াগুলি, মূলছাপ এবং তার সংস্করণ ( edition ) অবধি শিল্পীরা সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন শ্রীবসুর উপর। শ্রীবসুর প্রত্যক্ষ আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব ঘটলে ঐ সময় নন্দলাল, বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর ছাপচিত্রের প্রতি যত্নবান হতেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

রামকিঙ্করের সহজাত প্রতিভা, ছাপচিত্রের সৃজনধর্মী সম্ভাবনা ও চরিত্রটি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিল সহজেই। কিন্তু তৎ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও উদ্দীপনা থাকলেও দীর্ঘপ্রক্রিয়াযুক্ত এই মাধ্যমটিকে কাজে লাগিয়ে নিতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। তবুও রামকিঙ্কর ছাপচিত্র করেছেন এবং করেছেন শ্রীবসুর সক্রিয় সহযোগীতায়।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যায়, ছাপচিত্র সম্পর্কে সাম্প্রতিক মনোভাবটির কথা।

মোটামুটি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই শিল্পীসমাজে ছাপচিত্রের স্বতন্ত্র শিল্পী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ছাপচিত্রের বিশেষজ্ঞ এই শিল্পীরা 'প্রিণ্টমেকার' নামে পরিচিত। ১৯৬৪ সালে 'প্রিণ্টমেকিং কাউন্সেল অব আমেরিকা' মৌলিক প্রিণ্ট বিবেচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিধিগুলি ধার্য করেনঃ শিল্পী নিজেই মূল ব্লকটি তৈরী করবেন; প্লেট, লিথো (বিশেষধরনের পাথর), কাঠ, লিনো প্রভৃতির উপর শিল্পী নিজেই মূল চিত্রটি আঁকবেন, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি করবেন এবং নিজেই প্রিণ্ট নেবেন। অর্থাৎ একটি ছাপের ছবি করার প্রতিটি অধ্যায়ের সঙ্গে শিল্পীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবে। উক্ত নির্দেশাবলী কেবলমাত্র ১৯৩০ সালের পরবর্তী সময় থেকে প্রযোজ্য হবে বলে স্থির হয়। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের শিল্পী, সমালোচক, শিল্পসংগ্রাহকবর্গ এই বিধিগুলি সাধারণভাবে মেনে নিয়েছেন।

অর্থাৎ ছাপচিত্রের শিল্পী এবং 'প্রয়োগবিদ্যাবিৎ' (Technologist) যখন একজন, তখন তাকে 'প্রিণ্টমেকিং' বলা হয়। প্রিণ্টমেকার গোষ্ঠী আবির্ভাবের পূর্বে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর যৌথ প্রয়োগের ছাপচিত্র হতো। একদিকে শিল্পী, যিনি মুখ্যচিত্রটি আঁকতেন বা মূলখসড়াটি তৈরী করতেন। অপরদিকে পেশাদারী কারিগর যিনি মূলচিত্রটি অনুসরণে ও অনুকরণে এনগ্রেভিং এচিং করতেন। ফলে শিল্পীর সঙ্গে ছাপচিত্রের সম্পর্ক থাকত প্রাথমিক স্তরে। মূলকাজটি সম্পাদিত হত দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মাধ্যমে—যাঁরা কেবলমাত্র নকল-নবিশ ছিলেন।

'প্রিণ্টমেকার'দের সঙ্গে পূর্বতন গোষ্ঠীর তফাৎ অনেকখানি। ছাপচিত্রের উপাদান-গত চারিত্রিক সম্ভাবনা প্রিণ্টমেকারগণ যতখানি উপলব্ধি করতে পারেন পূর্বজ গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে তা সম্ভবপর ছিল না। যেহেতু তাঁদের কাজ প্রথমস্তরেই সম্পূর্ণ হয়ে যেত এবং সহকারীগণ (Technician) ঐ চিত্রটিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে যথাযথ রাখার চেষ্টা করতেন; ফলতঃ ছাপচিত্রটি মূলচিত্রের প্রতিলিপিরূপে প্রকাশিত হত। অর্থাৎ মূলচিত্রের একাধিক সংস্করণ ঐ সময় ছাপচিত্রের প্রধান চরিত্ররূপে প্রতিপন্ন হয়েছে; ছাপচিত্রের মৌলিকসত্তা ও স্বকীয় দিকটি প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে স্বাভাবিক কারণে। অন্যদিকে প্রিণ্টমেকারগণ একটি কাজ শুরু করে প্রতিটি প্রক্রিয়ার সহজাতগুণটি উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেন। সহজাত চরিত্রগুলির প্রয়োগবিধির মাধ্যমে মূলচিত্রের গুণীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি ক্রমাগত সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। প্রিণ্টমেকারগণ গুণীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পর্বটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন বলে ছাপচিত্র কেবলমাত্র প্রতিলিপি হয়না।

রামকিঙ্কর 'প্রিণ্টমেকার' ছিলেন না, ছিলেন দ্বিতীয় গোষ্ঠীর শিল্পী। কিন্তু উল্লেখযোগ্য দিকটি হল তিনি দ্বিতীয় গোষ্ঠীর শিল্পী হয়েও ছাপচিত্রকে মূলচিত্রের যথাযথ প্রতিলিপিরূপে বা কেবলমাত্র একাধিক সংস্করণমূলক মাধ্যমরূপে দেখেন

নি। ছাপচিত্রকে শিল্প প্রকাশের একটি স্বাধীন মাধ্যম এবং ছাপচিত্রের অন্তরস্থিত মৌলিক চরিত্র তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নন্দলালকৃত ছাপচিত্রের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতায় এবং তাঁর সহজাত প্রগাঢ় বোধশক্তির মাধ্যমে। ফলে এচিং, ড্রাইপয়েণ্ট লিথোগ্রাফ কিংবা লিনোকাট করতে গিয়ে রামকিঙ্কর যখন মূলখসড়াটি করেছেন তখন ছাপচিত্রের সম্ভাব্য চরিত্রটি উপলব্ধির মাধ্যমে পরিকল্পনাটি করেছেন, ফলে সেগুলি কেবলমাত্র রেখাচিত্র বা চিত্রের প্রতিলিপি হয়ে যায়নি, ফলতঃ সেগুলি চিত্রধর্মী ( Painterly ) না হয়ে ছাপচিত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দ্বিতীয়তঃ, ছাপচিত্রের জন্য তাঁকে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা যেহেতু প্রধান শিল্পী ছিলেন, কেবলমাত্র নকল-নবিশ ছিলেন না, ফলে যৌথ প্রয়াসে রামকিঙ্করের কাজগুলি সার্থকতার দিকে এগিয়ে গেছে।

একদিকে বিশ্বরূপ বসুর প্রত্যক্ষ সহযোগীতা, অন্যদিকে নন্দলাল বসুর অনুপ্রেরণা ও কলাভবনে একাধিক মাধ্যম নিয়ে কাজ করার সক্রিয় পরিবেশ রামকিঙ্করের ছাপচিত্রচর্চার অনুপ্রেরণাকে অগ্রগতি দিয়েছিল।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তাঁর ছাপচিত্রগুলিকে প্রধানতঃ চারশ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) নরনারীর জীবন (২) প্রাণীজগৎ (৩) নৈসর্গিক দৃশ্য (৪) বিমূর্ত ঃ এই বিষয়সূত্রধারাটি প্রধানতঃ তিনটি বিভাগে অনুসৃত—(ক) মা ও শিশু (খ) নর-নারী ও প্রকৃতি (গ) প্রতিকৃতি

'মা ও শিশু'—এই বিষয়টি বারবার ফিরে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে। নর-নারীকে কেন্দ্র করে গাছপালা, পশুপাখী ইত্যাদি বীরভূমের গ্রাম ও তার প্রকৃতি মিলেমিশে আছে 'মানুষের জীবনে'। 'ধানকাটা', 'ধানবোনা', 'হলকর্ষণ' প্রভৃতি এচিং, 'দিনের শেষে'—ড্রাইপয়েণ্ট প্রভৃতির নাম করা চলে। প্রতিকৃতি ঃ যেমন 'গৌরী'—ড্রাইপয়েণ্ট, 'নেপালরাজ'—ড্রাইপয়েণ্ট প্রভৃতি। (২) পশুপাখী—এই শ্রেণীতে লক্ষ্য করা যায় পশুপাখীর স্বতন্ত্র রূপ—যেমন বিড়াল পরিবার—লিথো, কুকুর—এচিং; মাছ ও জাল—এচিং, পাখীর ছানা—লিনো ইত্যাদি। (৩) নৈসর্গিক দৃশ্য ঃ গাছপালা, ফুলফল, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি নানা বিষয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে তাঁর এই অধ্যায়ের কাজগুলি—যেমন সূর্যমুখী—লিথো; বসন্ত—লিথো; ঝড়—লিথো; নেপালের দৃশ্য—ড্রাইপয়েণ্ট; নদীর তীরে—ড্রাইপয়েণ্ট; কেয়াঝোপ—সিমেণ্ট ব্লক; ইত্যাদি। (৪) রামকিঙ্কর কৃত বিমূর্ত ভাস্কর্য ও চিত্রের অনুসরণে গড়ে উঠেছে এই বিমূর্ত কাজগুলি—যেমন মিথুন—এচিং, সাজ—এচিং ইত্যাদি।

উপরি উল্লিখিত সমীক্ষায় আমরা লক্ষ্য করলাম, রামকিঙ্কর এচিং, ড্রাই-পয়েণ্ট, লিনো, লিথো এমনকি সিমেণ্ট ব্লকের মত একটি অপরম্পরা ( Non-traditional ) মাধ্যমে কাজ করেছেন।

রামকিঙ্করের ছাপচিত্রচর্চা শুরু হয়েছিল সিমেণ্ট ব্লকের থেকে রাবিং পদ্ধতিতে ছাপ নেওয়া থেকে। রাবিং পদ্ধতিতে ছাপ নেওয়ার প্রথা চীনদেশে দীর্ঘকাল থেকে

প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে রাবিং পদ্ধতিতে ছাপ গ্রহণের রীতি প্রচলন করেন কলাভবনের শিল্পীরা। দ্বিতীয় দশকে করা মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কৃত কাঠখোদাই-এর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ঐগুলি ছাপা হয়েছিল রাবিং পদ্ধতিতে। ১৯২৪ সালে নন্দলাল বসু চীনদেশ ভ্রমণকালে বড় বড় রাবিং প্রিণ্ট সংগ্রহ করেছিলেন। কলাভবনের সংগ্রহশালায় সেগুলি স্থান পায়। চীনদেশ থেকে প্রাপ্ত ঐ রাবিংগুলি তদানীন্তন শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তৃতীয় দশকে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন নন্দলাল, রামকিঙ্কর প্রমুখ শিল্পীদের অনুসন্ধিৎসু করেছিল।

সিমেণ্টে বড় বড় ব্লক তৈরী করে কাঁচা অবস্থায় তার উপর খোদাই করে কিংবা কখনো কখনো লিখিত ও ছবির অংশগুলি উঁচুতে রেখে কালি লাগিয়ে রাবিং পদ্ধতিতে অসহযোগ আন্দোলনের বেশ কিছু পোস্টার ছেপেছিলেন রামকিঙ্কর। সমগ্র কর্মকাণ্ডটি গোপন ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন: 'সন্ধেবেলা সিমেণ্ট ঢেলে বড় বড় ব্লক তৈরী করে নিতাম। অসহযোগ আন্দোলনের পোস্টার ছাপা হত তাতে। কোলকাতা থেকে লোক এসে নিয়ে যেত।' পোস্টার ছাপার এই রীতিকে কাজে লাগিয়ে তিনি কিছু ছবি ছেপেছিলেন। কলাভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত 'কেয়াঝোপ' নামক ছাপচিত্রটি উল্লেখ করা যায় এই প্রসঙ্গে।

রামকিঙ্কর কৃত ছাপচিত্রের চারিত্রিক আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করব যেহেতু তাঁর ছাপচিত্র কোন নির্দিষ্ট পর্যায়কাল অনুসরণ করেনি, তিনি ছাপচিত্র করেছেন ছবি আঁকা ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে, সেজন্য তাঁর ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপাকৃতি, আঙ্গিক ( Style ), গঠনরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ছাপচিত্র-গুলিতে। তাঁর আঁকা ছবিগুলির সঙ্গে ছাপচিত্রের এই মিলনতন্ত্রী কেবলমাত্র রূপাকৃতি, আঙ্গিক ও গঠনরীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

যেহেতু রামকিঙ্কর উপাদানের গুণগত চরিত্র সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন, সেইজন্য তাঁর নিজস্ব চিত্রাবলীর প্রভাব ছাপচিত্রে লক্ষ্য করা গেলেও সেগুলি চিত্রধর্মী হয়ে যায়নি। একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক। একই বিষয় ও মোটামুটি একই গঠনরীতিতে তিনটি আলাদা আলাদা উপাদানে কাজ করেছেন এমন দৃষ্টান্তের নিদর্শনরূপে তাঁর 'বসন্ত' কাজগুলির তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। 'বসন্ত' নামক একই শৈলী অনুসরণে তিনি জলরঙ, তেলরঙ ও রঙীনলিথো করেছেন। উপাদান, প্রক্রিয়ার তারতম্যে একই বিষয়নির্ভর এই তিনটি কাজ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ তৈরী করেছে। তিনটিতে গঠনরীতির মূলসুরটি এক হলেও উপাদানের স্ব-কীয় চারিত্রিক দাবীতে প্রতিটি কাজেই লক্ষ্য করা যায় গঠনরীতি ও বিন্যাসে পরিবর্তন এসেছে। অপরদিকে রঙীনলিথোটির সঙ্গে রঙীনচিত্রদুটির তফাৎ ঘটেছে রৈখিক অনুভূতিতে, রঙ ব্যবহারে, স্পর্শানুভূতি ( tactile feeling ) ও বহিপৃষ্ঠের কর্ষশক্তির ( surface tension ) তারতম্যে। ফলে প্রতিটি কাজে সৃষ্টি হয়েছে ভিন্ন পরিবেশ এবং

পরিবেশই তিনটি কাজকে নিয়ে গেছে ভিন্নমাত্রায়। প্রসঙ্গত পিকাসোর কথা উল্লেখ করা যায়। স্বল্পদিনের ব্যবধানে পিকাসো একই সঙ্গে এচিং, ড্রাইপয়েন্ট, সুগার অ্যাকোয়া, এনগ্রেভিং ও তেলরঙে এঁকেছেন ক্রন্দনরতা রমণীর মুখমণ্ডল। লক্ষ্যণীয় দিকটি হল উপাদানের চরিত্রানুসারে প্রতিটি কাজের পরিবেশ গেছে বদলে, যদিও গঠনরীতিতে একটিই আঙ্গিক তিনি ধরে রেখেছিলেন। রামকিঙ্করকে প্রশ্ন করেছিলাম পূর্ব উল্লিখিত 'বসন্ত' কাজগুলির সম্বন্ধে। তিনি বলেছিলেন : 'মানসিকতার তফাৎ হয় উইথ্ দি মিডিয়াম্। একই সাব্জেক্ট করি কিন্তু কপি হয় না। বারবার করি…এ-ত হবেই। কম্পোজিশ্ন একই, কিন্তু দেখ তফাৎ আছে অনেক। তিনটি তিনরকমের। তফাৎ না থাকলে একটিতেই শেষ হয়ে যেত। নানা মিডিয়াম-এ নানা মজা। ওটি না জানলে কিছু হল না।·· বারবার ফিরে আসে একই বিষয়। কেন আসে বলা কঠিন। কিন্তু আসে এটাই সত্য। তবে বলি একটা মজার গল্প—গুরুদেবের পোর্ট্রেট করছি, উনি তো চুপচাপ। মনে সাহস রেখে বলে ফেললাম আপনার নতুন কবিতাগুলি পড়েছি। উনি ভারীগলায় বললেন—'কিছু হয়নি ওগুলি। পড়লে কোথায় ?' ভয়ে ভয়ে বললাম, সুধীরবাবুর[১] কাছে দেখেছি। পরে যখন বই বেরুল, কি দেখি জানো ? ঐ আগের দু-তিন লাইন আছে আর সবই নতুন। এইটাই হয়। বারবার ভাঙতে হয়। ভয় পেও না। ভাঙতে পারার সাহস রাখবে—তবেই নতুন হবে। দেখ না, ঐ যে স্প্রিং লিথোটা, মাঝে একটু সাদা লাইন দরকার। আবার আঁকব. পাথর রেডি করে দিও। খুঁতখুঁতটা এখনও থেকে গেল। মনটা ছটফট করে যতক্ষণ না পূরণ হয়।'

ছাপচিত্রের উপাদানের স্ব-কীয় চরিত্র সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন একথা একাধিকবার উল্লেখ করেছি। এবং সজাগ ছিলেন বলেই বিষয় নির্বাচনও হয়েছে উপাদানকে কেন্দ্র করে। ফলে দুটি পরস্পরবিরোধী না হয়ে, হয়েছে একে অন্যের পরিপূরক। যেমন পায়রার তুলতুলে নরমভাব ফুটিয়ে তুলতে পিকাসো বেছে নিলেন লিথোগ্রাফ কিংবা ব্যাঙ-এর কর্কশ বহির্গাত্র আঁকতে প্লেটের উপর অ্যাসিডের ব্যবহারে বুদবুদের স্থায়ী আবরণ সৃষ্টি করলেন কিংবা ক্রন্দনরতা রমণীর মুখমণ্ডলে তীব্র যন্ত্রণার ভাব ফুটিয়ে তুলতে এনগ্রেভিং ও ড্রাইপয়েন্ট বেছে নিলেন, অন্যত্র যুবতী রমণীর মুখমণ্ডলে পেলবভাবটি ফুটিয়ে তুলতে সুগার অ্যাকোয়া করলেন ; যেমন নন্দলাল বসু সহজপাঠে সহজভাবে সাদাকালো বিভাজনে লিনোখোদাই বেছে নিলেন। কিংবা সোমনাথ হোর 'ক্ষত' আঁকতে গিয়ে প্লেটের উপর সরাসরি আঘাত হেনেছেন বাটালী দিয়ে কিংবা অ্যাসিড ব্যবহ. করেছেন সূক্ষ্মের বিপরীতে কিংবা গরমছুরি দিয়ে মোমের পাতে ক্ষত সৃষ্টি করে পা প্রিণ্ট করেছেন কিংবা ব্রোঞ্জের মূর্তিতে ক্ষত সৃষ্টি করতে বিদীর্ণ করেছেন মোমের তকে, তেমনি রামকিঙ্করের

১. সুধীর কর

ছাপচিত্রে লক্ষ্য করা যায় বিষয় ও উপাদান দুটি দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। বেড়ালের তুলতুলে-ভাব ফুটিয়ে তুলতে রামকিঙ্কর যেমন লিথোগ্রাফ করেছেন তেমনি 'দিনের শেষে' 'হলকর্ষণ', 'প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি ছাপচিত্র রচনায় তিনি বেছে নিলেন এচিং, কেননা অ্যাসিডের কামড়জাত চরিত্রের ভিতর দিয়ে যে রৈখিক অনুভূতি হাজির হবে তা হবে ঐ বিষয়ের পরিপূরক। তেমনি কালবৈশাখীর তাণ্ডবরূপটি ধরতে তিনি এচিং-এর সঙ্গে ড্রাইপয়েন্টের সমন্বয় ঘটালেন।

রামকিঙ্কর ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীরূপে যতখানি সুপরিচিত, ছাপচিত্রশিল্পীরূপে ততখানি সুপরিচিত নন। রামকিঙ্করের ছাপচিত্র তাঁর ভাস্কর্য ও চিত্রের মত স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এই মাধ্যমটির প্রতি তাঁর সস্নেহ প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা ছিল প্রবল কিন্তু উক্ত মাধ্যমটির প্রতি সময় দিয়েছেন কম। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ 'সবসময় লোক থাকে না এচ্ করে দেওয়ার জন্য। তোমাদের মত তো স্পেশালাইজেশান হয়নি তখন। লিথোটা খুব ভাল লাগে। লিথো হেভী জিনিস, পেইন্টিং-এর মত। ড্রাই-পয়েন্টও ভাল লাগে। কিন্তু কপার প্লেট হওয়া চাই। জিঙ্ক প্লেট ভাল লাগেনা। ওতে ঠিক হয়না যা চাই। একটা বই করব লিথোতে, শান্তিনিকেতনের স্মৃতি। সনৎ[২] আর সোম[৩] বলেছিল 'নন্দনমেলার' মত দশ-বারটি প্রিন্ট নয়, বেশী চাই। ঠিক আছে পঞ্চাশটা হবে। না না পঞ্চাশ নয়, এক-শ দুশোর মত। প্রেস নিজেদের হাতে থাকা চাই। মজা লাগে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রিন্ট হয় বলে। নিচে সই করে দিলে দলিলের মত অরিজিনল। গ্রাফিকস্ হচ্ছে একেবারে আধুনিক কালের আর্ট।'

২. সনৎ কর ৩. সোমনাথ হোর

## রামকিঙ্কর ও রেখা

.................................

### রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

যাঁদের কাজ নিশ্চিতভাবে আমাদের হৃদয়ে-মনে-দেশে-সমাজে নিত্য আনন্দধারা, সেসব কাজের ভালো-মন্দের আলোচনার চেয়ে যা সবচেয়ে কর্তব্য তাহল তাঁদের কাজের মধ্যে যে অনুভব চেতনা কাজ করেছে তারই উষ্ণতাব কাছে নিজেদের নিয়ে যাওয়ায় সচেষ্ট হওয়া। এইসব শিল্পীদের কাজের মধ্যে রসগ্রহণে ব্রতী না হলে নিজেরাই বঞ্চিত হব যদি কেবল ভালো বা মন্দের বিচারের পথে চলতে থাকি।

শিল্পী রামকিঙ্কর এমন একজন শিল্পী ছিলেন যাঁকে সাধারণভাবে কোন ছকে ফেলে মেলান সম্ভব নয়। তাঁর নিজেব সমস্তকিছুতেই ছিল এক অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্রতা আর যে স্বাতন্ত্রতা তাঁকে এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই বিশেষ আলাদা ব্যক্তিত্বের স্পর্শ যাঁবা তাঁর সঙ্গ পেয়েছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন আর যাঁদের তাঁব সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ ব্যবহারেব-মননের সঙ্গ ঘটেনি তাঁরাও তাঁব কাজের মধ্যে দিয়ে এলে এই অনন্য স্বাতন্ত্রেব দিকটি অনুভব ও প্রত্যক্ষ করতে পারবেনই, কেননা শিল্পীব কাজ ও জীবনে কোন ফাঁক ছিল না। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যে খোলামেলা পরিবেশ, জল, হাওয়া এবং মানুষজনকে যে অকৃত্রিম ব্যবহার আর হৃদয় নিয়ে দেখা গেছে ঠিক তেমনটিই শিল্পী নিজে। তাঁর একটি প্রতীকি ব্যবহারের উল্লেখ করি, উদাত্ত হাসি, যে হাসি ঝরণার মত ছন্দায়িত আবার প্রতিধ্বনির চমৎকারিত্বের গুণে মাখা। ঐ হাসির হিল্লোলের শব্দ যাঁরা শুনেছেন তাঁরা কখনই ছবির সঙ্গে শিল্পীকে আলাদা-ভাবে দেখতে চাইবেন না। তাই কিঙ্করদার যেকোন সামান্যতম কাজের ধারে গিয়ে দাঁড়ালে ঐ খোলা উচ্ছল পাহাড়ী নদীর শব্দের মত হাসির দৃশ্যটি অনায়াসে অনুভব করা যায়। তাঁর সবকিছুতেই একটি বিশেষ ধরণেব শৌর্য কাজ করেছে। কোনদিনও বিমর্ষতার কুয়াশা তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। অগ্নির মত সবকিছুকেই দহন করবার অনমনীয় মন ছিল তাঁর। কিন্তু যা কোন কারণেই কখনও অসংলগ্ন নয়।

কালো-সাদার কাজ, মূর্তির কাজ, তেলরঙ, জলরঙ এসবকে বিশেষ বিশেষ পর্যায়ক্রমে ভাগ করলে এরা কেউই আমাদের ছকে দেওয়া ছকে থাকবে না। তিনি কালো আঁচড়েই কাজ করেছেন বলেই তা রঙীনছবির এক বিশেষ ছায়া পেলো তা কখনও নয়। তিনি সবসময়ই ছবিকেই ধরেছেন, তা কাপড়ের জমিতেই হোক, কাগজের আস্তরণে কিংবা মাটির পরতে বা পাথরের গায়ে। তাঁর কাজের বিভিন্ন করণকৌশলের মধ্যে কোথাও বিশেষ পারঙ্গমতা দেখানোর মনটা কাজ করেনি, যে

ক্ষমতা, যে উৎসের স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণ আমরা দেখতে পাই তাঁর কাজে সে সম্বন্ধে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন না। আর সে বিষয়ে যে শিল্পীরা সচেতন হয়ে পড়েন তাঁদের কাজের সীমা ঐ করণকৌশলের, চটকের মধ্যেই আটকা পড়ে। রসে পৌঁছান সম্ভব হয় না। কিঙ্করদার সাথে অনেক জায়গায় গেছি কেবল ছবির আঁকার জন্য একথা বলব না। প্রতি বুধবার মাঝেমধ্যেই অনেকজন মিলে তাঁর সঙ্গ পেয়েছি, সেখানে দেখাতেন কেমনভাবে একটি বিষয়কে ছবির মত করে ধরতে হয়। সেই পাঠ সেখানেই নিয়েছি যে প্রকৃতির সবকিছু ভালোর মধ্যেই ছবির মত বিষয় করে পটে নিয়ে আসা।

কিঙ্করদার কালোকালির কাজের সবচেয়ে বড় দিক যা আমাদের অবশ্য গ্রাহ্য তাহল প্রকৃতির ভূমি থেকে বিষয় যখন পটের ভূমিতে স্থাপিত হচ্ছে তখনই তা অনন্য হয়ে রূপ পেয়ে যাচ্ছে। অনন্যতা এই কারণে যে যখন রূপটিকে ফুল তোলার মত করে তুলে নিয়ে নিজের সাজিতে রাখলেন তখনও সে তার সত্তা থেকে বিচ্যুত হলনা—সেই সজীবতা, প্রাণময়তা একাকার হয়ে চিরদিনের মতো প্রাণ পেয়ে প্রতিষ্ঠা পেল, মূল প্রকৃতিতে যে বিষয়ে রূপের হেরফের ঘটে যায় শিল্পীর মনে ধরা সেইরূপ সজীবভাবে চিরদিনের জন্য ধরা রইল। এই চমৎকারিত্বের বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার করে দেখতে চেষ্টা করি। আমাদের শিল্প শিক্ষার্থীদের ড্রইং এবং স্টাডির পার্থক্যটিকে খুব সঠিকভাবে ধরে দেওয়ার চেষ্টা কখনও করা হয়নি। আমরা একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ স্টাডিকে অনায়াসেই 'কি সুন্দর ড্রইং!'—বলতে কুণ্ঠা বোধ করিনা। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবধর্মী জানাকে পটে যথাযথ স্থাপন করলে সেটি স্টাডির পর্যায়েই থাকার কথা। সেই যথাযথ দেখাশোনার পর শিল্পী নিজের ভাবনার দেখাকে যোগ করে যখন আরবার পটে স্থাপন করেন তখনই তা ড্রইং-এর সৃষ্টির পরিচয় পূর্ণ হয়। কিঙ্করদা এই চাক্ষুষ দেখা বিষয়টিকে যখনই গভীর অনুভবআঁচড়-এর বিভাজনে পটে স্থাপন করতেন তখন তা ড্রইং হিসাবে স্থান পেয়েছে। বাস্তববস্তুকে প্রদক্ষিণ ও তা পটে এসে পড়ার সময়ের মধ্যেই স্টাডি, ড্রইং-এ রূপান্তর হয়ে এক অসাধারণ রূপে নিজেকে উজ্জ্বল করে সোচ্চার হত। আমার বলার কারণ একটাই। কিঙ্করদা সদাবাস্তব বিষয়কে বারংবার দেখেছেন কিন্তু এই দেখার সঙ্গে তাঁর অন্তরের দেখার কৌতূহল ও মেজাজটুকু তাঁর অজান্তেই পটে পড়ে নিজের হয়ে উঠত, তা তখন প্রকৃতির দেখা রূপে রূপান্তর ঘটে যেত শিল্পীর মনের ভেতর দিয়ে এসে।

এই ধরনের কাজের মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কিঙ্করদা সবসময়ই বলিষ্ঠ রেখা দিয়ে মূল বিষয়টিকে যথার্থভাবে ধরে তার সঙ্গে কিছু ছন্দায়িত রেখার সংযোজনে প্রাণ চঞ্চলতা এনে দিয়েছেন অনায়াসেই। এই ধরণটি একটি মাত্র দিক, কোন কারণেই একই ধাঁচ-ধরনের মোহজালে তিনি ধরা পড়েননি। এইসব কাজের বলিষ্ঠতার সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের উচ্ছলবোধের যোগটিও লক্ষণীয়। শিল্পীর কালোকালির কাজের

মধ্যে তা তুলিতে, কলমে বা আঁচড়ের দ্বারা পরিচালিত হলেও কখনো কোথাও থেমে যাওয়া নেই। এরপর কি করব বা করব না এই সংশয়ের মানসিকতা কাজ করেনি, যা প্রতিষ্ঠা দিতে বাসনা হয়েছে তা অবলীলাক্রমেই রূপ পেয়েছে। অনেকে কিঙ্করদার চটজলদি কাজগুলিকে স্কেচ বলে পরিচিতি দিলেও এগুলি সবই পূর্ণ-চিত্রের মর্যাদায় উত্তীর্ণ। এগুলিকে খসড়া কাজও বলা চলবে না। কোন মূর্তি করার সময়ে বার বার কোন আকারকে দেখতে চাওয়াকে এই ধর্মী কাজের সঙ্গে তুল্যমূল্য করলে ভুল করব। এইসব কাজের মধ্যে একটি বিশেষ আকার ও ভঙ্গীকে দেখার তীক্ষ্ণতা কাজ করে। কিন্তু এইসব আঁচড়ের মধ্যে একটি প্রত্যয়ও সবসময়ে কাজ করেছে তাহল রেখাকে বার বার বাঁক ফেরানোর চেষ্টা নিস্ফলতার হতাশায় ঘুরে ফেরেনি। তাই তাঁর কোন কাজই হার মানা বা নিশ্চল হয়ে পড়ার মানসিকতায় আক্রান্ত নয়। সজীবতা যে তাঁর সৃষ্টির জীবন—এ-তো প্রত্যেক কাজই সোচ্চারভাবেই বলতে থাকে।

শিল্পীর এই আকার অন্বেষণের বলিষ্ঠ আঁচড়ের ছন্দগুলি তাঁর বিরাট ভাস্কর্যের গায়ে গায়ে ছড়িয়ে জড়িয়ে আছে। এই না-টানা, না-দেখা রেখা সব আশ্চর্যভাবে সারা মূর্তির গায়ে হিল্লোল তুলেছেই শুধু নয়, মূর্তির যে পাশ দিয়ে হাঁটা-চলা করা যাক এই হিল্লোলেব কল্লোল রেখাব শব্দ আপনাকে কেবল বিমোহিত করবেই শুধু নয়. এই উচ্ছল সচল বয়ে যাওয়া রেখাব ছন্দ মূর্তিগুলিকে দিয়েছে আরও সজীবতা—সেই সঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে অমৃতঅক্ষয়ের বিশ্বাসবোধে। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়—কালোকালির কাজের পাশে দাঁড়ালে কখনোই মনে হয়না এটি বহুবর্ণে রঞ্জিত হলে আরও মাত্রা পেত বা তাঁর রঙীন ছবির পাশে দাঁড়িয়ে একথাও মনে হয় না তা বর্ণবাহুল্যে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এখানেই মাধ্যমকে যথাযথ ব্যবহারের দক্ষতার অপরিমেয় ক্ষমতা। আর সে ক্ষমতা সম্পর্কে শিল্পী কখনোই সচেতন থাকেননি। কালোকালির কাজের দিকে লক্ষ্য করলে দেখব বস্তুর প্রতি শিল্পীর একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গভীর মননের ছায়াপথ। কাজটি নিজেই বলে ওঠে শিল্পী কিভাবে তাকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর যেকোন কাজের মধ্যে দেশের মাটির পরিচয়ের ছবি যেমন পাওয়া যায়, তেমন তাঁর চারপাশের পরিবেশ-পরিজনদেরও দেখা যায়। এইসব নিত্যদিনের পরিবেশ ও পরিজনদের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলিই পটে অনন্যভাবে জায়গা করে নিয়েছে। চাক্ষুষ স্থূলরূপকে অতিক্রম করে বিভাসিত হয়েছে অনন্তরূপের, যেখানে বিষয়ের কুশীলবেরা প্রাণ নিয়েই নড়াচড়া করেছে। সাদাকালো কাজের মধ্যে শিল্পীকে প্রত্যক্ষভাবেই পাওয়া যায় এই কারণেই যে তা করণকৌশলের সহায়ক হিসাবে কেউ এসে তাঁর সহযোগী হয়নি। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা কালো-সাদার কাজ করে থাকেন তাঁরা তো জানেন শিল্পীকে কতটা নিশ্চিত হতে হয়। এবং এই নিশ্চিত হয়েই তিনি বিষয়কে পটে ধরতে যান। কিন্তু তার চরিত্র, আকার. সুষমা ও সংযম সম্পর্কে সদা সচেতন নিরীক্ষণ একটু ভুলের জন্য সমস্ত

কাজটিকেই বিসর্জন দিতে হয়। কিঙ্করদার সাদা-কালো কাজের মধ্যে যে সুঠাম ছন্দটি ধরা পড়ে তাহল তার বাঁধন। প্রত্যেকটি কাজের মধ্যেই সেই বাঁধন অদ্ভুতভাবে সুসংহত কিন্তু কখনো আবেগশূন্য নয়।

তাঁর কাজের মধ্যে কখনো পরিচিত আকার ধরা পড়েছে ছন্দায়িতভাবে, আবার অনেক আস্তরণে ভাগ করা রূপের খেলাও গড়ে উঠেছে। এইসব কাজ সবসময়ই যে রেখাভিত্তিক তা নয়, যেখানে প্রয়োজন মনে করেছেন সেখানেই একইধরনের আলতো পরতে তার ওঠা-নামাকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু যে কথা আগেই বলেছি, শিল্পীকে এসব কাজের জন্য কখনো বিশেষ ধ্যান নজরে আনতে হয়নি বা সমীক্ষায় পড়তে হয়নি। এ ছিল তাঁর সহজাত অধিকার, যে অধিকারের গুণেই এমনটি সম্ভব হয়েছে।

কিঙ্করদার বহু কাজই সাঁওতাল-আদিবাসী জীবনচর্চার ও তাদের বসন-ভূষণকে কেন্দ্র করে রচিত। কোথাও কখনো গেলে, সেখানকার জীবনধারার উপর কাজ করলেও এই সরল জীবনযাত্রার যাত্রীদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। নিজের তেজদীপ্ত ও সরল আচরণের বা চালচলনের সঙ্গে এসব মানুষদের একটি অন্তরের যোগ অনুভব করতেন সবসময়ে। সব কাজের মধ্যেই শিল্পীর মনটি উজ্জ্বলভাবে বর্তমান। প্রত্যেক কাজের মধ্যেই প্রচণ্ডতা অবিশ্বাস্যভাবে স্থান করে নিয়েছে। অসংখ্য কালোকালির কাজ তিনি করেছেন কিন্তু কখনই এই কাজের মধ্য দিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া ছিল না। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে একই বিষয়কে সামনে রেখে তাকে নানানভাবে দেখতে চেয়েছেন। এই দেখার নক্সার মধ্যে আকার-মেজাজ-গুলি এক-একটি বিশেষ মাধ্যমের ইঙ্গিত নিয়ে উপস্থিত হত। একই বিষয়কে কখনো মূর্তিকল্পের আদলে আবার ছবির পটে প্রতিষ্ঠায় কিংবা ছন্দায়িত নক্সার সুডৌলে তারা ঘোরাফেরা করেছে। তাঁর এই সাদা-কালো কাজের সৃষ্টিগুলি আকারে সবসময়ে বড় হয়নি। কিন্তু বড়-বিস্তৃত কাপড়ের পটের উপর যখন করেছেন তখনই তা কেবল একটি বিশিষ্ট আকারে রূপ পেত।

প্রতিকৃতি করার সময়ও এই নক্সায় তক্ষণ মূর্তিকল্পের আদল অদ্ভুতভাবে প্রতি-ফলিত। কিঙ্করদার এইসব কাজের মাধ্যম তুলি, কলম হলেও তাঁর আর একটি বিশেষ করণ-কৌশলের ব্যবহার দেখবার মতো। অনেকক্ষেত্রে তুলির পিছনে কাঠের ডাঁটিটি কালোকালির দোয়াত থেকে তুলে সরাসরি কাজ করতেন। এর ফলে নিজে পেতেন প্রচণ্ড গতি আর কাঠের শলা হওয়ার জন্য তীক্ষ্ণতার একটি বিশেষ মজা আসত। আর একটি বিষয়ে এই কাজের চমৎকারিত্বের বাহার রেখায়, কমবেশী ওজন, আরম্ভ আর শেষের চিহ্নগুলি একটি বিশেষ গুণ বহন করত। কেবল তাই-ই নয়, অনেক সময় কাছাকাছি যা পেতেন, তা গাছের সরু ডাল বা কাঠি যাই হোক তাকে একটু থেঁতো করে কাজে ব্যবহার করতেন। কিন্তু এইসব করণকৌশল চলত তাঁর ইচ্ছামাফিক। ওঁর কোন কাজের মধ্যে মেনে নেওয়ার নমনীয়তা কাজ করেনি।

প্রকৃতিতে সামান্য-সামান্য গাছ-পাতা-ফুল-পাখী-পশু-জীবজন্তু কত অভাবনীয়-ভাবেই না ধরা দিয়েছে। কাকের মাতৃত্বের অনুভবকে প্রজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধভাবে উপস্থিত করার কি অসাধারণ নমুনা। কিন্তু এটিতে একটি বিষয় লক্ষ্য করার তা হল কোথাও ক্ষুধার ব্যস্ততা আর খাওয়ানোর স্নেহের পরিমণ্ডল নষ্ট হয়নি, ড্রইং কোন জায়গায় বিষয়ের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়নি।

বোলপুরের মাঠে সার্কাস এলে কিঙ্করদার সঙ্গে সেখানে যাওয়া আর কাজ করার একটি আনন্দ ছিল। তাঁর সঙ্গে যাব এইটাই ছিল মস্ত ব্যাপার। কিন্তু যে বয়সে তাঁর সঙ্গে কাজে গেছি তখন তাঁর ড্রইং বা চিত্রচর্চার ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্রতা সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। আর সে বয়সে থাকাও সম্ভব নয়। তবে এমন একটি স্থানে শিল্পচর্চার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছিলুম যেখানে চিত্রের প্রথম পাঠই ছিল ছবি আঁকা, প্রথমেই শুরু হয়ে গেল ছবি আঁকার ক্লাস, কি জানি-না জানি, কাকে জানি—কতটা জানি এসবের ফাঁক না দিয়েই পূর্ণ ছবি করার বরাত পেয়ে লেগে পড়ে-ছিলুম। আর এই পূর্ণ ছবি আঁকাব সাহসই আজও চালিয়ে চলেছি। শান্তিনিকেতনে কিঙকরদা যখন প্রথম পাঠ নিতে শুরু করেন তাঁর হৃদয়েও এই বীজই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে আজ আমবা এই বিস্ময়কর স্রষ্টাকে দেখতে পাচ্ছি। ভাষায় যেমন ইদানীংকালে ডাইরেক্ট মেথড বলে বহুল প্রচারিত, শান্তিনিকেতনের শিল্প-শিক্ষার প্রথম শর্তই তাই। আর এই সবাসরি কাজের প্রাণবন্ততাই কিঙ্করদার চিত্র-জীবনের মূল কথা।

কালো-সাদার পাশাপাশি তাঁর করা রঙীন কাজের সৃষ্টিগুলি রাখলে দুটি বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া যাবে—প্রথমতঃ, রঙীন বিষয় নির্বাচনেও পারিপার্শ্বিক জীবনধারার মানুষজনদের জীবনযাত্রা, হাসি-আনন্দ, গতিচঞ্চল অনুভূতিই জায়গা করে নিয়েছে। আর একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়, এইসব প্রাণচঞ্চল আদিবাসীদের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির গাছপালা, ফুলফল, পাখী-পশু এসে যেখানে জায়গা করে নিয়েছে সেখনেও ফুলফল, জন্তু-জানোয়াররা বলিষ্ঠগুণের অধিকারের ভেতর দিয়েই স্থান পেয়েছে। উপাখ্যানধর্মী চিত্রের বিষয় চিন্তার উপর মন ততটা সায় দেয়নি। তিনি নাড়াঘাঁটা করেছেন জীবন্ত দেবতার বিগ্রহদের যারা তাঁর নিকটেই ঘোরাফেরা করেছে কিন্তু সমস্ত মানুষের ভাষাই যাঁদের অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠেছে। জীবনের নয়, জাতের দুঃখ-দুর্দশা-আনন্দের ঘাত-প্রতিঘাতের সকল ছবিই প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে।

জলরঙের কাজের মধ্যে তাঁর যে দক্ষতা ও স্পর্শবোধটি কাজ করেছে সবসময় তাহল বর্ণ প্রয়োগের স্বচ্ছতা। দ্বিতীয়তঃ বর্ণ সংমিশ্রণের চেয়ে জলরঙে মূলবর্ণের উজ্জ্বলতাকে আশ্চর্যভাবে রক্ষা করেছেন সবসময়ে। কিন্তু এই মূলবর্ণ ব্যবহারে যে উচ্চাঙ্গবর্ণের সমারোহ ঘটিয়েছেন তাতে কখনও মনে হয়না একটি বর্ণ আর একটি বর্ণের উপস্থিতিতে অস্বাচ্ছন্দ বোধ করেছে। উদার উন্মুক্ত নীলরঙটির প্রয়োগ প্রায়

সবসময়েই ঘটেছে। আর লালবর্ণের ব্যবহার খুব সাবধানে, প্রয়োজনে প্রয়োগ করেছেন। আমাদের লালের ব্যবহারের আধিক্য দেখে প্রায়ই বলতেন, 'মিষ্টি-মিষ্টি রঙ লাগাতে খুব ভালো লাগে তাইনা ?'—বুঝিনি তখন, বোঝার অভিজ্ঞতা হওয়ার কথাও নয়।

জলরঙের কাজের মধ্যে আরো একটি করণ-কৌশলের প্রয়োগ প্রায়শই করতেন। বর্ণের স্তর দিয়ে পূর্ণ ছবিকে করে নিয়ে শেষে তীক্ষ্ণ কালো রেখা দিয়ে তাকে প্রয়োজনবোধে বিভাজন করা। আগে কালো দিয়ে এঁকে পরে বর্ণের প্রলেপ দেননি এমন নয়। কিন্তু প্রায় সবসময় বর্ণের প্রলেপের পর তাকে কালো দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলতেন। কালোর ব্যবহার তাঁর বর্ণ প্রয়োগের করণ-কৌশলের আর একটা বিশেষ আনন্দঅধ্যায় ছিল। বর্ণ ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গেই আকারের দোলগুলিকে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতেন সবসময়ে। পরে ঘসে-মেজে তাকে উচ্চগ্রামে আনার দুর্বল প্রচেষ্টায় তাঁর মন ছিল না। তবে যে কথাটি আগেই বলেছি তাহল, এই বর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্রতা ও বলিষ্ঠতা সমানে কাজ করেছে—যেমন তাঁকে কেউ কোনদিন ঝুঁকে কুঁজো হয়ে আলস্যে বসে থাকতে দেখেনি। এই ভাবটি আমরা তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও দেখতে পাই। কলাভবনের তাঁর স্টুডিও-র সামনে মহানীম গাছের তলায় সবসময় বসতেন দৃঢ় সোজা হয়ে, মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত কোথাও ছন্দের টোল ছিল না, ছিল সুঠাম-সুদৃঢ় আর সেইসঙ্গে মাথা উঁচু করা দৃপ্ত। তাঁর ছবির ক্ষেত্রেও এই বিশেষ ভঙ্গী-ছাঁদটি প্রত্যক্ষ করার।

কিঙ্করদা অনেক সময় রচনার আবেগে রঙ সোজা টিউব থেকে কাগজে ব্যবহার করতেন। এমনকি কেককালারের কেকগুলি সরাসরি জলে ডুবিয়ে কিংবা প্রয়োজনমাফিক কাগজ ভিজিয়ে নিয়ে ব্যবহার করেছেন। এই কেকের আকারের জ্যামিতিক লাইনগুলি তাঁর ছবিতে এক বিশেষমাত্রা এনে দিয়েছে। তাঁর গ্রীষ্মকালের প্রিয়তা সম্পর্কে সকলেই জানেন আর এই প্রকৃতি প্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ঋতু অনুযায়ী বর্ণ ব্যবহারের দিকটিও তাঁকে ভাবাতো সবসময়। ধূসরবর্ণের ব্যবহার কিংবা পাংশুহলুদ, কালচেনীল আর মাটিঘেঁষা লাল সবই অনুসরণ করত ঋতুকে পরিক্রমা করেই।

তাঁর সাদা-কালোর রেখাভিত্তিক কাজ, আবার পূর্ণ জলরঙের কাজের মধ্যে একটি করে বিশেষ প্রকরণ-কৌশল কাজ করেছে। কিন্তু তা কখনো গতানুগতিক বর্ণ ব্যবহার বা রেখাটানার নিয়মকানুনকে মেনে চলেনি। এসবই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে শিল্পীর ইচ্ছার লাগাম ধরেই। আর তা দক্ষ ও প্রত্যয়ের সঙ্গেই যে শুধু তাই-ই নয়, এই প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তিনি একান্ত নিজস্ব এক নতুন ধারার, এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

বারবার যে কথা বলতে চেয়েছি তাহল রামকিঙ্কর এমন এক স্তরের শিল্পী যাঁকে কোন শিক্ষার্থীর তুল্যমূল্য করে চেনা দুঃসাধ্য। শিল্পীর একমাত্র

পরিচয় বন্ধনহীন—সম্পূর্ণ স্বব্যক্তিত্বে পূর্ণ। এই বন্ধনহীন, নিয়ম না মানা স্বভাব আর মননই রামকিঙ্করের কাজে অনন্যতাই এনে দিয়েছে। কিন্তু যেটি আজও আমার কাছে সবচেয়ে মস্ত বিষয় তাহল তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার মধ্যে কোন পাওয়ার বুদ্ধি কাজ করেনি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা মনে পোষণ করে ছবি আঁকেননি। ছবি আঁকার আনন্দেই উত্তাল সমুদ্রের মতোই গর্জন করেছেন, দাপিয়ে বেড়িয়েছেন সমস্ত শিল্পলোকে।

## রামকিঙ্করের জলরঙের ছবি

আর. শিবকুমার

রামকিঙ্কর ছিলেন রূপ অন্বেষণের উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত একজন প্রতিভাবান শিল্পী। এই শতাব্দীর অনেক শিল্পী যেমন সেজান, মাতিস, পিকাসো প্রভৃতিরাও ছিলেন এই উৎকণ্ঠার অংশীদার। প্রচলিত শিল্প আঙ্গিকের পরিবর্তনের ইচ্ছায় চলতি পথ ছেড়ে পরিবেশ অনুযায়ী নতুন সম্ভাবনার প্রতি সাহসী পদক্ষেপই উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল তাঁদের। আজকের দিনে এই উৎকণ্ঠা ও সাহসের তাৎপর্য আমরা ততো অনুভব করিনা যে শুধু তাই-ই নয় আধুনিক শিল্পের ভাব, ভঙ্গীমা এবং সংবেদনশীলতা এতই পরিচিত আর স্বাভাবিক যে এসবের সন্ধানে এই উৎকণ্ঠার ইতিহাস আমাদের মনেও আসেনা।

দ্বন্দ্ব বা উৎকণ্ঠার নানা প্রকারের মধ্যে আমরা দুটি প্রকৃতিকে বেছে নেব যা রামকিঙ্করের চিত্র—মূলতঃ জলরঙের ছবির ক্ষেত্রে একান্ত প্রাসঙ্গিক। মাতিস, পিকাসো, রামকিঙ্কর প্রভৃতি শিল্পীরা যেমন বাস্তবের অনুকৃতি পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন তেমনি তাঁরা তাঁদের নতুন উদ্ভাবনের পাশাপাশি বর্তমানও রেখেছিলেন তাকে। আবার রামকিঙ্করের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবরূপ এতই অপরিহার্য হয়ে উঠত যে যেখানে আধুনিক ভাষার প্রয়োগ ঘটেনা। মাতিস এবং পিকাসো যেখানে পরিবর্তন বা উদ্ভাবনের দিকে ক্রমে এগিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে রামকিঙ্কর দুইয়ের মাঝে একটা সিদ্ধান্তহীন অবস্থার স্তরে আটকে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংকট—নিছক পরিবর্তনকে তাঁরা অনুমোদন করতেন না। মাতিস এবং পিকাসোর মতোই রামকিঙ্করও এমন একটা শিল্পভাষার অনুসন্ধানে ব্রতী ছিলেন যা প্রত্যক্ষ বাস্তবরূপের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন তো নয়ই উপরন্তু তা সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতায় সমৃদ্ধ।

এই দোদুল্যমানতা মাতিস এবং পিকাসোর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে—১৯১৪ সালে মাতিসের করা 'নতরদাম'-এর দুটি ভিন্ন কাজ এবং পিকাসোর কিউবিজমের পরবর্তী কাজগুলিকে। মাতিস এবং পিকাসো তাঁদের সৃষ্টি কর্মের পর্যায় বা বিবর্তনগুলিকে আলাদা-আলাদাভাবে বহাল রাখতেন। অন্যদিকে রামকিঙ্কর অনুরূপ কোন চিন্তা মাথায় না এনে একটি চিত্ররূপকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে—নির্মমভাবে মুছে ফেলে তারই উপর অঙ্কিত করতেন অন্য একটি। পরিণামে তাঁর এই দুর্দম আর ক্লান্তিহীন পরীক্ষা প্রচেষ্টাগুলি অল্প সংখ্যক ব—

আয়তনের ছবির রঙের আড়ালেই থেকে গেছে। এইদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে তেলরঙ থেকে আলাদা তাঁর অসংখ্য জলরঙের ছবিগুলি এক ভিন্ন মাত্রা আর মূল্য যোজনা করে ফিরে আসে আমাদের কাছে।

অধিকাংশ শিল্পীর কাছে জলরঙের মাধ্যম প্রাথমিক পর্যায়ের বড় ছবির খসড়ার জন্য। আবার কারো কাছে বা তা অনুশীলনের জন্য উপযোগী। কিন্তু রামকিঙ্করের জলরঙের ছবি অনায়াস এবং স্পষ্ট এবং আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে করা। তাঁর করা জলরঙের স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবিগুলি আলাদা এক রামকিঙ্করীয় কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে আনে। চারপাশের দৃশ্যজগৎ এবং বিশেষ মানসিকতার প্রতিফলনে এগুলি অভাবনীয়ভাবে সজীব আর অনবদ্য। তাঁর অধিকাংশ জলরঙের ছবিগুলিতে বিধৃত হয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্য বা উক্ত পরিবেশে মানুষজন এবং তাদের ক্রিয়াকর্ম। জলরঙে করা প্রতিকৃতিগুলি প্রসঙ্গে বলা যায় যে তা অনেকবেশী অনায়াস যা তেলরঙে আঁকা বা তাঁর প্রতিকৃতি ভাস্কর্যগুলির ক্ষেত্রে ততখানি প্রযোজ্য নয়। 'ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট'-এ সংরক্ষিত একটি জলরঙে এবং অন্যটি তেলরঙে করা 'বিনোদিনী'র দুটি প্রতিকৃতি দেখলে একথা প্রমাণিত হয়। প্রথমটি তরলীকৃত জলরঙের স্বচ্ছ প্রয়োগে তাজা এবং যৌবনোচ্ছল। অপরদিকে তেলরঙে করা একই প্রতিকৃতিটি মাধ্যমের পদ্ধতিগত প্রয়োগে যা জটিল এবং রহস্যময়ী।

জলরঙের ছবিতে স্বভাবতই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যঞ্জনা এবং আবেগের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে তেলরঙ মাধ্যমের প্রতিকৃতিতে অনুসন্ধানী বা পরীক্ষা-মূলক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে চিত্ররূপটির সৃষ্টি হয় তাকে বলা যেতে পারে ধারণাত্মক বা Conceptual. ভঙ্গীমা এবং ভাব মাধ্যমগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা ভিন্নধর্মী হয়ে ওঠে। তাই জলরঙের ক্ষেত্রে যা চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত অন্যটিতে তা চরিত্রানুগ এক ভাবমূর্তি।

এইভাবে রামকিঙ্করের চিত্রায়ণের দুটি ভিন্ন মাধ্যমের প্রতিক্রিয়ায় বিপরীতধর্মী চিত্ররূপ পাওয়া যায়। একটি সরাসরি পর্যবেক্ষণ নির্ভর, অপরটি ধারণাত্মক। জলরঙের ছবিতে অনেক সহজে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এবং যে রূপটি তিনি ফুটিয়ে তোলেন তা টাটকা, সজীব এবং আবেগীয়।

তিরিশ দশকের শেষের দিকে করা কিছু জলরঙের ছবিতে, যার অধিকাংশই কালি-তুলিতে করা, যেখানে গ্রাম্যকুটীর, বৃক্ষ এবং উড়ন্ত পাখীদের লক্ষ্য করা যায় যা অনেকটা তাঁর শেষের দিকের কিউবিজম বা ফিউচারিস্ট ছবির মতো। এইসব ছবির কতকগুলি কিউবিস্টরীতিতে বিধৃত আকার বা বস্তু স্তূরীভূতভাবে বিন্যস্ত। আবার কিছু কিছু ছবিতে জ্যামিতিক কোণাচে বুনোট লক্ষ্য করা যায়। এই দুটি ধরণই রামকিঙ্করের চল্লিশ দশকের তেলরঙে এবং ভাস্কর্যেও বর্তমান। এখানে তিনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম আধুনিক আঙ্গিকের কাছাকাছি।

পরবর্তী সময়ে নেপালে থাকাকালীন তিনি বেশ কিছু জলরঙের কাজ করেন,

যেমন নেপালের পাহাড় এবং তার ঢালুদেশ, যা সেজানের Mont Sainte-victoire-র সাদৃশ্যকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তা সেজানীয় মনে হলেও এইসব ছবি ছোট ছোট তেরছাটানে করা, যা ঠিক কিউবিস্টিক নয়। প্রতিটি তুলির টান বা ছোপ কাটাকাটা, যার ধারগুলি এবং প্রতিটি বস্তু বা আকার তাতে স্পষ্ট। সেজানের থেকে সেগুলি অনেক বেশী ভাস্কর্যধর্মী। যদিও এগুলির সঙ্গে সেজানের শেষের দিকের জলরঙের ছবির মিলগত একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তবুও এগুলি ঠিক তাঁর, সেজানের, শেষদিককার জলরঙে করা ছবির মতো নয়। সেজানের শেষেরদিকের ছবিগুলিতে একটা দ্যুতিময় স্বচ্ছতা লক্ষ্য করা গেলেও বিংশ শতাব্দীর হাল্কা, পরস্পরের উপর বিন্যস্ত রঙের স্ফটিকোজ্জ্বল চিত্রপটও বলা যায়না এগুলিকে। সেজানের পরিণত তেলরঙের ছবিগুলিতে, বিশেষতঃ ১৮৯৫ থেকে ১৯০০'র মধ্যে আঁকা প্রতিকৃতি চিত্রে এবং স্থিরবস্তুর চিত্রে আকারগত বৈশিষ্ট অনেক বেশী। রামকিঙ্করের নেপালে করা সেরা জলরঙের ছবিগুলিতে আকারগত কাঠিন্যের সঙ্গে সঙ্গে যার শূন্যস্থানগুলিও বায়বীয় না হয়ে তা হয়ে উঠেছে ঘন এবং কঠিন।

রামকিঙ্করের দৃশ্যচিত্রের আরও একটি অভিব্যঞ্জনাও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়না আমাদের। 'খোয়াই'-এর ছবিতে ভূমিস্তরকে ওলটপালটভাবে বিন্যস্ত করেছেন তিনি। বৃক্ষের জমাট জটলা কোথাও কোথাও। এইসব দৃশ্যে কখনও আকার এবং শূন্যস্থান পরস্পরের মধ্যে সংবদ্ধ। কখনও আকার নিজেই শূন্যস্থানগুলিতে প্রধান হয়ে উঠেছে। 'খোয়াই'-এর মধ্য দিয়ে ধাবিত ট্রেন, উড়ন্ত কালো ধোঁয়া এবং পড়ন্ত বিকেল ইত্যাদির সমারোহে একটি জলরঙের ছবিতে ( ১৯৪৬ ? ) অচিত্রিত শূন্যস্থান অনেকবেশী লক্ষ্যণীয়। এবং যেখানে বর্ণময় বস্তুরাজী যেন তির্যকভাবে ঝুলন্ত। পরিপ্রেক্ষিতের বিকৃতিতে এই অচিত্রিত শূন্যস্থানের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। শূন্যস্থানের ভিন্ন প্রয়োগ আমরা পাশ্চাত্যের 'জিয়োত্ত'র ছবিতেও লক্ষ্য করে থাকি। একে আমরা ভারতীয় বা পারসিক চিত্রে আবর্তিত বা পরিবর্তিত দৃশ্যকোণের পাল্টা এক দৃষ্টান্ত হিসাবে ভাবতে পারি। পরিপ্রেক্ষিতের বিকৃতি যা ভারতীয় পারসিক চিত্রে লক্ষ্য করা যায়—রামকিঙ্করের ছবিতে তা অনেক সহজ বিশ্বাসযোগ্যতা এবং তার সঙ্গে গতির দ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত। পরবর্তীকালের কিউবিস্ট চিত্রে অনুরূপভাবে শূন্যস্থানে বিন্যস্ত জটিল পরস্পর সংগ্রথিত আকাররাজী চোখে পড়ে। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে রামকিঙ্করের স্পর্শময় ভারী আকার বিন্যাসের আঙ্গিক তাঁর সামাজিক বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও আরোপিত হতে দেখা যায়। তবে তা ট্রাডিশনাল শিল্পের বর্ণনাত্মক বৈশিষ্ট নিয়ে কিছুটা আলাদা। ফলে তাঁর শেষদিকের কিউবিস্টধারা কিছুটা যেন সঙ্কটাপন্ন।

রামকিঙ্করের তেলরঙের ছবিগুলি পরস্পর বিরোধীতায় আচ্ছন্ন। অপ্রত্যয় এবং দ্বিধাক্লিষ্ট রূপকল্পগুলি বারেবারে পরিত্যক্ত বা সংশোধিত। অপরদিকে তাঁর জলরঙের ছবিগুলি স্বতঃস্ফূর্ততায় সাবলীল, যেখানে পূর্বের প্রায় কিউবিস্টধারা

শেষের দিকে এসে যা স্পষ্ট, সোজাসাপ্টা বিষয়াশ্রয়ী হয়ে ওঠে। রঙ কালোরেখার ঘেরে আবদ্ধ, বিভিন্ন আকার বা বস্তু যেন সহজবোধ্যভাবে চিত্রপটে উৎকীর্ণ। রেখাই এখানে প্রধান। এবং তা বস্তুর আকার, আয়তন এবং ভঙ্গীর নির্ধারক। শেষদিকের এইসব ছবিতে রামকিঙ্কর স্পন্দ-ছন্দ ও সংবেগের উপর জোর দিয়েছেন। এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বস্তুর আকারের সংক্ষিপ্ত বা সারাংশের চিত্রায়ণ। বাস্তবানুগ রূপরাজী চিত্রগতভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে ক্যালিগ্রাফিক বৈশিষ্টে। তবে তাতে অলংকরণের আমেজ নেই। ক্যালিগ্রাফিক রেখার ঘেরে শূন্যস্থানে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন আকার বা মোটিফের চিত্রগত এক ঐক্যতান। এইসব ছবিতে চোখে পড়ে তবঙ্গায়িত গতিময় রেখার ঝলক, যেমন—পলাশবৃক্ষের শাখা-প্রশাখার বিন্যাসে, উর্ধ্বমুখী ভঙ্গীমার বৃক্ষ কাণ্ডে, গোপালপুরের ঢেউলাঞ্ছিত সমুদ্রতটের উৎকীর্ণ রেখায় বা পাহাড়চূড়ো থেকে দেখা বেঁকে যাওয়া পথের রেখায়।

রামকিঙ্করের তেলরঙের ছবি বা ভাস্কর্য থেকে স্বতন্ত্র এইসব জলরঙের ছবি-গুলিতে অবশেষে তাঁর মানসপ্রকৃতি, আবেগ ইত্যাদির প্রতিফলন দেখতে পেয়ে যাই আমরা। যার একদিকে আছে বিপুল আবেগ ও অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত আঙ্গিক প্রয়াস। এবং এই দুইয়ের মাঝখানে মাধ্যম হিসাবে জলরঙ রামকিঙ্করের সহজাত শিল্পবোধ প্রকাশে ও শিল্প আঙ্গিকের বা প্রকাশভঙ্গীমার সহজ সমাধানে একান্ত সহায়ক হয়ে ধরা দেয় আমাদের কাছে।

## পরিবেশীয় ভাস্কর্যের একটি ইতিহাস ও রামকিঙ্কর বেইজ

জনক ঝঙ্কার নারজারি

পরিবেশীয় ভাস্কর্য আধুনিক ভাস্কর্যশিল্পে একটি নতুন দিক ও মাত্রা যোজনা করে। এক্ষেত্রে ভাস্বরকে ভাস্কর্যটির অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিচার করে নিতে হয় তার বিষয়, জায়গা, ফর্ম এবং কনটেন্ট। কোন পূর্ব-ধারণা নিয়ে তিনি এগোন না কিন্তু নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত নির্বাচন এবং বর্জন করতে করতে এক নতুন স্কালপচারাল রিয়েলিটির দিকে তিনি এগোতে থাকেন যা চারপাশে ছড়িয়ে থাকা পরিবেশেব সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এইভাবে ফর্ম এবং কনটেন্টের পরিবৃদ্ধি চলতে থাকে আর এর উপরেই একজন ভাস্করকে নির্ভর করে যেতে হয়। পরিবেশীয় ভাস্কর্য সাধারণতঃ হয়ে থাকে খোলা আকাশের নীচে এবং যা তার চারপাশের পরিবেশ অথবা তার পটভূমিকার সঙ্গে যুক্ত। চার দেওয়ালে আবদ্ধ ভাস্কর্য সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে পরিবেশীয় ভাস্কর্য তেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে পরিবেশীয় ভাস্বর্যকে তার চারপাশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সহ-অবস্থান করে যেতে হয়। খোলা আকাশের নীচে যেখানে ভাস্কর্যটি তৈরী হবে সেই মাধ্যমের ব্যবহার এবং তার মূল্য বা উপযুক্ততাও এক্ষেত্রে একটি অন্যতম বিচার্য বিষয়। এটি উদ্ভূত অবস্থা বা পরিবেশের সঙ্গে বিরোধীতা করেনা বরং সামগ্রিকভাবে তাকে ঐক্য এবং একতার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। সবশেষে, যে নির্দিষ্ট জায়গা বা নির্বাচিত জমির উপর ভাস্কর্যটি তৈরী হবে তার ঐতিহাসিক অথবা বাস্তবতথ্যও কোন নির্দিষ্ট ফর্ম এবং কনটেন্ট নির্বাচনেব ক্ষেত্রে একটি জরুরী দিক। পরিবেশীয় ভাস্কর্য সাধারণতঃ স্থাপত্য ঘেরা শহর, পার্ক, বাগান, চৌমাথা, শহরের কোন চৌহদ্দি, ঐতিহাসিক বা স্মরণীয় জায়গা এবং সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বিশাল বাড়ী বা ব্যক্তিমালিকানাধীন স্থাপত্যপূর্ণ কোন বাড়ীতে হয়ে থাকে।

যুদ্ধপূর্বকালে অধিকাংশই মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য পরম্পরাগত ধারণায় গড়ে ওঠা রিয়ালিস্টিক ভাস্বর্যের খুব কাছাকাছি ছিল। তবে রঁদার ভাস্কর্যগুলিতে রিয়ালিস্টিক ফর্ম থাকা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে থাকা মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য হিসাবে তাদের মাত্রাগত অভিব্যক্তি তার চারপাশের খোলা জায়গা এবং পরিবেশের তাৎক্ষণিকতার সঙ্গে সুসংহতভাবে যুক্ত। তাঁর করা 'বালজাক' (১৮৯৩—৯৭) অথবা 'বারগার্স অফ ক্যালিস' (১৮৮৪—৮৬) আধুনিক পরিবেশীয় ভাস্কর্যের সুস্পষ্ট প্রবর্তক কাজ হিসাবে ধরা যায়। এইসমস্ত ভাস্কর্যগুলিতে উপরিতলের কর্কশ বুনোট, স্পর্শ ও জৈব অনুভূতির

জন্য ব্রোঞ্জ এবং প্যাটিনার ব্যবহার, আলো ও ছায়ার পরিবর্তন এবং খোলা জায়গায় তাদের গতিময়ভঙ্গী সমস্তকিছুই চারদিকের প্রাকৃতিক চত্বরের সঙ্গে সমান-ভাবে মিলেমিশে সহাবস্থান করে। টুইলার গার্ডেনে মিলোল-এর ( Maillol ) করা 'রিভার' ( ১৯৩৮—৪৩ ), যা তাঁর অধিকাংশ স্থির ন্যুড মূর্তিগুলির মতো নয়, এর গতিময়তায় তরঙ্গায়িত নদীর অবাধ গতিকে ধরা হয়েছে। এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত পার্কে করা 'সিভিক মনুমেন্ট' হিসাবে ধরা যায় এবং যদিও স্থাপত্য-শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন তবুও এর উপস্থিতি তার চারপাশের খোলা জায়গাকে উজ্জীবিত করে তোলে। যুদ্ধোত্তর আধুনিক স্থাপত্যশিল্প আধুনিক কনস্ট্রাকশনাল টেকনোলজির উপর নির্ভর করে নতুন ভাস্কর্যগুণের দাবী নিয়ে উপস্থিত হতে থাকে। হেনরী ম্যুর ( Henry Moore ), বারবারা হেপওয়ার্থ ( Barbara Hepworth ), গাবো ( Gabo ), ক্যালডার ( Calder ), ডেভিড স্মিথ ( David Smith ), নাগুচী ( Naguchi ) এবং অন্যান্য আরো অনেক ভাস্কর নানা এজেন্সী এবং পৃষ্ঠপোষকের পৃষ্ঠপোষনায় অনেকগুলি পরিবেশীয়রীতির মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য করেন। উদাহরণ হিসাবে ইউনেস্কোর জন্য করা হেনরী ম্যুরের শায়িত মূর্তিটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পরিবেশীয় ভাস্কর্যটিতে লক্ষ্য করা যায় এটিকে এর তাৎক্ষণিক চত্বরের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য করে তোলা এবং তাকে জীবন্ত ও দর্শন ইন্দ্রিয়ের উপর সংহত প্রভাব বিস্তারের জন্য এর টেক্সচাবাল দিকটিকে মূল্য দিতে এখানে ব্রোঞ্জের পরিবর্তে উপাদান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে মধুরঙের ( Honey Colour ) পাথর। স্থাপত্যশিল্পের পটভূমিকায় এর ভারসাম্যতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে যথেষ্ট বড়ো মাপেব শায়িত ভঙ্গীমার এই ভাস্কর্যটি স্থাপত্যশিল্পের শক্তিটিকেও উদ্দীপিত করে তোলে।

কিউবিস্ট এবং পোস্ট-কিউবিস্ট ভাস্করেরা খোলা জায়গার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ফর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভাস্কর্যের গঠন এবং ফর্মের বিন্যাসে এক নতুন পরিবর্তন নিয়ে এলেন। এইভাবে খোলা জায়গাকে সৃজনশীল উপাদান হিসাবে ধরে নিয়ে ভাস্কর্য আর শুধুমাত্র খোলা জায়গার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অবজেক্ট না হয়ে তা হয়ে উঠল ঐ জায়গারই সৃষ্টির অংশ। এবং এইসব ভাস্কর্যগুলি খোলা আকাশের নীচে প্রসারিত হয়ে মনুমেণ্টাল ও পরিবেশীয় ভাস্কর্য হিসাবে উপস্থাপিত হল। ১৯৫৩ সালে রোটার ডাম-এ জাডকিন-এর (Zadkine) করা ব্রোঞ্জ স্মারণিক 'ডেসট্রয়ড সিটি'তে লক্ষ্য করা যায় অবয়ব কিউবিস্টিক ট্রিটমেণ্টের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি-ধর্মীতায় সরে গেছে। বাইরের খোলা জায়গার সঙ্গে সম্পর্কিত মূর্তির পা এবং বাহুর নাটকীয় ভঙ্গী তাদের আতঙ্কজনিত শিহরণকে তুলে ধরে এবং কেন্দ্রের গভীর ক্ষত শুধুমাত্র হৃদয়ের গভীর বিষাদেরই প্রতীক না হয়ে তা বাইরের এবং ভেতরের স্পেস-ফর্ম সম্পর্ককেও চিহ্নিত করে।

'কনস্ট্রাকটিভিস্ট'রা তাঁদের ভাস্কর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আধুনিক কনস্ট্রাকশনাল

টেকনোলজিকে ব্যবহার করে ফর্মকে পুরোপুরি বিমূর্ততায় নিয়ে এলেন। গাবোর ( Gabo ) তারজাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী ভাস্কর্যের গঠনকৌশল ( Stringed Construction ) যদিও জৈব এবং বিমূর্ত তবুও একে টেকনিক্যাল ক্রিয়েশন বলা যায়। এর অব্যবহিত উন্নতির পর অনেক 'কনস্ট্রাকটিভিস্ট' গাঠনিক রীতি-নীতিতে কাজকর্ম করেছেন। এবং লক্ষ্য করা যায় ফর্ম এখানে আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যার খুব কাছাকাছি চলে গেছে। ট্যাটলিন-এর ( Tatlin-১৯২০ ) গঠনকৌশল এই ধারার প্রবর্তক কাজ বলা যায়।

মানবমূর্তি গঠন ছাড়াও আজকের ভাস্কর্যের ফর্ম-এ গণিত এবং নানান বৈজ্ঞানিক নিয়মকানুন প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। গণিতসংক্রান্ত আকৃতি যেমন ঘনক, চোঙ, কোণ, পিরামিড, প্রিজম, গোলক প্রভৃতির জ্যামিতিক চরিত্রের চাইতে এদের সাদৃশ্যগত রূপের উপস্থিতিও চোখে পড়ে। ক্যালডার ( Calder ), লিপোল্ড ( Lippold ) এবং অন্যান্যদের করা ভাস্কর্য ছাড়াও এমনকি রবার্ট স্মিথসন-এর ( Robert Smithson ) করা 'স্পিরাল জেট্টি' এইধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। সময় এবং খোলা জায়গার সঙ্গে আবদ্ধ পারম্পর্যগত ধারায় গড়ে ওঠা ভাস্কর্যগুলির থেকে ক্যালডারের গতিময় ভাস্কর্যগুলি এক নতুন ধারার সূচনা করে। তাঁর ভাস্কর্যগুলি অসীম সময় এবং মহাকাশের মধ্যে ক্রমাগত চলমান থেকে বিশ্বজনীন নিয়মকেই প্রতিধ্বনিত করে। গতিময় আকার, বিমূর্ত জ্যামিতিক গঠন, হাল্কা এবং বেগবান—প্রভৃতি যথাযথ পরিমাপের সাহায্যে সংগঠিত এবং নিজস্ব ভারসাম্যতায় সম্মিলিত হয়ে গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, ফুল, পাতা, পতঙ্গ এবং পাখীদের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে আপনা-আপনি আন্দোলিত ও গতিময় হয়ে সেগুলি আকাশ এবং খোলা জায়গার সঙ্গে একটা বিমূর্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। ক্যালডারের শক্তিশালী স্থির ভাস্কর্যগুলিকে গতিময়তার এক বিমূর্ত নিষ্কাশন বলা যায়। এইভাবে খোলা জায়গায় তাদের প্রতিষ্ঠান ভূমির বন্ধনে গঠিত হয়ে মুক্তাবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে তারা প্রাইমারি স্ট্রাকচারকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলে। কিন্তু কৌণিক বিন্দুর সঙ্গে তাদের বক্র জ্যামিতিক গঠন খোলা জায়গার শূন্যতাকে ব্যাপ্ত করে মাটি ও মহাকাশের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়।

ব্রাঙ্কুসি ( Brancusi ) তাঁর 'এণ্ডলেস কালাম'-এ ( ১৯৩৭ ) গাণিতিক প্রোপশনের বিন্যাসকেই ব্যবহার করেছেন। ১ : ২ : ৪ এই মডিউলের উপর নির্ভর করে তিনি তাঁর কালামের বিন্যাসকে উন্নত করেছেন। শুধুমাত্র মনই নয় শক্তিশালী দৃষ্টি এবং মনোবিদ্যাও এই বিশালমাপের কাজটি উপভোগের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অন্যান্য ভাস্করেরা যাঁরা দৃশ্যগত অভিব্যক্তির জন্য বিজ্ঞান এবং গণিতকে কাজে লাগিয়েছেন এমন কয়েকজন দক্ষ ভাস্কর হলেন : টোনি স্মিথ—Tony Smith ( স্মোক—১৯৬৭ ), রোনাল্ড ব্রানডেন—Ronald Blandon ( দি X—১৯৬৭ ), সল লেউইট—Sol Lewitt (বি ৭৮৯—১৯৬৬)

বারনার্ড রোসেনথাল—Bernard Rosenthal ( গ্র্যাফারিং মাউনটেন্ট—১৯৬৯ ), অ্যানটোনি স্মিথ ( Antony Smith ) এবং অন্যান্য। তাঁদের ভাস্কর্যগুলি সাধারণ প্রাইমারি স্ট্রাকচারের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। এইসমস্ত ভাস্করেরা জ্যামিতিক ধর্মীতায় আরম্ভ করে পরবর্তী চূড়ান্ত রচনা এবং সার্বজনীনতা ফর্ম-এর সুবিন্যস্ততার উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে।

পরিবেশীয় ভাস্কর্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এক নতুন উপাদানের সূচনা করে। এর অন্যতম একটি হল 'পরিবেশীয় বাস্তবশিল্প' বা 'ইকোলজিক্যাল আর্ট'। যেখানে প্রাকৃতিক হ্রদ অথবা উপকূলরেখায় অথবা শহরের গগনচুম্বী অট্টালিকায় 'পাহাড়' নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি অথবা শহরের ভেতরের কোন এলাকাকে পরিবর্তনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। এইরকম পরীক্ষার একটি উদাহরণ হল বিখ্যাত লবণহ্রদে, 'ওথা'য় রবার্ট স্মিথসনের ( Robert Smithson ) বিশাল সৃষ্টি 'স্পিরাল জেটি' (১৯৭০)। এইধারার অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল ক্রিস্টোর (Christo) করা সিরিজ 'প্রোজেক্ট নট রেলিজড'—এ ফাউনটেন এণ্ড এ মেডিয়াভেল টাউয়ার (১৯৬৮), মিউজিয়াম অফ কনটেম্পোরারী আর্ট চিকাগো—২৮০০ স্কয়ার ফুট কাপড়ে ঢাকা এবং এন অস্ট্রেলিয়ান কস্টলাইন (লিটল বে—১৯৬৯)। সমকালীন বাস্তবশিল্পেব এগুলিই হল উৎসাহব্যঞ্জক উদাহরণ। নিসর্গের পরিবর্তনই ছিল এর লক্ষ্য কিন্তু তা একটি অন্তহীন প্রস্তরপুঞ্জের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

এইধারায় ভারতবর্ষে পরিবেশীয় ভাস্কর্যের তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন উন্নতি হয়নি। এর কারণ হয়ত আধুনিক ফর্ম এবং দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাইরের খোলা জায়গায় বিশালমাপের ভাস্কর্য করবার মতো কোন পৃষ্ঠপোষকের অনুপস্থিতি নতুবা শিল্পীব সাহসের অভাব। বস্তুতঃ আমাদের পৃষ্ঠপোষকেরা দপ্তরী, আধাদপ্তরী অথবা ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোন সংস্থা কখনো কখনো ভিকটোরিয়ান স্টাইলে, রিয়ালিস্টিক ফর্মে কোন বিখ্যাত দেশপ্রেমিক অথবা নেতার মূর্তি কববার জন্য কোন ভাস্করকে নিয়োগ করেছেন। এবং এইসমস্ত পৃষ্ঠপোষকেরা আবার কখনো কখনো কোন সৃষ্টিশীল ভাস্করকে প্রভাবিতও করেছেন। ঔপনিবেশিক যুগের ইমপেরিয়াল ছাঁদে করা স্মৃতিসংক্রান্ত রিয়ালিস্টিক মূর্তিগুলিকেই স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী যুগের ভারতীয় পৃষ্ঠপোষক ও ভাস্করেরা জাতীয় নেতা ও ব্যক্তিত্বের আদর্শ মডেল হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। যদিও এইসমস্ত মূর্তিগুলি যথেষ্ট বড়ো এবং উঁচু পেডেসটাল-এর উপরে করায় মনুমেণ্টাল ও পরিবেশীয় বলে মনে হয় তবুও তারা সুসংহত কোন কিছুই তৈরী করেনা। বরং ভারতীয় ঊষর ও জনহীনপ্রান্তরে তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ. একা-একা স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকাকে বড়ো অদ্ভুত বলে মনে হয়। এসব সত্ত্বেও খুব অল্প কয়েকজন সৃষ্টিশীল ভাস্কর নতুন ধারণা এবং নতুন ফর্মের স্মৃতিসংক্রান্ত মূর্তি বা মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য করবার জন্য ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকদের প্রভাবিত করেছিলেন। বস্তুতঃ আজকের দিনে অনেক নতুন ধরনের মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এগুলির খুব অল্প কয়েকটিই পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে সুসংহতভাবে ধরা দেয়। এগুলির বেশীরভাগই হল ডেকোরেটিভ। এবং এগুলিই হল আজকের কল্লোলিনী আধুনিক শহরের ভূষণ।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষে আধুনিক পরিবেশীয় ভাস্কর্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা রামকিঙ্কর বেইজের নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। তিনিই হলেন প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর যিনি পরম্পরাগত থেকে আধুনিক—শিল্পপরিক্রমণশীল এই সময়সীমার মধ্যে ভারতবর্ষে কাজ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীতার মূল এবং শিকড় নিহিত আছে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব এবং পরিবেশের মধ্যে। তবুও তাঁর নিজস্ব আস্থা ও বিশ্বাসে খুব অল্প কয়েকটিই কাজ করতে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। আপোসহীন চরিত্রের জন্য তাঁর করা 'গান্ধীজি' এবং 'সুভাষ বসু'র ম্যাকেট পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা আশ্চর্যজনকভাবে পরিত্যক্ত হতে দেখা যায়। নতুন দিল্লীর 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বিল্ডিং'-এর সামনে 'যক্ষ-যক্ষী'ই হল কোন দপ্তরেব পৃষ্ঠপোষণায় করা তাঁর একমাত্র কাজ। ১৯৫৪—৫৯ এই সময়সীমাব মধ্যে এই মনুমেণ্টটির জন্য তিনি একটি ধারাবাহিক পবীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। মডেল হিসাবে 'যক্ষ-যক্ষী'র পরম্পারগত ইমেজকেই তিনি প্রথম ব্যবহার করেন। এই ধারাবাহিকতায় 'যক্ষ-যক্ষী'র ইমেজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, স্বাতন্ত্র্যতায় উন্নয়ন এবং এর ধারণা ও ফর্মের বিবর্ধনও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাব মধ্য দিয়েই তিনি 'যক্ষ-যক্ষী'র ইমেজের একটা উন্নতি সাধন করতে পেরেছিলেন। এবং ২৫ ফুটেরও বেশী উচ্চতার খোদাই করা এই ভাস্কর্যটি স্থাপত্যের সঙ্গেও সুসংহতভাবে অবস্থান করে। বৈজনাথ থেকে আনা গ্রেনাইট পাথরই মূর্তিগুলি খোদাই-এর পক্ষে সবচেয়ে ভালো উপাদান বলে মনে করেছিলেন তিনি। বিশেষভাবে খোলা জায়গায় ব্রোঞ্জ, মার্বেল প্রভৃতি উপাদানের চেয়ে ধূসর রঙের এই পাথরই খুব সংহতভাবে নজরে আসে সহজেই। ধূসর রঙের গ্রেনাইট পাথরে ফর্মের সেকেলে সরলীকরণের ফলে মূর্তি দুটি হয়ে পড়েছে ভারী এবং জাগতিক। সম্পদ এবং কর্তৃত্বের প্রতীক হিসাবে এটিকে ব্যবহার করেছেন তিনি। এবং তা অট্টালিকাব বিষয়বস্তুর সঙ্গে অর্থময় হয়ে তার পটভূমি হিসাবে কাজ করে চলে। বিশাল মূর্তি দুটি প্রধান প্রবেশদ্বারেব পাশে অবাধে দাঁড়িয়ে আছে এবং এদের দীর্ঘতাও স্থাপত্যের পটভূমিকায় স্বয়ংসম্পূর্ণ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে যথেষ্ট।

তাঁর একরোখা সৃষ্টিশীল উদ্দীপনা কখনোই কোন পৃষ্ঠপোষকের মুখ চেয়ে বসে থাকেনি। গোড়ার দিকে তাঁর করা অপূর্ব, বিশাল মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যগুলিতে তিনি এক নিজস্ব টেকনিক এবং মাধ্যমের সূচনা করেন। এবং যেগুলিকেই প্রথম আধুনিক ভারতীয় পরিবেশীয় ভাস্কর্য হিসাবে চিহ্নিত করে; রঁদা—Rodin (বারগার্স অফ ক্যালিস), জার্ডকিন—Zadkin (দি ডেসট্রয় সিটি), জিয়াকোমেট্টি—Giacometti (ওয়াকিং ম্যান), এমিলোগ্রিকো—Emilo-Greco (পিন্নোচিও), হেনরি ম্যুর—Henry Moore (নর্থ উইণ্ড), রোনাল্ড

ব্লানডেন—Ronald Blanden ( চি—X ) এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া যায়।

রামকিঙ্করের বিশিষ্ট মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যগুলির মধ্যে কয়েকটি হল 'শ্যামলী' এবং 'কালোবাড়ী'র মাটির দেওয়ালে করা ক্লে-রিলিফ এবং এইগুলিকেই তাঁর একেবারে প্রথম পর্যায়ের কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। 'যক্ষ-যক্ষী' হল সম্মুখধর্মী এবং স্থাপত্য-শিল্পের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকা ভাস্কর্য। তাঁর অন্যান্য পরিবেশীয়রীতির মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যগুলি শান্তিনিকেতনের পরিবেশের জন্য তৈরী হয়েছিল। এগুলির কয়েকটি মূর্ত, অন্যান্যগুলি বিমূর্ত বা আধাবিমূর্ত। এইসমস্ত মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যগুলির বেশীরভাগই বিশালমাপের, মনুমেণ্টাল এবং পরিবেশীয় ভাস্কর্য হিসাবে ফর্ম ও ধারণায় নতুনত্বের দাবী করে। ব্রোঞ্জের মতো দামী উপাদানের পরিবর্তে সিমেণ্টে মেশানো যায় এমন আশপাশের সহজপ্রাপ্ত টুকরো পাথর বা কাঁকড়কেই এইসমস্ত ভাস্কর্যগুলির বিকল্প উপাদান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বাঁশ, লোহার রড এবং খড় প্রভৃতি দিয়ে এইসমস্ত ভাস্কর্যগুলির কাঠামো তৈরী করে সিমেণ্ট ও পাথর কুঁচি বা কাঁকড়ের মিশ্রণ ধরে ধরে ও ছুঁড়ে ছুঁড়ে লাগানো হয়। এবং ফর্মের অভ্যন্তরীণ গঠনকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য অতিরিক্ত মাস ও ভল্যুমকে ছেঁটে ফেলা হয়। এইভাবে সিমেণ্টে সরাসরি পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করায় ভাস্কর্যকে খোলা জায়গার মতো বিশাল করবার একটা বিস্তৃত সুযোগ পেয়েছিলেন রামকিঙ্কর। এবং ঐ মিশ্রণের ছুঁড়ে লাগানো পদ্ধতিই ( Throwing process ) ভাস্কর্যগুলির উপরিতলে প্রকৃতির মতো একটা কর্কশ-জৈব টেক্সচার ফুটিয়ে তুলে তাঁর ভাস্কর্য-গুলিকে পরিবেশের সঙ্গে খুব দ্রুত যুক্ত করে দেয়।

তাঁর করা মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যগুলি, তা মূর্তই হোক বা বিমূর্তই হোক এবং তাদের ফর্ম ও স্ট্রাকচারও যাই হোক না কেন এগুলির ছন্দে প্রাইমারি স্ট্রাকচারের প্রাধান্যই বেশী। যেমন লম্বালম্বি দাঁড়িয়ে থাকা 'সুজাতা', তীর্যকভাবে ছুটে যাওয়া 'কলেব বাঁশি', স্থাপত্যগত শক্তিবান 'সাঁওতাল পরিবার' অথবা ভাবসাম্যতায় আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে থাকা 'ধান ঝাড়া'—এগুলির প্রত্যেকটিই গাঠনিক উপবৃদ্ধি এবং অক্ষরেখার ভারসাম্যের ( axis line ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। এটাই তাঁকে আমাদেব সময়ের অন্যান্য ভাস্করদের থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সরিযে আনে। অক্ষরেখাব ভারসাম্যকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য ওলনরেখার ব্যবহার হয় এবং পশ্চিমের একমাত্র কনস্ট্রাকটিভিস্টদের কাজের মধ্যেই গাঠনিক নির্মাণেব পবীক্ষা-নিবীক্ষা লক্ষ করা যায় সেহেতু অল্প কয়েকজন ভাস্করের কাজেই প্রাইমারী স্ট্রাকচারের ব্যাপক পরীক্ষার বিস্তার ঘটে। কিন্তু রামকিঙ্করেব অক্ষরেখাব উপর নির্ভর কবে প্রাইমারী স্ট্রাকচার এবং গঠনসংক্রান্ত নির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বেশীরভাগই মূর্ত গঠনের প্রতিনিধিমূলক ধারণার মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁর করা 'সুজাতা', 'সাঁওতাল পরিবার', 'কলের বাঁশি' প্রভৃতির মতো মূর্ত বা আধা-বিমূর্ত

ভাস্কর্যগুলি রঁদা, মিলোল, জার্ডাকিন প্রভৃতিদের মতো না হয়ে তারা শক্তির বিমূর্ততা, গতিময়তা এবং বিশ্বজনীনতাকেই সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলে।

নিবিড় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসা নারী, পুরুষ, জন্তু-জানোয়ার এবং নিসর্গ-মালাই হল তাঁর ভাস্কর্যের বিষয়। যেগুলি তাঁর পরিবেশীয় ভাস্কর্যের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ সেগুলির দুটিতে প্রতিবেশী সাঁওতালদের প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। পঞ্চাশ বছর আগে রামকিঙ্কর যখন সাঁওতাল পরিবার করেছিলেন তখন শান্তিনিকেতনের জীবন ও পরিবেশ ছিল ভিন্ন। সাঁওতাল ও প্রতিবেশী গ্রামের অন্যান্য মানুষদের জীবন, তাঁদের প্রতিদিনের দুঃখ, হাসি, গান প্রভৃতি ছিল তখন শান্তিনিকেতনের জীবনের অংশ। রামকিঙ্কর সাঁওতালী জীবনের সমস্ত উচ্ছ্বাস এবং উদ্দীপনাকে নথিভুক্ত করে রাখার জন্য উৎসাহিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৮-৩৯ সালে 'সাঁওতাল পরিবার' এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে 'কলের বাঁশি' জনসাধারণের যাতায়াতের পথের পাশে করেন যা সর্বসাধারণের চোখে বারবার পড়ে। 'সাঁওতাল পরিবার' হল কাজ শেষে ফিরে যাওয়া একটি সাঁওতাল দম্পতির জটিল রচনা ( complex composition )। এই বিশাল আকারের বাস্তবশৈলীর ভাস্কর্যটির বৈশিষ্ট্য হল এর শরীরের মাধুর্যময় ছন্দ, দৃঢ় গঠন, স্বাস্থ্যময়তা এবং কর্মচাঞ্চল্যতায় ভরা তাদের গোষ্ঠীর নমুনাগত একটি নিখুঁত আদল। আকৃতির শক্তিশালী গঠনের জন্য আঙ্গিকের দিক দিয়ে এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে কেন্দ্রের অক্ষরেখার নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক ভারসাম্যতায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য কোরে স্থাপত্যগত শক্তিকে সামগ্রিকভাবে ফুটিয়ে তোলে এবং চলমানতা ও গতিময়তাকেও এর মধ্যে প্রতিধ্বনিত করে তোলে। ছুঁড়ে লাগানো পদ্ধতির জন্যই ভাস্কর্যগুলির উপরিতলে একটা কর্কশ-জৈব টেক্সচার ফুটে উঠে জীবন্ত, জৈব মনে হয় এবং প্রকৃতির সঙ্গে সমানভাবে যুক্ত করে দেয়। হেনরী ম্যুব এবং অন্যান্য সমকালীন ভাস্করেরা কেবলমাত্র যুদ্ধপরবর্তী সময়ে ভাস্কর্যে একটা দ্রুত পরিবেশীয় স্পর্শ এনে দেবার জন্য ভাস্কর্যের উপরিতল এবং উপাদানগত বিচার-বিবেচনায় একই পথ ধরে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

'কলের বাঁশি'তে একই উপাদান এবং কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। উচ্ছ্বসিত জীবনীশক্তি, মাধুর্যপূর্ণ দেহ এবং হাস্যময় মুখের মধ্যে ভালোবাসা এবং আনন্দের অভিব্যক্তি নিয়ে যুবতী সাঁওতাল মেয়ের মূর্ত গঠনের যথাযথ প্রকাশ লক্ষ করা যায়। উত্থিত ধুলিকণা, হাওয়ায় তীর্যকভাবে উড়ে যাওয়া পেছনের আঁচল এবং মূর্তিগুলি রচনার মধ্য দিয়ে তাদের হেঁটে যাওয়ার শক্তিশালী গতির জোরালো প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। মূর্তিগুলির অবয়ব রঁদার মতো না হয়ে হয়েছে গাঠনিক এবং এইজন্য মূর্ত ও বিমূর্তের সমঝোতার মধ্য দিয়ে এদের প্রকাশ ঘটেছে। আলম্বিত গঠন অক্ষরেখার উপর ভারসাম্য রেখে মূর্ততার মধ্যে এটি নির্মাণের বিমূর্তনীতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলে। এবং খোলা জায়গার নির্মাণের গাঠনিক শক্তিকে ধরে রাখে ও

মাত্রাগত স্পষ্টতাকে গভীরভাবে ধারণ করে।

তাঁর করা প্রথম মুক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য হল লম্বা ছিপছিপে, সরু চোঙের মতো মেয়ে মূর্তি 'সুজাতা'। মূলতঃ তিনি এই ভাস্কর্যটিকে একটি চঞ্চলা-তন্বী আশ্রমবালিকা হিসাবে তৈরী করেছিলেন। মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যের জন্য সরাসরি কংক্রীটে করা এটি তাঁর প্রথম পরীক্ষা হিসাবে এখানে রামকিঙ্কর জটিল আলম্বিত গঠনকে এড়িয়ে গেছেন। এবং পরিবর্তে অক্ষরেখার উপর লম্বালম্বিভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ একটি চোঙের মতো ব্যবহার করেছেন একে। ভাস্কর্যটির মূলদেশ ভূমিতলের উপর থাকায় এটিকে মাটির মধ্যে শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে বেড়ে ওঠা বৃক্ষের মতো মনে হয়। এখানে রামকিঙ্কর তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে মূর্তিটিকে মূর্তভাবে রচনা করেছেন। এবং এর চারপাশেব ইউক্যালিপ্টাস গাছের সঙ্গে ঐক্যময়ভাবে সহ-অবস্থান করবার সুযোগ দেওয়ায় মূর্তিটি তার চত্বরের সঙ্গে দৃঢ় আত্মীয়তা স্থাপন করে অবশেষে এটিকে 'বনদেবী' বলে মনে হয়।

রামকিঙ্করের করা 'ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড' বা 'দীপস্তম্ভ' বা 'বাতিদান' হল পরিবেশীয় ভাস্কর্যের বিশেষ একটি দিক এবং যা ভারতীয় আধুনিক ভাস্কর্য জগতে বিমূর্ততার প্রথম নিদর্শন। প্রশ্ন জাগে ১৯৩৮ সালে সাঁওতাল পরিবারের মতো মূর্ত ভাস্কর্য করার পর ১৯৪০ সালেই এমন বিমূর্ত কাজের ভাবনা বা পরিকল্পনা এল কেন? অথচ যেখানে কোন পূর্বপ্রস্তুতি অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অনুশীলনেরও প্রয়োজন হলনা। এযেন শিল্পীর সৃষ্টির গর্ভ থেকে উদ্‌গীবণ হওয়ার মতো হঠাৎ জন্ম নিল রূপ ও ভাবের পূর্ণতা নিয়ে। তিরিশের গোড়ায় করা তাঁর ভাস্কর্যগুলিতে বিমূর্ততার পরিচয় থাকলেও তা মূর্তরূপেরই ভাঙচুর মাত্র এবং যাদেব 'মিথুন', 'কচ দেবযানী', 'নারী ও কুকুর' ইত্যাদি বলে চিনে নিতে অসুবিধা হয়না আমাদের। ল্যাম্পস্ট্যাণ্ডের ছোট প্ল্যাস্টারের নক্সাটি হয়ত তিরিশেব গোড়ার দিকেই করেছিলেন তিনি। কিন্তু বাস্তব মূর্তরূপের কোন পরিচয় নেই এর মধ্যে। হ্যাঁ কিছুটা গাছের মতো দেখতে লাগে ঠিকই কিন্তু তারও কোন বিশেষত্ব মেলে না মোটেই। কিন্তু এই নক্সাটি থেকে যখন এটিকে বড় করে মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যের আকারে নিয়ে এলেন তখন যাঁরা পরিচিত রূপেব সঙ্গে মিল খোঁজেন তাঁদের কাছে জটিলতা বেড়ে গেল অনেক। সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে উঠল দুর্বোধ্য আর দুরূহ। রামকিঙ্কর তাঁর দর্শকদের বারবার শুধু ঘুরিয়েছেন এই ভাস্কর্যটির চারদিকে। এবং কেউ এব মধ্যে দেখতে পেয়েছেন যুগল পাখী, কেউ চুম্বনরত নরনারী, আবার কেউবা স্বপ্নের দেবীকে। কিন্তু এতে মোটেই আপত্তি ছিল না তাঁর, উপলব্ধির পরম আনন্দে প্রাণ খুলে হেসেছেন শুধু।

ভাস্কর্যের মাঝখানে আলম্বিত অক্ষরেখাটি স্থির ও জমিতে স্থাপন করা এবং যাকে কেন্দ্র করে নিরেট আকারের তল-অবতল, সোজা ও বাঁকাল রেখা আরোহণ-অবরোহণ করেছে। আবার কোনটা আলোয় প্রকাশিত স্ফীত-নিরেট আয়তন,

কোনটাবা ছায়ায় ঢাকা গভীর শূন্যতা। একটি বিভাজিত আকারের তল ক্রমশঃ ঘুরে গিয়ে আর একটি বিভাজিত আকারের তলের সাথে মিশে গিয়েছে অথবা অবতলে পরিণত হয়েছে। আবার আর একটি বিভাজিত আকারের তলের গতি হঠাৎ অন্যদিকে ঘুরে গিয়ে বাঁক নিয়ে কোণের সৃষ্টি করেছে যা কখনো বহির্মুখী, কখনোবা অন্তর্মুখী। ঠিক তেমনিভাবেই ভাস্কর্যটির উপরিতলের রেখাগুলিও কখনো সোজা, কখনো বাঁকা, কখনো বাইরের থেকে বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠেছে, আবার কখনোবা ঘুরে ঘুরে ভেতরে ঢুকেছে। অথচ আকারের এতসব বিভাজন, তল-অবতল, আলোছায়া ও রেখার বিভিন্ন বৈচিত্র থাকা সত্ত্বেও ভাস্কর্যটি বেশ আঁটো-সাঁটো, কমপেক্ট, বলে মনে হয় এবং যেখানে ঐক্যতার ছন্দ পতন হয়নি এতটুকু। আসলে প্রকৃতির সৃষ্টিজনিত পরমশক্তি এবং তার যে বিকাশ বা বৃদ্ধির ছন্দ তারই রূপায়ণ হয়েছে এই বিমূর্ত ভাস্কর্যটিতে। এবং অক্ষরেখাকেন্দ্রিক তল-অবতল বা অন্যসব আঙ্গিকের আরোহণ-অবরোহণ ইত্যাদির সমন্বয়ে ভাস্কর্যটিতে ফুটে উঠেছে এক জৈবশক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশের ছন্দ। কোন অলৌকিক কল্পনা বা স্বপ্নের রূপ নয়, এক সত্য উপলব্ধির অরূপধারণার রূপকে এই বিমূর্ত ভাস্কর্যটিতে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন রামকিঙ্কর। ল্যাম্পস্ট্যাণ্ডের ছোট নক্সাটি যদিওবা কোন এক অজানা গাছের ইঙ্গিত বহন করে আনে কিন্তু নক্সাটির পরিবর্ধিত আকারের মধ্যে এরকম কোন পরিচয় পাওয়া ক্রমশঃ কঠিন হয়ে ওঠে। এমন পরিচয়হীন বিমূর্ত রূপেব ভাস্কর্যের প্রয়োজন ছিল ব্রহ্ম-উপাসনা গৃহের চৌহিদ্দে। মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যের স্থান ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই ব্রহ্ম-উপাসনা গৃহ এবং তার আদর্শের কথা উপেক্ষা করতে পারেননি রামকিঙ্কর। অনেক বিচার-বিবেচনা, চিন্তা-ভাবনা করেই তিনি এই ভাস্কর্যটি করেছিলেন শান্তিনিকেতন গৃহ এবং ব্রহ্ম-উপাসনা গৃহের মধ্যপ্রাঙ্গনে। আর যে ভাস্কর্যের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে পরমব্রহ্মের নিরাকার রূপের সুর। এবং এই পরমনিরাকার রূপের ছন্দের মধ্যে তিনি বেঁধে দিয়েছেন চারপাশের গাছপালা, পশুপাখী, মানুষ-মানুষীর প্রাণ-আত্মার ছন্দে উদ্দীপিত জীবনেরই এক উচ্ছল প্রাণছন্দকে। ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড রামকিঙ্করের বিমূর্ত মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য হিসাবে প্রথম হলেও এমন নিখুঁত রূপ ও ভাবের নজীর আজো কোন ভারতীয় ভাস্কর্যের কাজে পাওয়া যায়না।

রামকিঙ্করের করা অন্যতম আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য হল 'ধান ঝাড়া' (১৯৪৩-৪৪)। এখানে উপভোগ্য হল মূর্তিটির মাথা এবং শরীরের উপরের অংশের ভাঙ্গনীকরণ বা সংক্ষিপ্তকরণের মধ্য দিয়ে একটি মাত্রা-প্রধান অংশে রূপান্তর। কিন্তু খুব সাধারণ ঢঙে করা এর বিস্তৃতভাবে ফাঁক করা দুটি পা এবং হাত অভিব্যক্তিপূর্ণ, যেটি ভাস্করের মানবদেহের প্রাইমারী স্ট্রাকচারের সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে নির্দেশ করে। আড়াআড়ি গঠনকে অবলম্বন করে এই ভাস্কর্যটি নিজেকে দৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত করে এবং আঙ্গিকধর্মী গঠনের ভিত্তি হিসাবে অক্ষরেখার

ব্যবহারকে পরিষ্কার করে দেয় ও শারীরসংস্থানসংক্রান্ত এবং প্রাইমাবি স্ট্রাকচার-সংক্রান্ত সংশ্লেষের ( synthesis ) এটি সবচেয়ে ভালো উদাহরণ প্রতিপন্ন করে। বাস্তবের দুটি গাঠনিকতলের সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে এমন নতুনধারার সৃষ্টি পশ্চিমেও খুব একটা অগ্রসর হয়নি। কিউবিস্টরা, যাঁরা, অবজেক্ট অথবা ফিগারকে ভাঙ্গনীকরণ অথবা সরলীকরণ ( simplyfying or distorting ) করে থাকেন তাঁরা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্ট্রাকচারের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। অন্যদিকে মিনিমেইলইস্ট এবং কনস্ট্রাকটিভিস্টরা পুরোপুরি টেকনোলজিক্যাল অথবা প্রাইমারি স্ট্রাকচার সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে তাঁদের সৃষ্টি কাজ করেন। তাঁদের কাজ শারীরসংস্থানসংক্রান্ত গঠনের ধরণধারণ থেকে মুক্ত। রোনাল্ড ব্রানডেনের 'দি X' এইধরনের একটি কাজ, এর আড়াআড়ি গঠনেব ( cross structure ) সঙ্গে রামকিঙ্করের 'ধান ঝাড়া'র খুব গভীর সম্পর্ক আছে, কিন্তু বিমূর্ততাকে উপস্থাপিত করবার জন্য ব্রানডেনের কাজটি পুরোপুরিভাবে গাঠনিক সৃষ্টি, যেখানে রামকিঙ্কর মানুষেব জীবনের প্রাচুর্যতার মধ্য দিয়ে মানবিক অবস্থাকে ( Human condition ) হাজির করেছেন। এমনকি তাঁর 'গতি' এবং 'ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড'-এ, যাকে বিমূর্ত এবং ভাবতবর্ষে এইধরনের প্রথম কাজ হিসাবে ধরা যায়, সেখানে তিনি প্রকৃতি এবং জীবনের গতি ও প্রাচুর্যতাকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছেন। শুধুমাত্র মূর্ত বা বিমূর্তই নয় তাঁর সমস্ত ভাস্কর্যগুলিতে প্রাইমাবি স্ট্রাকচারের প্রয়োগিক ব্যবহারেব প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বস্তুতঃ পশ্চিমের ভাস্করদের হাতে যেমন ছিল তেমনভাবে কাজ করবার বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার মতো সম্ভাবনাময় কোন শিল্পসংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা তাঁর হাতে ছিলনা।

এই বিষয়বস্তুগত বিচার বিশ্লেষণ থেকে একথা বলা যায় যে সমগ্র প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের পরিবেশীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসের পটভূমিকায় নতুনদিকের প্রবর্তক হিসাবে রামকিঙ্করের অবদান হল মূর্ত আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে প্রাইমারি স্ট্রাকচারের সংশ্লেষণ। এবং তাঁর করা 'ধান ঝাড়া' আধাবিমূর্ততা থেকে ভাস্কর্যের বিমূর্ততা এবং গাঠনিক কলাকৈবল্যের দিকে এগিয়ে যায়।

## মঞ্চশিল্পী রামকিঙ্কর

.........................

### সুখেন গাঙ্গুলী

আজকাল শোনা যায় শিল্প যুগনির্ভর—কথাটা মিথ্যা নয়, একটা বিশেষ স্থানকালের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাতে মূর্ত হয় বটে কিন্তু শিল্প স্থানকালকে অতিক্রমও করে, ঐতিহাসিক কালের মধ্যে থেকেও সৃষ্টি করে মানবতার মুহূর্ত, ইঙ্গিত, প্রতীক এবং সংকেতে জানায় বাস্তবাতীত বাস্তব। মনে পড়ে মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্বয়ং লেনিন একটি সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন—'আমাদের শিল্প বাস্তবের ঊর্ধ্বে উঠবে, মানুষকেও নিয়ে যাবে বাস্তবকে অতিক্রম করে—বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়।'

রামকিঙ্কর বেইজ জীবন ও শিল্পের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর বহু শিল্পসৃষ্টিতে এই প্রতিভা লক্ষ করা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপাতবাস্তব ও অন্তর্নিহিতবাস্তবের পার্থক্য স্পষ্টভাবেই টেনেছেন। রামকিঙ্করের মঞ্চ পরিকল্পনায় তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। একথা সুবিদিত যে সহজাত প্রতিভার অধিকারী রামকিঙ্কর কোন আর্ট কলেজের ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিল্পী ছিলেন না, রবীন্দ্র আবিষ্কৃত মাটির কাছাকাছি থাকা আত্মভোলা মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁকে লোকে সাধারণতঃ ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী হিসাবেই জানেন কিন্তু মঞ্চসজ্জার ও রূপসজ্জার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা-ভাবনার কথা অনেকেই জানেন না। সেখানেও তাঁর সহজাত বোধশক্তি, কল্পনা ও সৃজনশীলতার একটি অভিনব পরিচয় পাওয়া যায়।

মঞ্চসজ্জা ও নাটকের সাজপোশাকের ক্ষেত্রে রামকিঙ্করের যে গভীর আগ্রহ, অবদান ও অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার প্রয়োজন বোধ করছি। একথা সকলেই জানেন শান্তিনিকেতনের জীবনের সঙ্গে তাঁর গভীর ও আত্মিক সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে রবীন্দ্র নাট্যাভিনয়ে সামান্যতম উপকরণ দিয়ে তিনি যে ত্রিমাত্রিক পরিকল্পনা ও একটি সুন্দর মঞ্চআবহাওয়া বা পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই সময়কার যাঁরা দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র তাঁরাই তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। কেননা এ বিষয়টি এমন যে কয়েকটি শব্দ দিয়ে বোঝান, অন্ততঃ আমার পক্ষে, অসম্ভব মনে হয়।

শান্তিনিকেতনে দুটি বড়রকমের পরিবর্তন এনেছিলেন তিনি। প্রথমতঃ মঞ্চ। দ্বিতীয়তঃ অভিনেতার সাজপোশাক এবং রূপসজ্জায়, যেখানে তিনি বাস্তব বা

পৌরাণিক আবহাওয়াকে পুরোপুরি অস্বীকার করলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হয়—'অভিনয় ব্যাপারটি বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল, দৃশ্যপট তার বিপরীত'—যদিও ঠাকুরবাড়ীর নাট্য প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চ ছিল বাস্তবঘেঁষা, সেই সময়কার মঞ্চের কিছু ছবি (Reproduction) দেখলে চলচ্চিত্রের সেটের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাতে 3-D অথবা ত্রিমাত্রিকতার এবং ভারসাম্যের প্রাধান্য ছিল অত্যাধিক। মঞ্চসজ্জা বাস্তবঘেঁষা হলে খুশী হতেন সকলে। অবন ঠাকুরের লেখাতে পাওয়া যায় ঠাকুরবাড়ীর নাটকের মঞ্চের উপর ঝাঁঝরি দিয়ে নকল বৃষ্টি করা হত, বজ্রবিদ্যুতের শব্দ করা হত, এমনকি বাজার থেকে অর্ডার দিয়ে জোনাকী কিনে এনে ছেড়ে দেওয়া হত। শান্তিনিকেতনেও একসময় 'শারদোৎসব' নাটকের সময় বেতস নদী, কাশবন এইসব দৃশ্যাবলীকে প্রকৃতির সঙ্গে হুবহু মেলাবার চেষ্টা করা হত। রামকিঙ্করের গুরু নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আসার পর মঞ্চপরিকল্পনায় একটা আমূল পরিবর্তন ঘটল। তিনি বাস্তবে না গিয়ে একেবারে সহজ-সরল কিছু রঙের সংযুক্তিতে মঞ্চ তৈরীর একটা চেষ্টা করলেন।

আমাদের দেশের যাত্রার সঙ্গে জাপানের অনাড়ম্বর ধারার মিল খুঁজে পাই। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় জাপানে দেখেছি কয়েকটি জাপানী পৌরাণিক নাটক ও ধ্রুপদী নৃত্যানুষ্ঠান, যেমন বসন্তকালে 'মিয়াকে ওদোরী' এবং পৌরাণিক বলতে 'কাবুকী'। সেখানে দেখতে পাওয়া যায় মঞ্চে যতদূর সম্ভব দৃশ্যপট কাঠের ফ্রেমে এঁকে তাতে একটা চূড়ান্তরকমের ত্রিমাত্রিকতা আনবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু 'নোহ' (noh) নাটকে অনেকটা আমাদের দেশের যাত্রা, উত্তরপ্রদেশের 'নত্তকঙ্কি' ও মহারাষ্ট্রের 'তামাসা'র লোকআঙ্গিকের (Folk Form) প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়, যা সত্যিই তুলনাহীন। সেখানে দৃশ্য নেই বললেই চলে এবং আসবাবের ব্যবহার খুবই সীমিত। আর যেটুকু হয় তার মধ্যে সাদৃশ্যের চাইতে প্রতীকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। 'নোহ' নাটকে মঞ্চের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের দেশে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, যেমন থার্ড থিয়েটারে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে বিশেষ কোন দূরত্ব রাখতে চাইছে না সেইরকম 'নোহ' নাটক দেখার পর তা উপলব্ধি হল। যাই হোক শান্তিনিকেতনে পরবর্তী যুগে দেখা গেল রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চসজ্জায় একটা প্রতীকী মায়ার জগৎ তৈরী হল। মঞ্চসজ্জায় দেখা গেল পশ্চাদপটে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নীল। হলুদ আর গেরুয়া রঙের দুটি উইংস এবং ফ্লাই-এ থাকত ইণ্ডিয়ান রেড ( Indian Red )। এইসমস্ত রঙ দিয়ে মঞ্চে একটা গভীর বিস্তার (dimension) সৃষ্টি হত এবং মঞ্চের শেষে পশ্চাদপটে দরজার মতো ফাঁক থাকত আর তার চারপাশে রঙীন কাপড়ের টুকরো দিয়ে সাজানো হত। কখনো এসেছে কাঠের ফ্রেমে স্থাপত্যের ইঙ্গিত, যেমন 'বিসর্জন', 'নটীর পূজা', 'তাসের দেশ', 'অরূপরতন' এবং 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকগুলিতে। আসবাব বলতে কাপড় দিয়ে ঢাকা প্যাকিং বাক্স। 'অরূপরতন', কিংবা 'রক্তকরবী' নাটকে অন্ধকারের রাজার কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তারই একটা মানানসই প্রতীকী

স্থাপত্যগত আঙ্গিক মঞ্চের বিস্তারে প্রতীকী শৈলীতে তৈরী করা হত। অবনীন্দ্রনাথের হাতে রবীন্দ্রনাট্যের 'রাজা', 'সন্ন্যাসী' বা 'পুরোহিত' ইতিহাসের কোন বিশেষকালের বা অঞ্চলের সাজপোশাক পরে হাজির হয়েছে। কিন্তু নন্দলালের যুগে নন্দলাল রাজা সাজাতে গিয়ে রাজসিকতার ভাব ফোটালেন। গ্রামবাসীদের জামাকাপড়ের মধ্যে প্রকাশ পেল সারল্য আর সাধাসিধে ভাব। তাছাড়া প্রধান চরিত্রের সঙ্গে তার সখী ও দাসদাসীদের একটি বিশেষ তফাৎ রেখেই সাজপোশাকের ব্যবহার হতে লাগল। এই প্রসঙ্গে একটু জানিয়ে রাখি আজকাল শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাট্যে ও নৃত্যনাট্যে সাজপোশাকের ব্যাপারে দেখা যায় যে রাজা বা রাণীর কোন তারতম্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কেবা রাণী আর কেযে সখী বোঝাই দায়। সমস্ত ব্যাপারটি বৈচিত্রহীন বলে মনে হয়। নন্দলালের সময় চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিককালের বাইরে এনে এমনভাবে সাজানো হল যে তা কোন বিশেষ দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ রইল না। জনসমক্ষে তারা উপস্থিত হল সর্বকালের এবং সর্বযুগের মানুষ হয়ে।

এবারে কিছু নাটকের মঞ্চসজ্জার বিষয়ে আসা যাক। 'ডাকঘর' নাটকের মঞ্চসজ্জার বহুল প্রকাশিত ফটোগ্রাফ নিশ্চয় অনেকেই দেখে থাকবেন। তাতে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরবাড়ীর অনেকেই অভিনয় করছেন। সেখানে মঞ্চে realism বা বাস্তবঘেঁষা দৃশ্য যতদূর সম্ভব আনা যায় তার একটা চেষ্টা হয়েছে আর চরিত্রগুলির থেকে মঞ্চের প্রাধান্য এতো বেশী যে চরিত্রগুলির অভিনয় দক্ষতা বা ভাবপ্রকাশ কিছু নজরে এসেছে বলে আমার মনে হয়নি।

তৎকালীন এই রীতি থেকে একেবারে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রামকিঙ্কর সেক্সপীয়ার এবং অন্যান্য নাট্যকারের লেখা কিছু নাটকের মঞ্চসজ্জায় একটা আমূল পরিবর্তন নিয়ে এলেন। এগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', 'ক্ষুদিত পাষাণ' এবং রাজশেখর বসুব 'ভুশুণ্ডির মাঠে' তার মধ্যে আমার দেখা অন্যতম। এই নাটকগুলির মধ্যে তাঁর একটা নতুন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ধরা যাক ১৯৪৮ সালে 'ওথেলো' নাটকের মঞ্চসজ্জার একটি বিশেষ দিক ছিল। কারণ যে বাড়ীতে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল সেই বাড়ীটির নাম 'দ্বারিক', স্থাপত্যশিল্পের দিক দিয়ে বাড়ীটি ছিল কিছুটা গথিক প্যাটার্নের এবং এই বাড়ীর খিলানগুলির ও স্থাপত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তিনি মঞ্চের একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ এবং পরিকল্পনা করেছিলেন যা ছিল 'ওথেলো' নাটকের পক্ষে একমাত্র আদর্শ পরিবেশ আর যা হয়ে উঠেছিল আমাদের কল্পনার বাইরে এক সার্থক সৃষ্টি।

সেকালে Photo documentation-এর কোন ব্যবস্থা না করায় আজ আর এগুলির কোন নথি (record) পাওয়া যায়না। একমাত্র পাঠকেরা যদি চান তাহলে একটি কেন সেই সময়ে রামকিঙ্করের পরিকল্পনায় যতগুলি এবং যত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল সবকটিরই স্কেচ তৈরী করে ছাপান সম্ভব হতে পারে। এছাড়াও 'ভুশুণ্ডীর মাঠে' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল 'সিংহসদন' বাড়ীতে এবং সেকালে শান্তিনিকেতনে

একমাত্র রীতিমত মঞ্চ বা Stage বলতে যা বোঝায় এটি ছিল তাই-ই, সবরকমের মঞ্চের উপকরণসহ যা আয়তনে ছিল খুবই ছোট। কিন্তু 'ভুশুণ্ডির মাঠে'র মঞ্চ ছিল বাস্তবঘেঁষা অথচ তাতে কোনরকম প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু জিনিস ব্যবহার করা হয়নি, একটি মাত্র Stage-set তৈরী হয়েছিল। আর সেই অমাবস্যার রাত, ঘুটঘুটে আঁধার, ইঁটের পাঁজা এবং পশ্চাৎপটে অমাবস্যার চাঁদ সঙ্গে সঙ্গে সীমিত আলোর পরিকল্পনা—এই সবকিছু মিলেই একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করবার আগ্রহ। আর মঞ্চসজ্জার মধ্যে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা Experiment করবার আগ্রহ। যাই হোক, আজ আমরা বলব neo-realism ঘেঁষা মঞ্চপরিকল্পনায় নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৪৬-৪৭-এর প্রথম দিকে। পরে নাটকটি কলকাতার 'রঙমহল' নাট্যমঞ্চে পরীক্ষিত হল। সেখানে লেখক স্বয়ং রাজশেখর বসু উপস্থিত ছিলেন। সেইসময়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের দ্বারা কলকাতার মতো শহরে এইরকম মঞ্চসজ্জা এবং পরিবেশনা বহুল প্রশংসিত হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে পঞ্চাশের দশকে তিনি আবও নাটক অনুযায়ী নানাভাবে, নানা পরিকল্পনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। শেষের দিকে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের এবং আংশিকভাবে বলা যায় 'ক্ষুদিত পাষাণ' নাটকের মঞ্চের পরিকল্পনা ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ এবং অসাধারণ সৃষ্টি। যার মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম মাত্র কয়েকটি টুকরো রঙীন কাপড়ের সাহায্যে রঙের বিস্তারের ( Colour dimension ) মধ্য দিয়ে কিভাবে যথেষ্ট depth বা গভীরতা আনা যায় তার-ই সার্থক পরিচয়। সেই সঙ্গে অভিনেতাদের মঞ্চের অবস্থন বিবেচনা করেই শূন্য জায়গার (space) সৃষ্টি করেছিলেন অথচ এই মঞ্চ সৃষ্টি করতে বিশেষ কোন উপকরণের দরকার পড়েনি। সেই রঙের বিস্তারের দিকে তাকিয়ে দর্শকদের মনে হয়েছিল বিরাট বাধা আর কালের চাকার ইঙ্গিত। আলো-ছায়ার খেলার মাধ্যমে ফুটিয়েছিলেন বিরাটত্ব ( monumental quality )। সেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মনে হয়েছিল যেন তাঁরা ঐ যন্ত্রের কাছে একটি ক্ষুদ্রতম জীব। বলা বাহুল্যই এটাই হল নাটকের প্রধান বক্তব্য। শান্তিনিকেতনের মঞ্চ পরিকল্পনার এই বিশিষ্টতা, এই রুচি এবং সংযম পরবর্তী যুগে তাঁর কিছু কিছু ছাত্র তাঁরই প্রেরণায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

## অমিতাভ চৌধুরী

ছবি আর মূর্তি বাদ দিলে কিঙ্করদার বড় বাতিক ছিল নাটক। শুধু শিল্প নির্দেশনাই নয়, পরিচালনার ভারও নিতেন তিনি। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র—অরবীন্দ্র কোন নাটক হলে নিজেই এগিয়ে যেতেন এবং কোন অংশ কিভাবে হবে, কিভাবে চলতে হবে রিহার্সেলে রোজ উপস্থিত থেকে তা বলে দিতেন। মনে আছে ১৯৪৬ সালে শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে সেই প্রথম হল 'বাঁশরী' নাটক। শুধু স্টেজই নয়, পাত্রপাত্রীদের মেকআপও করে দিলেন নিজে।

কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' অভিনয় করালেন সেবারই। মুখোশ বানানো থেকে সঙ্গীত পরিচালনা সবই ছিল তাঁর। দুর্দান্ত হয়েছিল নাটক। নাটকের শুরুতে একটা গানও জুড়ে দিয়েছিলেন তিনি। 'আবোল-তাবোল' বইয়ের প্রারম্ভিক কবিতাটিতে সুর দিয়েছিলেন নিজেই। সেটা গাওয়া হতো ড্রপসিন ওঠার আগে। 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' গানটির আদলে 'আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়' যখন গাওয়া হতো কিঙ্করদাও গলা মেলাতেন।

পরে আমাদের দিয়ে কলকাতার নিউ এমপায়ারে করালেন 'হ-য-ব-র-ল,' আমি সেজেছিলাম 'কাক্কেশ্বর কুচকুচে'। মনে আছে কি নিষ্ঠার সঙ্গে কাকের গলা নকল করে পাঠ শেখাতেন আমাকে। অন্যদের বেলাতেও তাই। একমাত্র তাঁর জন্যই এ নাটক এতো জমেছিল।

১৯৪৭ সালে পরশুরামের 'ভুশুণ্ডির মাঠে' গল্পটির গীতিনাট্যরূপ দিয়ে শান্তিনিকেতনে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে যখন অভিনয় করাই তখন কিঙ্করদা দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয়বার নাটকটি মঞ্চস্থ করবার সময় তিনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি তোমাদের সাজাবো, স্টেজ বানাবো।' আমরা তো আনন্দে আত্মহারা। তিনি সকাল থেকে শুরু করলেন। সবই হল কিন্তু তাঁর নতুন একটা আইডিয়া নিয়ে সবাই হিমসিম। ভুশুণ্ডির মাঠের শুরু অমাবস্যায়, শেষ পূর্ণিমায়। সেই অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তরণ দৃশ্যে দৃশ্যে চাঁদের কলাবৃদ্ধি দিয়ে বোঝাতে চাইলেন। ঐ চাঁদ নিয়ে কিঙ্করদা এতো মেতে গেলেন যে সেবার নাটক শুরু করতে একঘণ্টা দেরি হয়ে গিয়েছিল। তবে যখন পুরো ব্যাপারটা দেখা গেল তখন কি চমৎকারই না লাগছিল। ঐ স্টেজের একটা রঙীন স্কেচ করেছিলেন, সেটা এখনও আমার কাছে আছে।

ভূতুড়ে কাহিনী, তাই আমাদের সকলকে খালি গায়ে দাঁড় করিয়ে কালো বুরুশ চালালেন সারা গায়ে। তারপর হাত, পা, বুক, মুখ, থেকে একটু কালি মুছে দিলেন। স্টেজে যখন দাঁড়ালাম তখন মনে হল ব্রহ্মদৈত্য, প্রেত, যক্ষ, প্রেতনি, শাকচুন্নি, ডাইনির কঙ্কাল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুধু বাংলা নয়, ইংরেজী নাটকেও কিঙ্করদার উৎসাহ ছিল প্রচুর। 'প্রিনসেস অব দা আরাকান', 'এনড্রোক্লেস অ্যানড দা লায়ন',—এইসব নাটকেও প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। নাটকের কাজ যখন চলত তখন ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়ার কাজ মুলতুবি থাকত।

১৯৫৮ সালে একটি গ্রীক নাটকও অভিনয় করাতে উদ্যোগী হন। তার মহড়াও শুরু হয় সঙ্গীতভবনের স্টেজে। কিন্তু এই মহড়া নিয়ে এমন একটি কাণ্ড ঘটল যা পরে গ্রীক ট্র্যাজেডিতে দাঁড়াল। সেই সময়ের নামকরা সাহিত্যিক, ইংরেজীর অধ্যাপক সুধীন ঘোষ কিঙ্করদার সঙ্গে ঐ স্টেজেই সবার সামনে এমন অভদ্র ব্যবহার করলেন যার পরিণতিতে সুধীন ঘোষকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।*

## শুচিব্রত দেব

১৯৫৯ সালে আমি কলাভবনের ছাত্র হয়ে আসি। এ সময়ে শিল্পচর্চার আর একটি বাড়তি জিনিস তাঁর মধ্যে দেখেছি, তাহল কিঙ্করদার নাট্যচর্চা। আর এই নাটকের মাধ্যমেই তাঁর অনেক কাছাকাছি চলে যেতে পেরেছিলাম আমরা। সুযোগ পেলেই তিনি আমাদের নিয়ে নাটক করাতেন। এবং তার প্রস্তুতি পর্বটাই ছিল সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। নাটকের ব্যাপারে বই-খাতা নিয়ে কখনো ছোটাছুটি করতে দেখিনি তাঁকে। মঞ্চ, পোষাক-আষাক ইত্যাদি নিয়ে তিনি যে গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করতেন তা তাঁকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না মোটেই। যতক্ষণ মহড়া শুরু না হত ততক্ষণ নাটকের ঐ সংলাপ, গান, নির্দেশনা যে ওঁরই নিজের চিন্তাধারার প্রকাশ তা বোঝাই যেত না। মহড়া যতক্ষণ মনের মতো না হত ততক্ষণ নিজে ছুটি নিতেন না, কাউকেও দিতেন না। অসম্ভব পরিশ্রম করতেন নাটক নিয়ে। আমার চারবছরের ছাত্রজীবনে ওঁর গোটা তিনেক নাটকে অভিনেতা ছিলাম। প্রথমটি পরশুরামের 'ভুশুণ্ডির মাঠে', দ্বিতীয়টি সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' এবং তৃতীয়টি রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী' নিয়ে হিন্দীতে

* ২৩৮ পৃষ্ঠায় বিশ্বজিৎ রায়-এর পরবর্তী রচনায় এ সম্পর্কে আরো বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। সঃ

একটি নাটক করিয়েছিলেন। 'তোতাকাহিনী'তে আমি মঞ্চের আড়ালে নানানভাবে ওঁর সঙ্গে সহযোগীতা করেছি। মঞ্চের আড়ালে বা মঞ্চের উপরে যেখানেই হোক না কেন যদি তিনঘণ্টাও চুপচাপ বসে থাকতে হয় তবুও যতক্ষণ মহড়া শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ কারও সরে যাবার উপায় থাকত না। একবার একটা ঘণ্টা জোগাড় করা হল। এবং মহড়া শুরু হবার সময় মঞ্চের সামনের পর্দাটা ( ড্রপসিন ) সরাবার সঙ্কেত দেবার জন্য ঘণ্টা বাজাবার দায়িত্ব দেওয়া হল সুকুমার দত্ত নামে একজনের হাতে। কিন্তু সেটা আর কেউ বাজাতে পারবে না। যতক্ষণ মহড়া চলেছিল ততক্ষণ ওকে একধারে চুপচাপ বসে বসে পুরো মহড়াটা দেখতে হয়েছিল।

মহড়া সাধারণতঃ কিঙ্করদার স্টুডিওতেই হত। তবে চারদিক খোলা গাছতলার একটি দিককেও দর্শকদের বসার আসন মনে করে মহড়া চলত। কিঙ্করদা বলতেন, 'সামনের দিকে ঘুরেই যে সবসময় নাটকের সংলাপ বলতে হবে তার কোন যুক্তি নেই।' তাঁর নাটকের এইসব ক্রিয়াকলাপ দেখে শান্তিনিকেতনের আগন্তুক দর্শকেরা থমকে দাঁড়িয়ে যেতেন। কেউ কেউ নানারকম মন্তব্যও করতেন। এতে তাঁর অসুবিধা হত। তাই মাঝে মাঝে রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর নটা-সাড়ে নটা থেকে একটা-দেড়টা পর্যন্ত মহড়া চলত কারও ঘরের সামনের বারান্দায় অথবা আশ্রম চত্বরের কোন লাইটপোস্টের নীচে।

প্রতিটি নাটক প্রায় একমাস ধরে মহড়া চলেও মনের মত হতনা কিছুতেই। তাই অনেকবার নাটকের দিন-তারিখ ঠিক করেও আবার পাল্টাতে হত। শেষ পূর্ণাঙ্গ মহড়া হত সঙ্গীতভবনের মুক্তাঙ্গন মঞ্চে।

কিঙ্করদার অধিকাংশ নাটকেই অনেকগুলি গান থাকত। একটা নাটকে পুরোপুরি ভোজপুরী সুর দিয়ে এই গানটি গেয়েছিলেন :

পিয়া পিয়া যো পিয়া হো
বরষবিতি গৈল হো
কাহে যো পিয়া।
পহলে বাহারাল প্রেম
শেষে সারে সাহেলিগো
কাহে যো পিয়া।

একেবারে গ্রাম্য ভোজপুরী গানের রূপ ফুটে উঠেছিল গানটিতে।

কেউ না পারলে কিঙ্করদা নিজেই করে দেখিতে দিতেন। হয়ত কোথাও গাছ থেকে নীচে পড়ার দৃশ্য আছে। নিজেই গাছে উঠে নীচে পড়ে অভ্যাস করার কায়দা শিখিয়ে দিলেন। সেও যেন একটা আলাদা নাটক।

## বিশ্বজিৎ রায়

কলাভবনের শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান দিক ছিল শান্তিনিকেতনের সমস্ত সভা, উৎসব এবং নাট্যানুষ্ঠানে অলংকরণের ভার নেওয়া। আশ্রমে বারো মাসে তেরো পার্বন লেগেই থাকত। নাটকও হতো অজস্র। প্রধানতঃ গুরুদেবের রচনাগুলি বেশী হলেও ভালো মানের, রুচিসম্মত যেকোন বাঙলা ( যার সংখ্যা অবশ্য আঙুলে গোনা ), সংস্কৃত এবং ইংরেজী নাটকই আশ্রমে অভিনীত হতো। মাস্টারমশাই অধিকাংশ প্রযোজনাতেই তাঁর ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীদের নিয়ে স্টেজ এবং পাত্রপাত্রীদের সাজানোর ব্যাপারে যুক্ত থাকতেন। কিঙ্করদাও একাধিক ক্ষেত্রে এই ভার নিয়েছেন এবং আশ্চর্য শিল্পকৃতিত্ব দেখিয়ে তা পালন করেছেন। মনে আছে 'ভূষণ্ডির মাঠে'র কী অপরূপ কল্পনাকুশল পটভূমিকা তিনি রচনা করেছিলেন, যেমন করেছিলেন 'হ-য-ব-র-ল'। 'অ্যানড্রোক্লেস অ্যাণ্ড দা লায়ন'-এর স্টেজও তিনি করে দিয়েছিলেন এবং নিতান্ত সামান্য উপকরণের সাহায্যে প্রাচীন রোমের আভাষ ফুটে উঠেছিল তাতে। গুরুদেবের নাটকে দৃশ্যসজ্জার ক্ষেত্রে কিঙ্করদার সবচেয়ে উজ্জ্বল সাফল্য দেখেছিলাম পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে মঞ্চস্থ নাটক 'মুক্তধারা'য়। আকাশকে বিদ্ধ করতে উদ্ধত মুক্তধারাকে বাঁধার যন্ত্রের প্রকাণ্ড অমানুষিক রূপ কালো পটভূমিকার ওপর হলদে, খয়েরী, নীল কিছু কাপড় জ্যামিতিক ধাঁচে সাজিয়ে তিনি ধরে দিয়েছিলেন এমন ভয়ঙ্করভাবে যে 'যন্ত্ররাজ বিভূতি'রও ঐ বিকট আকৃতির যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বুক গুরগুর করে উঠেছিল। এইসব স্টেজ সাজানোর দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়ার ফলেই তাঁর একবার অত্যন্ত দুঃখের অভিজ্ঞতা হয়। ১৯৫৮ সালে 'আন্তিগোনে' নাটকের শেষ মহড়ার দিন স্বাভাবিক সহৃদয়তায় পরিচালককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কিঙ্করদা। হলো হিতে বিপরীত। উক্ত পরিচালক মহোদয়, যিনি তখন শান্তিনিকেতনে অন্তত আরো একজন কর্মীকে প্রহার করে-ছিলেন এবং বর্বরতার অন্যান্য নানা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তিনিই লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করলেন কিঙ্করদাকে। বিশ্বভারতীর শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র আমিই এই শোচনীয় ঘটনার দর্শক ছিলাম। পরিচালকটির হাত থেকে কিঙ্করদাকে উদ্ধার করি আমিই। তারপরের ঘটনা আরো লজ্জাকর। শান্তিনিকেতনের আশ্রমের আদর্শের কথা বিস্মৃত হয়ে কয়েকটি ছাত্র তার শোধ তুলল অত্যন্ত গর্হিতভাবে ঐ পরিচালকের গায়ে হাত তুলে। সম্পূর্ণ সত্য কথার পরিবর্তে এক বাংলাকাগজে ছেপে বেরল কেবল কিঙ্করদার ওপর আক্রমণের বিবরণ আর তাঁর উপর আক্রমণের সাফাই গাইতে গিয়ে আরএক বিকৃত সংবাদ প্রকাশ করল একটি ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র।

তারপর ঐ পরিচালকের পক্ষ নিয়ে এক হাস্যকর উকিলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এক সাহিত্যিক, যিনি পরবর্তীকালে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রার্থী বাছাই-এর ব্যাপারেও অনুরূপ নীতিবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। এছাড়াও ঐ পরিচালকের সম্মান রাখতে অন্য এক সাহিত্যিক লিখলেন এক উপন্যাস। কিন্তু যিনি কিঙ্করদার অবমাননা করলেন তাঁর প্রতি কোন ধিক্কার তাঁদের কারো কাছ থেকেই শোনা গেল না। শারীরিক আঘাত থেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলেও মনে মনে অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন কিঙ্করদা। তিনি ভাবতেই পারেননি যে ঐ ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার সময়ও বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য তাঁর আঘাত সম্পর্কে সামান্য কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করবারও শিষ্টতা ভুলে যাবেন। সে যাই হোক, বাইরের প্রোপাগাণ্ডাকারীরা যাই করুন, সমস্ত শিক্ষকদের সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ দাবীতে উক্ত পরিচালককে ছ'মাসের বেতন দিয়ে বিশ্বভারতীর অধ্যাপনার কাজ রেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। কিঙ্করদার প্রতি সকলেই জানান সহানুভূতি।

কিঙ্করদা কিন্তু নাটক করতে সত্যিই ভালোবাসতেন, বিশেষতঃ ইংরেজী নাটক। 'ওথেলো' এবং 'ফেরোভিয়স'-এর বাচনভঙ্গী এবং ভাবভাব তিনি যেভাবে উক্ত চরিত্র দুটির অভিনেতাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তা অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় রাখে। তাঁর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'রক্তকরবী'। সেই অভিনয়ে বিশুর ভূমিকায় কিঙ্করদার গান এখনো কানে বাজে। 'কে তুই নেয়ে'—পঞ্চম থেকে চড়া 'সা' এবং কোমল 'নিখাদে' মীড়ের সাহায্যে আরোহন-অবতরন এমন হৃদয়গ্রাহীভাবে অথচ স্বরস্থান ঠিক রেখে তিনি যে গলায় আনতে পারবেন ভাবতেও পারিনি। এই পর্যন্ত লিখে মনে হল কিঙ্করদার সঙ্গে 'রক্তকরবী'র পাগল বিশুর কি কোন মিল ছিল ?

## শিক্ষক রামকিঙ্কর

.........................

### প্রভাস সেন

ইদানীং অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, শিক্ষক হিসাবে রামকিঙ্কর কেমন ছিলেন? এবং প্রতিবারই বিস্ময়ের সঙ্গে আমার মনে হয়েছে, কিঙ্করদা বিশেষ করে শিক্ষক হিসাবে কেমন ছিলেন কখনও তো তা ভেবে দেখিনি। ভাবতে বসে এখন যা মনে হচ্ছে তাহল কিঙ্করদা ভাল কি মন্দ শিক্ষক ছিলেন তা আমাদের ছাত্রাবস্থায় বা পরে ভেবে দেখবার প্রয়োজন হয়নি কখনও। এবং এও মনে হয়েছে যে তার কারণ বোধ হয় তখনকার কলাভবনের শিক্ষা পদ্ধতির ভেতরেই তা অনেকটা অস্বীকৃত ছিল।

কলাভবনের শিক্ষা পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সবাই ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বসে নিজেদের কাজকর্ম করতেন। ছাত্রছাত্রীরা দেখতেন কিভাবে তাঁরা একটি ছবি বা মূর্তি বা ডিজাইনের পরিকল্পনা করছেন বা কিভাবে কাজ করতে করতে তাঁদের শিল্পকর্মের নান্দনিক ও আঙ্গিকের সমস্যাগুলির মীমাংসা করছেন। যে শিল্প-ছাত্রের শিল্পদৃষ্টি আছে তাঁর কাছে এই দেখার চেয়ে বেশী শিক্ষাপ্রদ আর কি হতে পারে?

মাস্টারমশাই নন্দলাল থেকে শুরু করে বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর, গৌরিদি (ভঞ্জ), বিশুদা (বিশ্বরূপ বসু) এবং পেরুমল সবাই কলাভবনে নিজ নিজ কাজের জায়গায় বসে কাজ করতেন। আর আমাদের আমলে এই কজনাই ছিলেন কলাভবনের শিক্ষকমণ্ডলী*। বিনায়ক মাসোজীমশাইও কলাভবনে যোগ দিয়েছিলেন চল্লিশের দশকে ৬/৭ বছরের জন্য।

কিঙ্করদা কাজ করতেন 'মডেলিং ক্লাস' ঘরে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে। অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বিভিন্ন ব্লকে নিজেদের 'কাজের ঘর' ছিল ছাত্রদের কাজের জায়গাগুলির পাশেই। মাস্টারমশাই-এর কাজ করবার ঘরটি ছিল যে বাড়ীতে—তাতে ছিল সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ করবার ৬/৭টি ঘর। সবই সমান মাপের। ছাত্র-ছাত্রীরা যেকোনও সময় সেখানে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজ দেখতে পারতেন বা তাঁদের সঙ্গে নিজেদের কাজের সমস্যাগুলি নিয়ে নির্দ্বিধায় আলাপ-আলোচনা করতে পারতেন।

* ১৯৩৭—৪২ পর্যন্ত কলাভবনের ছাত্র ছিলেন এই প্রবন্ধের লেখক। সঃ

ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে এমন একটি হার্দিক সম্পর্ক ছিল যাকে একেবারেই পারিবারিক সম্পর্কের পর্যায়ে ধরা যায়।

যেকোনও বিদ্যায়তন বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার মান শুধুমাত্র শিক্ষকদের বা অধ্যাপকদের ক্লাস লেকচারের মানের উপর নির্ভর করে উন্নত করা যায়না। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের ভেতর এবং সিনিয়র ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গে গভীর বুদ্ধিগত লেনদেন, শিক্ষক বা অধ্যাপকদের ক্লাসের বাইরে ছাত্রদের সঙ্গে গভীর সংযোগ ও তাঁদের সম্ভাব্য প্রতিভার উন্মেষের জন্য উপযুক্ত উৎসাহ দান ইত্যাদির সমবেত পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত শিক্ষার বাতাবরণ তৈরী হয়।

আমাদের সময়ে কলাভবনে এইরকম একটি বাতাবরণ উপস্থিত ছিল। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী যথাসম্ভব স্ফুরণও সম্ভব হয়েছিল।

মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু ছিলেন কলাভবনের কর্ণধার। তাঁর সহকর্মীরা সবাই তাঁরই ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন। এঁরা কেউই নিজেদের মাস্টার মনে করতেন না। মোটামুটি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সবারই রিসার্চ স্কলারের মতো। আর আমরা ছাত্ররা যেন ছিলাম রিসার্চ এ্যাসিস্টেণ্ট।

চিত্র-ভাস্কর্যের নানাদিক নিয়ে চলতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাঁর যাঁর নিজের ধরনে। মাস্টারমশাই আর তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী—এই তিনজনের কাজ ছিল সম্পূর্ণ তিনধরনের। আবার সবার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও তখন ছবি আঁকছেন—যেগুলি আবার এঁদের সবার চেয়ে আর একরকম। অথচ সবাই সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দুনিয়ার শিল্প আন্দোলন, আমাদের দেশের শিল্পের ভবিষ্যৎ রূপ, শিল্পের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, শিল্পশিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে খুব আলোচনা, তর্ক-বিতর্কও চলেছে আর আমরা, সেই রিসার্চ এ্যাসিস্টেণ্টরাও অনেকে তাতে মহাউৎসাহে যোগ দিচ্ছি। মাঝে মাঝে এসব নিয়ে গভীর মতভেদও দেখেছি। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের প্রতি বা গুরুদেবের শিল্পীসত্তা সম্বন্ধে তিনজনের কাউকেই সে সময় বা পরেও কখনও শ্রদ্ধা হারাতে দেখিনি।

এইসব তর্ক বিতর্কের ভিতরেই বিনোদবিহারী বলছেন—'মাস্টারমশাই-এর স্বর্ণকুম্ভ দেখেছ? এ শতাব্দীতে ভারতের মাস্টারপিস।' মাস্টারমশাই বলছেন—'বিনোদ ল্যাণ্ডস্কেপ নিয়ে অসাধারণ সৃষ্টিশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে।' কিঙ্করদার নতুন ধরনের কাজ, সাঁওতাল পরিবার, সম্বন্ধে তদানীন্তন কিছু কলেজ অধ্যাপকদের বিরূপ মন্তব্য বা অনুযোগের উত্তরে বলছেন, 'ওর শিল্পে সিদ্ধাই লাভ হয়ে গেছে। যা করে ভাল শিল্পই হয় তাই আমি উৎসাহ দিই।' পুরনো নন্দনগৃহে হ্যাভেল হল, বর্তমান গ্রাফিক স্টুডিও, উদ্বোধনের পরদিন হ্যাভেল সাহেবের মস্ত মস্ত অয়েল পেণ্টিং-এর মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট ছবি টাঙিয়ে দিয়ে আমাদের হতবাক করে নন্দলাল বুঝিয়েছিলেন ছবির নান্দনিক গুণ কাকে বলে।

কিঙ্করদা নিজে কাজ করেছেন 'মডেলিং ক্লাসে' তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে। ছাত্ররা

দেখেছে তাঁর কাজ করবার ধরনধারন, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চোখের উপর। দেখেছে বহুদিনে বহু পরিশ্রমে গড়া মূর্তি—যা অন্যদের মনে হয়েছে অপরূপ—নির্দয়ভাবে ভেঙে ফেলে দিতে। এতো সুন্দর কাজ কেন ভেঙে ফেলছেন—প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—'সুন্দরতো চাইনি।'

তারপর হয়তো দু'ঘণ্টা ধরে সেই 'অধরা' ব্যাপারটি নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে বসে আলোচনা করেছেন শিল্পী রামকিঙ্কর।

মডেলিং ক্লাসে একটি মানুষের কঙ্কাল ছিল। কিঙ্করদার সব ছাত্রকেই একবার সেই কঙ্কালটিকে নেড়েচেড়ে দেখতে হতো। সেই কঙ্কালের উপর কিভাবে পেশীর প্রলেপে ধীরে ধীরে মানুষের দেহটি গড়ে ওঠে হাতেকলমে সেটি বুঝতে হতো। তখন মডেল থেকে ড্রইং-এর প্রথা কলাভবনে না থাকলেও ভাস্কর্যের ছাত্রদের জন্য মানুষের শরীর নানাদিক থেকে ও নানা ভঙ্গীমায় ড্রইং করে ও পারতপক্ষে মডেল করে দেখা কিঙ্করদা অপরিহার্য মনে করতেন। ছাত্রদের বলতেন, 'ভাস্কর্যের প্রধান অবলম্বন মানুষের শরীর। এ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকলে তারপর শিল্পী নান্দনিক প্রয়োজনে তাঁর শিল্পকর্মে যত ভাঙাচোরাই করুক না কেন—এই জ্ঞান তার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকবে। তাছাড়া মানুষের শরীরের স্টাডি চোখকে যেকোনও জিনিষ বিষদভাবে দেখতে শেখাবে আর হাতকে করবে সংবেদনশীল।'

কিঙ্করদা ভাস্কর্যের ছাত্রদের সবসময় বলতেন মূর্তি যেন পুতুল না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে। যদি কখনও কারুর কাজে হাত দিতেন তবে সেটা ঘটতো শুধু ঐ এক ক্ষেত্রেই—অর্থাৎ যদি কোন ছাত্র মূর্তিকে পুতুল পর্যায় থেকে না তুলতে পারতো। কোথায় সে মূর্তি পুতুলে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সেটা দেখিয়ে দিয়ে মূর্তিটি ভেঙে আবার করতে বলতেন। অন্য কোনরকম ভুলের জন্য কখনও তাঁকে ছাত্রদের কাজে হাত দিতে দেখিনি। কাজটি শেষ হবার আগে বা পরে যখন ছাত্র এসে তাঁর মতামত জানতে চাইতো তখন তিনি তাঁর কাজটি নিয়ে আলোচনা করতেন সেই ছাত্রের নিজস্ব ক্ষমতার পরিধির ভেতর। শিল্প সম্বন্ধে নিজের অনুভবের বিষয়েও নানা পরিস্থিতিতে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতেন।

কিঙ্করদা খুব ভাল চিত্রকরও ছিলেন এবং জলরঙের কাজ করতেন অসাধারণ। ছাত্রদের সবসময় জলরঙে স্কেচ করতে বলতেন। বলতেন, 'মূর্তিতে রস আনতে হলে প্রকৃতির রূপ-রঙকে হাতে কলমে জানা দরকার।'

# রামকিঙ্করের শেষ পর্যায়ের কিছু ছবি

রবি পাল

### শান্তিনিকেতনের সমকালীন শিল্পচর্চা ও নন্দলাল

বহুল বৈচিত্রময় সংস্কৃতি নিয়ে গড়া এই মহান ভারতবর্ষ। কি জাতিতে, কি ভাষায়, কি বেশভূষায়, কি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে। স্মরণকালে ভারতীয় সাংস্কৃতিক চেতনা গঠনে যেসব মনীষীর অবদান স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নাম অগ্রগণ্য। আধ্যাত্মবাদী ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এতই প্রাচীন ও শক্তিশালী যে বিদেশের ঐতিহ্যের দিকে বিশেষ তাকাবার প্রয়োজন নেই। তবুও স্বীকার করতেই হবে যে পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যেসব জাগরণের জোয়ার এসেছিল তাও কোন অংশে কম বা উপেক্ষা করার নয়।

প্রকৃতির অমোঘ খেয়ালে হিমালয় থেকে উৎসারিত জলধারা গঙ্গোত্রী হতে সমতলে বয়ে এসে তিনভাগে সলিলতীর্থ ত্রিবেণী সঙ্গমে এসে মিলিত হয়েছে। সেইরকম কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইশারায় রবীন্দ্রনাথকে সাংস্কৃতিক প্রেরণার পীঠস্থল ক'রে শান্তিনিকেতনের শিল্পসঙ্গমে নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর মিলিত হয়েছিলেন। বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর চর্চিত দুই ধারা নন্দলালের চর্চিত মূলধারার সঙ্গে কিছুকাল মিশে থাকলেও পরবর্তীকালে মুক্ত ত্রিবেণীর মতো আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনটি পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়ে সংস্কৃতির অনন্ত সাগরে গিয়ে মিশে গেছে।

শান্তিনিকেতনে সমকালীন শিল্পের গতি প্রকৃতি বা চর্চার কথা আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই সেই পটভূমিতে মূলধারা নন্দলালের অবদানের কথা এসে পড়বে। প্রথমে মূলধারা নন্দলালের শিল্পচিন্তা ও শিল্পভাবনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। ইংরাজী ১৯১৯ সালে নবজাত কলাভবনের প্রধানরূপে ১৯২২ সালে যোগদান করার পর তিনি যে স্বাধীনভাবে শিল্পশিক্ষার নতুন ভাবনাচিন্তা রূপায়নের অবাধ সুযোগ পেয়েছিলেন তা তৎকালের গুটিকয়েক ছাত্রকে নিয়ে কাজে লাগিয়েছিলেন। বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বের ছাত্র। নন্দলাল জীবনে বহু জিনিস দেখেছিলেন, বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ছবিতে যেমন গ্রীক, মিশরীয়, বাইজানটাইন, গথিক প্রভৃতি শিল্পশৈলীর সূক্ষ্ম প্রভাব দেখতে পাই তেমনি আর একদিকে চীন জাপানের করণকৌশল, বিষয় নির্বাচনের গোপন রহস্য খুব ভালভাবে আয়ত্ব করেছিলেন। আমার মনে হয় চীন বা

জাপানের দক্ষ শিল্পীদের মতো একই আঙ্গিক নিয়ে সারাজীবন যদি কাজ করতেন তাহলে সেইসব মহান শিল্পীদের সমকক্ষ হতে পারতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতীয় ভিত্তিচিত্র অনুশীলন করার পর নন্দলালের শিল্পভাবনার পালে হাওয়া লেগে বাঁক নিতে আরম্ভ করে। ভিত্তিচিত্রের আঙ্গিকগত ধারা ও দৃশ্যগত (composition) ধারার কিছু অংশকে আদর্শ করে এক নতুন আঙ্গিক কলাভবনের শিল্পঅঙ্গনে প্রবর্তন করেন। ছবি বিচার করতে গেলে একদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও আমাদের দর্শনকে মনে রেখে বিচার করতে হবে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি তাঁর রচনা দেখি এবং গভীর মনোনিবেশ করি তাহলে দেখবো, যে সময়ে পৌরাণিক বিষয় নিয়ে ছবি করেছেন সেইসময়ে তাঁর ভূমিকা খানিকটা কথকথা বলিয়ের মতো। আবার নৈসর্গিক চিত্রকর রূপে যখন দেখবো তখন তিনি সম্পূর্ণ একক এবং অনন্য। প্রকৃতিকে এমন নিবিড়ভাবে দেখেছেন, তার সঙ্গে এমন মিতালী করেছেন যে ভারতীয় শিল্পজগতে তাঁর তুলনা মেলা ভার। এক কথায় তাঁকে আমরা সার্থক প্রকৃতিবাদী শিল্পী বলতে পারি। শিল্পআঙ্গিকে তাঁর যে পরিবর্তন হয়েছিল সে কথা ইংরাজী ১৯৪৭ সালের ৫ই মে তৎকালীন ছাত্র কানাই সামন্তকে কথোপোকথনকালে বলেছিলেন—'২১—২২ বছর এখানে আছি, এর মধ্যে আমাদের ছবি আঁকার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন আগেকার পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে পারিনে, চাইনে—নিতান্ত দরকার পড়লেই কখনো আঁকি।' এই আঙ্গিকের পরিবর্তন মূলতঃ কলাভবনের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য করেছিলেন বলে মনে হয়। তিনি ছাত্রছাত্রীদেরকে বলতেন—'তোমাদের মনে দোল খাওয়া ছন্দ তোমাদের মতো হবে। আর আমার ছন্দ হবে আমার মতো। নইলে মজা নেই। এইতো ছবি, এই কবিতা।' তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোন ছাত্রের ছবি শিক্ষকমশাই আমূল সংস্কার করে দিলেই ছাত্রের শিক্ষা হবে না। তার পরিবর্তে তিনি ছাত্রের আঁকা ছবি যথাযথ রেখে সংযোজনের পক্ষপাতী ছিলেন। নন্দলালের এই বিশ্বাসের ছায়ায় বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্করের শিল্প মানসিকতা বড় হয়েছিল।

### দুটি ভিন্ন স্রোত : বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর

প্রথমে বলেছি যে মূলধারা নন্দলালকে কেন্দ্র করে বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর এই দুটি শাখা বেরিয়ে এসেছিল। প্রথমে বিনোদবিহারীর কথায় আসা যাক। বিনোদবিহারী প্রথম জীবনে ভারতের গুরু পরম্পরা বা প্রথাগত আঙ্গিকে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই ধারণা নিয়ে বহু ছবি এঁকেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ 'ঠাকুমার গল্প বলা' ( কলাভবন সংগ্রহের নথিভুক্তি নং Exp—89 ) 'পলাশগাছের নীচে ছাগল' (-সংগ্রহ কৃষ্ণ কৃপালনী ) প্রভৃতি বলা যেতে পারে। কিন্তু পথের সৌন্দর্য যদি পথিকের মনে দাগ কাটতে না পারে তাহলে সেইরকম পথ চলায় লাভ কি ?

তাই লাওৎস-এর বাণী স্মরণ করে যে পথে চললে নিজের সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটবে সেই পথে চলার চেষ্টা করেছেন বাকী জীবন।

তিনি প্রকৃতির গাছপালা, পশু-পাখী, মানুষ-জন এবং সকলের বিশেষ চারিত্রিক গঠন বিশেষভাবে দেখেছেন ও বিশেষভাবে মনোনিবেশ করার পর একটা আদর্শ গঠন ও সৃষ্টি করেছেন। আবেগের ঢেউ এসে মনের তীরে আছড়ে পড়েছে ঠিকই কিন্তু স্থিতধীর হয়ে, নিজেকে ঠিক রেখে, বহু বিচারবিশ্লেষণ করে নিজের আবেগের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রকাশ করেছেন। এখানে তিনি নন্দলাল বা রামকিঙ্কর থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যতা বেশী লক্ষ্য করা যায় ইংরাজী ১৯৩৭-৩৮ সালে জাপান থেকে ফেরার পর। এই পর্ব থেকে তিনি বস্তুবিশেষের গাঠনিক আকৃতি নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তবে রঙ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নন্দলালের মতো তিন-চারটি রঙের মধ্যে নিজের মনের প্রকাশকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। জাপান থেকে ফেরার অব্যবহিত বছরগুলিতে কলাভবন ছাত্রাবাসের দেওয়ালে ভিজে পদ্ধতিতে (Fresco) দেওয়ালচিত্র আঁকার কাজে মন দিয়েছিলেন এবং এই কাজগুলির মধ্যে তাঁর স্বকীয়তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই স্বকীয়তা গড়ে ওঠার মূলে নন্দলালের অবদান যে অনেকখানি সেকথা তিনি স্বীকার করে চিত্রকর প্রবন্ধে বলেছেন—'পাঠক্রমরূপ কাঁচি দিয়ে নন্দলাল গাছের ডালপালা কেটে, সব গাছকে এক ঢঙে সাজিয়ে তোলবার চেষ্টা করেননি।'

বিনোদবিহারীর মানসিক পরিস্ফুটনে নন্দলালের মতো গল্প বলিয়ে এবং নৈসর্গিক চিত্রকরের মতো দুটি গুণের আভাষ পাই। বিনোদবিহারী—নন্দলাল ও রামকিঙ্করের তুলনায় অধ্যয়নে পটু ছিলেন বেশী এবং তার ফলে আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে পাশ্চাত্য শিল্পজগতের শিল্পপটভূমিতে কি পরিবর্তন হচ্ছে, ইম্প্রেসনিজম্ বা পোস্ট-ইম্প্রেসনিজমের আসল তত্ত্ব কি সে সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। এবং সেই আলোকের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প নিয়ে কি ধরনের ভাবনা-চিন্তা বা প্রয়োগ হচ্ছে সে বিষয়েও সচেতন ছিলেন। তাঁর এই সচেতনতা আমরা বেশী করে লক্ষ্য করি 'বাগানের মধ্যে' ছবিটির মধ্যে। এখানে তিনি প্রাকৃতিক গঠনের কাঠামোরীতির (structural low of natural form) সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। আমাদের ঐতিহ্যময় লোকশিল্পের আদলে মেয়েদুটি, গাছ ও ঘরবাড়ীর গঠন বৈশিষ্ট্য অনুধাবনযোগ্য। রচনায় (composition) ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বস্তুর অকৃত্রিম রূপটি তুলে ধরেছেন। লোকশিল্পের জোরালো রেখা ও জাপানিজ বা চাইনিজ ক্যালিগ্রাফিক-রৈখিক গুণের সমন্বয় দেখতে পাই। শান্তিনিকেতনে চর্চিত শিল্পধারার মধ্যে প্রথম বিনোদবিহারী তাঁর রচনার ভিতর গঠনের বা রঙের ভারসাম্য বজায় রাখার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। তাঁর রচনায় দেখানো এক বস্তুর সঙ্গে অন্য এক বস্তুর এমন কর্ষশক্তি (Tension) লক্ষ্য করা যায় যে রচনা (Composition) থেকে কোন বস্তু বাদ দিলে ছবিটিকে অসম্পূর্ণ মনে হবে। এই

অপূর্ব বাঁধুনির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হচ্ছে ভিজে পদ্ধতিতে করা দেওয়ালচিত্র (Fresco)। এখানে বিনোদবিহারী তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের জ্ঞান উজাড় করে দিয়ে ভারতের সব ধর্মের আধ্যাত্মবাদের চিরন্তন সত্যরূপটি তুলে ধরেছেন, কি তত্ত্বগত দিকে, কি আঙ্গিকগত দিকে। এই রচনার মধ্যে তাঁর ব্যাকরণ জ্ঞান প্রতিটি দৃশ্যে দেখতে পাই কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শিল্প-ব্যাকরণের তত্ত্বপরীক্ষার প্রয়োগ করতে গিয়ে বিরাট সৃষ্টিকে কঠিন বা রসহীন করেননি। বরং বিনোদবিহারীর অন্যান্য দেওয়াল চিত্রের চেয়ে এ অধিক রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এক কথায় এই বিশাল ভিত্তিচিত্রে একলহমায় আমরা ভারতের মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মবাদের গতিময়তা ও ধৈর্য একই সঙ্গে দেখতে পাই। বিনোদবিহারী এই সার্থকতার মাঝে বহুকাল বেঁচে থাকবেন বলে আমার বিশ্বাস।

**আসুন একটা বড় কিছু করা যাক**

এবার রামকিঙ্করের কথায় আসা যাক। রামকিঙ্করও আপন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য ভিন্ন পথে চলার চেষ্টা করছিলেন। প্রথম দিকে রামকিঙ্কব অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল প্রবর্তিত আঙ্গিকে শিল্পচর্চা করে চরম সাফল্য লাভ করে-ছিলেন। আঙ্গিকগত মুন্সীয়ানার নমুনা হিসাবে 'তিনবোন' ছবিটির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে রামকিঙ্কর তাঁর পুরানো মূল্যবোধকে কোন অংশে অবজ্ঞা না করে নতুন কিছু একটা করতে চাইছিলেন। কেননা তৎকালীন কলাভবনে শিল্পসৃষ্টির পরিমণ্ডলে কেমন যেন একঘেয়েমী এসে-গিয়েছিল। রামকিঙ্করই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি নতুনের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে হাঁক পেড়েছিলেন। রামকিঙ্কর বিনোদবিহারীকে বলেছিলেন— 'আসুন একটা বড় কাজে হাত দেওয়া যাক।' একথা বিনোদবিহাবী অকপটে তাঁর চিত্রকর প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন। ফলশ্রুতি হিসাবে বিনোদবিহারীর কাছ থেকে পেয়েছি কলাভবন ছাত্রাবাসেব দেওয়ালে একগুচ্ছ দেওয়ালচিত্র এবং রামকিঙ্করের কাছ থেকে পেয়েছি 'সোমা যোশী', 'বাণী' প্রভৃতি তৈলচিত্র ও 'সুজাতা', 'সাঁওতাল পরিবার' প্রভৃতি অসাধারণ ভাস্কর্য।

রামকিঙ্করের মানসিক আবেগ নন্দলাল বা বিনোদবিহারীর তুলনায় একটু বেশী বা ভিন্নরকম মনে করি। রামকিঙ্করের ক্ষেত্রে এর কারণ হিসাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপট অনেকাংশে দায়ী। রামকিঙ্কর যত তাড়াতাড়ি অতি সাধারণজনের মনের দুয়ারে প্রবেশ করতে পারতেন এবং যতখানি তাদের সুখ-দুঃখকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারতেন ততখানি নন্দলাল বা বিনোদবিহারী অনুভব করেছেন বলে মনে হয়না বা করলেও এত গভীরভাবে নয়। রামকিঙ্করের প্রথম জীবনের কিছু রোমাণ্টিক রচনা বাদ দিলে সামগ্রিক রচনার মধ্যে সমাজের ব্রাত্যজনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ও ঘামের গন্ধে ভরপুর। নন্দলাল ও

বিনোদবিহারীর তুলনায় রামকিঙ্করের সৃষ্টির মধ্যে তাৎক্ষণিকভাব (Immediacy) বেশী আছে বলে আমার মনে হয়। এর মূল খুঁজতে গেলে রামকিঙ্করের সেই অতি স্পর্শকাতরতা (Sensitiveness) সবসময় কাজ করেছে। যে জায়গাতেই তিনি গেছেন সেখানের সবকিছু বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন।

একবার রামকিঙ্করকে তাঁর চিন্তাগত, আঙ্গিকগত পরিবর্তনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তার উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তাহল—'দেখ ভাই, আমি বিনোদ-বাবুব মতো পড়ুয়া লোক নই, অত লেখা-পড়াও করিনি। বিনোদবাবু বিদেশী শিল্পতত্ত্বের বই পড়ে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা, তাঁরা কি করতে চাইছে তার সারমর্ম আমাকে বোঝাতো, পড়ে শোনাতো, আবার মাস্টারমশাই, বিনোদবাবু এবং আমার মধ্যে তর্কাতর্কিও হত। এইসব রীতি ও আঙ্গিকের কথা শোনা ও মন দিয়ে তাঁদের কাজের ছবি দেখার পর নিজেকেই প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম মনে করে ছবি এঁকেছি।'

একথা ঠিক যে রামকিঙ্কর যে কিউবিজম করেছেন তা ইউরোপীয় ঘেঁষা কিউবিজম নয়। রামকিঙ্কর মূলতঃ মানসিক ভাব প্রকাশের জন্য কিউবিজম আঙ্গিককে কাজে লাগিয়েছেন। জার্মানীতে প্রথম দিকে এই একই রীতিতে কিউবিজমকে কাজে লাগিয়েছিল। মানসিক ভাব প্রকাশের জন্য কিউবিজমকে যে কয়েকটি ছবিতে প্রয়োগ করেছেন তার মধ্যে Autumn, Spring, Festive eye ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্য্যের মধ্যে Coolle Mother, Famine-এর নাম করা যেতে পারে। রামকিঙ্করের কিউবিজম সম্পূর্ণ ভারতীয় কিউবিজম বলতে পারি। তাঁর দেখা অন্তরঙ্গ পারিপার্শ্বিককে শুধু কিউবিজমরূপ হাতিয়ার দিয়ে ভেঙেছেন মাত্র।

শান্তিনিকেতনের সীমিত শিল্প পরিমণ্ডলে প্রকৃতি থেকে সরাসরি ছবি করার রেওয়াজ ছিল না। বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্করই জলরঙ দিয়ে প্রকৃতির মাঝে গিয়ে সরাসরি ছবি আঁকার পথ দেখিয়েছেন। তবে দুজনেই হুবহু প্রকৃতিকে নকল না করে তার সাথে নিজের অনুভূতি মিশিয়ে দিয়েছেন। বিনোদবিহারী ও রাম-কিঙ্করের জলরঙের ধারা সম্পূর্ণ পৃথক। রামকিঙ্করের জলরঙের ছবির মধ্যে ইম্প্রেসনইজম বা পোষ্ট-ইম্প্রেসনইজম শিল্পীদের প্রভাব যেমন একাধারে দেখতে পাই তেমনি প্রাচ্যের ক্যালিগ্রাফিক রেখার গুণেরও সংমিশ্রন ঘটেছে। এই আঙ্গিকে রামকিঙ্কর যেন অনেক বেশী সাবলীল, অনেক বেশী সংবেদনশীল। এখনও পর্য্যন্ত রামকিঙ্করের প্রবর্তিত এই রীতিতে কেউ কাজ করছেন কিনা জানা নেই। এই আঙ্গিকের আরও ব্যাপক চর্চা হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। রামকিঙ্করের সব রচনা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো তিনিও নন্দলাল এবং বিনোদবিহারীর মতো প্রাকৃতিক গঠনের কাঠামোসংক্রান্তবিধিসম্মত (Structural law of natural from) উপায় নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি ছবিতে বা মূর্তিতে খাঁজ বা পেঁচানো কোন বস্তুর আকৃতি ব্যবহার করেছেন। ইংরাজী ১৯৬২ সালে সৃষ্ট 'কাক ও

কোকিল' ভাস্কর্যে ব্যাঙের ছাতার গঠন ও ১৯৬৩ সালে সৃষ্ট 'ঝর্ণা' ভাস্কর্যে ব্যবহৃত পদ্মডাঁটায় বেষ্টিত লতা লক্ষণীয়। যাইহোক না কেন রামকিংকর পূর্ববর্তী দুই ধারা থেকে একটু বিপরীত মুখী হয়ে নাটুকে ঢেউ তুলে পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

**রামকিঙ্করের শিল্পচিন্তা : কয়েকটি প্রসঙ্গ**

রামকিঙ্করের ব্যক্তিগত জীবন ও শিল্পী জীবন নানান সংঘাতময় ঘটনায় একদিকে যেমন পরিপূর্ণ তেমনি অন্যদিকেও বৈচিত্রে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। এই বৈচিত্রময় স্বাদ আমরা আস্বাদন করি তাঁর বাল্যকালের কর্মকাণ্ডের শুরু থেকেই। দেবদেবীর চিত্ররচনা, মাটি দিয়ে লৌকিক মূর্তি বা পুতুল বা থিয়েটারের পশ্চাৎপট দৃশ্য আঁকার মধ্য দিয়ে কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু সে বিস্তার-বৈচিত্রের মধ্যে ছিল খানিকটা বালকসুলভ চাপল্য ও সারল্য। কিন্তু তাই বলে আবেগ ও উপস্থাপনা কোন অংশে কোথাও ব্যাহত হয়নি বলে আমার ধারণা। আর তার প্রমাণ কোন মূর্তি বা পুতুলেব মধ্যে না পেলেও থিয়েটারের পশ্চাৎপট দৃশ্যে ও উদ্ধারপ্রাপ্ত কয়েকটি তৈলচিত্রের মধ্যে দেখতে পাবো। এসবই কিন্তু একমুখী আবেগ উৎসারিত রূপ ও অশিক্ষিত-পটুত্ব। পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে শান্তিনিকেতন রামকিংকরের মনে লালিত আবেগ ও নানা আঙ্গিকে পটুত্ব অর্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ালো।

অতি তুচ্ছ ঘটনা রামকিংকরের অতি স্পর্শকাতর দরাজ মনকে ব্যথিত, উল্লসিত বা উদ্বেলিত করত। প্রাত্যহিক জীবনের প্রবহমান আনন্দ-বেদনা বা উল্লাস রামকিংকরের মতো প্রকৃত শিল্পীমনকে অভিভূত করতে পারেনি। কখনও বা কোন ঘটনা চাক্ষুষ ঘটতে দেখে উদ্দীপ্ত অনুভূতির মধ্য দিয়ে নিজেকেই রোমান্থন করে সর্বসাধারণের মাঝে উজাড় ক'রে ব্যক্ত করেছেন।

শিল্প রসিকজন বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন যে রামকিঙ্কর ছাত্রজীবনে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের একান্ত স্নেহভাজন হয়ে উভয়ের প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ ক'রে ছবি আঁকায় শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং সফল উত্তরসূরীর মতো রোমান্টিক, পৌরাণিক, লৌকিক বিষয়ভিত্তিক ছবির সার্বিক পরিবেশ রচনায় যে চরম সার্থকতা লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রায় এক দশকের কিছু কম কালসীমা পর্যন্ত তাঁর ছবির জগতে ঐসব পৌরাণিক, রোমান্টিক, লৌকিককাহিনীর কুশীলবরা ঠাঁই পেয়েছিল। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর আপন পথ খুঁজে নিয়ে অতি সাধারণজন, বিশেষ ক'রে আদিবাসী সাঁওতালদের জীবনযাত্রা ও কৃষ্টিগত বহুমুখীধারায় আকৃষ্ট ও একাত্ম হয়ে ছবি আঁকা শুরু করেন এবং সেই চর্চা আমৃত্যু চালিয়ে গেছেন। পিছন ফিরে আর তাকিয়ে দেখেননি। এই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল যে—'এই একটি সাধনাই

ঠিক মতো করতে পারলে কি সাধারণ, কি অসাধারণ, পৌরাণিক বা লৌকিক বিষয়বস্তু মিলেমিশে একাকার হ'য়ে যাবে, অসীম আনন্দে ভেসে যাবে।'

আধুনিক সমাজ দর্পণে প্রতিবিম্বিত বহু বিষয় নিয়ে যেসব শিল্প সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে সে বিষয়ে রামকিঙ্করের মতামত জানতে চেয়ে একবার প্রশ্ন করেছিলাম—আপনি কি মনে করেন পৌরাণিক বিষয়বস্তু ও প্রথাগত শিল্পানুশীলনের ( Academic Study ) প্রয়োজন আছে ? উত্তরে বলেছিলেন—'নিশ্চয়ই দরকার আছে। আমাদের রামায়ণ, মহাভারতের কথা না জানলে ভারতাত্মার নিগূঢ় শাশ্বতবাণী জানতে পারবেনা। আমিও শিক্ষার শুরুতে 'সীতা ও লবকুশ' 'নল-দময়ন্তী', 'রাধাকৃষ্ণ' প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় ও ভাব নিয়ে প্রথাগত পদ্ধতিতে ( Academic Study ) ছবি এঁকেছি।'

এই বক্তব্যের আলোকে আমাদের কাছে এই ধারণা সুস্পষ্ট হয় যে এই মূল্যবোধ নিয়ে রামকিঙ্করের শিল্পচেতনার শিকড় গভীরে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করেছিল। যদিও সৃষ্টির ক্রমপর্যায়ে তিনি কখনওবা সনাতন ও প্রাচ্যভাবের রূপকার, আবার কখনওবা আধুনিক শিল্প সৃষ্টি করে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি চিত্র ও ভাস্কর্যের ভাষা দিয়ে সমাজের ও দেশের চরম অবক্ষয়ের প্রতি জাতিকে সচেতন করতে চেয়ে সোচ্চার হয়েছেন। মুখের ভাষা যেখানে সহজে প্রবেশ করে না সেখানে চিত্রের ভাষা অতি সহজে প্রবেশ করিয়েছেন। চিত্রভাষা যে কত শক্তিশালী সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী ১৯২০ সালে ভারতপ্রবাসী রুশী-শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখকে লিখেছিলেন—'শব্দ কেবল সত্যের একটি বিশেষদিকই প্রকাশ করতে পারে, যেখানে শব্দবাহিত ভাষা প্রবেশ পায়না, চিত্রের ভাষা সেই বিশেষ সত্যে যেতে পারে।'

### রামকিঙ্করের শেষ কয়েকটি বছর . শেষ কয়েকটি ছবি

রামকিঙ্করের শেষ জীবনে আঁকা ছবিগুলি আমাদের সেই বিশেষ সত্যে পৌঁছে দেবে তা সামাজিকভাবেই হোক আর রাজনৈতিকভাবেই হোক। প্রথম জীবনে কিছু রাজনৈতিক পোস্টার আঁকা বাদ দিলে রামকিঙ্কর মোটামুটিভাবে ত্রিশ দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত নিজেকে রাজনৈতিক ভাবনায় সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। এছাড়া সামাজিক দুঃখ-সুখের ভাবনা তো তাঁর চিরসঙ্গী হিসাবে জন্ম থেকে লালিত হতে শুনেছি।

রামকিঙ্কর জীবনের শেষ চার-পাঁচ বছরে যেসব ছবি রচনা করেছেন তার সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। যে মহাশিল্পী জীবনের বেশ কিছুটা সময় চিত্র ও ভাস্কর্যের মধ্যে ইজম্ বা মতবাদ নিয়ে কাজ করলেন, সেই শিল্পী অভিজ্ঞতার প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে কয়েকটি আঁচড় বা কয়েকটি রেখার ভাষায় কি বললেন—তা বিস্তৃতভাবে জানতে পারলে আমাদের মনের জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হবে।

আলোচনার প্রথমে ধরা যাক অন্নপূর্ণা চিত্রমালার কথা। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে চিত্রমালা রচনার সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারি। ভারতের আপামর জনসাধারণ চুলচেরা ধর্মীয় বিচার না জেনেও জানে যে অন্নপূর্ণা খাদ্যদ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কাজেই চিত্রমালার সব ছবিগুলিকে দৃষ্টিগোচরে নিয়ে এলেই সব চিন্তনের উত্তর এক লহমাতেই পেতে পারি।

এবার ছবিগুলি রচনা করার সময় ও পরিবেশের দিকে তাকানো যাক। নবান্ন উৎসব রাঢ়বঙ্গের একটি বিশেষ লৌকিক উৎসব। বিশেষ ক'রে বীরভূম অঞ্চলে। এই উৎসব পাঁজি-পুঁথির বিশেষ চিহ্নিত তিনদিনে অনুষ্ঠিত না হয়ে অগ্রহায়ণ মাসের যেকোন শুভদিনে অনুষ্ঠিত হ'তে পারে। ছবিগুলি আঁকার পূর্ববর্তী বছরগুলিতে পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের অন্য কিছু রাজ্যেও যখন খরার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল ঠিক তখনই রাজনৈতিক ঝড়, জরুরীঅবস্থা সারাভারত জুড়ে বয়ে গিয়েছিল। খরার দাপটের ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ সাময়িকভাবে খাবারের জন্য হাহাকার ক'রে বেরিয়েছিল দুয়ারে দুয়ারে। রামকিঙ্কর ছবিগুলি রচনা করার আগে হয়তো মনে মনে ভেবেছিলেন ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত উক্তি—'অন্নপূর্ণা যাঁর ঘরে সে কাঁদে অন্নের তরে এ বড় মায়ার পরমাদ।' মনে-পোষিত এমনি এক অবস্থায় অন্নপূর্ণা পূজার দিনে শান্তিনিকেতন থেকে কয়েক মাইল দূরের এক গ্রামে নিমন্ত্রিত হয়ে জনৈক চাষীভক্তের ( মানুষ হিসাবে রামকিঙ্করের ভক্ত ) বাড়ী গিয়েছিলেন। সঙ্গীহিসাবে আমিও ছিলাম। প্রথমে পূজামণ্ডপে গিয়েই দেখলেন কতকগুলো অর্ধ উলঙ্গ-উলঙ্গ ছেলে ভাঙা-চোরা এ্যালুমিনিয়ামের থালা বাটি হাতে আনন্দে লম্ফ-ঝম্প করছে সম্ভবতঃ প্রসাদের আশায়। স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন—'চল ওই পুকুরপাড়টায় গিয়ে বসি।' একটা সিগারেট মুখে ধরিয়ে অনেকক্ষণ কি জানি ভাবলেন, তারপর নিত্যসঙ্গী সাইডব্যাগের ভিতর থেকে পেনসিল, স্কেচ্পেন, কিছু শুক্নো জমানো জলরঙের টুক্রো বের করলেন ও ফেল্টপেন দিয়ে ড্রইংটা সেরে এক-আধ জায়গায় প্রয়োজন মতো জলরঙের ছোঁয়া লাগিয়ে ছবির বাহার খুলিয়ে দিতে লাগলেন। পূর্ববর্তী সব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দিষ্ট দিনটি এই ধরনের ছবি আঁকতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এবার ছবিগুলির ভাবগত, আঙ্গিকগত ও বিষয়গত দিকের একটু গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করা যাক। অন্নপূর্ণা চিত্রমালার জন্য সৃষ্ট ছবিগুলির বিষয়বস্তুগত ( composition ) দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখতে পাবো যে পথে পড়ে থাকা অনাহার ক্লিষ্ট উত্তোলিত ক্ষীণ হাতে মুমূর্ষু পিতার অন্ন দাও অন্ন দাও কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে মুকুট পরিহিতা দেবীসদৃশ নারী দণ্ডায়মানা অবস্থায় নিজের খাদ্যভাণ্ড থেকে খাদ্য বিতরণে উদ্যতা, পশ্চাৎপটে ধান ঝাড়াই-এর দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। রামকিঙ্কর এইসব শায়িত, মৃতপ্রায়-ক্ষুধিত মানুষের মধ্যে শিবত্ব

আরোপ করতে চেয়েছেন। দেবীসদৃশ নারীকে কোনক্রমেই দেবী বলবো না এই কারণে যে দেবীত্ব আরোপে ব্যবহৃত যেসমস্ত চিহ্নাদি মূর্তিকারেরা ব্যবহার করেন সেইসব প্রতীক-চিহ্ন এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি। যদিও ভারতীয় জৈন বা উড়িষ্যার চিত্ররীতির ন্যায় জ্ঞানচক্ষু বা তৃতীয় নয়নকে পুরোপুরি দেখানো হয়েছে কিন্তু অন্নপূর্ণার সামনাসামনি অবয়বে হাস্যময় মুখমণ্ডল পাশ থেকে ( Profile ) দেখানো হয়েছে। ছবিগুলির কাঠামোগত ( structural ) দিক দেখতে গেলেই ভারতীয় ক্লাসিকভাস্কর্যের ইমারতীগুণ ( Monumental ) সহজে ধরা পড়ে। অন্নপূর্ণার নিম্নাঙ্গের আদল ও ভারতীয় যক্ষীমূর্তির আদলকে অতি সহজেই মনে করিয়ে দেয়। সবকিছু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পুরোপুরি দেবীচরিত্র প্রতিফলিত না হয়ে বরং কোন বিশেষ নারীর বিশেষ সময়কার বিশেষ চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সহৃদয় পাঠকবর্গ হয়তো স্মরণ করতে পারেন যে ঐ সময়ে ভারতের আর এক চিত্রশিল্পী—মক্‌বুলফিদা হুসেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আদর্শ করে একটি চিত্রমালা রচনার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এবং আমারও দৃঢ় ধারণা, পাঠকবর্গ একমত নাও হতে পারেন, যে রামকিঙ্করও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর তৎকালীন প্রশাসনিক ভাবমূর্তির উপর দেবীত্ব আরোপ ক'রে একটা আদর্শ ভারতীয় নারীর রূপ তুলে ধরবার প্রয়াস করেছেন। তবে এটাও ঠিক যে হুসেন সাহেবের মতো এত চটকদার এবং সস্তা বাস্তবের কাছাকাছি যাননি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে যে আদর্শ করেছেন তার প্রমাণ দেখতে পাই পাশ থেকে আঁকা মুখমণ্ডলের নাকের গঠনের ও হাসির বিশেষ বৈশিষ্ট্যে। তিনি কোনক্রমেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্বীকার করে নিজের মতো ক'রে উত্তরণ ঘটাতে পারেননি। এই না-পারা প্রচেষ্টার গন্ধ পেয়েই রামকিঙ্করকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম আপনিও কি হুসেন সাহেবের মতো এই চিত্রমালা রচনার মধ্যে সেরকম কিছু ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন বা রাজশক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন ? প্রশ্নটা নিশ্চয়ই সুখকর ছিল না স্বাধীনচেতা রামকিঙ্করের পক্ষে। তাই তান্ত্রিক সাধকের মতো ঈষৎ লাল্‌চে উজ্জ্বল চোখ নিয়ে রাগত অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন—'নাঃ বাহবা পাবার তোয়াক্কা করিনা। তবে সনাতনী মতে ভারতীয়রা নারীকে শক্তিরূপে দ্যাখে, পূজো করে, তাই শক্তি ও করুণা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে নারীকে অন্নপূর্ণার প্রতীকরূপে প্রকাশ করেছি বলতে পারো।'

অন্নপূর্ণা চিত্রমালা রচনাকালে রামকিঙ্করের মধ্যে দু'টি পৃথক সত্তার মিলনের চরম প্রকাশ হতে দেখেছি। প্রথমটি সৌন্দর্য সাধক, জ্ঞান-তপস্বী নিবাত-নিষ্কম্প দীপ শিখার মতো এবং দ্বিতীয়টি লৌকিক সত্তার সঙ্গে নিজেকে সঁপে দিয়ে শিশুর মতো আত্মভোলা হয়ে যাওয়া।

### আর একটি ছবি : ট্রাকের ধাক্কায় মৃত গর্ভবতী গাই

আর একটি ছবিতে ব্যথিত রামকিঙ্করকে খুঁজে পাওয়া যাবে। ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ও চাকায় পেষিত গর্ভবতী মৃত এক গাইগরুর মৃত্যু ছবির বিষয়বস্তু। কালো পিচরাস্তার উপরে রক্তে রাঙা টায়ারের ছাপ ও মৃত গাইগরুর ভাবলেশহীন চোখ এবং ছাতির সামান্য অংশ ছাড়া পায়ের নিম্নাংশগুলি দেখিয়েছেন। মৃত গাইগরুর গর্ভাকৃতিটি অনেকগুলি রেখা টেনে ভূমণ্ডলের সাদৃশ্যে এ'কেছেন। কিছু দূরে রাখাল ছেলেটি হাঁটুতে মাথা রেখে কান্নায় আকুল। ছবিখানিকে দীর্ঘ সময় ধ'রে পলকহীন দৃষ্টিতে দেখে, মনে নানানভাবে ব্যাখার ব্যর্থ চেষ্টার পর শিল্পীর নিজস্ব মতামত কি, তা জানবার প্রবল আগ্রহ চেপে রাখতে না পেরে রামকিঙ্করকে প্রশ্ন করেছিলাম— 'কিঙ্করদা! গরুর গর্ভের অংশের ড্রইংটা ভূমণ্ডলের ড্রইং-এর মতো রেখা দিয়ে আঁকলেন কেন?' স্বভাবসিদ্ধ হাসির সঙ্গে জবাব দিয়ে বললেন—'কি বললে! পেট বা গর্ভকে ভূমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করা যায়না! আমাদের শাস্ত্রে আছে অম্বুবাচীর দিনে নাকি মাটি, অন্য অর্থে মা-টি, রজঃস্বলা হয় তা কি তুমি জানো? গভীরভাবে ভেবে দ্যাখো পৃথিবী যেমন আমাদেরকে ধরে রাখে তেমনি গর্ভও আমাদের সৃষ্টির পরিপূর্ণতা দান করে বাঁচিয়ে রেখেছে। এটা কোন অহেতুকী ব্যাপার নয়। তাই আমি গর্ভকে পৃথিবী ভেবেছি, তার মতো করে এ'কেছি। বেশ করেছি। তুমি যা ভাবার ভাবো, তাতে আমার কি আসে যায়।' কথাগুলি শুনে যুগপৎ বিস্ময় ও সাধকের কথা বলেই মনে হয়েছিল।

একটি দুর্ঘটনার বিষয় নিয়ে এতকিছু ভেবেছেন তা রীতিমত বিস্ময়ের। রসিকজন রামকিঙ্করের জবানীতে মূল ভাবনা জানাতে পেরে তাঁর হৃদয়ের ব্যথা কি পরিমাণ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ছবিটি মূলতঃ কালো-সাদা আঙ্গিকে আঁকা, যদিও রঙের ব্যবহার মাঝেমধ্যে বিশেষ ক্ষেত্র বোঝানোর জন্য করা হয়েছে। যেমন রক্ত বোঝানোর জন্য লালরঙের এবং মাঠের সবুজ ঘাসের ক্ষেত্রে হাল্কা সবুজ রঙ ব্যবহার করেছেন। ছবিটির রূপ বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যে দুর্ঘটনা দৃশ্যের হুবহু ভয়ঙ্কর ছাপ এক নিমেষে মূর্ত হয়ে ওঠেনা। আবার বিমূর্ততার ছাঁচে ফেলারও কোন কষ্টকর প্রয়াস চোখে ধরা পড়েনা। এক কথায় ছবিটিকে অভিব্যক্তিধর্মী ( Expressnism ) ছবির সার্থক নমুনা ধরতে পারি। রামকিঙ্কর জীবনের মধ্যভাগে কিছু সময়ের জন্য অভিব্যক্তি-মূলক ( Expressionistic ) আঙ্গিক নিয়ে যে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে-ছিলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের শেষ অধ্যায়ে আঁকা এই জাতীয় ছবি তাঁর পূর্বরচিত শিল্পকর্ম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অতীব সহায়ক।

### বৈরাগ্যীতলার পথে

অবলা পশু নিয়ে আঁকা অন্য আর একটি ছবির কথায় যদি আসি তাহলে

যন্ত্রণাকাতর পশুর সমব্যথী রামকিঙ্করকে দেখবো। ছবির বিষয়বস্তুতে দেখানো হয়েছে জলকাদায় আটকে পড়া একটি ছইওয়ালা গরুরগাড়ীকে জলকাদা থেকে শুকনো রাস্তায় টেনে তোলার জন্য শীর্ণ বলদযুগলের আপ্রাণ প্রয়াস। ছবিটির নামকরণ হয়েছে 'বৈরাগীতলার পথে'। বৈরাগীতলার মেলার যাত্রী হিসাবে স্বয়ং রাধারাণী আরোহিনীরূপে ছিলেন। ছবিতে রাধারাণীরূপী এক মহিলার কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায়। বলদযুগলের শারীরিক জোরের শেষ বিন্দুটুকু দিয়েও গাড়ী না ওঠার দরুন গাড়োয়ানের বেদম প্রহার রামকিঙ্করকে দারুণভাবে বিচলিত করেছিল। তিনি ব্যথা সহ্য করতে না পেরে নিত্যসঙ্গী কাঁধের ব্যাগ থেকে খাতা পেনসিল বের করে একটার পর একটা সেই বেদনাহত দৃশ্যের রেখাচিত্র (Sketch) এঁকেছিলেন। শেষ বয়সে আঁকাহেতু রেখাগুলি কিছুটা দুর্বল কিন্তু রেখার গতির উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে রামকিঙ্করের অনুভূতির সুষ্ঠু ও উজ্জ্বল প্রকাশ হতে দেখি। বলদ দুটির মুখ তোলা আকুতি, অব্যক্ত যন্ত্রণা, জলকাদার গন্ধ সবই যেন রেখার সাবলীল গতিতে ফুটে উঠেছে। রামকিঙ্করের মনের চিরন্তন স্বভাব অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে জলরঙের মাধ্যমে বা লিথোগ্রাফ মাধ্যমে এই একই বিষয়বস্তু নিয়ে বহু ছবি আঁকলেও কোন ছবি অভিব্যক্তিহীন স্থির, আকৃতিসর্বস্ব হয়ে পড়েনি। আমরা দেখতে পাই প্রতিটি ছবিতে গরুজোড়ার অসহ্য ক্লেশের সঙ্গে রামকিঙ্করের সমবেদনা মিশে গিয়ে ডুক্‌রে-ডুক্‌রে কেঁদেছে।

পৌষমেলা সিরিজ : ক্রন্দনরতা উলঙ্গ একটি মহিলার ছবি

সবশেষে পৌষমেলা চিত্রমালার ছবি দিয়ে আলোচনা শেষ করবো। যে পৌষ মেলাকে ইংরাজী ১৯২৫ সাল থেকে রামকিঙ্কর দেখে আসছেন, মেলার ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজের যোগ নিবিড় করেছিলেন সেই পৌষমেলাকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। একে এককথায় স্মৃতিপটে ভাসমান রূপের বহিঃপ্রকাশ বলতে পারি। যাঁরা এই প্রজন্মের মানুষ তাঁরা এই চিত্রমালার মধ্য দিয়ে খুঁজে পাবেন অতীতে হারিয়ে যাওয়া পৌষমেলার আসল চেহারা। রামকিঙ্কর তাঁর স্মৃতির মহা-সমুদ্রের অতলে ডুব দিয়ে দক্ষ ডুবুরীর মতো এক একটি মুক্তা যেন কুড়িয়ে এনেছেন। প্রতিটি ছবির মধ্যে রসিকজন পুরানো মেলার আমেজ খুঁজে পাবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নহবৎখানার সেই সুরেলা সানাই-এর শব্দ, মেলায় সাঁওতালরমণীদের হাঁড়িকলসী কেনার সময় খিলখিল মিষ্টি হাসির উচ্চকিত করা শব্দ, বেলোয়াড়ী চুড়ি পরিয়ে দেবার দৃশ্য, রয়েল ড্রেস পরিহিত যাত্রাভিনয়ের নায়ক, ভিড়ের মাঝে হতচকিত কুকুরের ভয়ার্ত করুণ চাউনী—এসবই মেলা সাজাবার মতোই আমাদের সামনে থরেথরে সাজিয়েছেন। আবার রেস্তোঁরার ফুলদানী দিয়ে সাজানো টেবিলে বসে অভিজাত মহিলার মুরগার ( তাঁর ভাষায় ) ঠ্যাং চিবানোর দৃশ্য এঁকে অন্য এক মূল্যবোধ আনতে চেয়েছেন, যা মেলার মূল আদর্শের পরিপন্থী। এই মেলায় যে

সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার্যের বিধি এবং যে আদর্শ থেকে আমরা ক্রমেই বিচ্যুত হচ্ছি এই ছবিটি তার এক প্রামান্য দলিল হয়ে থাকবে।

অন্য একটি ছবির ভিতর দিয়ে অতীতের কোন এক পৌষমেলায় হঠাৎ চকিত অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন। বলাৎকাবেব বিষয়বস্তু ছবিটিতে নিবদ্ধ। ক্রন্দনরতা উলঙ্গ এক মহিলা অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে পলায়মান তৎপর লোকটিকে দেখাতে ব্যস্ত। উদ্ধারকারী কয়েকজন মহিলার দল সমবেত। হ্যারিকেনেব সামান্য উদ্ভাসিত আলোকে ইঁটের ভগ্নস্তূপের মধ্যে যে দৃশ্য দেখতে পাই তাতে আমাদের মতো তথাকথিত সভ্য সমাজের লজ্জা পাওয়া উচিত।

মনে অনেক সাহস সঞ্চয় ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'এই দৃশ্য কি স্বচক্ষে দেখেছিলেন ?' অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিয়েছিলেন 'নাঃ—রাধারাণী ও আরও দুএকজন মেয়েটির চীৎকার শুনে গিয়েছিল রক্ষা করতে। রাধারাণী ফিরে এসে ঘটনাটা আমাকে বলেছিল। কুমারী মেয়েটার জন্য দুঃখ হয় বুঝলে।' এখানেও রামকিঙ্করকে সামাজিক সুখদুঃখের অংশীদার হিসাবে পাই।

ছবির দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করতে গেলে ছবিটিকে ভাস্কর্যধর্মী বলা যায়। ছবিটির মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্যের ইমারতীগুণ (Monumental), কাঠামো ও আয়তন রূপায়িত অবয়বগুলির (Figure) মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান। পৌষমেলা চিত্রমালার সব ছবিগুলি মূলতঃ রেখা-ভিত্তিক ; যে রেখা শুধুমাত্র কারিগরেব রেখা নয়। এই রেখাপ্রবাহের মধ্যে তাঁর অনুভূতির ছন্দ অনুভব করতে পারি। ছবিগুলির মধ্যে প্রয়োজনবোধে খুব সীমিতভাবে রঙের ব্যবহার কবেছেন। অনেকের মতে এই আলোচনায় বর্ণিত ছবিগুলি এমন কিছু অসাধারণ নাও হতে পারে কিন্তু আমার মতে এই সমগ্র সৃষ্টিগুলি রামকিঙ্করের জীবনব্যাপী সাধিত শিল্পের মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে।

রামকিঙ্করের শেষ বয়সে আঁকা ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির আংশিক তুলনা করা যেতে পারে—বিশেষ ক'রে তার ভাবগত দিক থেকে। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনব্যাপী নানান শব্দের মালা গেঁথে বিচিত্র অনুভূতি দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেও না-বলা ভাষা যা কিছু রয়ে গিয়েছিল সেগুলিকে ষাট বছর বয়সের উপান্তে পৌঁছে গিয়েও বিস্মৃত হননি, নানান রঙের নানান ছন্দে রূপবদ্ধ ক'রে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রকাশের প্রয়াস করেছেন। এই প্রয়াসকে নিছক চমক সৃষ্টিকারী প্রয়াস বা খামখেয়ালীপনায় লালিত কোনটাই বলা যায়না—তেমনি আমরা অনায়াসেই ধ'রে নিতে পারি যে রামকিঙ্কর তাঁর দীর্ঘ শিল্পীজীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহুবিধ আঙ্গিকে চিত্ররচনার ভাষা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলেও হয়তো সব কথা বলতে পারেননি। তাই এইসব চিত্রমালার মধ্য দিয়ে বহু সঞ্চিত

অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এই রচনাগুলি নিছক শিশুসুলভ বা ইজমবহির্ভূত রচনা নয় বরং এই রচনাগুলি পূর্ববর্তী রচনাগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের সেতুবন্ধ হিসাবে কাজ করবে। সবরকম ইজমের কূটজাল ছিন্ন ক'রে রেখাপ্রধান ছবিগুলি যদি অগণিত রসিকজনকে অনাস্বাদিত মুক্তির আনন্দ দেয় তাহলেই হয়তো রামকিঙ্করের অন্তিম রচনাগুলির সার্থক উত্তরণ ঘটবে।

# পরম্পরা, আধুনিকতা ও রামকিংকর

অরুণ পাল

পরম্পরার অর্থ অভ্যস্ত সংস্কারের অনুবৃত্তি। সেই অর্থে পরম্পরাগত শিল্পের সঙ্গে আধুনিক শিল্পের বিরোধ ; পরম্পরাশ্রয়ী হওয়া মানেই আড়ষ্ট ও সঙ্কুচিত শিল্পী-সত্তা। বস্তুতঃ আধুনিক শিল্পী নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার স্বপক্ষে এবং আত্মচিন্তার প্রতিফলনে সোচ্চার, পশ্চিমী আধুনিক শিল্পের ইতিহাস পাঠ থেকে আমরা এই চলতি ধারণাটি পেয়েছি।

পশ্চিমী ভূমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে শিল্পবিপ্লব জাত যে সমাজের উন্মেষ ঘটে তাতে পরম্পরাগত সমস্তকিছু মূল্যবোধ নিরর্থক অর্থাৎ একজন ব্যক্তির প্রচলিত বিশ্বাস, ধারণা বা সংস্কারের কাছে নত বা নম্র হবার প্রয়োজন রইল না। বরং ব্যক্তির অস্তিত্ব, তাঁর বিচার বিবেচনার প্রাধান্য স্বীকৃত হল। এভাবেই এল প্রগতি। এবং প্রগতির সংকট। আগ্রাসন, যুদ্ধ ইত্যাদি—তাতে যন্ত্রের ব্যবহার এবং তৎ সৃষ্ট বিপদ ও বিপন্নতা থেকে গড়ে উঠল হতাশা এবং নিঃসঙ্গতাবোধ। ব্যক্তিচেতনা, ব্যক্তির বুদ্ধি এবং হতাশা-বিপন্নতাজনিত আবেগকে আশ্রয় করে উৎসারিত হল আধুনিক শিল্পের ধারা, বিভঙ্গ বা নানা 'ইজম' এবং তাদের নান্দনিক তত্ত্ব। পরিণামে কখনই একটি অভঙ্গ শিল্পভাবনা গড়ে উঠল না। অস্থিরতা, পরস্পরবিরোধীতা এবং নতুনত্বের প্রবর্তনার উৎকণ্ঠা ইত্যাদির অনুষঙ্গ নিয়ে আবির্ভাব হল আধুনিক শিল্পের ইতিহাস।

আধুনিক শিল্পের এই গতিপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে রামকিঙ্করের শিল্পকর্মের বিচারে উদ্যোগী হওয়া সঠিক নয়। বস্তুতঃ রামকিঙ্করের চিত্র-ভাস্কর্যের প্রকৃতি বা অভিব্যঞ্জনায় এমন একটি বিশিষ্টতা বা ব্যাখ্যা আছে যার ফলে রামকিঙ্কর আমাদের কাছে একজন আলাদা ধরনের আধুনিক শিল্পী বলে প্রতীয়মান হন।

শান্তিনিকেতনের কলাভবন প্রসঙ্গে নন্দলাল, বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্কর এই তিনটি নাম সবিশেষ উচ্চারিত। তাঁদের শিল্পকর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও শিল্পের যথার্থ concept বা সম্যক দৃষ্টিভঙ্গী যা হওয়া উচিত সেই ভাবনায় তাঁরা প্রকৃতই অভিন্ন ছিলেন। অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টির আঙ্গিক বা ভাষার সূত্র, কি রীতি বা প্রকৃতিতে তার স্থিতি বা কোন লক্ষ্যে উদ্যত ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁরা গোড়া থেকেই স্পষ্ট ছিলেন।

গুরু নন্দলাল প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয় নন্দলাল একটা দৃঢ়মূল শিল্পতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। অতীতের শিল্পবিত্ত থেকে অনুকূল উপাদান নির্বাচন,

পারিপার্শ্ব জগতের চেতনা এবং সম্যক আত্মশৈলীর স্ফুরণ—এই ত্রিভুজ নীতির দ্বারা নন্দলাল কলাভবনের শিষ্যমণ্ডলীকে প্রভাবিত বা পরিচালিত করতে উদ্যমী ছিলেন। বস্তুতঃ পরম্পরাগত শিল্পদৃষ্টান্ত ধরে লক্ষ্যে পৌঁছবার যুক্তিকে সামনে রেখে তিনি শিল্পপ্রচেষ্টার স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিতে চাননি। অপরদিকে তৎকালীন বেঙ্গলস্কুলের পারিপার্শ্ব জগতের সঙ্গে সংস্রবহীন সৌখীন অতীতগামীতাকেও অকুণ্ঠ-ভাবে মেনে নিতে পারেননি। বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্কর উভয়েই নন্দলালীয় ভাবনার সারমর্ম সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। অতীতের ধ্রুপদী শিল্পের প্রতি অনুৎসাহ বা অবজ্ঞা নয়, পক্ষান্তরে তাঁরাও তাঁদের স্বতন্ত্র শিল্প আঙ্গিকের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন সচেতনভাবে অতীত শিল্প দৃষ্টান্তের বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে। পশ্চিমী আধুনিক শিল্পের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভাবে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব নয়, দেশজ শিল্পঐতিহ্য থেকে বিস্রস্তি বা বিযোজনও নয় বরং তা থেকে নিজস্ব শিল্প আঙ্গিকের সম্ভবপর সমৃদ্ধি ইত্যাদির শিক্ষা বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্কর যে তাঁদের গুরু নন্দলালের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

রামকিঙ্করও নন্দলালের মতো শিল্প প্রচেষ্টার প্রত্যূষকালে বেঙ্গলস্কুলের ধারায় চিত্র অভ্যাস করলেও অচিরেই তার সারবত্তাহীনতা বা অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন। কলাভবনে থাকাকালীন আমন্ত্রিত ইউরোপীয় শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাঁদের মাধ্যমে আধুনিক শিল্পনন্দনের পাঠ ইত্যাদির কারণে শিল্পে আধুনিক ভাষা ব্যবহারের তাগিদ রামকিঙ্কর উপেক্ষা করতে পারেননি। সেইসঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগৎ—রাঢ় অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য, আদিবাসী-গ্রামীণ মানুষজন ইত্যাদি যা বেঙ্গলস্কুলের শৌখীনধারায় বেমানান, রামকিঙ্করের সহজাত আবেগ-প্রবণ মনে সহজেই রেখাপাত করেছিল। বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত রামকিঙ্কর তাঁর ভাবনার পরিপূরক এক আধুনিক শিল্পভাষায় শিল্পকর্মে ব্রতী হলেন। কিন্তু পশ্চিমী আধুনিক শিল্পের অভিব্যঞ্জনা এবং ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পের নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনি কোন বিরোধ অনুভব করেননি। পশ্চিমী আধুনিক শিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি স্থূল প্রত্যক্ষরূপের অনুকৃতির বিরোধীতায় মর্মসত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। অপরদিকে ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্যের ভঙ্গীমায় তিনি স্পন্দ সৌষম্যের ছন্দ এবং সংবেগকে অনুভব করেছিলেন। ভারতীয় ভাস্কর্যের শারীরিভঙ্গীমায় তিনি সন্ধান পেলেন ইন্দ্রিয়বোধ স্পন্দিত এক প্রকৃতি যা মূর্তির মেরুদণ্ডীয় বাঁকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের mass বা ঘনত্বে উচ্ছলিত।

ইতিমধ্যে রামকিঙ্কর মিনিয়েচার ছবির বদলে পশ্চিমী শিল্পীদের মতো বেছে নিয়েছিলেন বিশালায়তন চিত্রপট, মোটা তুলি এবং তেলরঙ। বেঙ্গলস্কুলের লাবণ্যের বদলে চিত্রপট হয়ে উঠেছে কর্কশ—কখনও ইম্প্রেসনিস্ট ধরনের ছাপছোপে বা ক্ষিপ্রগতির তুলির টানে বা আঁচড়ে। মানুষজন বা প্রাকৃতিক দৃশ্যে বিধৃত বস্তু ইত্যাদির রূপায়ণে কিউবিস্ট বা জ্যামিতিক বিন্যাস শিল্প সৃষ্টিতে এনে দিয়েছে

আধুনিক স্বাদ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি বিশিষ্ট সব পাশ্চমী আধুনিক আঙ্গিকের অনুকারক।

পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পে কিউবিজম মূলতঃ আকারের বিশ্লেষণ, বিভাজ্যকরণের প্রয়াস। সমতল পটে আকারের ঘনত্বকে স্ফটিকের স্তরে বিন্যস্ত করা বা পরস্পরকে সংগ্রথিত বা সংবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে এক শক্তিশালী নক্সায় রূপকে বেঁধে ফেলাতেই কিউবিস্টরীতির নান্দনিক তাৎপর্য নিহিত। এভাবে বিশ্লেষিত আকার জড়, আবেগহীন এবং জ্যামিতিক বিন্যাস মাত্র। রামকিঙ্কর কিউবিস্ট পদ্ধতিকে সেভাবে ব্যবহার করেননি। রামকিঙ্করের চিত্রে বা ভাস্কর্যে মানুষজনের দেহাবয়ব শক্ত সামর্থ। শ্রমে-বিশ্রামে সেইসব মানুষজনের ভঙ্গীমায় অভিব্যক্ত করেছেন মেরুদণ্ডীয় অবস্থান অনুযায়ী এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী অনুযায়ী সংবেগকে, যা ধ্রুপদী ভারতীয় ভাস্কর্যে বিশিষ্টভাবে বর্তমান। এবং তাদের সহজ স্ফূর্তিদ্যোতক ভঙ্গীমার ইঙ্গিত তিনি সেখান থেকেই পেয়েছেন। অন্যদিকে শক্তিদ্যোতক তাদের উত্তলঘন শরীরী অংশগুলিকে আরও সৌষম্যে সমৃদ্ধ করতে কিউবিস্ট ধরনের ভারী এবং ঘন তল বা স্তরের সংবদ্ধতা ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রচেষ্টাতেও যে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না এসব তাঁর ঐধরনের শিল্প দৃষ্টান্ত দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু সেসব প্রচেষ্টা নিছক আকারের অসাড় নক্সা মাত্র নয়। গতি বা শক্তি সমন্বিত বিমূর্ত আকারগুলি নিতান্তই ভঙ্গীমামাত্র না হয়ে দৃশ্য জগতে যে গতির চাঞ্চল্য তারই দ্যোতনায় এসব বিমূর্ত সৃষ্টিগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে অর্থবহ।

সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বা বিবাদ-বিসংবাদজাত যে দুঃখবোধ বা morbidism, প্রক্ষোভ ইত্যাদি আধুনিক শিল্পের অভিব্যক্তিমূলক ধারায় (expressionism) অনেকাংশে প্রতিফলিত। রামকিঙ্করের শিল্পকর্মে যে অভিব্যক্তি তা গ্লানিহীন, আনন্দ বা উল্লাসের রসানুভূতিতে সান্দ্র। বস্তুতঃ রামকিঙ্কর প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যা, তাহল তাঁর প্রাণশক্তির উল্লাস বা আনন্দময় প্রকাশ। শৈশবে গ্রামীণ পরিবেশে লালিত রামকিঙ্কর এবং পরিণত রামকিঙ্কর মানসিকতায় চিরকেলে গ্রামীণ আনন্দময় পুরুষ। চিত্রে বা ভাস্কর্যে বিধৃত আদিবাসী, কৃষক বা গ্রামীণ মানুষজনের মধ্যে তিনি তাঁর মর্মস্থিত মানুষটির আর্কিটাইপকে (architype) খুঁজে পেয়েছিলেন। শ্রমরত বা অবসরের সেইসব মানুষজন নিপীড়ন বা অবদমনের প্রতিনিধি নয়, বরং তারা নিরঙ্কুশভাবে প্রাণতেজ এবং আনন্দ-স্বভাবের প্রতিনিধি।

জীবনের স্বাভাবিক স্বচ্ছ পরিতৃপ্তি যা পরিস্থিতি, নিমিত্ত বা বিষয়ের অপেক্ষায় থাকে না ; রামকিঙ্করের জীবন এবং শিল্প উভয়ের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। তাঁর সমস্তকিছুর মধ্যে আছে আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনা। তাই আনন্দ-স্ফূর্তির বা উল্লসিত গতির ব্যঞ্জনা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ধ্রুপদী ভারতীয় শিল্পে, চারপাশের জীবনযাত্রায়, প্রকৃতি, বনভূমি ইত্যাদিতে। এবং তাঁর শিল্প, তাঁর আধুনিক আঙ্গিক তারই সমার্থক।

# শিল্প, শিল্পী, সমাজ ও রামকিঙ্কর

অমিত মুখোপাধ্যায়

রামকিঙ্করের শিল্পকর্মের উপর এ পর্যন্ত যত আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ। ব্যতিক্রম সামান্য। এবং বলা যেতে পারে রামকিঙ্করের শতবার্ষিকী পালনের পূর্বেই তাঁর শিল্প সৃষ্টি সম্পর্কে নব মূল্যায়ন হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

রামকিঙ্কর মডার্ন হিসাবে যেমন চিহ্নিত হয়েছেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা হয়েছে মর্ডানিজমের সাধারণ ব্যাখ্যার সঙ্গে, যা পাশ্চাত্য ধারণা বলা হয়েছে, রামকিঙ্করের ভারতবর্ষীয় মর্ডানিজমের সাযুজ্য তৈরীর ঐকান্তিক চেষ্টা।

কেউ কেউ রামকিঙ্করকে একাধারে মডার্নিস্ট ও সিনথেসিস্ট ও একলেকটিক বলেছেন। মডার্ন বা মর্ডানিজম যদি ভাঙন / পরিবর্তনের খেলায় মত্ত হয় তাহলে সে কি করে সিনথেসিস্ট হয়?

মডার্ন বা মর্ডানিজম একটি জটিল আইডিয়া। যে অর্থে পিকাসো, ব্রাক ইত্যাদিরা ট্র্যাডিশানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ও ভেঙে নতুন শিল্পকর্ম বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন সেই অর্থে রামকিঙ্কর কি কখনও ট্র্যাডিশানকে উপেক্ষা করেছেন/বিস্মৃত হয়েছেন? রামকিঙ্কর ট্র্যাডিশান বজায় রেখেই নতুন শিল্প করেছেন। লায়নেল ট্রিলিং বলেছেন, 'মর্ডানিজম শব্দটাই এমন যে এর মানের পর মানে, মানের মধ্যে মানে এই অবস্থায় এমন একটা সময় আসে যখন একটা মানে আরেকটা মানের বিপরীত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।'

নীৎসে শুনিয়েছেন যে শিল্প একটা ব্যক্তিগত চেতনার বিষয়, বাইরের জগতের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। এই যে ফ্লবেরীয় স্বাধীন কল্প-জগৎ, তা ক্রমশই বস্তু ও মানবীয় পরিধি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি উচ্চমার্গীয় আত্মমগ্ন বিষয়হীনতার দিকে এগোয়। এইখানেই শিল্প বাস্তব ও মানবিক ভাবনা থেকে দূরে সরে যায় এবং তার পরিবর্তে জীবনের গভীরে প্রবেশ করার নামে যা জন্ম দেয় তাহল একটি বিশেষ শৈলী, একটি বিশেষ কারিগরী (technique) দিয়ে তৈরী ফর্ম। নীৎসে পরিষ্কার বলেছেন, 'No artist tolerates reality'. মর্ডানিজম শিল্পীকে নিজের কাছে আরও স্বাধীন করেছে, প্রয়োজনের তাগিদ থেকে নিয়ে গেছে আলোর স্বর্গরাজ্যে! উয়ালেস স্টিভেন (Wallace Stevens) বলেছেন, 'One poet must be able to abstract reality'—যা তিনি কল্পনার দ্বারা করে থাকেন, যা তাঁকে দিতে পারে আলোক-উজ্জ্বল শান্ত অবসাদ।

মর্ডানিজমই ডি-হিউম্যানাইজেসনের বীজ বপন করে। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নতুনকে আবিষ্কার করার মধ্যে যে পাগলামি তা রোমান্টিসিজম ও ন্যাচারালিজমের মধ্যে অন্তর্গত মানবিক দিকগুলিকে ক্রমশঃ ভাঙতে ভাঙতে অন্তঃসারশূন্য, আত্মকেন্দ্রিক, পরিশীলিত, দক্ষতাবিশিষ্ট এক শিল্পের জন্ম দেয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরী হয় 'radical remaking of a form'. পুরোনো ফর্মকেই নতুন করে করার এই তীব্র ইচ্ছা শিল্পকে নিয়ে যায় চরম সর্বনাশের মুখোমুখি। সর্বনাশ বা সঙ্কট বলছি এইজন্যই যে শুধু ফর্মের অনুসন্ধানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জড়ত্ব, অন্ধকার, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও তীব্র আত্মাভিমান। ক্রম-পর্যায়গত পরিণতিবোধ ভেঙে যে নতুন শিল্প গড়ে উঠল তা ক্রমপর্যায়গত পরিণত মূল্যবোধকেই তো ভাঙে। সেক্ষেত্রে নতুন ফর্মের জন্ম কেবলমাত্র ব্যক্তিশিল্পীর সঙ্কট নয়, এ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটও। তাই হয়তো বলা যেতে পারে 'it is one art which represent the scenanos of our chaos'. খুব সংক্ষেপে মর্ডানিজমের আরও কয়েকটি ব্যাখ্যা এখানে রাখতে চাই :

১। It is the art of 'Play' ২। It is delightful fraud ৩। It is an aversion to the traditional ৪। It is a tendency towards selfpity or Irony ৫। It is private art and hoarding of artistic powers against populace and the claims of time and history.

এতক্ষণ মর্ডানিজম সম্পর্কে যা বলেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করিনা রামকিঙ্কর একজন মর্ডানিস্ট ছিলেন অথবা মর্ডানিজমের আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে শিল্পে মর্ডানিজম চর্চা করেছিলেন। তাহলে প্রশ্ন উঠবে রামকিঙ্করের শিল্পকর্ম আমরা কিভাবে বোঝবার চেষ্টা করব ? বোঝাবার উপায় একটা নয় অনেকগুলি। যেমন ঃ

১। রামকিঙ্করের জন্মগত / শ্রেণীগত অবস্থান ২। প্রাথমিক শিক্ষা ৩। রামকিঙ্করের সময়ের সমাজ ৪। ঐ সময়কার ভারতীয় শিল্পের গতি প্রকৃতি ৫। ঐ সময়কার ইউরোপীয় শিল্পের গতিপ্রকৃতি ৬। রামকিঙ্করের ছবির বিষয় ঃ ক) রোমান্টিক পুরাণাশ্রিত ছবি খ) সামাজিক / রাজনৈতিক ছবি গ) পোর্ট্রেট ঘ) ল্যাণ্ডস্কেপ ৭। রামকিঙ্করের শৈলী এবং ৮। ব্যক্তিগত জীবন

রামকিঙ্কর ছিলেন অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান। সাধারণ পরিবারের সন্তান বলতে না বোঝায় তাঁর শ্রেণীগত অবস্থান, না বোঝায় তাঁর সামাজিক, সংস্কৃতিগত পরিবেশ। তিনি ছিলেন নিম্নবর্ণের ও নিম্নমধ্যবিত্ত (Lower income group ? ) শ্রেণীর মানুষ। বর্ণগত ও শ্রেণীচরিত্র রামকিঙ্করের জীবনে কি প্রভাব ফেলেছিল এবং ফেলে থাকলে তা কতটুকু ? প্রভাব নিশ্চয় ছিল, প্রভাব শব্দের বদলে বরং বলা ভালো তাঁর শ্রেণীচরিত্রই ব্যক্তি ও শিল্পী রামকিঙ্করের প্রধান ও অত্যান্তিক

শক্তি। শান্তিনিকেতনের সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও তিনি সহজ, সরল জীবনযাপন করেছেন। মেকী ও নকল চাকচিক্যময় বাহুল্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। সাধারণ মানুষজন, সাঁওতাল-আদিবাসী এদের সঙ্গেই আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল তাঁর। এরাই ছিল তাঁর জীবনের সুর। অগ্রণী শিল্পী হয়েও তিনি তাঁর জন্মগত অবস্থান কোনদিনই ভুলে যাননি। সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর ভার্টিক্যাল অগ্রগতি ও অবস্থান অথচ ব্যক্তিহিসাবে তাঁর জীবনধারণ হরিজন্টাল অগ্রগতির মধ্যে বিরাজ করেছে। এটা কি সোস্যাল রিগ্রেসন বলব? হতে পারে। তবে যে কথাটা বলতে চাই তাহল, এই হরিজন্টাল অবস্থানই তাঁকে শিখিয়েছে মানুষের কথা ভাববার জন্য, বলবার জন্য। প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা এ কারণেই।

রামকিঙ্কর স্কুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবিকার্জনের জন্য নাটকের সিন আঁকতেন, সেই সঙ্গে কংগ্রেসের পোষ্টারও। জীবনের একেবারে কাঁচা বয়সে স্কুলের শিক্ষার চেয়েও রামকিঙ্করের জীবনে যে শিক্ষা প্রধান হয়ে উঠেছিল তা বোধহয় শান্তিনিকেতনের সহজ জীবনযাত্রা, সাঁওতাল ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সান্নিধ্য, রুক্ষ লালমাটি 'খোয়াই', প্রকৃতির এক অনাস্বাদিত গন্ধ। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের উপস্থিতি।

১৯২০ সাল থেকেই সমস্ত পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর এক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ালো পৃথিবীর মানুষ। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লব সমাপ্ত। একদিকে সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও তার স্বপক্ষের লড়াই, অন্যদিকে জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট শক্তির সমাবেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে তার সর্বগ্রাসী প্রসারের প্রয়াস. এই দুই শক্তির লড়াই ক্রমশঃ দানা বাঁধছিল। ভারতবর্ষে তখন একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ধর্মঘট তুঙ্গে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই সমস্তশ্রেণীর মানুষের মনে সাড়া জাগিয়েছিল। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও ক্রমশঃ ঘোরালো হয়ে উঠছিল, যদিও দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন অর্থনৈতিক সঙ্কট ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষভাবে ততটা প্রভাব বিস্তার করেনি, যতটা ইউরোপে করেছিল। ১৯১৯ সালে রমাঁ রলার নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবিরা 'A declaration of Independence of thought' ঘোষণা করেন। দুজন ভারতীয় মনীষী এই ঘোষণায় সই করেন, এ'রা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আনন্দ কুমারস্বামী। ১৯৩৩ সালে প্যারিতে 'European Anti Fascist Workers Congress' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালে তৃতীয় কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেস থেকে 'Anti Fascist' ও 'Anti Imperialist Peoples Front' গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। ১৯৩৭ সালে 'League against Facism and War' নামে একটি কমিটি কলকাতায় গঠিত হয় যার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'All India Peoples Theatre Association' গঠিত হয় ১৯৪৩ সালে। সারাভারত জুড়ে শিল্প ও সংস্কৃতিতে প্রগতিশীল আন্দোলনের জোয়ার আসে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৮ এই পর্যায়ে শিল্প ও সংস্কৃতির যে নতুন রূপ তা কি রামকিঙ্করকে প্রভাবিত করেনি? যদি না করে থাকে তবে ১৯৪৩-এর ভয়াবহ মন্বন্তরের ছবি / ভাস্কর্য তিনি কি করে করলেন? এই মন্বন্তরই তো জন্ম দিয়েছে জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ ও সোমনাথ হোরের মতন সমাজবাস্তববাদী শিল্পীদের। তফাৎ হল চিত্তপ্রসাদ ও সোমনাথ সেই সময় সরাসরি রাজনৈতিক ছবিও করেছেন যা রামকিঙ্কর করেননি। ওঁরা দুজনেই কম্যুনিস্ট পার্টির কাছাকাছি ছিলেন তাই ছবিতে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে রামকিঙ্কর শ্রেণীগত অবস্থান থেকে সমাজের সমস্যাগুলিকে ছবিতে নিয়ে এসেছেন। অবস্থান-গত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রামকিঙ্কর সমসাময়িক জীবনের মধ্যেই বিচরণ করেছেন। এখানেই রামকিঙ্কর শিল্পী হিসাবে প্রকৃত রিয়ালিস্টের ভূমিকা নিয়েছেন। সমাজচিন্তা রামকিঙ্করের সমগ্র জীবনব্যাপী ছিল, তা বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি মাত্র ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে তেমন নয়। অথচ সেই সময়েই কলকাতায় গঠিত 'ক্যালকাটা গ্রুপ' (১৯৪৩) ও বম্বেতে গঠিত 'প্রোগ্রেসিভ আর্টিস্ট গ্রুপ' (১৯৪৬) ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য পুরোপুরি অস্বীকার করে ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলন থেকে বিভিন্ন গঠনগত, শৈলীগত দিকগুলি আয়ত্ত করে নিজেদের আধুনিক বলে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করলেন না। এঁরা দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি বিষয়ের উপর ছবি এঁকেছেন ঠিকই কিন্তু একজন শিল্পী ২০/৩০ বছরের কর্ম-কাণ্ডে মাত্র কয়েকটি ছবি সমাজবিষয়ক ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রতিফলন ঘটলেই কি তিনি নিজেকে প্রগতিশীল বলে জাহির করতে পারেন? না। তার জন্য চাই ধারাবাহিক প্রগতিশীলতাব সমান তৈরী 'বডি অফ ওয়ার্ক', যার দ্বারা সেই শিল্পীকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায়। এবং শিল্পী ও শিল্পের চরিত্র বোঝবার সেটাই প্রধান উপায়। এই সমসাময়িকতাই (Contemporaneity) রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়ে দেয় যে তিনি সেই সময়কার বেঙ্গলস্কুল পরিমণ্ডলীর শিল্পপরিবেশের বাইরে অবস্থান করছিলেন। রবীন্দ্রনাথই হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি প্রথা ভেঙেছেন, বিষয় ও শৈলীগত দিক থেকে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর এই প্রথা ভাঙার স্পৃহা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করবার পাগলামী নয়, শুধু নতুন ফর্ম তৈরী করবার এক্সপেরিমেণ্টও নয়। রবীন্দ্রনাথের ছবি সৃষ্টিসুখের উল্লাসে তৈরী হয়নি, তা হয়েছে এক গভীর প্রয়োজনবোধ থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাইপোদের বারংবার অনুরোধ করেছেন জোড়াসাঁকোর বারান্দার বাইরে এসে জীবনকে দেখতে। অনুযোগ করেছেন যে অবন-গগন-এর ছবি মন ভরায় না। প্রাণহীনতার লক্ষণ এত নগ্ন যে ঐতিহ্যের প্রতি কঠিন হয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন, 'I can paint whatever I want to paint. That is why I

have no challenge before me which can inspire me to paint'. এই অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে ১৯২৮—৩০ সনে 'Arabian Nights' সিরিজের মধ্য দিয়ে। নতুন ছবি এ'কেছেন নতুন বিষয়ে। তাঁর ধ্রুপদী চরিত্রে তখন স্থান পেয়েছে মুটে-মজুর, ফেরিওয়ালা, স্বপ্নময় কল্পলোক যা লোকায়ত ভাষয় প্রাণ পেয়েছে। নন্দলালেরও পরিবর্তন সূচিত হয় ১৯২১ সালের পরবর্তী শান্তি-নিকেতনের জীবন থেকেই। লিজেণ্ড, মিথোলজি, সাহিত্যাশ্রিত ওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা ছবির জায়গায় চলে এলো গ্রামের মানুষ, রিক্সাওয়ালা, সাঁওতাল, প্রকৃতির সরল সুন্দর রূপ টেম্পেরা, ড্রইং, ম্যুরালের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের শেষদিক (বা শুরুর দিক) অর্থাৎ ১৯২৮—৪১, অবনীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের ছবি অর্থাৎ ১৯২৯—৪২ (ক্ষুদুর রামায়ণকেই আমি শেষ উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হিসাবে ধরছি), নন্দলালের দ্বিতীয় পর্যায় ১৯২১—৬৭, এই সময়কার কি কোন সামগ্রিক চিত্র আমরা পাই? একটা বিষয়গত ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তন সুনিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে—কল্পনা থেকে বাস্তবে ফেরার প্রবণতা, দ্বিতীয়তঃ টেকনিকগত ও শৈলীগত পরিবর্তনের আভাস তোলে। আমার মনে হয় বাংলার শিল্পকলার ইতিহাসে ১৯২০—১৯৪২, এই সময়ে বাস্তববাদের প্রকাশ ঘটে। যদিও এই বাস্তববাদ ইউরোপীয়ান অর্থে নয়। আমরা যদি বাস্তববাদের সংজ্ঞাকে একটু সম্প্রসারিত করে দেখতে পারি, ঠিক যেমন আগে মর্ডানিজম-এর ব্যাখ্যায় খোঁজবার চেষ্টা করেছি, তবে বুঝতে পারব বাস্তববাদের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা যেমন দেওয়া যায় ঠিক তেমনিই দেশ, কাল, সময় বিশেষে এর ব্যাখ্যা একটু পরিবর্তিত হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে বাস্তববাদ মানে বাস্তবের হুবহু অনুসরণ / অনুকরণ / প্রতিফলন বোঝাতে চাইছি না। ঠিক যেভাবে ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে তা হল: 'Realism is characterised among other things by art's liberation from mythological modes of thought, an extraordinary broadening of the sphere of phenomena from real life... ..by special system of artistic techniques and use of imagery etc.'

অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য তাঁদের পূর্বেকার শিল্প-কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটবে তাঁর ১৯৩০ পর্যন্ত সাহিত্যকর্ম, দর্শন, চিন্তা ও সমসাময়িক বাংলার শিল্পধারার পরিপ্রেক্ষিতে। এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের কথাও প্রাসঙ্গিক।

আমাদের মনে রাখা দরকার মার্কসীয়তত্ত্ব ১৮৪০-এর আগে প্রকাশিত হয়নি। মার্কসীয়তত্ত্ব বিচারে তাহলে তার পূর্বেকার যাবতীয় শিল্পকর্ম কি নস্যাৎ হয়ে যাবে? তা হয়না। কেননা শিল্পকে তার নিজস্ব দেশ, কাল, সময়ের মধ্যে প্রথমে রেখেই তবে তার বিচার সম্ভব। প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পই পৃথিবীতে তৈরী হয়েছে বেশী। কিন্তু শিল্প ইতিহাসের মধ্যে মানবতাবোধ একটা স্থির বিষয় (constant

factor ) হিসাবে কাজ করেছে। খুব সাধারণীকৃত ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ কথা বলা যায় যে, 'All art is a form of protest. A reaction against the existing social order.'

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে বাস্তববাদের সূত্রপাত ঘটেছিল শিল্প ও সাহিত্যে। কোরো—এইসব শিল্পীরা কি মার্কসীয়তত্ত্ব শিখে শিল্পে তার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন ? সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা মার্কসবাদ প্রচার হতেও সময় লেগেছিল। একথা বোধহয় বলা যেতে পারে মার্কসবাদের সঙ্গে বাস্তববাদের সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই।

আমেরিকান শিল্পে বাস্তববাদের সূত্রপাত ঘটে ১৯১০ সাল থেকে। এই সময়-কার ছবি দেখলে বোঝা যায় যতটা না বাস্তববাদের দিকে ঝোঁক ছিল তার চেয়েও ছিল 'আমেরিকান ছবি' করা. যার মধ্যে জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিকতাবাদের ঝোঁক বেশী। আমেরিকার ল্যাণ্ডস্কেপ, আমেরিকার মানুষ, তাদের জীবন এই ছিল ছবির বিষয়। গ্রাণ্ট উড. র্জজিয়া ঔকিফী, আণ্ড্রিও ডাসবার্গ, মেনার্ড ডিক্সন প্রভৃতি শিল্পীরা নিউইয়র্ক ছেড়ে নিউ মেক্সিকোতে বসবাস করতে লাগলেন। ঔকিফী ঘোষণা করলেন—'I will make it an American painting they will not think it great with the red stripes down the sides......but they will notice it.' এই আঞ্চলিকতাবাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাস্তববাদের শুরু হয় আমেরিকায়। থমাস হার্ট বেণ্টন. ফিলিপ এভারগুড, উইলিয়াম প্রোপার ইত্যাদি শিল্পীরা আমেরিকার সমাজজীবন, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কঠিন ভাষায় আক্রমণ করেন। এই বাস্তববাদ ও সমাজবাস্তববাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

বাস্তববাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে একটা মিথিক মানসিকতাকে ভাঙা, প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার মুক্তি, জীবনকে বড় করে দেখা, সাধারণের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা এবং সর্বোপরি শিল্পের করণকৌশলগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন দৃশ্যকল্প উপস্থাপনা করা। বাস্তববাদ সমাজের একটা বিশেষ অবস্থাতেই সম্ভব, যেমন সম্ভব ন্যাচারালিজম, সমাজবাস্তববাদ, রোমাণ্টিসিজম ইত্যাদি। ঘড়ির কাঁটার মতন একে উল্টোদিকে ঘোরানো বা ফেরানো যায়না। তাই আমরা দেখতে পাই সোভিয়েত রাশিয়া, মেক্সিকোতে যখন সমাজবাস্তববাদের (১৯১৫—৩০) ঢেউ আসে তখন ব্রিটেন, জার্মানী, আমেরিকা, ভারতবর্ষ বা বাংলা প্রভৃতি দেশে বাস্তববাদ নিয়ে ছবি হচ্ছে। আমেরিকা, জার্মানী, ইংল্যাণ্ডের সমাজবাস্তববাদ নিয়ে যা করা হয়েছে তা ১৯৩০-এর পর।

১৯২০ সাল থেকেই ভারতীয় শিল্পের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। রামকিঙ্কর এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশীদার হয়ে তাঁর নিজের লক্ষ্যে পৌঁছেছেন এবং শিল্পের ইতিহাসে একজন সমাজবাস্তববাদের পুরোধা হিসাবে চিহ্নিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ১৯২৫—৪০ পর্যন্ত বাংলাদেশে আর একটি শিল্পধারা প্রবহমান

ছিল। সেটা ছিল ন্যাচারালিজমের ধারা। বেঙ্গলস্কুলের কিছু শিল্পী, অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র বা ছাত্রসম, যেমন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, হরেন দাস, এল. এম. সেন ইত্যাদিরা এই ন্যাচারালিজমের প্রবর্তক। অনেকেই নন্দলাল ও অবনীন্দ্রনাথকে এর সঙ্গে যুক্ত করে ভুল করেন। এবং নন্দনাল, অবনীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাজে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল, যে মিথিক মানসিকতা থেকে তাঁরা বের হতে পেরেছিলেন তা অলক্ষিত থাকে। নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম বলা যায়। কিন্তু ন্যাচারালিজমের ঢেউ শান্তিনিকেতনে এসে-ছিল। এঁরা বেঙ্গলস্কুলের করণকৌশল আয়ত্ত করে গ্রামজীবনের ছবি আঁকতেন। রামকিঙ্কর নিজেই বলেছেন, 'Naturelistic art in fact found favour in Santiniketan. তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই উক্তি, '...I happened to believe firmly that a realistic approach was the sole guarantee of success in the world of art.' বাস্তববাদী ছবি করার একটা সুচিন্তিত পছন্দ ছিল তাঁর। এই পছন্দ থেকে দায়বদ্ধতার প্রশ্ন আসে। আর এই দায়বদ্ধতা রামকিঙ্কর কতটা মার্কসবাদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতি নিশ্চই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু জন্মসূত্রের দায়বদ্ধতা তাঁর কোনকালেই ঘোচেনি। চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথের সঙ্গে এখানেই তাঁর তফাৎ। কিন্তু তা হোক। সবার উদ্দেশ্যই যে এক ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে বলে মনে করি না।

১৯২৫ সাল থেকে রামকিঙ্কর যে শিল্পসাধনা শুরু করেন তার প্রথমপর্বে বেঙ্গলস্কুলের প্রভাব ছিল। ধীরে ধীরে গভীর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। রামকিঙ্করের সমগ্র শিল্পকর্মের শ্রেণীবিভাগ করার প্রয়োজন রয়েছে। জয়া আপ্পাস্বামী এইভাবে শ্রেণীবিভাজন করার চেষ্টা করেছেন :

১। ১৯২৫—বিমূর্তপর্ব ২। ১৯৩০—৪০—ফলপ্রসূপর্ব ৩। ১৯৪০—৫০—বিমূর্ত, অধিবাস্তব, ঘনকবাদীপর্ব।

বলাই বাহুল্য এই বিভাজনপর্ব অসম্পূর্ণ।

এই মুহূর্তে আমার পক্ষেও রামকিঙ্করের ছবির পর্যায় চিহ্নিত করা মুশকিল। এখানে কিছু প্রশ্ন রাখা যেতে পারে : ১৯৩৫ থেকে ১৯৭৫-৭৬ পর্যন্ত রাম-কিঙ্করের বিভিন্ন ছবি দেখতে পাই। যাতে : ১। বিমূর্ত ২। অধিবাস্তব ৩। ঘনকবাদী ৪। বাস্তববাদী ও সমাজবাস্তববাদী এই বিভিন্নভাবেরই ছবি আছে। এরই মধ্যে :

১। ১৯৩৭-৩৮ : Mother    ২। ১৯৪২ : Noonday Rest
৩। ১৯৪২-৪৩ : Coolie    ৪। ১৯৪২-৪৩ : Harvest
৫। ১৯৫৩: Peasants    ৬। ১৯৪৩ : Thrasher
৭। ১৯৫০ : Birth of Krishna

৮। ১৯৭৫-৭৬ : Woman enjoying children

এবং ১৯৩৮-৩৯-এর 'সাঁওতাল পরিবার' এবং প্রায় দু'দশক বাদে করা 'মিলকল' সমাজবাদমুখী শিল্প বলে অবশ্যই গণ্য করা যেতে পারে।

ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রভাব নিশ্চয়ই রামকিঙ্করের উপর পড়েছিল। উপরের যে কয়টি ছবির কথা উল্লেখ করেছি তাঁর প্রত্যেকটিতে 'ঘনকবাদী' প্রভাব স্পষ্ট। ঘনকবাদী কায়দায় জমিকে ভেঙেছেন। রামকিঙ্করের এইসব ছবিতে খাড়া রেখা ( Vertical Line ), আনুভূমিক রেখা (Horizontal Line) এবং তীর্যক রেখার (Diogonal Line) ব্যবহার তাঁর বক্তব্যকে তীব্র, তীক্ষ্ণ করেছে। বিদ্যুৎ চমকের মতো রেখা সমস্ত ক্যানভাসে আলো ছড়িয়ে দেয়। ক্রোধ, ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য এই রেখার ব্যবহার। তীর্যক, খাড়া, আনুভূমিক রেখার প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। তিনটি রেখার সংমিশ্রণ ঘটাবার জন্য তাঁর ছবি 'কমপ্লেক্স চরিত্র' পেয়েছে। রামকিঙ্করের শিল্পের অগ্রগতি : Simple to Complex এবং from complex to simple, এইভাবেই এগিয়েছে। জ্যামিতির এই ব্যবহাব মানুষবর্জিত কিন্তু নয়। তাঁর প্রাথমিক ও প্রধান বিষয়ই ছিল নীচুতলার মানুষ। উপরোক্ত ছবিগুলি এবং দুর্ভিক্ষপর্বের (১৯৪৩—৪৬) ছবিগুলিই তার প্রমাণ। জ্যামিতি ও মানুষের এই মৌলিক প্রয়োগ তাঁকে সমাজ-বাস্তববাদ থেকে সরিয়ে আনে না। বরং সমাজবাস্তববাদ বলতে যে শুধুই 'আন্দোলিত হাতের' ছবি নয় তারই যুক্তি খণ্ডন করে। সমাজবাস্তববাদ কোন একটি টনিকের ফর্মূলা নয়। তাঁর পৌরাণিক চরিত্রে সমসাময়িক প্রতিফলন দেখা যায় 'Birth of Krishna' (১৯৫০) ছবিতে। তলোয়ার হাতে কংস নিশ্চয় 'পৌরাণিক কংস' নয়। এখানে কংস কার প্রতিনিধি একথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

রেখার সাহায্যে জমি ভাঙার মধ্যে ঘনকবাদী প্রচেষ্টা থাকলেও ঘনকবাদের জন্মসূত্রে যে মূলনীতি কাজ করেছে পিকাসো, ব্রাক প্রভৃতির মধ্যে—সেই ঘনকবাদী নীতি রামকিঙ্কর গ্রহণ করেননি। তার অন্যতম প্রমাণ নরনারীর শারীরিক গঠনের মধ্য দিয়ে ভারতীয়স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের উপস্থাপনা। এখানে দুটি ছবির কথা উল্লেখ করব :

১। Picnic—১৯৩৮-৩৯ ২। Thrasher—১৯৪৩

'পিকনিক' ছবিটিতে নারীদের মুখ পার্শ্বদেশ (Profile) থেকে দেখা। নাক তীক্ষ্ণ, চোখ টানা, চেরা। শারীরিক ভল্যুম দেখানো হয়েছে রেখার সাহায্যে। এবং হাত, পা পেলব ও গোলাকৃতির কাছাকাছি। এই ধরনের ছবি আমাদের লোকায়ত-কালীঘাট চিত্রমালারই বৈশিষ্ট্যকেই স্মরণ করায়। 'থ্রেসার' ছবিটিতে বাঁদিকে আছে একজন 'গোলাকার নারী'। মুখ হাত, পা, জানু, নিতম্ব সবই প্রায় ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহ্যের কাছাকাছি। মডেলিং-এর প্রাধান্য চোখে পড়ে। ছবির ডানপাশেও একটি ফিগার রয়েছে। তার গঠন কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে মডেলিং একেবারে

অনুপস্থিত। অবশ্যই তাঁর .উদ্দেশ্য বাঁদিকেব নারীশরীরের উপর বেশী জোর দেওয়া। বাঁ-দিকের নারীটি আমার মনে হয় 'আঁকিটাইপাল'। নারী-মৃত্তিকা-ফসল-সৃষ্টি এই আইডিয়ার সংমিশ্রণেই আঁকিটাইপাল চরিত্রের সৃষ্টি।

বেঙ্গলস্কুলের রোমাণ্টিক জগতের বাইরে গিয়ে রামকিঙ্কর কঠিন বাস্তবকেই তাঁর ছবিতে এংকেছিলেন। 'সাঁওতাল পরিবার' ও 'মিলকল' সেই রোমাণ্টিক অতিকথাব বিরোধী সত্যিকার সাঁওতাল জীবনেব চিত্রণ। এদের চরিত্রে রয়েছে ফর্মেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। 'ফর্মের' এই প্রকাশ ভাস্কর্য দুটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমসাময়িক শিল্প ইতিহাসে চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল, সোমনাথ ছাড়া ধারাবাহিকভাবে এই চিন্তাব প্রকাশ বামকিংকর ব্যতীত অন্য কোন শিল্পীর কাজে দেখা গেছে কিনা তা আমার জানা নেই। শিল্প ইতিহাসে রামকিংকবেব স্থান সমাজবাস্তববাদী শিল্পী হিসাবে চিহ্নিত হলে তা যথার্থ হবে।

১২

১৩

১৬

## সত্যজিৎ রায়

অসাধারণ শিল্পী ছিলেন রামকিঙ্কর, অসাধারণ ছিল তাঁর ক্ষমতা। ভাস্কর হিসাবে তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ। পেণ্টার হিসাবেও ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। তিনি আমুদে মানুষও ছিলেন, হৈ চৈ করে জীবন কাটাতে ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতির সন্তান। বাঁকুড়া থেকে এসে তিনি নিজেকে যে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। সেই সঙ্গে গান, বাঁশী, নাটক কোন-দিকেই তাঁর উৎসাহ কম ছিল না। আমি ঠিক প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ছাত্র নই, তবে দু-বছর তাঁর ক্লাস করেছি। নাটক প্রযোজনা করতে ভালবাসতেন রামকিঙ্কর। শান্তিনিকেতনে বাবার হ-য-ব-র-ল প্রযোজনা করেছেন। পরে সেটি নিয়ে আসেন কলকাতায়। শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় হ-য-ব-র-ল করে তিনি দারুণ খ্যাতি পান। কিঙ্করদার জীবন নিয়ে সিনেমা করার কথা আমি ভাবিনি। তবে দু'জন ভেবেছিলেন। তাঁরা হলেন হরিসাধন দাশগুপ্ত এবং ঋত্বিক ঘটক।

## চিন্তামণি কর

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে রামকিঙ্কর এক বিরাট স্রষ্টা, বিশেষ করে ভাস্কর্যশিল্পের ক্ষেত্রে। যে কোন সার্থক শিল্পীর অবদানের সঠিক মূল্যায়ন তাঁর সমকালীন লেখক ও সমালোচকদের দ্বারা কদাচিৎ সম্ভব হয়ে থাকে। সেহেতু মনে হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিল্পস্রষ্টারাই রামকিঙ্কর সৃষ্ট শিল্পরচনার মান ও শ্রেষ্ঠত্বের স্থান সঠিকভাবে লিখতে ও চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন।

স্রষ্টা-শিল্পীদের সৃজনশীলতায় দেখা যায় যে তাঁদের কেউ কেউ ঐতিহ্য পরিপন্থী অথবা নিয়মতান্ত্রিক অনুশীলনের পথাবলম্বী এবং তাঁদের রচনার স্বকীয়তায় তার প্রতিফলন মূর্ত হয়ে থাকে। আবার সংখ্যালঘিষ্ট হলেও তাঁদের কেউ আসেন এমন প্রতিভা নিয়ে যে সে শিল্পীর সৃজনশীলতায় প্রয়োজন হয় না কোন ঐতিহ্যের বা প্রতিষ্ঠিত অনুশীলিত নিয়মের অবলম্বন। এ'রা সবকিছু পূর্বকল্পিত অথবা পূর্বচিহ্নিত শিল্পরূপের সঙ্গে সংযুক্ত হন না। অসাধারণ স্বকীয়তাব্যঞ্জক স্বয়ংসম্পূর্ণ অতি অভিনব শিল্পের জনক হিসাবে এই শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটে কখনো কখনো অপ্রত্যাশিতভাবে। এইধরনের শিল্পীদের অবদানকে উপলক্ষ করে কোন অনুসৃত

শিল্প পরম্পরারও প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পাশ্চাত্যে যেমন ভ্যানগগ, এদেশেও তেমনি কবি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পী রামকিঙ্কর শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন অনন্যসাধারণ মৌলিক শিল্পরচয়িতা হিসাবে, যাঁদের শিল্পপথে অন্য কারুর অনুগমন বা বিচরণ করা সম্ভব হবে না। চিত্ররচনার চেয়ে ভাস্কর্যে রামকিঙ্কর বলিষ্ঠতর শিল্পী ছিলেন এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে রামকিঙ্কর তাঁর ভাস্কর্য রচনায় উপাদানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকায় তাঁর প্রাধান্যময় বড় মূর্তির বেশ কয়েকটি রচনা এখনই প্রায় ভঙ্গুর দশায় পরিণত। সেই মূর্তিগুলির একটিকে সম্প্রতি ব্রোঞ্জে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে অচিরে বাকী মূর্তিগুলিকেও ঐভাবে চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রামকিঙ্করের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্মরণ করবেন যে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বাক্যালাপে শিল্পীর ভাষণ উদ্ভাসিত হোত এক অদ্ভুত মৌলিকতায়। তাঁর অনুরাগী কেউ যদি সেসব ভাষণ বা বাক্যালাপ সংগ্রহের একটি সঙ্কলন প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তাহলে সেটিও তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের সাথে তাঁর ব্যক্তিত্বের এক উপভোগ্য পরিচিতিকে প্রকটিত করবে শিল্পী ও শিল্পরসিকদের দরবারে ও সাধারণ সমাজে।

## রথীন মৈত্র

আঃ হ্ হাঃ হাঃ হাঃ···উদাত্ত হাসির আওয়াজ। যাচ্ছি রামকিঙ্করের বাসার দিকেই। কাছাকাছি এসে পড়েছি। স্থান শান্তিনিকেতন। সঙ্গে শিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ বিশী। সাল ১৯৩৭ কি '৩৮ হবে। সেই প্রথম রামকিঙ্করের সঙ্গে পরিচয়। সত্যেন বিশীই প্রথম যোগসূত্র এই মিলনের। ঋজু, বলিষ্ঠ দেহ, মাথায় ঘনচুল, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। এর আগে কিঙ্করবাবুর সম্পর্কে জেনেছি। কিছু কিছু ছবি ও ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখেছি। তাঁর সম্পর্কে বেশ মনে দাগ কেটেছিল আমার প্রথম দর্শনেই। এর মধ্যে আমি কবে কিঙ্করদা বলে ডাকা আরম্ভ করেছি মনে নেই। শান্তিনিকেতনে যতবার গিয়েছি তাঁর সঙ্গে একবার না একবার দেখা করেছি। কখনও কর্মরত অবস্থায় অথবা গাছতলায় বা তাঁর বাসায়। শেষের দিকে অনেকদিন ধরেই খড়ের আটচালা ঘরেই কাটিয়েছিলেন। সামনে একটা বড় আঙ্গিনাও ছিল। সমাবর্তন উৎসবে আগে প্রায়ই শান্তিনিকেতনে যেতাম। গোপাল ঘোষও বেশীরভাগ আমার সঙ্গেই থাকত। একবার নেহেরুজীর ভাষণ শেষে আমি কিঙ্করদার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। কারণ আম্রকুঞ্জে আশ্রমের সবাই আছেন—ওঁকেই দেখতে পেলাম না। কিছুদূর গিয়েই দেখা পেলাম। মেয়েদের হোস্টেলের কাছেই ফুলপ্যাণ্টটা হাঁটুর

উপর গুটিয়ে, হাতে গ্লাভস পরে, আধপোড়া বিড়ি মুখে দিয়ে, কয়েকজন ছাত্র নিয়ে একটা ভাস্কর্যের কাজে তন্ময়। তখন কিঙ্করদাকে আমার মনে হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রের সেনা অধিনায়ক। কয়েকটি প্রমাণ সাইজের মোষের মূর্তি দিয়ে সিমেন্টের একটা ফোয়ারার কম্পোজিশন করছিলেন। অনেকক্ষণ কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন কথা নেই। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হোল—আমি তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'কখন এলে? কেমন দেখছ?' আমি বললাম, 'কিঙ্করদা সবকিছু ছেড়ে আপনি মোষ নিয়ে মাতলেন কেন?' একটা উদাত্ত সেই পরিচিত হাসি দিয়ে বললেন, 'মোষেরাই তো জলে পড়ে থাকে। আর এখানকার দারুন গ্রীষ্মের সময় তো কথাই নেই, তাই ফোয়ারার জলে ওদের ভিজতে দিয়ে ভাল করিনি?' ওয়াণ্ডারফুল! কথাটা আমার আপনার থেকেই বেরিয়ে এসেছিল। তারপর দু'দিন দেখা হয়নি। একদিন সন্ধ্যায় 'রতনকুঠি'র দিকেই যাচ্ছি। প্রায় কাছাকাছি এসেছি, ভাঙা ভাঙা সুরে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত ভেসে এলো—'তবু মনে রেখো…।' ভাঙা ভাঙা সুর হলেও গায়কীটা বিশুদ্ধতার দিকেই। দেখি সামনেই কিঙ্করদা আমাকে দেখে হাত নেড়ে নেড়ে ঐ গান করছেন। অনেকক্ষণ ধরে চললো গানটা। আমার তখন ঐ পাগল, আত্মভোলা কিঙ্করদাকে অপূর্ব মনে হয়েছিল। কোনরকম সংসার গোছানোর বুদ্ধি তাঁর ছিল না, ছিল না কোন পাটোয়ারী বুদ্ধি। তিনি ছিলেন একজন জাতশিল্পী। যতবার তাঁর কাছে গিয়েছি, পেয়েছি উষ্ণ স্নেহ-ভালবাসা। তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে যখন কলকাতার হাসপাতালে রোগশয্যায়, তখন মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা করতাম। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে গিয়ে দেখি রণবিদ্ধস্থ ক্লান্ত সৈনিকের মতো শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'ভাই এই বদ্ধ হাওয়ায় আর থাকতে পারছি না, শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।' আমি তখন ওঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিলাম, 'তাড়াতাড়ি তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। কয়েকদিন পরেই যাবেন।' সেই কয়েকদিন বাদেই গেলেন একেবারে চিরশান্তিনিকেতনে। তাঁর মৃতদেহে মালা দেবার সময় আমার মনে পড়েছিল তাঁরই গাওয়া সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতটা —'তবু মনে রেখো…।'

### সোমনাথ হোর

রামকিঙ্কর দেবশিশু ছিলেন। পরিণত বয়সেও তিনি দেবতা হতে পারেননি; কারণ কুটিলতা, অসূয়া পরশ্রীকাতরতা অথবা পরস্ত্রীগমনে পারদর্শিতা কোনটিই তাঁর আয়ত্তে আসেনি। এমন নির্মল চরিত্র স্বভাবশিল্পী বহুবছরের ব্যবধানে কোটি-কোটিতে একজন আসেন।

আমি তাঁকে ভয় পেতাম। তাঁর সরল হাসি কিংবা দু-চারটি অসংলগ্ন মন্তব্যে

আমার ভেতরটা যেন বাইরে বেরিয়ে পড়ত। কঠোর কিছু কোনদিন বলেননি, বরং অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তবু মনে হত—মনের দুর্বলতাগুলি দেখতে পাচ্ছেন, অথচ প্রকাশ করে বিব্রত করতে চান না। তাঁর অসাধারণ কর্মক্ষমতা দেখে অভিভূত হতাম। ১৯৫৫ সালে বৈশাখের খররৌদ্রে টোকা মাথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'কলের বাঁশি' (Mill Call) মূর্তির কাজে বাহ্যচেতনাহীন অবস্থায় ব্যাপৃত দেখেছি। আবার ঊনসত্তর সালে কলাভবনে পাকাপাকি যোগ দিয়ে দিনের পর দিন দেখেছি শারীরিক শতবেতরতা সত্ত্বেও কি মাটি, কি পাথর, কি ছবি নিয়ে গভীর মনোনিবেশে কাজ করে চলেছেন। একেবারে শেষদিকে খুব কম সময়েই সুস্থ থাকতেন, কিন্তু হাতে কাগজ, কলম কি রঙ পড়লেই ছবি বেরিয়ে আসত। সে কী ছবি! কিছু ভাগ্যবান সে ছবি পেয়েছেন। আশা করব মূল্যায়নের নামে ফাটকাবাজীতে তার মূল্যাবনয়ন হবে না। হবেই হয়ত; তবু ছবিতো থাকবে। ভারতবাসী বুক উঁজিয়ে একদিন বলতে পারবে—রামকিঙ্কর এদেশেই জন্মেছিলেন, যেখানে অজন্তা, এলিফ্যাণ্টা, কোনারক হয়েছে।

কিঙ্করদা পানাসক্ত ছিলেন। একটি সাঁওতাল শিশু যেমন অতি ছোট থাকতেই পানে অভ্যস্ত হয়, পিতামাতা বাধা তো দেয়ই না বরং সস্নেহ প্রশ্রয় থাকে, কিঙ্করদাও সম্ভবতঃ তেমন পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য প্রায় ১৫/২০ বছরের ঘন পরিচিতিকালেও তাঁকে কোনদিন বেসামাল হতে দেখিনি। এমন ভদ্র, শান্ত সমাহিত চরিত্র দুর্লভ। অথচ সাধারণ ধারণায় ভদ্রলোক বলতে যে চেহারা ফুটে ওঠে উনি ঠিক তা ছিলেন না। যাঁরা জানতেন, তাঁরাই বলতে পারবেন কি অসাধারণ শক্তিধর এই মনুজ, প্রকৃতির মাঝে অবাধে বিচরণ করতেন সভ্যতার সমস্ত বাহুল্য বর্জন করে এবং কারও এতটুকু বিরক্তি উৎপাদন না করে।

শিল্পকর্মে পূর্ণমগ্নতা যেমন কিঙ্করদার বৈশিষ্ট্য ছিল—কাজ সমাপ্ত হলে তার প্রতি আকর্ষণ আর তেমন জোরালো থাকত না। একই তৈলচিত্রে বার বার রঙ লাগাতেন, চিত্ররচনা বদলে দিতেন, এমনকি প্রয়োজন হলে বৃষ্টিধারা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেই ছবি মশারির উপরে বিছিয়ে দিতেন। চাওয়া মাত্রই অনেকে তাঁর কাছ থেকে চিত্র-ভাস্কর্য উপহার পেয়েছেন। তিনি মনে করতেন কাজ করার আনন্দই আসল পাওনা; ফসলের স্থান যত্রতত্র। গভীর আত্মবিশ্বাস এবং চরম নির্লিপ্তি তাঁকে এমন এক মহিমা দিয়েছে যা চেনামহলে দুর্লভ।

হিতৈষীদের কেউ কেউ তাঁর সঙ্গীনি নির্বাচনে দুঃখিত ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে কিঙ্করদার ভালবাসা অপার ছিল। সঙ্গীনির জন্য তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। অপরের সমালোচনায় মৌনি থেকেছেন, কিন্তু প্রেম পরিহার করেননি। হাসপাতালের শেষ দিনগুলিতে রাধারাণী-কিঙ্কর মধুর মিলনের যাঁরা সাক্ষী তাঁরা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

রাধারাণীর সঙ্গে অনুষ্ঠানাবদ্ধ তিনি ছিলেন না; বিষয়বণ্টনে তাঁর সুরক্ষার ব্যবস্থা

করতে কিন্তু ভোলেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে তাঁর সে ইচ্ছা পূরণও হয়েছে। ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয় বলতে ছবি-ভাস্কর্য বিক্রীর টাকা। জমানো বলতে কিছু ছিল না, থাকত না। এক সংগ্রাহক নগদ উনিশহাজারের কিছু ছবি কিনলেন; পরদিন বহুকষ্টে দশহাজার স্থায়ী আমানতে ( Fixed deposit ) জমা করা হল। বাকী ন'হাজার হাতে পৌঁছানোর আগেই তথাকথিত পাওনাদাররা হাত সাফাই করল। কিছুকাল বাদে মৃত্যুর পর দেখা গেল ফিক্সড ডিপোজিটের অঙ্কও নানা হাতে সাফসুফ্। এইতো কিঙ্করদার বিষয়বোধ!

সন্তানের অভাব বোধ করতেন; শিশু দেখলে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। মানবক আর পশুশাবকে খুব একটা তফাৎ করতেন বলে মনে হয় না। কুকুরছানা, বিড়ালছানা তাঁর থালায় খাবারের ভাগ নিচ্ছে; উনি বলছেন—'যে যা পারিস তুলে নে, বাঁচতে হবে তো'—রোজকার এই দৃশ্য অবিশ্বাস্য এবং অনুপম। সামান্য মানবদেহে কী বিশাল হৃদয় ধারণ করেছিলেন! তাঁকে পেয়ে আমরা ধন্য, আমাদের বৈভব বর্ধিত।

## গণেশ হালুই

যেন শায়িত অনড়, মাতাল ভাস্কর্য। আমার প্রথম ও শেষ দেখা পি. জি. হাসপাতালের হিমঘরে।

গ্রন্থিতেই শক্তি। তেমনি বেদনাসিক্ত অভিব্যক্তিতেই অনুভূতির জোর। লোকটা মারা গেল! ভরা হাড়িটা কাত হয়ে গেছে। ভেজা মাটির রঙ আরও গাঢ় হয়েছে। উঁইঢিপির মতো ভুঁইফোড় মাটির গন্ধ। মানুষজন গাছ-গাছালীদের মাতাল করেছে। একদিন সে ছিল দাঁড়িয়ে। নড়ে না। তবু মার কেন? উপর-নীচ। আমার চতুর্দিক দিয়েছি তোমাদের। আমি নিঃস্ব এখন। মার কোপ। লাগে না। ভরা হাড়িটা কাত হয়ে গেছে। ভেজা মাটির রঙ আরও গাঢ় হয়েছে।

খোয়াই-এর উঁচু-নীচু। আমি চাইনি সমান করতে। চাইনি প্রকৃতির বুকে বালি কাগজের ঘষা। আমি আদিম। আমি নগ্ন। অসভ্য বর্বর আমি। যা পেয়েছি ঘুমিয়েছি তার চেয়ে বেশী। আমি আর উঠব না। থাকো তুমি—আমি আসি। তোমাদের অস্থির মজ্জায় মজ্জায়। হে বন্ধু বিদায়। ভরা হাড়িটা কাত হয়ে গেছে। ভেজা মাটির রঙ আরও গাঢ় হয়েছে।

সত্যকে চাইনি মিথ্যার প্রলেপে ঢেকে দেবো। ছিলাম যা—তাই আছি। উলঙ্গ তোমার সম্মুখে। দেখো—কাঁকড় বেছানো ওই রাঙা মাটিটাকে মাড়িয়ে। উঁচু মাথা তালগাছের শীর্ণ ছায়ায়। পোড় খাওয়া ধূসর চামড়ার আবরণে। পাবে আমাকে।

উঁইঢিপির মতো ভুঁইফোড় মাটির গন্ধ। মানুষজন গাছ-গাছালীদের মাতাল করেছে।

## ঈশা মহাম্মদ

১৯৮০ সালে রামকিঙ্করের মৃত্যুর পর বিড়লা এ্যাকাডেমিতে একটা শোকসভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় রামকিঙ্কর সম্বন্ধে প্রথম যে কয়েকটি কথা বলেছিলেন তা শিল্পীর জীবন এবং শিল্প সম্বন্ধে খুবই যথার্থ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'রামকিঙ্করের মতো নির্মোহ শিল্পী তিনি জীবনে আর দ্বিতীয় দেখেন নি। তিনি ছিলেন নিমগ্নচিত্ত, বাঁধনহীন একটি মানুষ। সেই মানুষটিকে চিনলেই তাঁর কাজগুলোকে বুঝতে অসুবিধে হবে না। কারণ তাঁর কাজ এবং তিনি ছিলেন একাত্ম।'

শিল্প সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর উন্মাদনা, প্রকাশবেদনা এবং প্রাণচাঞ্চল্য কোন সময়েই বাস্তব লাভক্ষতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষচিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, প্রভাবিত বা ব্যাহত হয়নি এবং সেই কারণেই তিনি যখন হাতের কাছে যা কিছু পেয়েছেন যেমন কাগজ, পেন্সিল, তেলরঙ, জলরঙ, মাটি, পাথর এবং সিমেণ্ট, কংক্রিট প্রভৃতির দ্বারা সৃষ্টির উন্মাদনায় কাজ করে গেছেন সেইসব কাজের স্থায়িত্ব বা যথার্থতা ইত্যাদির কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। সম্মান, সুখ্যাতি বা অখ্যাতি যেন কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করত না। তাই তাঁর বহু কাজ সময়ের ব্যবধানে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে গেছে বা হতে চলেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ফরাসী ইমপ্রেসনিস্টদের অনেকের ছবির অবস্থা (Physical condition) একই কারণে খুবই জীর্ণ। এর পিছনে হয়ত আরও একটা কারণ পরোক্ষভাবে কাজ করে, বিশেষ করে আমাদের দেশে। আমাদের দেশীয় এবং জাতীয়চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলো মানসিকতা আছে যার কারণে কোনকিছুকেই খুব স্থায়িত্ব দেওয়ার কথা আমরা পাশ্চাত্য দেশের মতো করে ভাবিনা। মহাকালের কোলে কি রইল বা রইল না তাতে কিবা আমাদের এল গেল। সুতরাং প্রকৃতি যুগ যুগ ধরে তার নিজের ভঙ্গিতে ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

শৈশব এবং কৈশোর গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটির পুতুল, প্রতিমা, চালচিত্র, পট প্রভৃতি নিয়ে খেলতে খেলতে এবং দেখতে দেখতে বড় হয়েছেন। তার মধ্য দিয়েই তাঁর সৃষ্টিশীল মন আন্দোলিত এবং উন্মেষিত হতে আরম্ভ করে।

সেটা ছিল জাতীয়তাবাদের যুগ, স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ সারা দেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। শিল্পীর স্পর্শকাতর সজাগমন তাতে সাড়া দিয়েছে এবং তারই মধ্যে সৃষ্টির আনন্দে ছবি, মূর্তির চর্চা করে গেছে। প্রথম যুগের সেইসব কাজের কোন নিদর্শনই আজ আর অবশিষ্ট নেই। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে চরিত্র গঠনের একটা দিক ছিল। সেই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই তিনি অর্জন করেছিলেন চরিত্রের দৃঢ়তা, ঋজুতা এবং নির্ভিকতা যা তাঁর পরবর্তী জীবনে শিল্প

সৃষ্টির ক্ষেত্রে সব প্রচলিত ধারণাকে উপেক্ষা করে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করবার ক্ষমতা এবং সাহস জুগিয়েছে। সেই স্বাধীনচেতা, বলিষ্ঠ, আত্মমগ্ন মানুষটি জীবনে লাভক্ষতির কথা ভাবেন নি। শুধু চেয়েছিলেন ভালবাসতে এবং ভালবাসা পেতে। চেয়েছিলেন তাঁর কাজের মাধ্যমে প্রকৃতির কোলে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পন করতে।

১৯২৫ সাল, তাঁর শিল্পী জীবনের একটা নতুন অধ্যায়ের শুরু। রামকিঙ্কর এলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং আরও কিছু দেশী-বিদেশী গুণীজন সান্নিধ্যে তিনি নিজেকে তৈরী করলেন একইসঙ্গে ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পী হিসেবে। কিন্তু তবুও ভাল করে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে; তিনি রইলেন ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি-র নব প্রবর্তিত শিল্পধারার বাইরে। এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা যেতে পারে যে শান্তিনিকেতনে যখন শিল্পী নন্দলালের ছত্রছায়ায় কলাভবনে ঐতিহ্যবাহী শিল্পভাষার প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছবি আঁকা আরম্ভ করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রথায়, যার সঙ্গে ইউরোপীয় এক্সপেসনিস্ট আন্দোলনের চরিত্রগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শিল্পী রামকিঙ্করের জীবনে তার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করার পরও শিল্পীকে আমরা প্রখ্যাত ভাস্কর হিসেবেই জানি। তিনি বীরভূমের লাল মাটিতে শক্ত শিমূল গাছের মতো সোজা দাঁড়িয়ে আছেন গায়ে কাঁটা আব মাথায় লাল ফুল নিয়ে।

প্রতিকৃতি ভাস্কর্যের মধ্যে যাঁরা তাঁর তৈরী 'মধুরা সিং,' 'বিনোদিনী' এবং 'রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি' দেখেছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে তাঁর শিল্পদৃষ্টি এবং দক্ষতা বহিরাবয়বের মোহময়তা ভেদ করে অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তাঁর কাজের মধ্যে এনে দিয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা স্বাদ, একটা প্রাণের উত্তাপ এবং অজানা সত্যের ইঙ্গিত।

'সাঁওতাল পরিবার' রামকিঙ্করের আর একটা অসাধারণ শিল্পসৃষ্টি। গড়নের মধ্যে দিয়ে একটা সমগ্রতা, একটা জীবনবোধের সাবলীল প্রকাশ কাজটির মধ্যে এমন এক ছন্দময় গতি এনে দিয়েছে যে তাকিয়ে দেখলে আজও আমার মনে হয় যেন শিল্পী এদের বড় কাছের লোক। তিনিও হেঁটে চলেছেন ওদেব সঙ্গে তপ্তরোদ্দুর মাথায় করে আর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলছেন—'চলে আয় সাহস করে, অত ভয় কিসের।' তবু আজও আমরা ওঁর মতো সাহস করে শিল্পের পথে বেরিয়ে পড়তে পারিনি।

### প্রকাশ কর্মকার

কিঙ্করদাই বলি, কারণ রামকিঙ্কর বললে লোকটাকে পরপর মনে হয়। সেই

কতদিন আগেকার কথা, আর্ট কলেজ শেষ করে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেছি। কিঙ্করদার কাছে বেড়াতে যাব সেটা একটা বিশেষ আকর্ষণ। কারণ লোকটা পালিশ করা নয়, মাটির দেয়ালে জল দিয়ে নিকিয়ে দিলেই যেন শুদ্ধ হয়ে যায়। সুন্দর হয়ে যায়। আমরা দুজনে ছিলাম। কিঙ্করদার ঘরে ভয়ে ভয়ে ঢুকেছি। একগাদা কাগজ নিয়ে বসে আছেন। কিছু কিছু খেলাচ্ছলে আঁকছেন, আবার চুপ করে বসে থাকছেন। ইতিমধ্যেই আমাদের দেখে বলে উঠলেন, 'আয় বোস। এই কে আছিস দু-মুঠো মুড়ি দিয়ে যা।' সঙ্গে সঙ্গে এক মহিলা এসে আমাদের মুড়ি দিয়ে গেলেন। ছোট কুনকের মতো একটা জায়গায় ভর্তি মুড়ি আর গুড়। 'খা খা—আমি ছবি আঁকি' —পরেই বোতলের শেষটুকু গলায় ঢেলে দিলেন। তখন প্রায় বারোটা—সাড়ে বারোটা। অনেক সময় ধরে দেখে দেখে কোন কথা না বললে শেষে বললাম, 'কিঙ্করদা একটু ঘুরে আসি।' 'আয়।'

বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুরে, এদিক ওদিক দেখে শুনে যখন আমাদের ফিরে আসার পালা, সে সময়ে মনে হল একবার দেখা করে যাই। আবার এলাম। দেখলাম—সমানে এঁকে যাচ্ছেন, তবে ঘর আরও নোংরা। আরও এলোমেলো। বোতলের মাত্রা বেশী। অর্থাৎ দুটি বোতল খালি। তিনটে শেষ হতে চলেছে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মাথা চুলকে বললাম, 'কিঙ্করদা অত মদ খাচ্ছেন কেন?' সঙ্গে সঙ্গে জবাব, 'তাহলে কি তোর পোঁদ খাব।' মাথা নীচু করে বেরিয়ে আসতে হোল। ইচ্ছে ছিলো দুটো ড্রইং নেবো। তা আর হোল না।

এই হোল কিঙ্করদা। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লোকই এই লোকটাকে বুঝতে পেরেছিলো। গরীব ও শয়তান হবার জন্য এই সেদিনও মানুষ কতো মূর্খ হয় তার একটা নমুনা দিই। মন্ত্রী মহোদয় শ্রীমান যতীন চক্রবর্তী মহাশয়কে ঘটনাচক্রানুসারে ওঁর ব্যাপারে আসতে হয়েছিলো। সেই মন্ত্রী মহোদয়ের বিশেষ কথাবার্তা যা উনি বিদেশে থাকাকালীন রামকিঙ্করের ভাস্কর্য সম্বন্ধে বলেছিলেন তা হয়তো পৃথিবীতে সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আর কোন মন্ত্রী মহোদয় বলেন নি। রামকিঙ্করের করা সেই মূর্তিটির আসল দিল্লীর ললিতকলা ভবনে এখনও আছে। সে যাক। কিঙ্করদার বিষয়ে কিছু লিখতে হলে যে কথাটি বলা উচিত সেকথায় এবার আসি।

আমাদের দেশীয় ঘ্রাণ ছেড়ে পারস্য, চীন, জাপান ও শেষসময়ে ইউরোপীয় পূর্বসমকালীন বা উত্তরসমকালীনতার প্রভাবে আমরা যখন দলিত হয়ে নড়বড়ে হয়ে আছি সেসময়ে কিঙ্করদা নিজের বিচ্ছুরণে এমন একটা জায়গায় এসেছিলেন যা বিশেষ ভারতীয়। সমকালীনতা, পূর্বসমকালীনতা বা উত্তরসমকালীনতা সবই একাকার হয়ে ভারতীয় আত্মায় তাঁর মূর্তিকলার যে উত্তরণ তা অদ্বিতীয়। আর সেজন্যই কিঙ্করদা।

ভারতীয়তা বলতে যদি রূপবন্ধ আঙ্গিক হয়, ভারতীয়তা বলতে যদি লালিত্য ও রূপের রেখা সমৃদ্ধ ও একমাত্র অলংকরণ হয়, তাহলে সে ছবি, ছবি হবে কেন?

সমকালীনতায় ইউরোপ যা আমাদের দেখিয়েছে—সেদিক দিয়ে বলা যায় ইউরোপের কাছে আমরা বিশেষ ঋণী। ধরা যাক অবনীন্দ্রনাথের ছবির কথা, শাজাহানের দুঃখ কিংবা ভারতমাতার দুঃখ, সে দুঃখ বা সুখ বা অনুভূতি আমাদের যত না আঘাত দেবে তার থেকে ইউরোপের সমকালীন ছবি আমাদের বোধকে অনেক বেশী নাড়া দেবে কিভাবে দেবে ? তা পরে বলছি। আবার ইউরোপীয় ধরনে আমরা যদি দেশীয় মানুষজন ও পরিবেশের ছবি আঁকি তাতে শুধু ইউরোপীয় অনুকরণ হয়ে যাবে আমরা কি স্রষ্টা হিসেবে জ্যাকেট ( পোষাক ) পাল্টিয়ে বিদেশীদের নকল করবো ? শুধুমাত্র তাই হবে আমাদের মতো গরীব দেশে স্বীকার্য ? নিশ্চই না।

গরীব দেশের বিশেষ চরিত্র থাকে। বিশেষ করে যে দেশগুলো কলোনিয়াল। তাঁদের কাছে প্রযুক্তি থেকে শিল্পকলা এসবেব যে বিরাট চাপ তা সমাজে পড়তে বাধ্য। প্রযুক্তির লেনদেন নিয়ে যে বিত্তশালী লোকগুলো সরকার ও শাসনের মধ্য দিয়ে সমাজ ও দেশকে শোষণ করে তাঁদের মধ্যে প্রযুক্তির যুক্তিবদ্ধতার ফাঁকে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব এসে পড়বেই। আসতে বাধ্য। আমরা আজ সেই দোষে দুষ্ট হয়ে পীড়িত হয়ে আছি। একমাত্র কিঙ্করদা এর ব্যতিক্রম। এই যে ব্যতিক্রমতা, তা কিন্তু সচেতনভাবে নয়। প্রকৃতির আবেশের মধ্যে যে স্বকীয় রূপ নির্ভয়ে থাকে—যে আওয়াজ—যে গান—যে কলা—যে নৃত্য—যা সাবলীল—তা কে শেখায় ? বরঞ্চ পালিশ করতে গেলে তা খারাপ হয়ে যাবে। কিঙ্করদাও তাই খারাপ হননি।

ঐ শান্তিনিকেতনেই অনেকে তা সহ্য করেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পাখীর ডানার মতো আগলে রাখতেন। তারও কারণ আছে। একটাই কারণ যা হতে পারে তাহল, রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসাবে মহান। অবনীবাবুরা যে সময়ে শিবদুর্গার ছবি আঁকছেন, সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের সমকালীনতায় দংশিত হয়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। তিনি ছবি আঁকতে জানতেন ? না। তাহলে ? তিনি ছবির আত্মাটাকে ধরেছিলেন, যে আত্মা, যে নমনীয়তার ঘর্ষণ প্রাচ্যে আছে। যা ইউরোপে নেই। আর সেজন্যই রবীন্দ্রনাথের ছবি অনেকের চেয়ে ছবি হয়ে আছে। বাকী যাঁরা, তাঁরা হচ্ছে এস্টাবলিশমেণ্ট।

হয়তো আমার কথা অনেকের বোধগম্য হচ্ছে না, তাহলেও আমি যে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি তা আমাদের সময়ে সব থেকে বেশী গ্রাহ্য হওয়া উচিত। মিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে কেন অমিত্রাক্ষর-মিত্রাক্ষর ছন্দ হবে, কোন অবচেতন মনে এ তাগিদ জন্মায়, কেন জন্মায়—এসব ভাবতে হবে। ছবিতেও তাই। লালিত ললিত রেখা, এবড়ো-থেবড়ো রেখা, সরু-মোটা রেখা, হতাশার রেখা এসব কেন থাকবে ? কারণ সমকালীনতাই যে সুখদুঃখে ভরা। বৈভব ও মৃত্যু একই বিন্দুতে যে ! আরো কারণ, আমাদের উপর ধর্মের এস্টাবলিশমেণ্ট চাপানো নেই! বোদলেয়র যেমন প্রথমে বলেছিলেন, নরকেও ফুল ফোটে—তার আগে শুধু স্বর্গেই ফুল ফুটতো

গরীব দেশে প্রযুক্তির আমদানিবিশেষে সমাজব্যবস্থা পাল্টাতে বাধ্য। সুতরাং

তাতে যদি দেশের সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটিয়ে দিতে আমরাও শিল্পী হুসেন কিংবা দিল্লীর পরাধীন যে তখতগুলো আছে তাদের অনুসরণ করি তাহলে আমরা নিঃশেষ হয়ে যাবো। যা হতে চলেছে, যেমন ধরা যাক খাজুরাহ কিংবা কোনারক মন্দিরের ঘোড়া। সে ঘোড়ার আদল মুছিয়ে দিয়ে ইংরেজরা তাঁদের মতো ঘোড়া আঁকতে আমাদের শিখিয়ে দিলো। আজও আমরা তা ভুলতে পারছি না। দোষটা কার? আমাদের। সেদিক থেকে কিঙ্করদা ঈশ্বর।

## রবীন মণ্ডল

এখানে আমরা শিল্পী রামকিঙ্করকে কোন নিরীখে চিহ্নিত করবো? রামকিঙ্কর নিশ্চয় দর্শক সাধারণের কাছ থেকে নিজস্ব শিল্পরীতির জন্য appreciation demand করেন নি। 'God' শব্দটি যদি অনাবিল, অকপট সরলতা এবং ভোগ-ঐশ্বর্যের প্রতি ঔদাসীন্যের সমার্থক কিছু বোঝায় তাহলে রামকিঙ্করকে নিশ্চিতভাবে 'God' আখ্যায় ভূষিত করা অপরাধ হবে না। আবার নিজের দিক এবং দর্শকের দিক সামলে চলতে গেলে যে রফা বা compromise-এর কথা ওঠে রামকিঙ্করের ক্ষেত্রে তাও প্রযোজ্য নয়।

আসলে রামকিঙ্করের ব্যক্তিস্বভাব, তাঁর শিল্পচেতনা, তাঁর নির্ভার উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ সবকিছুর মধ্যেই তাঁর বন্ধনহীন স্বভাব ধরা পড়ে। নিজেকে জাগতিক সবরকম বন্ধন থেকে মুক্ত রেখে শিল্পকে নিয়ে তাঁর খেলা, যে খেলা তাঁর কাছে হারজিতের হিসাবের বাইরে।

নিজের সৃষ্টির প্রতি মমত্ব কার না থাকে? তা সন্তান-সন্ততি হোক আর শিল্প-সৃষ্টিই হোক। কিন্তু রামকিঙ্করের শিল্পীজীবনে নিজের সৃষ্টির প্রতি এক বিচিত্র ঔদাসীন্য আমাদের অবাক করে। একারণেই সম্ভবতঃ তাঁর সমগ্র শিল্পকর্মের কোন তালিকা প্রস্তুত অথবা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

রামকিঙ্করের নিরাভরণ গ্রাম্যতা তাঁর বিশুদ্ধ passion-কে চালিত করেছে. যা তাঁকে শীত-গ্রীষ্মের কাঠিন্য, প্রকৃতির রূঢ়তার মধ্যে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করেছে। স্বাচ্ছন্দ ও শৌখিনতার কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। নিজের ভিতর থেকে যখন যে তাগিদ অনুভব করেছেন তখন তা চিত্রায়িত বা ভাস্কর্যায়িত করেছেন তাঁর দুর্দম জীবনাবেগের তাড়নায়। তিনি নিজের পরিবেশ, মানুষ এবং প্রকৃতিকে গভীরভাবে জানতেন। জানতেন তাঁর স্বভাবজ শিল্পচেতনার উৎস ও প্রকৃতিকেও।

রামকিঙ্করের শিল্পমানসের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এখানে সূত্র বা উৎস একই ভূমিজ। ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাস একারণেই রামকিঙ্কর বিরলতম ব্যক্তিত্ব। যাঁর শিল্পী জীবন উন্মুক্ত প্রাকৃতিক

পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যাঁর চরিত্র ও শিল্প কোনদিককেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়।

ঋতু পরিবর্তনের মতো তাঁর শিল্পকর্মের প্রকৃতিও ছিল পরিবর্তনশীল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার মতো তাঁর কাজে রিয়ালিস্টিক, কিউবিস্টিক, সুররিয়ালিস্টিক, এক্সপ্রেসনিস্টিক প্রভৃতি নানা রীতির সঙ্গে কোনারকের ভাস্কর্যের প্রকৃতিও অদৃশ্য থাকেনি। আসলে গতিময়তাই তাঁর শিল্প বিন্যাসের হাতিয়ার। তাঁর সমকালীন শিল্পজগতে যখন পেলবতা, নিটোলতার মধ্যে ভাবরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা তখন তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন মানুষের চলমান জীবনকে ঘিরে। ছবি বা ভাস্কর্য উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর অনমনীয় বলিষ্ঠতা, ঋজুতা বিষয়ানুগ হয়ে এক বিচিত্র চেতনার সৃষ্টি করে। বাইরের রূপাবয়বের সঙ্গে ভিতরের অন্তর্লীন চেতনাপ্রবাহ তাঁর শিল্পকর্মকে এক গভীর অনুভূতিতে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

ছবিকে ছবি বা মূর্তিকে শুধুমাত্র মূর্তিতে রূপান্তরিত করে চমক সৃষ্টি বা আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারে তাঁর নির্লিপ্ততা আশ্চর্যরকমের স্পষ্ট। 'বেঙ্গল স্কুলের' প্রচলিত ভাবনার দায় থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন অনাবিল ঔদাসীন্যে। এই উদাসীনতার কারণ, মনে হয়, তাঁর চরিত্রের আদিম গতিময়তা।

ছবির ক্ষেত্রে তাঁর রেখা এবং বর্ণের ব্যবহার বিষয়ভিত্তিক ছিল বলেই আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের অন্বেষণে তিনি হারিয়ে যাননি। বরং বলা যায় বিষয়ের সঙ্গে রীতি বা আঙ্গিক তাঁর কাছে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে চলে আসে। বিষয়ভিত্তিক ছিলেন বলেই প্রকাশভঙ্গীমার স্বভাবজ উদ্দীপনাকে আশ্রয় করে তিনি রীতিপ্রকরণকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

তাঁর ভাস্কর্যে আদিম উদ্দামতার মধ্যে যে মনুমেণ্টালিটি তা তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এবং একারণে তা স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাবলীল। তাঁর কাজে কোন বাহুল্য ছিল না, ছিল ঋজুতা, বলিষ্ঠতা, অনমনীয় মনের প্রকাশ। এবং এই সরল বলিষ্ঠতার কারণে তিনি কমিউনিকেটিভ হয়ে উঠেছেন। তাঁর কাজে সাধারণ দর্শক থেকে শিক্ষিত অভিজ্ঞ শিল্পরসিক সকলেই আকৃষ্ট হন। তাঁর সময়ের অনেক ভাস্কর সেভাবে সচেতন ছিলেন না। তঁদের কাজে একধরণের আরোপিত ব্যক্তিত্বের লক্ষণ স্পষ্ট। ফলে বলা যায়, তাঁদের কাজ কিছুটা আধুনিক গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসাবে থেকে গেছে অলংকরণাত্মক ভঙ্গীমায়। আবার কারও কাজ বুদ্ধির তাড়না ছাড়া হৃদয়াঙ্গম করা সহজসাধ্য নয়। ফলে তা ব্যাপকতা থেকে বঞ্চিত।

শিল্পকলার জগতে ব্যক্তিমানুষ এবং শিল্পব্যক্তিত্বের আত্মীকরণ খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। স্রষ্টার মধ্যে যে মানুষ এবং শিল্পী তার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। অনেকের কাছে শিল্প তাঁর ব্যক্তিত্বের সজ্জা বা অলংকরণ। এবং এই বিশেষণের মারফৎ সমাজের কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করা বিশেষ কষ্টকর নয়। অর্থাৎ শিল্পীর

involment বলতে যা বোঝায় তার সন্ধান প্রায় উহ্য থেকে যায়। পরিবর্তে যা দেখি, তা তাঁদের সস্তায় বাহবা পাবার আকুলতা। বক্তব্যে এবং বিন্যাসে যা গভীর তা প্রায়শঃ তাঁদের কাজে অনুপস্থিত।

রামকিঙ্করকে বাদ দিলে তাঁর সমকালীন শিল্পজগৎ অসম্পূর্ণতায় ম্রিয়মান। কারণ ঠিক অর্থে ভারতীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে আধুনিকতা বলতে যা বুঝি তার স্রষ্টা হিসাবে রামকিঙ্করকেই চিহ্নিত করা যায়। তাঁর গুরু নন্দলালের মধ্যে যে আধুনিকতার শুরু রামকিঙ্করের মধ্যে তার ব্যাপ্তি এবং বিকাশ। সূচিত সময় রাম-কিঙ্করকে এক জায়গায় বাঁধতে পারেনি। গতিপ্রবণতাই সবসময় তাঁর রচনাকে সজীব করে তুলেছে।

জাগতিক প্রয়োজন কেন রামকিঙ্করকে আকৃষ্ট করেনি, কেন স্বভাবের দিক থেকে তিনি সবকিছু সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বেঁচে থাকার স্বাচ্ছন্দ্যকে অবলীলাক্রমে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অথচ সুযোগ-সুবিধার বিশেষ অভাব ছিল বলে মনে হয় না। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাটা কখনই তাঁর কাছে খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়নি। শিল্পের বাস্তব মূল্য কতটা তাও তাঁর কাছে জানার বিষয় ছিল না। নিজেকে প্রকাশ করা, নিজেকে কাজের মধ্যে খুঁজে পাওয়াই তাঁর মুক্তি।

তাঁর কাজে অবিলম্বে যে দিকটি আমাদের নজরে পড়ে তা হচ্ছে ছবি বা ভাস্কর্যকে নয়নসুখকর করে গড়ে তোলার ব্যাপারে তীব্র অনীহা। শিল্প-ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতাকে কোনভাবেই তিনি খর্ব করতে নারাজ। এ মনোভাব তাঁর সমকালীন শিল্পকলার জগতে দুর্নিরীক্ষ।

চিত্রকলা থেকে ভাস্কর্যে রামকিঙ্কর অনেক বেশী স্বতঃস্ফূর্ত, বলিষ্ঠ এবং সাবলীল। মনে হয় মাধ্যমগত কারণে এবং সময়ের দিক থেকে তিনি চিত্ররচনায়, বিশেষ করে তৈলচিত্রের ক্ষেত্রে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে পারেন নি। জলবর্ণের ক্ষেত্রে তিনি বরং বেশী সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন। তবুও একথা বলা যায় যে ছবির ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বলিষ্ঠতার প্রয়োগে দ্বিধা করেন নি। চিত্ররচনাতেও তাই তাঁর শিল্প ব্যক্তিত্বের বিকাশ বেশ স্পষ্ট। আসলে তিনি নিজস্ব পরিমণ্ডলে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং মানুষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই শিল্পের পথে যাত্রা করেছিলেন। এবং সেইভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে গেছেন।

## শর্বরী রায়চৌধুরী

অধ্যাপনার সূত্রে আমি যখন শান্তিনিকেতনে যাই তখন কিঙ্করদা অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়েছেন। সেইসময় সেরকম কাজ করার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। এর

আগে তাঁকে ছবি বা মূর্তি করতে দেখলেও তখন তাঁকে দু-একবার ছবি আঁকতে দেখেছি। কিন্তু কোন স্কাল্পচার বা মূর্তি করতে দেখিনি।

কিঙ্করদার কাজ সাংঘাতিক পাওয়ারফুল। আমার কয়েকটা কাজ খুব মনে পড়ে। যেমন দিল্লীর রিজার্ভব্যাঙ্কের জন্য 'যক্ষ-যক্ষী'র অনেকগুলো সিরিজ। উনি প্রথমে কুষাণ পিরিয়ডের 'যক্ষ-যক্ষী'র একটা আর্টিস্টিক কপি করেন। মানে মাছি মারা কপি নয়। তারপর এটা থেকে আস্তে আস্তে ইভলভ করে নিজে যা তৈরী করলেন তার একটা 'যক্ষী' দেখে আমি তো অবাক! এরকমও হতে পারে? মোটা করে তৈরী ফিগার। প্রায় সাড়ে তিন/চার ফুট উচ্চতার প্লাস্টারে তৈরী ন্যুড। পা-দুটো বোধ হয় একটু ফাঁক করে দাঁড়ানো। গলায় বোধহয় একটা গহনা। বুক থেকে আরম্ভ করে কোমর, তলপেট, পা—সুন্দর-পরিচ্ছন্ন রেনডারিং আর এত সহজে ঐ মেয়ের ফর্মটাকে নিয়ে এসেছেন ভাবা যায় না। দুটো-তিনটে ব্রাস স্ট্রোকে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে না অথচ ক্ল্যারিটি। এরকম একটা ব্যাপার। কাজটা দিল্লীতে আছে। ওটার কথা আমার মাঝেমাঝেই মনে হয়।

তারপর কয়েকটা হেড। সাংঘাতিক। একটা মেল হেড। চোখগুলো বেরিয়ে এসেছে। মোচ আছে। না, রবীন্দ্রনাথ নয়। তারপর ঐ যে গান্ধীজি। দারুণ!

কেউ কেউ জিয়াকোমিট্টির থেকে অনেক গ্রেট বলেন কিঙ্করদাকে। কিঙ্করদার কথাতেই মনে হয়েছিল জিয়াকোমিট্টিকে খুব একটা পরোয়া করতেন না।

কিঙ্করদার কাজে আঞ্চলিক (Local) বা সাধারণ বিষয় নিয়ে এমন একটা শিল্পগুণ এবং ভারতীয় গন্ধ আছে যেটা খুবই কম দেখা যায়, যেটা আমাদের কোন-দিন হলো না। সাঁওতাল জীবন নিয়ে উনি অনেকদিন ধরে খুব স্টাডি করেছেন। এবং তাঁর নিজস্ব স্টাইলে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এত সুন্দর করে ধরেছেন—তার তুলনা নেই। আজকাল সাঁওতালী মেয়েদের কাছ থেকে দেখছি। কিন্তু ভাবা আর দেখাটা একসঙ্গে হচ্ছে না। এটা আমার ডিফেক্ট হতে পারে। কিঙ্করদার করা একটা সাঁওতাল মেয়ের এচিং আছে আমার কাছে। ঘাসের মধ্যে যেতে যেতে একটা সাঁওতাল মেয়ের শাড়ীতে চোরকাঁটা বিঁধেছে. অন্য একটি সাঁওতাল মেয়ে তা পরিষ্কার করে দিচ্ছে—বিষয় বলতে এইটুকু। সুন্দর ড্রইং। ছবির নীচে সাবজেক্ট লিখে দিতে হয় না। অথচ পরিষ্কার।

আমার মনে হয়েছে কোন ভারতীয় শিল্পী কিঙ্করদার মতো এত ভালো ওয়াটারকালার করেন নি। একদিন এক বন্ধু, পি এল. দেশপাণ্ডে, বলেছিলেন, 'কিঙ্করদার কিছু ওয়াটারকালার আছে শুনেছি—দেখতে চাই।' ওঁকে নন্দন'-এ নিয়ে যাই। স্পেশাল পারমিশন নিয়ে ঐসব ছবি বার করা হলো। উনি বসে বসে একঘণ্টা ধরে দেখে—উঠে এসে বললেন, 'মস্ত বড় মিউজিক কনফারেন্সের মাইফেল শুনে এসে যেমন আনন্দ, তার থেকে কিছু কম হয়নি। বরং বেশী হয়েছে। এ আমি কি দেখলাম?' একটু লাল দিয়ে ওয়াটারকালারে একটা ঘোড়ার ড্রইং জীবনে

ভুলব না আমি।

তারপর একটা ঘোড়া। স্কাল্পচার। ঘোড়াটাকে একটা লোক দলাইমলাই করছে। মাসাজ করছে। কাজটা দারুণ। দিল্লী নিয়ে গেছে।

কিঙ্করদা খুব মজার মজার কথা বলতে ভালোবাসতেন। আর ওরকম একটা ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে দেখেছি বলে মনে হয় না। গানও পছন্দ করতেন খুব। ক্ল্যাসিকাল গানে ওঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিঙ্করদার ভেতর ফর্ম, স্ট্রেংথ, স্ট্রাকচারের যে কোয়ালিটি বা ফিগার আছে সেধরনের গান হলে খুব উপভোগ করতেন। এসম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন। অনেকবার বলেছেন, 'তোমার কাছে ভাগনার আছে? ভাগনার ? ভাগনার আমার খুব ভালো লাগে। ভাগনারের মিউজিক দারুণ। সত্যজিৎ আমাকে অনেক শুনিয়েছে। তুমি আমায় একটু ভাগনার শোনাও।' মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে ঐরকম ভল্যুমে গেয়েও ফেলতেন।

নিজস্ব স্টাইলে গাইতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। এক-একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত উনি এমনভাবে গেয়েছেন যে রবীন্দ্রভক্তরাও কেউ এমন গাইতে পারেনি। এইসব গানে এমন একটা প্রাণঢালা দরদ ছিল যেটা আর্টকে ছাপিয়ে গেছে। সেই কিঙ্করদাকে যখন 'পদ্মভূষণ' দেওয়া হলো উনি নিজেই 'পদ্মভূষণ', 'পদ্মশ্রী'র তফাৎ করতে পারছেন না—'কি যে আমাকে দেওয়া হচ্ছে।' একটা সম্বর্ধনা দেবার জন্য আনা হলো তাঁকে। একটা গান গাইতে বলা হলো। উনি গাইলেন—'সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।' এই গানটা গাইতে খুব ভালোবাসতেন। আর গাইলেই দুচোখ দিয়ে গড়িয়ে আসতো জল। আমি কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছি—'কি ব্যাপার ?' তা উনি বলতে চাইতেন না।

## শুভাপ্রসন্ন

শিল্পী রামকিঙ্করের প্রথম পরিচয় হয় চিত্রশিল্পে। এক স্বাভাবিক দক্ষতায় শান্তিনিকেতনের সমসাময়িক শিল্পীবন্ধুদের থেকে তাঁর অনুশীলনপর্ব অন্যধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। যে রামকিঙ্করকে আমরা চিনি ক্ষিপ্ররেখা, দ্রুত রঙলেপন কিংবা সিমেন্ট-পাথরের অতিদ্রুত আবেগ সঞ্চারিত মূর্তিশিল্পী হিসাবে—তিনি যে কি অসাধারণ নিষ্ঠায় ও সংযতভাবে ওয়াস পদ্ধতিতে মিনিয়েচার ছবির আকারে গোড়ার দিকে কাজ করেছেন—তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

মিশ্রপ্রণালীতে সেসব অসংখ্য ছবি এ'কেছেন, সে সবের বেশীরভাগই রেখা—প্রধান। সে সময়ে শান্তিনিকেতনে মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর ধরনে তাঁর ছাত্ররা অনেকেই এধরনের রেখাচিত্র এবং মিশ্রমাধ্যমে কাজ করতেন। বিভিন্ন পশুপাখী, মানুষজন বা প্রকৃতি-পরিবেশই ছিল এইসব ছবির প্রধান বিষয়। এর কিছুপরেই

রামকিঙ্কর একেবারে নিজস্বরীতিতে অত্যন্ত বলিষ্ঠরেখায় সাদাকালো অনেক ছবি করেন এবং যা ছিল শান্তিনিকেতনের পরিচিত ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এসব ছবিতে রামকিঙ্কর অনেক সমকালীন, মানবতাবাদী ও আন্তর্জাতিক আঙ্গিকে একজন পূর্ণ ভারতীয়।

ভাস্কর রামকিঙ্করকে চেনা যায় ছবির ঘনত্ব আর অত্যন্ত বলিষ্ঠরেখার ব্যবহারে, যা পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মাইকেল এঞ্জলো থেকে শুরু করে রঁদা, জিয়াকোমিট্টি, হেনরী ম্যুরের কাজে আমরা লক্ষ্য করেছি।

পরবর্তীকালে বহু ছবি ক্যানভাসে তেলরঙে এঁকেছেন। এসব ছবিতে প্রধানতঃ কিউবিজম-এর প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও অভিব্যক্তিবাদই তাঁর ছবির প্রধান দর্শন ও আঙ্গিক বলে মনে হয়। কোন বিশেষ স্বকীয়তার সন্ধানে বেশীরভাগ তেলরঙের ছবিই তিনি সাধারণ গুঁড়োরঙের ( আর্থকালার, অক্সাইডকালার ) সঙ্গে লিন্সিড অয়েল মিশিয়ে আঁকতেন। অনেকসময় ছবিতে রঙ ও তেলের মিশ্রণ ঠিকমতো না হওয়ায় ক্যানভাসে একটু অন্যধরনের বুনন ও প্রতিক্রিয়ার আভাস দেখা যায়। নানা কারণে যা কিছু শ্রেষ্ঠ কাজ তিনি তা মাত্র কয়েক বছরে সম্পন্ন করেন। অল্প কয়েকটি ভাস্কর্য, যা ভারতবর্ষের সমকালীন শিল্পের চিরকালীন সম্পদই শুধু নয়—বিশ্বের কাছে ভারতীয় আধুনিক শিল্পের অত্যন্ত উজ্জ্বল উদাহরণ। আমার ধারণা চিত্রশিল্পে তিনি যদি আরো সংগঠিতভাবে কাজ করে যেতেন তাহলে তা ভারতীয় সমকালীন শিল্পে একটি বিশেষধারার প্রবর্তন করত। এবং যার বহুল সম্ভাবনা ছড়িয়ে আছে তাঁর বিক্ষিপ্ত বহু কাজে।

অত্যন্ত সরল, স্বাভাবিক ও মরমী এই শিল্পী তাঁর সমস্ত বেদনা আর আনন্দ-বোধের যে দান পৃথিবীর কাছে রেখে যেতে চেয়েছিলেন, কিছু সাধারণ মানুষ, তথা-কথিত বন্ধু ও গুণগ্রাহী এই সরল তাপসের সে স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন বুঝতে পারেন নি। তাঁরা তাঁদের জাগতিক রক্তমাংস-কামনাবাসনারবোধে শিল্পী রামকিঙ্করের জীবন-যাত্রায় নাটকীয় রসদ খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু পরিচিত নাটকীয় জনপ্রিয়তার কোলাহল তাঁকে সরিয়ে রেখেছিল তাঁর নিজস্ব বেদনা, আনন্দ আর সৃষ্টি-উল্লাসের মগ্নতা থেকে। হয়তো আমরা একজন শিল্পীর শিল্পকীর্তির চেয়ে তাঁর জীবন নাটকেই বেশী কৌতূহলী। ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে পড়া দুটি পরস্পরবিরোধী ঘটনা থেকেই এই অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলাম।

প্রথম ঘটনাটি হলো ঃ ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে কলকাতার একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের তরফ থেকে কলকাতার প্রকাশ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলির সমালোচনা করার জন্য তাঁকে দিনভর ঘুরিয়ে মূর্তিগুলি দেখানো হয়। এইকাজে অগ্রণী ছিলেন কলকাতার একজন বিশিষ্ট শিল্পী। এজাতীয় কাজ রামকিঙ্করের স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁর সরল-দিলখোলা বাউল মনে, কোন ঝোঁকে মূর্তিগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়ে নেওয়া হয়। লোকপ্রিয় পরিবেশনার জন্য সেগুলো ধরে রাখেন চতুর

সাংবাদিক। সেগুলি ঐ দৈনিকপত্রে বিধৃত হওয়ায় ক্ষুব্ধ হন অনেকেই। বিশেষভাবে মনে আছে প্রবীন ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কথা। ঐ মন্তব্যে তাঁর ক্ষোভ ও অভিমান জানিয়ে ছিলেন আমায় এবং যা তাঁকে আঘাত দিয়েছিল। এ ভূমিকায় শিল্পী রামকিঙ্করকে ব্যবহার করার প্রতিবাদে ঐ পত্রিকায় আমি দীর্ঘ প্রতিবাদপত্র লিখি। তার প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী হয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো ঃ ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতার এক প্রভাতী সংবাদপত্রের একটি ছোট্ট সংসাদে বিচলিত হই এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পত্রিকায় একটি ক্ষুব্ধপত্রে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ জানাই। সংবাদটি ছিল বুদাপেস্ট-এ রক্ষিত রামকিঙ্করকৃত রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ আবক্ষমূর্তিটির অপসারণ-কল্পে তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রীর দৌত্য, যা আমাদের দেশে শিল্প ও শিল্পীকে জানার এক চূড়ান্ত হাস্যকর উদাহরণ। জীবন সায়াহ্নে, রোগশয্যায় শায়িত শিল্পী রামকিঙ্করের কানে সে খবর পৌঁছায়। 'পছন্দ না হলে তুলে ফেলে দিক'—এই কথা বলে তিনি তাঁর স্বাভাবিক উদাত্ত হাসিতে ঢেকে দেন সেসবের প্রতিক্রিয়া। এইসব রাজনীতির মানুষের কথা বাদ দিয়ে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন দেখি সেই সংবাদের পক্ষে ও আমার প্রতিবাদ পত্রের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ, প্রবীনা সাহিত্যিকা থেকে শুরু করে বহু মানুষই রামকিঙ্করকৃত ঐ মূর্তিটির বিষয়ে মন্ত্রীর দৌত্যকে সাধুবাদ জানান। আমাদের সৌভাগ্য অবশেষে কিছু দায়িত্ববোধসম্পন্ন মানুষের প্রতিবাদে মন্ত্রীমহাশয় সেই কাজ থেকে বিরত হন।

আমি তাঁকে দেখেছি। কিন্তু পরিচিত ছিলাম না। বহু বয়স্ক শিল্পী এবং রসিকজন আছেন তাঁরা তাঁকে যেভাবে দেখেছিলেন আমি তাঁকে সেভাবে দেখিনি। সুতরাং সে অর্থে তাঁকে নিয়ে লেখার স্পর্ধা আমার নেই।

## যোগেন চৌধুরী

কি এক রহস্যময় সৃষ্টি
স্বর্গ এবং পৃথিবীর বহু পূর্বে বিরাজ করত
শূন্য ও নীরবতার মধ্যে তার জন্ম
একাকী স্থির এবং অপরিবর্তনীয়
সে সর্বদা বিরাজমান এবং গতিময়
তা মুহূর্তে সহস্র বস্তুকে সৃষ্টি করছে।

লাও এত সু রচিত 'তাও'-এর পঁচিশতম দর্শনতত্ত্ব থেকে।

রামকিঙ্কর যখন বেঁচে ছিলেন সেসময় নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ছিলেন যাঁরা তাঁর কাজ দেখে বিস্মিত হতেন, ভাবতেন এ কেমন ধরনের কাজ বা

কি এমন বিষয় লুকিয়ে আছে তাঁর ছবি বা ভাস্কর্যের মধ্যে যার জন্য রামকিঙ্কর এত বড় শিল্পী। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও অনেকেরই এমন দুর্ভাবনা ছিল। যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একথা বলছি তখন মাটিতে আসন পেতে রঙ-তুলি গুছিয়ে পরিপাটি করে বসে ছবি আঁকা হোত। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রামকিঙ্করের ছবি ও ভাস্কর্য অনেকটা অগ্ন্যুৎপাতের মতো। তখনকার দিনে যে নিপুণ শিল্পনিয়মানুবর্তিতার বিধিনিষেধের স্থিরতার মধ্যে শিল্পকলা বিষয়টি আবদ্ধ ছিল সেখানে তিনি তাঁর দু'টি শক্ত অথচ আন্তরিক হাত দিয়ে বাঁধ ভাঙলেন, যাঁরা তাঁর কাজ দেখে ভুরু কুঁচকে ছিলেন, সুখের কথা, তাঁদের প্রতি গুরু নন্দলালকেও একসময় বলতে হয়েছিল—'কিঙ্করের সিদ্ধিলাভ হয়েছে, ও সব করতে পারে।'

রামকিঙ্কর গ্রাম থেকে এসেছিলেন। মাটির সঙ্গে, গ্রামের মানুষের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ। কোথাও তাতে অস্পষ্টতা ছিল না। একথা তো সত্যি নয় যে বড় শিল্পী হতে গেলে শহুরে হতে হবে, 'শিক্ষিত' হতে হবে। মূলকথা হল শিল্পীর শিল্প প্রতিভার 'ব্যাপ্তি' এবং 'অস্তিত্ব'। শান্তিনিকেতনের অনুকূল সাংস্কৃতিক পরিবেশে, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এবং গুরু নন্দলালের মতো শিক্ষকের সংস্পর্শে রামকিঙ্করের অসাধারণ শিল্প প্রতিভার বিকাশ হতে কোন অসুবিধা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ রামকিঙ্করের শিল্পপ্রতিভাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। চেয়েছিলেন রামকিঙ্কর তাঁর হাতে তৈরী ভস্কর্য দিয়ে শান্তিনিকেতনের খোলা প্রকৃতিকে সাজিয়ে তুলবে।

পশ্চিমী শিল্পের প্রভাব ছাড়াও কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্ভবতঃ রাম-কিঙ্করের শিল্পানুভূতি ও স্বাধীন চেতনার উন্মেষে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আধুনিকতাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে বা গ্রহণ করতেও গুরুদেবের শিল্পচর্চা সম্ভবতঃ তাঁকে অনেকাংশে সাহায্য করেছিল। রামকিঙ্করের সতেজ প্রাণময় এবং অনুভূতিশীল মন শিল্পচর্চা ও সৌন্দর্যতত্ত্বের গভীর বিষয়টি স্বচ্ছন্দে অনুধাবন করতে পেরেছিল। তথাকথিত শিক্ষার অভাব সেখানে বাধা হয়ে ওঠেনি। বরং পশ্চিমী আধুনিকতা ও ভারতীয় পারম্পর্যের দ্বন্দ্বকে তিনি বুঝতে ভুল করেন নি। তাঁর সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব ভারতীয় শিল্পের পটভূমিকায় সেই দ্বন্দ্বের মাঝামাঝি থেকেও নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এদেশের জল হাওয়ায় পুষ্ট বহু ছবি ও ভাস্কর্যের জন্ম দিয়েছে।

আমরা বলি রামকিঙ্কর খুব বড় শিল্পী। তবে কত বড় শিল্পী তিনি? কি করেই বা বড় শিল্পী হলেন? মস্ত বড় শিল্পী তিনি একথা আমরা বহুবার বলেছি। সংক্ষেপে এবিষয়ে দু'একটি কথা বলি।

প্রকৃতই রামকিঙ্কর খুব বড় ভাস্কর এবং মস্ত বড় চিত্রকর। পশ্চিমদেশে জন্মালে এতদিনে তিনি পৃথিবী বিখ্যাত হতেন। একথা বলতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই।

কিন্তু একথা বলে আমরা তাঁকে নিশ্চয়ই মহত্তর করে তুলতে পারিনা। অনুভূতিশীল মন ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি শিল্পের জগতে এসেছিলেন। তিনি কেমন করে চলতেন, ফিরতেন, পোষাক পরতেন কিংবা মাটির ঘরে বাস করতেন এসব কিছু বড় কথা নয়—যদিও এগুলি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা প্রকাশ করে। কিন্তু মূলকথা হল তিনি আপাদমস্তক শিল্পী ছিলেন। এমন একজন শিল্পী, যাঁর কাজের সঙ্গে জীবনের সত্যিকারের সংযোগ ঘটেছিল। জীবনকে তিনি নিজস্বভঙ্গীতে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শিল্পচর্চা তাঁর কাছে শুধুমাত্র রঙ-তুলি-কাগজ কিংবা প্লাস্টার-মাটি বা সিমেণ্ট নিয়ে কারুকারী ছিল না। ছিল মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আত্মার অলৌকিক সম্পর্কের প্রতিফলন। তাঁর ছবি বা মূর্তির ভাঙাগড়াতে মিশে আছে সেই আবেগ ও অনুভূতি যা একজন মহৎশিল্পীর সৃষ্টির প্রেরণা কিংবা কারণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর তাবৎ বড় বড় চিত্রকর, ভাস্কর, কবি বা সঙ্গীতকারের ক্ষেত্রে যেমন একথা সত্যি, শিল্পী রামকিঙ্করের ক্ষেত্রেও তা ততখানি সত্যি। তাঁর ছবি বা ভাস্কর্যে রঙ-রেখা-ফর্ম-স্পেস-ভল্যুম—এ সবকিছু অর্থপূর্ণভাবে মিলেছে সার্থক শিল্পসৃষ্টির জন্য। সেই শিল্পকলা আমাদের এক অপার্থিব সৌন্দর্যের মুখোমুখি পৌঁছে দেয়।

রামকিঙ্কর বলতেন, গভীর অরণ্যের মধ্যে ফুল ফুটে থাকে, যেখানে হয়তো তাকে কেউ দেখবে না। ফুলের ফুটে ওঠাই কাজ এবং সার্থকতা। তিনিও তেমনি ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন। তাদের স্থায়িত্ব নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। এই মাটি, আকাশ, সূর্যালোক এবং ষড়ঋতু—সবাই মিলে এই ফুল ফোটানোর কাজে লেগে আছে। এবং তা একসময় শুকিয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও তাকে ফুটতে হয়। তিনি বলতেন, শিল্পীর কাছে লাভ-ক্ষতি বলে কিছু নেই, দেনা-পাওনা বলে কিছু নেই। সে এসব কিছুর জন্য অপেক্ষাও করে না। এই বিশ্বপ্রকৃতি এক বিরাট যাদুঘর এবং যা ঈশ্বরের সৃষ্টি তাই মূলতঃ শিল্পসৃষ্টির কারণ। কিন্তু শিল্পী যখন তাঁর রহস্যময় কুঠুরীর মধ্যে সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত হন, তখন সৃজনীশক্তির এক অপার্থিব আলোড়ন এবং সৃষ্টির আনন্দের মধ্যেই তিনি মগ্ন হন। তাঁর মতে শিল্পসৃষ্টি হচ্ছে রহস্যময়ী মিথ্যা মায়া। কিন্তু জীবনকে তা ভরপুর ও সার্থক করে তোলে।

শিল্পসৃষ্টি নিয়ে এমন নিস্পৃহ অলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ক'জন শিল্পী ভাবতে পারেন বা পেরেছেন। রামকিঙ্করের শিল্পসৃষ্টিকে যথার্থভাবে বুঝতে গেলে তাঁর জীবনবোধ ও বিশ্বাসকে বুঝতে হবে। যেখানে দেখা যাবে যে তাঁর বিশ্বাসবোধ ও জীবনচর্চার মধ্যে কোথাও এতটুকু খাদ ছিল না। এক্ষেত্রে তিনি সত্যিই ছিলেন প্রকৃতির কাছাকাছি।

রামকিঙ্করের ছবি ও ভাস্কর্যের গুণাগুণ নিয়ে ব্যাখ্যা ও বিচার, ভারতীয় শিল্পের পরম্পরা কিংবা পশ্চিমী শিল্পের পাশাপাশি তাঁর শিল্পকাজগুলি কিভাবে গড়ে উঠেছে, সেই ইতিহাস কিংবা প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন তাঁকে কতখানি প্রভাবিত

করেছে—এসব বিষয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হয়তো এখনো হয়নি। ভবিষ্যতে শিল্পানুরাগীরা কিংবা সমালোচকেরা সে কাজটি নিশ্চয়ই করবেন। তবে এই মুহূর্তে তাঁর বহু বড়-ছোট ভাস্কর্য, তেলরঙা, জলরঙা ছবি, অজস্র স্কেচ আমাদের সামনে রয়েছে। তা আমাদের আন্তরিকভাবে মুগ্ধ করে। ভারতীয়শিল্পের ইতিহাসে তিনিই প্রথম আধুনিক ভাস্কর এবং একজন মহোত্তম চিত্রকর।

## ইতি রামকিঙ্কর

..................

### প্রকাশ দাস

রামকিঙ্করের লেখা অল্প কয়েকটি চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে এপর্যন্ত। বালকবেলার বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে পোস্টকার্ডের এক পিঠে লিখে অন্য-পিঠে ছবি এঁকে পাঠাতেন রামকিঙ্কর। তবে তিনি চিঠিপত্র লিখতেন কম। লিখতেন স্বল্প পরিসরে। চিঠি বলতে আমরা যা বুঝি প্রাপ্ত চিঠিগুলির কয়েকটি তা নয়। বাঁকুড়ার বাড়ী ছেড়ে রামকিঙ্কর যখন পুরোপুরি শান্তিনিকেতনবাসী সেই-সময়ে বাঁকুড়াবাসী ভাইপো দিবাকর বেইজকে টাকা পাঠানোর সূত্রে মানি অর্ডার ফর্মের নীচে যে স্বল্প পরিসরটুকু সেই শূন্যস্থানে রামকিঙ্করের কলম থেকে একসময় ঝরে পড়েছিল স্বল্প কয়েক পংক্তি। পংক্তির সংখ্যা যতই সীমিত হোক না কেন সীমিত এই বাক্য সমন্বয়ের মধ্যে এগুলি এক ভিন্ন মাত্রা যোজনা করে ফিরে আসে আমাদের কাছে। সেই স্বল্প কয়েক পংক্তির মধ্যেই আমরা পেয়ে যাই ভিন্ন একজন মানুষকে। দেখা যাবে সেখানে তিনি শিল্পী-সন্ন্যাসী বা ঘোর শিল্পী-তান্ত্রিক নন। সংসার যাত্রায় বরাবর উদাসীন থেকেও দেখা যাবে তার প্রবল ঘূর্ণিস্রোত স্থির-অচঞ্চল প্রস্তরীভূত এক শিলাখণ্ডের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। আর যেন তিনি কেঁপে উঠছেন কোন এক অদৃশ্য রশির মৃদু টানে। হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া এইরকম কিছু চিঠির কথা বলছিলেন শ্রদ্ধেয় দিবাকর। যেগুলি শান্তিনিকেতন থেকে বাঁকুড়ার বাড়ীতে টাকা পাঠানোর সূত্রে একসময় লিখেছিলেন রামকিঙ্কর। সেই চিঠিগুলিতে ভাইপোর ছেলেমেয়েদের প্রতি গভীর মমত্ব আর ভালোবাসা তো ছিলই সর্বোপরি আরও যা ছিল তাহল তাদের শিক্ষা-দীক্ষা আর শরীরস্বাস্থ্যের প্রতি দৃঢ় সতর্কবোধ। লিখেছিলেন, 'ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করবি। আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হয়না—দেখ যদি হয়।' কোনটায় লিখেছিলেন, 'হাতের কাজটা শেখানো চাই। অবহেলা করবি না। মনে রাখবি হাতুড়ি-বাটালিটা যেন থাকে। চাকুরীর আশায় থাকলে চলবে না। আমারও হাতের কাজ।' দিবাকরবাবুর মেয়ে সত্যবতীর অন্নপ্রাশনে রামকিঙ্কর লিখেছিলেন, 'টাকা পাঠাচ্ছি কিন্তু তোর মেয়ের অন্নপ্রাশনে যাওয়া সম্ভব হবে না। তবে নাম সম্বন্ধে একটা কথা বলবার আছে—সত্যবতী না রেখে সত্যভামা রাখবি। সেটা শুনতে আরও ভালো হবে।' নাতি-নাতনিদের সুস্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত ভাতের মাড়, আলুসেদ্ধ, ডিম খাবার নির্দেশ দিতেন। একটি চিঠিতে হাঁস পুষতে লিখেছিলেন দিবাকরকে—'যার ডিম খেয়ে

ছেলেরা বাঁচবে।' আরও লিখেছিলেন—'তাদের পঞ্চাতিক্ত খাওয়াতে।' একবার মা সম্পূর্ণার শীতবস্ত্রের জন্য কিছু টাকা পাঠানোর সূত্রে মানি অর্ডার কুপনের নীচে মৃদু কৌতুক আর উপহাসে মাকে বস্তা সেলাই করে গরম জামা তৈরী করে পরবার জন্য লিখেছিলেন রামকিঙ্কর।

হাতে আসা চিঠিগুলির তিনটি পোস্টকার্ডে এবং একটি খামে পাঠানো। খামে পাঠানো চিঠিটির আংশিক জীর্ণ হয়ে গেছে। বাকী যেটুকু উদ্ধার করা যায় তাতে দেখা যাবে অভিজ্ঞ সংসারীর মতো দিবাকরকে নির্দেশ দিচ্ছেন একচালা ঘরের কাঠামোটি উঠানের মাঝে পড়ে গেলেও পাঁচিলের গায়ে তৈরী করবার জন্য। কারণ তাতে খরচ কম হবে। আর দেখা যায় বাঁকুড়ার সংসারকে ঘিরে তাঁর ভাবনা-চিন্তা। হাতে টাকা নেই তবুও ধার করে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কারণ একচালা ঘরের কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়।

অন্য তিনটি চিঠি পোস্টকার্ডে লেখা। একটির কোন সালের উল্লেখ নেই। শুধু লেখা আছে ২-মাঘ। তবে পোস্টকার্ডে লেখা অন্য দুটি চিঠির সঙ্গে বিষয়বস্তুগত মিল থেকে একথা অনুমান করে নেওয়া যায় যে চিঠিটি ইংরাজী '৭৩ থেকে '৭৫ সালের মধ্যে লেখা। অর্থাৎ তাঁর কলাভবনের অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসরের পর। এই চিঠিটিতেও জন্মভিটের জমিকে কেন্দ্র করে রামকিঙ্করের উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেখানে লিখছেন, 'চাকুরী নেই। অবস্থা খারাপ।' আর ভাইপো দিবাকরকে নির্দেশ দিচ্ছেন রামকিঙ্করের নিজের জমিটা বিক্রী করে দেবার জন্য। কারণ তাতে যা টাকা আসবে তাতে প্রয়োজন মিটে যাবে ভাইপোর। অন্য একটি চিঠিতে তাঁর এই উদ্বিগ্নতা আরো প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেখানে তিনি দিবাকরকে নির্দেশ দিচ্ছেন—যখন জমিটা রাখতে পারার সাধ্য নাই তখন তা বিক্রী করতেই হবে। কারণ ঋণ করা টাকার সুদবাবদ যে টাকার প্রয়োজন তা পরিশোধ করবার ক্ষমতা রাম-কিঙ্করের নেই। চলছে অভাব-অনটন। আর তাই 'জমিটা বিক্রী করার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করতে হবেই। ...তা নাহলে পাকা বাড়ীটাও যাবে। ভেবে দেখ।' সেই সঙ্গে পোড় খাওয়া সংসারীর মতো কূটবুদ্ধির জাল ঘেরা সাংসারিক কীট-পতঙ্গগুলিকে আর একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে নেবার নীরব নির্দেশ দিচ্ছেন—'মাকড়াদেরও যাচাই কর।' পোস্টকার্ডে লেখা অন্য আর একটি চিঠিতে দিবাকরের রোগ-ভোগকে কেন্দ্র করে জমি বিক্রীর প্রয়োজনের কথা এসেছে। কারণ 'রোগটি প্রমাণ হলে তাঁর সাধ্য নেই সেই খরচ বয়ে যাবার।' এভাবেই দায়িত্ব এড়িয়ে না গিয়ে রোগটি নিরাময়ের জন্য উপদেশ দিচ্ছেন বুকে রোদ লাগাবার। কারণ 'বিলাতী হাসপাতালে এসবের ব্যবস্থা আছে।' এ ব্যাপারে শান্তিনিকেতনের ডাক্তারদের কাছে খোঁজও নিয়েছেন তিনি। কিন্তু এখানের 'ডাক্তাররা এ-সম্বন্ধে কিছু বলে নাই।' চিঠিটির শেষে তাঁর এক আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি মৃদু কৌতুকমিশ্রিত ভর্ৎসনার একটা সুর শুনতে পাওয়া যায়। কারণ রামকিঙ্করের তৎকালীন অভাব-অনটনের সংসারে

আত্মীয়টি জমিজমা বিক্রী করে তাঁর শান্তিনিকেতনের কুটীরে সিঁদিয়ে পড়তে চায়। আর তাঁর এই আশ্রমে (!) এলেই 'নরকগুলজার হয়ে যাবে। মজাই হবে।' লিখছেন শ্রীরামকিঙ্কর।

বাকী ১৮টি চিঠি মানি অর্ডার ফর্মের নীচে লেখা, যাকে আমরা চলতি কথায় 'কুপন' বলে থাকি। এগুলির কোন সন-তারিখ নেই। চিঠির বক্তব্য স্বল্প-পরিসরে, মাত্র কয়েকটি শব্দ বা পংক্তিতেই সীমাবদ্ধ।

কুপনে লেখা চিঠিগুলির বক্তব্য অনুসারে বোঝা যায় এগুলির কয়েকটি তাঁর অধ্যাপনা জীবনের প্রথম পর্বে, মা-বাবা জীবিত থাকাকালীন, কয়েকটি তাঁর অধ্যাপনা জীবন থেকে অবসরের পর। প্রেরিত টাকার পরিমাণ ১৫ থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

পোস্টকার্ডে লেখা চিঠিগুলিতে যাঁকে চিঠিটি পাঠাচ্ছেন তাঁর নাম এবং জায়গার নাম বাংলায় লিখে পোঃ ও জেলার নাম লিখছেন ইংরাজীতে আর চিঠির বক্তব্যের নীচে পদবী বাদ দিয়ে পুরো নাম লিখছেন নিজের। খাম এবং পোস্টকার্ডে লেখা চিঠিগুলির ডানদিকে মাথার উপরে লিখছেন যেখান থেকে পাঠাচ্ছেন সেই জায়গার নাম এবং সন-তারিখ। কুপনে লেখা চিঠিগুলিতে কোনটায় নিজের নাম বাংলায়, কোনটায় ইংরাজীতে আবার কোন-কোনটায় নিজের নামের প্রথম অক্ষর 'রা'-টুকু লিখে ছেড়ে দিয়েছেন। সাবেকীরীতি অনুযায়ী চিঠিগুলির কোনটিরও মাথায় ঠাকুর-দেবতার নাম নেই। পোস্টকার্ড এবং খামে লেখা চিঠিগুলির যে অংশ পাঠযোগ্যতা হারিয়েছে সেখানে......এই চিহ্ন এবং কোন অসম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে ( ) এই বন্ধনী ব্যবহার করা ছাড়া বাক্য গঠন এবং বানানের কোন সংশোধন করা হয়নি।

কুপনে লেখা চিঠিগুলির বক্তব্য অনুসারে বাঁকুড়ার বসতবাটীর সংসারকে ঘিরে রামকিঙ্করের উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেখানে দেখতে পাই রামকিঙ্কর দিবাকরকে লিখছেন বাঁকুড়া থেকে শান্তিনিকেতন আসার পথে ছ-আনা দিয়ে একটি কাঠের গৌরাঙ্গমূর্তি নিয়ে ফিরেছেন। আর সাংসারিক স্বচ্ছলতা কিছুটা ফিরিয়ে আনবার জন্য দিবাকরকে নির্দেশ দিচ্ছেন এইরকমের কিছু কাঠের গৌরাঙ্গমূর্তি তৈরী করে বিক্রী করবার জন্য। যাতে সাংসারিক অনটন কিছুটা মেটবার আশা আছে।

কোন চিঠিতে বাবার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়ে তাঁর শরীর ভালো হলে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। কোনটিতে মা'র সঙ্গে ঈষৎ রসিকতা করে মাকে মুড়িভাজা শেখানোর জন্য পাঠশালায় যেতে বলছেন। একটি চিঠিতে নাতি-নাতনিদের মাড়ভাত খাবার নির্দেশ দিচ্ছেন। এবং যা রামকিঙ্করও খেয়ে থাকেন। নাতি শিবপ্রসাদের পাশ করবার সংবাদে আনন্দ-উচ্ছল রামকিঙ্কর লিখছেন—'এমনি করে গেলেই খুশী হবো।' আর সেই সঙ্গে তাঁদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবনের জন্য নির্দেশ পাঠাচ্ছেন—'একজনও অন্তত লেখাপড়া করবে, তা না হলে মান থাকবে না।' কোনটায় লিখছেন নিজের অসুস্থতা আর চাকুরীহীনতার কথা।

আবার কোনটাতে নার্তনি সত্যবতীকে পাঠানো টাকা হিসেব করে খরচ করবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন নিজের সংসার-সম্পদ সম্পর্কে উদাসীন বরাবরের বেহিসেবী রামকিঙ্কর। এইভাবেই টুকরো-টুকরো পংক্তিগুলি যোজনা করে উঠে আসেন ভিন্ন একজন মানুষ। যে মানুষের গায়ে সংসারযাত্রার কূটকলরোল এসে আছড়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। যে মানুষ আমাদের পরিচিত শিল্পী রামকিঙ্করের সঙ্গে একটু দূরত্ব রচনা করেন।

## চিঠি

১

Santiniketan
১৫/২/৫৩

দিবাকর

তোর চিঠি পেলাম। আমি প্রায় ১৯ দিন এখানে ছিলাম না, বোম্বে গেছলাম, ২ দিন হল ফিরেছি। ( বাড়ীটা ) উঠানের মাঝে করলে খরচটা কম হবে। তার জন্য আমার মনে হয় কাজগুলো মোটা শালের কাঠ কিনে প্রাচীরের গায়ে……একটা চালিকাঠামো করে……। অনেক খরচ করে এলাম। কিছু টাকা পাঠানোর চেষ্টা করব। কিছু ওদের কাছে ধার করতে হবে। কাজ যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার চেষ্টা করবি।

আমি একপ্রকার আছি। আশা করি তোরা সব ভাল।

স্বাক্ষর
রামকিঙ্কর

২

শান্তিনিকেতন
ইং ১২/১/৭৩

তোর চিঠি পেলাম

আমি যে জায়গা বিক্রির কথা লেখেছিলাম তার সম্বন্ধে কোন কথা লিখিস নাই। কারণ কি, আমি আমার জায়গার কথা লেখেছিলাম। তা কি ব্যবস্থা হল লেখলে না কেন ? লেখবে। জায়গাটা বিক্রী করলে তোর যা দরকার তা হয়ে যাবে। আমার অবস্থা ভাল নাই জানবি। চাকুরী নাই। চিঠি ভাল করে পড়বি।

স্বাক্ষর
রামকিঙ্কর

৩

শান্তিনিকেতন
১৭/১/৭৫

( জমি ) বিক্রয়ের কথাটা এখন বুঝলাম। সেটাই সত্য। কারণ যদি তোর এই রোগটি প্রমাণ হয় তাহলে আমার এমন সাধ্য নাই তোর খরচা বইবার। সংসার, ডাক্তাব, ঔষধ পথ্য খাদ্য ইত্যাদি। জমি বিক্রি হল কি ? লেখিস নাই। এখন কেমন আছিস জানাবি। শিবুব চিঠিতে লেখেছিলাম বুকে রোদ লাগাবার কথা, মনে রাখবি। বিলাতী হাসপাতালে এইসবের ব্যবস্থা আছে। এখানের ডাক্তাররা এ সম্বন্ধে কিছু বলে নাই। সাধন তার জমি বিক্রী করে আমার আশ্রমে আসবার ইচ্ছাটা জানিয়েছে। তাহলেই নরক গুলজাব হয়ে যাবে। মজাই হবে।

ইতি
রামকিঙ্কব

৪

শান্তিনিকেতন
২-মাঘ

দিবাকর

জমিটার বিক্রী করার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করতে হবেই। আমার সাধ্য নাই। সুদের টাকা শোধ করার আর সাধ্য নাই। যখন রাখতে পারার সাধ্য নাই তখন বিক্রী করতেই হবে। মাকড়াদেরও যাচাই কর। একটু তাড়াতাড়ি কর। আমার অবস্থা খারাপ। তা নাহলে পাকা বাড়ীটাও যাবে। ভেবে দেখ। দরখাস্তের উত্তর এখনই হবে……কখন হবে।……দলিল রেজিষ্টারী করে পাঠাবি। সাইন করে পাঠিয়ে দিতে পারা যায়। আমার যাওয়ার মুস্কিল আছে।

ইতি
রামকিঙ্কব

৫

কাঠের পুতুল করতে বলিস। আসার সময় গৌরাঙ্গের কাঠের পুতুল ছ-আনা দিয়ে কিনে আনলেম। তাই আবার লিখছি কিছু রোজগার হয়।

স্বাক্ষর
রা

৬

পরে ( আরো ) টাকা পাঠাব। ভাল করে চিকিৎসাটা করবার চেষ্টা করবি। মাকে মুড়ি ভাজানো শেখানোর জন্য পাঠশালায় যেতে বলবি।

স্বাক্ষব
রা

৭

পাস করেছিস জেনে খুশি হলাম। এমনি করে গেলেই আমরা খুশি হব। একজনও অন্তত লেখাপড়া করবে, তা নাহলে মান থাকবে না। আমার যাওয়া হবে না। আর বেশী পাঠাতে পারলেম না।

স্বাক্ষরহীন

৮

পরে আর একটু পাঠাবার চেষ্টা করব। যেতেও পারি। বাবার কাজ চলেচে? জানাবে।

স্বাক্ষর
Ramkinkar Veij

৯

বাবা কেমন আছে জানাবে। ভালো হলে আসতে বলবে। আমার যাওয়া হবে না।

স্বাক্ষর
রামকিঙ্কর বেইজ

১০

কর্মকারের বাতের তেলটা তাড়াতাড়ি পাঠাবার চেষ্টা করবে। সকলের খবর লেখবি।

স্বাক্ষর
রা

১১

তোর চিঠি পেয়েচি। পূজায় যেতে পারব কিনা জানি না। চেষ্টা করব। আশা করি সব ভাল।

স্বাক্ষর
রামকিঙ্কর

১২

(পাশ করেছ জেনে) খুশি হলেম। যা পাঠাচ্ছি বই কিনে নিয়ো। পরে ১৫ তারিখে পাঠাবো। আশা করি আর সব ভাল।

স্বাক্ষর
রা

১৩

মাড় ভাত খেতে বলবে। আমরাও খাই। আমার চাকুরী নাই।

স্বাক্ষর

রা

১৪

কামার কবিরাজ-এর বাতের তেলটা পাঠাতে হবে, আমার অসুখ হয়েছে। তোর জায়গাটা কেউ অধিকার করবে না ভয় নাই। পূজার সময় যেতে পারি।

স্বাক্ষর

রামকিঙ্কর

১৫

টাকা পয়সার টানাটানি আছে পরে পাঠাব।

স্বাক্ষর

রা

১৬

ইটের জন্য পাঠালেম—শোধ দিও। আমাকে জড়িও না।

স্বাক্ষর

রামকিঙ্কর

১৭

চিঠি পেয়েচি। নির্বীঘ্নে প্রসবের সংবাদ জেনে খুব আনন্দিত হলেম। আশা করি প্রসূতি এবং সন্তান ভালো আছে। দাদার কি শরীর খারাপ হয়েচে ? লেখবি।

স্বাক্ষর

রামকিঙ্কর

১৮

এ মাসে আমার খরচা হয়ে গেছে বেশী। পরে ( আরো ) দেখব।

স্বাক্ষর

রামকিঙ্কর

১৯

শিবপ্রসাদের স্কুলের বেতন আর ইটের দাম পাঠালেম, লেখে জানাবে পেলে কিনা।

স্বাক্ষর

রা

২০

পেনশনের টাকা পেয়েচি সেটাই পাঠাচ্ছি। তোর ওখানের কাজ শেষ হলেই অপারেশনের ব্যবস্থা করবি। দেরী করিস না। আশা করি বৌদিদি ভালো আছেন।

স্বাঃ

রা

২১

সব ভালো ত? চিঠি দিস।

স্বাক্ষব

রা

২২

সত্যবতীকে ২৫ টাকা পাঠানো হোল, হিসেব করে খরচ করবে। আমার চিঠিখানা পেয়েচ নিশ্চয়। কাজটা বোধহয় হবে। তোমাদের সংবাদ দিবে। আমরা ভালো।

রা

পরিচিতি: ১. শিবু—শিবপ্রসাদ বেইজ—নাতি, ভাইপো দিবাকরের পুত্র
২. সাধন—ভাই। মামা আশুতোষ বেইজ-এর পুত্র
৩. সত্যবতী—নাতনি। দিবাকরের কন্যা
৪. ৭, ১২ এবং ১৩ নং চিঠিগুলি দিবাকরের পুত্র-কন্যাদের উদ্দেশে লেখা

## রামকিংকরের বিদেশযাত্রা সংক্রান্ত একটি আবেদনপত্রের খসড়া ও অন্যান্য

প্রকাশ দাস

বিদেশে যাবার ব্যাপারে আত্মপ্রচারবিমুখ কর্মব্যস্ত এই মহাশিল্পীর মধ্যে বরাবরই একটা দারুণ অনীহা লক্ষ্য করা গেছে। দেশের বাইরে বিদেশের মাটিতে তাঁর ছবি বা ভাস্কর্য প্রশংসার তুঙ্গে উঠেছে বারবার। সেই সূত্রে বিদেশ যাবার আমন্ত্রণও এসেছে বেশ কয়েকবার। অনেকবারই ওদেশের শিল্পানুরাগী মানুষজন তথা সরকার চেয়েছেন রামকিঙ্কর একবার ঘুরে যাক ওদেশে। চেয়েছিলেন, ওদেশের তাঁর শিল্পানুরাগী মানুষজন এবং শিল্পীরা পরিচিত হোক তাঁর সাথে। এই প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে তিনি রাজী হলে তাঁরা তাঁদের খরচাপাতি এবং তত্ত্বাবধানে তাঁকে ওদেশে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবেন আবার। কিন্তু এসব আমন্ত্রণপত্র একটিবারও খুলে দেখেননি তিনি। ঐগুলি বারবার পৌঁছে গেছে ময়লা কাগজের আবর্জনায়। বিদেশ যাবার প্রশ্নে তিনি বলেছেন: 'কি হবে গিয়ে?' বলেছেন: 'ছবি আঁকা বা মূর্তিগড়া? সে তো নিজের এলেমের প্রশ্ন। তার জন্য অতো দরজায় দরজায় ভিক্ষে করা কেন?' বিদেশ বলতে চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে অল্প কিছু-দিনের জন্য ভাস্কর্যকলার কাজে একবার মাত্র নেপাল যাওয়া ছাড়া তাঁর ৫৫ বছরের আশ্রমিক জীবনে একদিনের জন্যও শান্তিনিকেতনের বাইরে যাননি কোথাও। যদিও জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে তাঁর একবার মনে পড়ে গিয়েছিল: 'একজন শিল্পীর অ্যাডভেঞ্চার না থাকা ভালো নয়।' বলেছিলেন: 'বিদেশ যাওয়া এবং পশ্চিমী শিল্পী-দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের চেষ্টা না করার ব্যাপারে আমার একটা ভুল ধারণা আছে।'

চল্লিশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমদিকে তৎকালীন ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক আধুনিক শিল্পপ্রদর্শনী' নামে প্যারিসে অনুষ্ঠিত একটি চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি প্রথম বিদেশে পাঠানো হয় এবং সেখানকার দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা পায়। পঞ্চাশ দশকের একেবারে গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক বিমূর্ত শিল্প আন্দোলন গড়ে তোলায় প্রয়াসী প্যারিসের এক নামী শিল্পীসংস্থা সারাবিশ্বের গুরুত্ব-পূর্ণ শিল্পীদের তাঁদের ৫ম চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। গোটা ভারত-বর্ষের মধ্যে একমাত্র রামকিঙ্করই এই আমন্ত্রণ পান। এবং তিনিই ছিলেন এমন একজন ভারতীয় শিল্পী যিনি প্রথম ঐ সম্মানে ভূষিত হন। এবং তাঁর চিত্রকলা প্যারিসের নতুন ধারার চিত্রশিল্পী বা শিল্পবোদ্ধাদের বিশেষভাবে নাড়া দেয়। একটি চিঠিতে তাঁরা তাঁদের প্রতিক্রিয়ার কথা জানান এইভাবে: 'রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনের

মতো জায়গায় উপেক্ষায় জীবন কাটিয়ে এইধরনের কাজ করতে পেরেছেন এটা সাধনার অঙ্গ এবং এইজন্য তিনি সব আধুনিক শিল্পীদের শ্রদ্ধার পাত্র।' ১৯৫১ সালেও তাঁর ছবি দ্বিতীয়বার প্যারিসে পাঠানো হয়। ১৯৫৪ সালে রোমে সেদেশের বড় বড় চিত্রশিল্পী এবং ভাস্করদের এক সভায় রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের কিছু ফটো-প্রিণ্ট দেখানো হলে তাঁরা এই শিল্পীর ভাস্কর্য সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়েন। তাঁর কাজ সম্বন্ধে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তাকাবলী সংগ্রহেও তাঁরা বিশেষ আগ্রহী হন। কিন্তু যখন তাঁরা জানতে পারেন এই শিল্পীর শিল্পকর্মের উপর এরকম কোন গ্রন্থই নেই, তখন তাঁরা ভীষণ হতবাক হয়ে যান। এছাড়াও বিদেশের তাঁর বহু শিল্পানুরাগী এবং শিল্পীরা শান্তিনিকেতনে তাঁর রতনপল্লীর মাটির দেয়াল আর খড়ের ছাউনির জীর্ণ কুটিরে ছুটে এসেছেন বহুবার। তাঁর চিত্র বা ভাস্কর্য সংগ্রহ করে ফিরে গেছেন কেউ কেউ, কেউ কেউ তাঁর চিত্র বা ভাস্কর্যের নিদর্শন ম্যুভি ক্যামেরায় বন্দী করে ফিরে গেছেন ওদেশে।

জীর্ণ কাগজের স্তূপ থেকে রামকিঙ্করের লেখা উদ্ধারপ্রাপ্ত নীচের একটি আবেদন-পত্রের খসড়া থেকে জানতে পারা যায় যে বিদেশযাত্রার ব্যাপারে তিনি বারংবার অনীহা প্রকাশ করলেও পঞ্চাশ দশকের শুরুতে যখন তাঁর শিল্পকলা বিদেশের শিল্পী ও শিল্পরসিক সমাজে খ্যাতি লাভ করে এবং তাঁরা তাঁকে তাঁদের খরচায় ঐদেশে নিয়ে যেতে আগ্রহী হন তখন হয়তো তাঁর বিদেশী শিল্পানুরাগীদের প্রবল অনুরাগের চপেই পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে রামকিঙ্করকে একবার মাথা নত করতে হয়। বিদেশে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। পাসপোর্ট চেয়ে ১৯৫৫ সালে বীরভূমের জেলাশাসকের কাছে তাঁর লেখা নীচের প্রথম আবেদন পত্রটির থেকে জানতে পারা যায় যে বিশ্বের কয়েকটি দেশ এবং তাঁদের শিল্পকলা দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন কারণ সেইসব দেশ তাঁর শিল্পকলাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তাঁর শিল্পকাজ সেইসব দেশের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তাঁরা দেখাতে চান। এবং তাঁর কিছু কাজ ইতিমধ্যেই তাঁরা দেখিয়েছেনও। বিদেশযাত্রায় পাসপোর্ট সংগ্রহের কাজ অনেকদূর পর্যন্ত এগোয় কিন্তু বরাবরের উদাসীনতার জন্যই শেষাবধি তাঁর কাঙ্খিত দেশগুলি পরিদর্শনে বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়ে পড়া হয়নি আর। বেরিয়ে পড়লে সারাবিশ্বে রামকিঙ্কর ও তাঁর শিল্পকাজ কি প্রতিক্রিয়া বয়ে আনতো সে কল্পনা আপাততঃ রেখে দেওয়া যাক।

নীচের দ্বিতীয় আবেদনপত্রটি হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ট-এ বসানো তাঁর করা রবীন্দ্রনাথের মূল আবক্ষ-মূর্তিটির কাস্টিং-এর কাজের অগ্রগতি কতদূর জানতে চেয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিটির প্রত্যুত্তর। তারিখবিহীন এই আবেদনপত্রটি ১৯৫৬ সালে লেখা বলে অনুমান করা যায়। কারণ ঐ বছরের ৯ই অক্টোবর ভারতসরকার কর্তৃক প্রেরিত রামকিঙ্করের করা রবীন্দ্রনাথের মূল আবক্ষ মূর্তিটির (রিয়ালিস্টিক) কাস্টিং হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ট-এর কাছে বালাতন হ্রদের তীরে বসানো হয়।

১

To

The Office of The District Magistrate
Birbhum.

**Sub : Application for Passport**

Ref. Memo No. 85 G.I J.G. XXII.II/55.

Dear Sir, dt. 22/8/55

Thanks very much for your Letter and for the enquiry made by the Home department about my passport after such a long time.

I had at least one apportunity to visit all these countries and their arts free of cost because they appreciated my art and wanted to exhibit these at the festival and had offered me this favour.

However now at least I want to possess the passport for future if I get any chance.

I think these countries mentioned in my application will cover up all I want to visit.

So I need the passport.

Yours faithfully
**Ramkinkar**

২

**Sub : Presentation of Tagore Bust to Hungary.**

Dear Sir,

This is to inform you that I handed over the original bust to Mr P. Sen* for casting it in Bronze. It will be ready by the middle of September.

As Mr. Sen was out of India the work of casting could not be taken up earlier.

Thanking you,

Yours faithfully
**Ramkinkar**

* **Probhas Sen**

## বাঁকুড়া পর্ব

..................

### ১৯০৬—২৪

**জন্ম**

বাঁকুড়া জেলার যুগীপাড়ায় একটি অত্যন্ত দরিদ্র ক্ষৌরজীবী পরিবারে রামকিঙ্করের জন্ম। জন্মসাল নিয়ে মতান্তর আছে। রামকিঙ্করের জন্মসাল কেউ উল্লেখ করেছেন ১৯০৪, কেউ ১৯০৬, কেউবা ১৯১০[১]। বিশ্বভারতী সার্ভিস রেকর্ডে রামকিঙ্কর তাঁর জন্মসাল উল্লেখ করেছেন ১৯০৬ সালের ২৫শে মে।

রামকিঙ্কর (১৯০৬—৮০)

পিতার নাম চণ্ডীচরণ। শোনা যায় রামকিঙ্করের পূর্বপুরুষদের বাড়ী ছিল বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার গণ্ডগ্রাম রাউৎখণ্ড (কৃষ্ণবাটী)। শোনা যায় যুগীপাড়ার কাছাকাছি পাঠকপাড়ার পাঠক ঠাকুরদের ডাকে গোপাল জীউর মন্দিরে ফুল আর মালা যোগান দেওয়ার শর্তে ৫/৬ পুরুষ আগে বসতবাড়ির জমি পেয়ে এই পরিবারটি যুগীপাড়ায় উঠে আসে[২]। সেই সঙ্গে গ্রহণ করে পাঠকপাড়ার ঠাকুরদের যজমানী বৃত্তি। অর্থাৎ ক্ষৌরকাজ। মায়ের নাম সম্পূর্ণা দেবী। পৈতৃক বাড়ী বিষ্ণুপুরের কাদাকুলি গ্রাম। চণ্ডীচরণ-সম্পূর্ণার চার মেয়ে, দুই ছেলে' বয়সানুক্রমে মেয়েরা হলেন ঃ থাকমণি, নারায়ণী, কালীদাসী এবং ইন্দুমতী বা ইন্দ্রাণী। ছোট মেয়ে ইন্দ্রাণী খুব অল্প বয়সেই জলে ডুবে মারা যায়। দুই ছেলের মধ্যে বড় রামপদ, ছোট

---

১. জয়া আপ্পাস্বামী রামকিঙ্করের জন্মসাল কোথাও উল্লেখ করেছেন ১৯০৬, কোথাওবা ১৯১০। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'বর্তমান' সংবাদপত্রের রবিবারের পাতা 'বর্তমান সাপ্তাহিকী'র ১৯৮৭ সালের ২৪শে মে তারিখে প্রকাশিত 'রামকিঙ্কর ও ১২ জ্যৈষ্ঠ' নামক প্রবন্ধে রবি পাল লিখছেন—'ইংরাজী ১৯০৪ সালে ২৬ (মাসের উল্লেখ নেই), বাংলা ১৩১১ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ মধ্যরাত্রিতে বাঁকুড়া শহরের যুগীপাড়ায় (রামকিঙ্কর) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাঁকুড়া বঙ্গবিদ্যালয়ের ভর্তির

রামকিঙ্কর। সব মিলিয়ে বলা যায় চণ্ডীচরণ-সম্পূর্ণার ছ-ছেলেমেয়ের মধ্যে রামকিঙ্কর-এর স্থান হল পঞ্চম।

### সেই সময়ের বাঁকুড়া ও তার মানুষজন

সেইসময়ের বাঁকুড়ার মানুষজন এবং তাঁদের জীবনযাপন ছিল গ্রামজীবনের মতো সহজসরল ও সাদাসিধে। ঘনবসতি হয়নি তখনও। বাঁকুড়া বলতে জাতিগত কয়েকটি পল্লীকেই বোঝাত। যেমন কামারপাড়া, তাঁতিপাড়া, শাঁখারীপাড়া, ঘটকপাড়া পাঠকপাড়া, লোহারপাড়া, নাপিতপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, বাগদীপাড়া প্রভৃতি। আর অঞ্চল বলতে বোঝাত রায়পুর, পালিতবাগান, নতুনচটী, স্কুলডাঙ্গা, মোলডুবকা, কেঠারডাঙ্গা, ঈদগামহল্লা, গোপীনাথপুর, পাটপুর, কানকাটা, লোকপুর প্রভৃতি। ছুতারপাড়ার মাঝখানে ছিল রামকিঙ্করের পৈতৃকবাড়ী। পৈতৃকবাড়ীর একদিকে, মানে পশ্চিমে ছুতারপাড়া, পূর্বদিকে একটা বড়ো পুকুর, নাম লাটবাঁধ। লাটবাঁধের পূর্বদিকটায় কর্মকারদের বাস। এছাড়াও ছিল তাঁতি, পোদ্দার প্রভৃতি মহল্লা।

### শিল্পীজীবনের সূচনা

ছেলেবেলা থেকেই রামকিঙ্করের মধ্যে একটি সহজাত শিল্পী-প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। শোনা যায় আর্থিক অনটনের জন্য পারিবারিক বৃত্তি দিয়ে ছেলেকে যুগীপাড়ার নিকটবর্তী দোলতলার গাছতলায় বসিয়ে দেওয়া হলে নরুন দিয়ে গাছের গায়ে ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দেন বালক রামকিঙ্কর। ছুতোর অধ্যুষিত পল্লী, যাঁরা কাঠ-

---

রেকর্ড হিসাবে ইংরাজী ১৯০৬ সাল করা আছে। অনেকে ২৫ মে'ও বলে থাকেন। কিন্তু কিঙ্করদার মুখে শুনেছি যে যেহেতু মধ্যরাত্রে জন্মেছিলেন তাই ইংরাজী মতে ২৬ মে। এবং এজন্য কিঙ্করদাকে হাসতে হাসতে বলতে শুনেছি যে মধ্যরাত্রে জন্ম বলেই সূর্য দেখতে অনেক দেরী হয়েছে। সারারাত্রব্যাপী আলোর জন্য হাতড়েছি।' কলকাতা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'প্রতিক্ষণ'-এর ১৯৮৪ সালের ১৭ই আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিল্পের মানুষ রামকিঙ্কর' নামক প্রবন্ধে বাসুদেব চন্দ্র লিখছেন—'ওঁর (রামকিঙ্কর) সমবয়সী আর এক বন্ধু রামপদ মণ্ডলের বাড়িতে গিয়েছিলাম অতুলদাকে (অতুলচন্দ্র কুচল্যান, অন্য এক বাল্যবন্ধু) সঙ্গে নিয়ে কিছু বাল্যস্মৃতি জানতে। অতুলদা বললেন, 'আচ্ছা রমপদ, তোর হিসেবে রামকিঙ্করের এখন কত বয়স হবে বলতো?' বেশ চিন্তা করে রামপদদা বললেন, 'তা আশি হবে।' 'তা কি করে হবে? তোর এখন কত?' 'বিরাশী।' ১৩০৬ সালের আশ্বিন মাসে আমার জন্ম। এখন ১৩৮৮ সাল। তাহলে বিরাশিই হচ্ছে। কিঙ্কর আমার থেকে বছর দু'য়েকের ছোট। অতুল তোর কত বয়স হলো?' '১৩১০ সালের ৮ই ভাদ্র আমার জন্ম। রামকিঙ্কর আমার চেয়ে একবছরের ছোট। ওর জন্ম সাল হলো ১৩১১, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯০৪, ২৮শে মে)। এখন আমার বয়স ৭৮। কিঙ্করের ৭৭ হবে। ওর গত বছর মৃত্যু হয়েছে ৭৬ বছর বয়সে। কিঙ্কর তোর থেকে দু-এক বছরের ছোট নয়, অন্তত ৫ বছরের ছোট।'

২. এ সম্পর্কে দিবাকর বেইজ-এর গ্রন্থভুক্ত 'আমার কাকা রামকিঙ্কর' প্রবন্ধের ৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাথর-মাটি এবং ছবি—এই চারটি মাধ্যমেই পারদর্শী ছিলেন, যুগীপাড়ার গ্রামীণ শিল্পীদের পরিবেশে, তাঁদের কাজ দেখতে দেখতে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। যাঁরা প্রায় সারাবছর ধরেই নানারকম মাটির কাজ করতেন। যাঁদের অনেকেই এখনো জীবিত এবং শিল্পী-প্রতিভাসম্পন্ন। এইসব কাজ তাঁকে শিল্পী হবার পথে উৎসাহিত করেছে। রামকিঙ্কর বলেছেন, 'পরের দিকে এঁদের কাজকর্ম আমাকে হয়ত ইনফ্লুয়েন্স করতেও পারে, কিন্তু ছোটবেলাতেই আমার টেনডেন্সি ছিল ছবি আঁকার। কেউ কিন্তু শেখায়নি, নিজেই দেখে দেখে শিখেছি[৩]। রামকিঙ্করের চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাসপাঠ্য একটি বইয়ের মলাটে আঁকা একটি ছবি (কপি) ভাইপো দিবাকরের সংগ্রহে আজো দেখা যায়[৪]। লাল-কালো রঙে আঁকা ছবিটির বিষয়বস্তু চা বাগানের দৃশ্য, যেখানে কয়েকটি মেয়েকে চা-বাগানে চা-সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়।

রামকিঙ্করের মূর্তি গড়ার ইতিহাসও খুব মজার। রামকিঙ্করের কথায়, 'আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তাটা লাল মোরামে ঢাকা ছিল। একদিন হঠাৎ বৃষ্টির পরে দেখি মোরাম ধুয়ে নীল মাটি বেরিয়ে পড়েছে। চোখে পড়ামাত্র সেই মাটি খাবলে তুলে নিয়ে নানারকম পুতুল তৈরী করতে লাগলাম। এখানে বলে রাখা ভালো যে আমার শিল্পের প্রথম ইস্কুল বাড়ীর পাশের কুমোরপাড়া। ছেলেবেলা থেকে অনেকক্ষণ ধরে কুমোরদের মূর্তি গড়া ও অন্যান্য কাজ দেখা বেশ অভ্যেস ছিল। সুযোগ পেলেই মাটিতে হাত লাগিয়ে ছানাছানি করতাম। রাস্তায় বেরিয়ে পড়া সেই নীল মাটি দিয়ে পুতুল ও মূর্তি গড়ার পর থেকে প্রায়ই নদী থেকে মাটি এনে নানারকম পুতুল ও মূর্তি করতে শুরু করলাম[৫]।' শোনা যায় পাড়ার সেরা শিল্পী অনন্ত পাল বা সূত্রধর, যিনি অনন্ত মিস্ত্রী নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন তিনি বালক রামকিঙ্করের মাটির কাজে গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করে তাঁর প্রতিমা তৈরীর কাজে তাঁকে লাগিয়ে দিতেন মাঝেমাঝে।[৬] কিন্তু তিনি রামকিঙ্করকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়না কিছু। শোনা যায় রামকিঙ্কর শিল্পী অনন্তকে শ্রদ্ধা করতেন খুব এবং পরবর্তী সময়ে রামকিঙ্কর বাঁকুড়া ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসার পরও বহুদিন পর্যন্ত অনন্ত পাল দুর্গা প্রতিমা তৈরী করে শুধুমাত্র চোখ না এঁকে রামকিঙ্করের অপেক্ষায় থাকতেন। আর রামকিঙ্কর

---

৩. গ্রন্থভুক্ত ২নং সাক্ষাৎকারের ৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪. কলকাতা থেকে প্রকাশিত লাল পাতলা কাগজের মলাট দেওয়া চটি বইটির নাম 'শৈশব পাঠ'। ইনফেন্ট রীডার। তৃতীয় ভাগ। নবম সংস্করণ, ১৯১৭। লেখক শ্রীশশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়। লেখকের নামের পাশে লেখা—এফ. আর. জি. এস. এম. আর এস. এ। দাম দুই আনা।

৫. গ্রন্থভুক্ত ২ নং সাক্ষাৎকারের ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬. দিবাকর বেইজ-এর গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধের ৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শান্তিনিকেতন থেকে এসে সেই না আঁকা চোখ এঁকে দিলে শিল্পী অনন্ত অত্যন্ত তৃপ্ত ও আনন্দিত হতেন।

**শিল্পীজীবনের সূচনায় পিতা ও তৎকালীন শিল্পী পরিমণ্ডল**

রামকিঙ্কর হলেন তাঁর পরিবারের এমন একজন ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম পরিবারের ধারাবাহিক প্রথা ভেঙে ছবি ও মূর্তি তৈরীর দিকে যান। এর আগে তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউই শিল্পী ছিলেন না কোনদিন। এবং পারিবারিক নানান আর্থিক অনটনের মধ্যেও পিতা চণ্ডীচরণের উৎসাহ শিল্পী-বালক রামকিঙ্করকে উৎসাহিত করেছে সবসময়। জানা যায় যে লেখাপড়ার জন্য তাঁকে ঘরের মেঝেতে বসিয়ে দেওয়া হলে লেখাপড়া না করে দেয়ালে টাঙানো নানান দেবদেবীর ছবি আঁকা আরম্ভ করে দিতেন তিনি। অপটু হাতে আঁকা এই ছবিগুলিই পরিচিতদের দেখাতেন পিতা চণ্ডীচরণ, যা পুত্রকে উৎসাহিত করবার পক্ষে এইটুকুই ছিল যথেষ্ট বড়রকমের কাজ। এছাড়াও বালক রামকিঙ্করের তৈরী ছবি, পুতুল বা মূর্তিগুলি বিক্রীর জন্য তিনি নিয়ে যেতেন একেশ্বর, হরিহরপুর, সোনাতোপল প্রভৃতি মেলায়। এতে পরিবারের আর্থিক অনটন হয়তবা মিটত কিছু কিন্তু এর চেয়েও যা বেশী ছিল তাহল এইরকম কাজে বালক রামকিঙ্করের ছবি, মূর্তি বা পুতুল তৈরীর উৎসাহ বেড়ে চলত আরো।

শিল্পী হবার পথে প্রেরণার উৎস হিসাবে বাড়ীর পাশের ছুতোরপাড়া ছাড়াও তৎকালীন ক্ষুদ্রশহর বাঁকুড়ার শিল্প পরিবেশের আর একটি দিকও একইরকম গুরুত্ব নিয়ে ফিরে আসে। সেইসময়ে যেটির খুব চল ছিল তাহল সেকালের বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীরা ঠাকুর গড়ার অবসরে মাটির মূর্তি গড়ে চকবাজার বা বড়-রাস্তার কাছে শাঁখারীপাড়া রোডের ( যুগীপাড়ার নিকটবর্তী ), বর্তমান গোবিন্দ সিংহ রোড, দুপাশে মাঝেমাঝেই সমাজজীবন ও ধর্মজীবনের উপর বিস্তর প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন। আবার কখনোবা সদররাস্তার ( Main Road ) বাড়ীর দু'পাশের প্রশস্ত ছাদে বা বড়রথতলায় বা অন্য জায়গায় একহাত-দেড়হাত প্রমাণ সাইজের মাটির মূর্তি দিয়ে যাত্রাকাহিনীর মূক অভিনয় দেখাতেন। বড়রথ, ছোটরথের মেলা, একেশ্বর, দশেরবাঁধ বা জুনবেদিয়ার গাজনের মেলার সেইসব বিচিত্র রঙের মাটির পুতুল বা মূর্তি যা সেইসময়ে দেখা যেত এখন তা আর দেখা যায় না। রামকিঙ্কর সেইসব বিচিত্র আর অপূর্ব মাটির কাজ দেখার পাশাপাশি এইসব শিল্পীদের সঙ্গে মিশে নিজেও সেইসব মাটির কাজ করেছিলেন।

একই পথ ধরে অন্যতম আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা মনে আসে। আমরা জানি বাঁকুড়ার অদূরবর্তী বেলিয়াতোড়ের মানুষ ছিলেন এসময়ের অন্যতম আর এক প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। যামিনী রায়ের জন্ম ১৮৮৮ সালের ১১ই এপ্রিল। কারো মতে ১৮৮৭ সালের ১০ই এপ্রিল। ১৯০৩ সালের তৎকালীন

বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রাম থেকে যেয়ে সোজা কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষা পেয়ে পরবর্তী জীবনে নিজের সাধনার জোরে অসাধারণ শিল্পীখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। রামকিঙ্করের কৈশোর জীবনের দিনগুলিতে বাঁকুড়া শহরে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাঁর। প্রমানস্বরূপ তাঁর তেলরঙে আঁকা উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতির নিদর্শন যা আজও বাঁকুড়ার কারো কারো বাড়ীতে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বাঁকুড়ার বড়বাজার-এর রাঠী পরিবারের কমলাপ্রসাদ রাঠীর পিতামহ শুকদেব রাঠীর চেয়ারে বসা ৪২ ইঞ্চি× ২৫ ইঞ্চি মাপের তেলরঙে আঁকা একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। এই প্রতিকৃতিটি এঁকে দেওয়া ছাড়াও জানা যায় যে ছবিটি বাঁধাই-এর ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন শিল্পী স্বয়ং। দ্বিতীয় ছবিটি হল স্কুলডাঙ্গার শ্রীযুক্ত অরুণ রায়ের পিতামহ বামাচরণ রায়ের ২৫ ইঞ্চি×২২ ইঞ্চি মাপের একটি আবক্ষ প্রতিকৃতি। সম্পর্কে যামিনী রায়ের জ্ঞাতিকাকা বামাচরণ বাঁকুড়া শহরে বসবাসের জন্য আসেন ১৯১০ সাল নাগাদ। এখানে মাঝেমাঝেই এসে থাকতেন যামিনী রায়। ছবিটি আনুমানিক ১৯২২-২৩ সাল নাগাদ আঁকা বলে মনে হয়। তৃতীয় ছবিটিও হল স্কুলডাঙ্গা নিবাসী প্রয়াত রাসবিহারী শিকদারের প্যাসটেলটাচসহ তেলরঙে আঁকা ১৫ ইঞ্চি× ১২ ইঞ্চি মাপের একটি আবক্ষ প্রতিকৃতি। ছবিটি আনুমানিক ১৯১০—১২ সাল নাগাদ আঁকা বলে মনে হয়। এছাড়াও বাঁকুড়ার অন্য আরো কারো-কারো বাড়ীতে যামিনী রায়ের শিল্পনিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

গ্রাম থেকে যেয়ে কলকাতার আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়া নিঃসন্দেহে সেইসময়ের একটি বড় রকমেরই ঘটনা। যামিনী রায়ের এই সাফল্য যা সেইসময়ে রামকিঙ্করের সমবয়সী বা তাঁর থেকে কিছু বড়, যাঁরা ছবি·আঁকায় বা শিল্পকাজে উৎসাহী ছিলেন, তাঁদের উৎসাহী ও শিল্পকাজে ব্রতী করেছিল আরো বেশী। এঁদের মধ্যে আজ কেউ মৃত, কেউবা জীবিত। এই উৎসাহী পরিমণ্ডলের এমন কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে। যেমনঃ ১· রামকিঙ্করের থেকে দু'বছরের বড়, যাঁর সঙ্গে রামকিঙ্করের বন্ধুত্ব ছিল অমলিন, স্কুলডাঙ্গার প্রয়াত ভুবন মিত্র ২· ফীডার রোডের প্রসিদ্ধ উকিল অশোকানন্দ বসু ৩· বাজারপাড়ার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী প্রয়াত অশ্বিনী দত্ত ৪· রামপুরের প্রয়াত নিতাই মিত্র ৫ নূতনচটির একদা প্রসিদ্ধ বর্ধমান ডিভিসনের স্কুল ইনস্পেক্টর প্রয়াত কালিপদ সরকারের ছোট ছেলে দেবেন্দ্রনাথ সরকার ৬· যামিনী রায়ের বংশের প্রয়াত ডক্টর গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এবং ৭· হ্যাভেল সাহেবের স্কুলে শিক্ষিত জিলা স্কুলের ড্রইং শিক্ষক অসিতরঞ্জন দাশগুপ্তের প্রিয় ছাত্র বর্তমানে জীবিত স্কুলডাঙ্গার বসন্তকুমার বসু প্রমুখ। অতএব খুব সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে উৎসাহী এই বিরাট শিল্পী গোষ্ঠীরও অন্যতম একজন ছিলেন বাল্যউত্তীর্ণ কিশোর বয়সের শিল্পী শ্রীরামকিঙ্কর।

**শিক্ষা**

রামকিঙ্করের শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় বড়োষোলআনার সুরেন্দ্রনাথ দত্তের পাঠ-

শালায়। শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ সুরেন পণ্ডিত নামেই পরিচিত ছিলেন। এখানে তিনি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। এরপর কিছুকাল তৎকালীন বঙ্গবিদ্যালয়ে ( এম. ই. স্কুল )। যুগীপাড়ার নিকটবর্তী দোতলার প্রতিবেশী অবলাকান্ত চৌধুরী, রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের পরিচালনায় গঠিত একটি নৈশ বিদ্যালয়ে কিছুকাল। এখানে তিনি ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয় পড়তেন। শোনা যায় তিনি অংকে অত্যন্ত কাঁচা হলেও ইংরেজী শিক্ষায় তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। এরপর অসহযোগ আন্দোলনের সময় অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম দিকে প্রসিদ্ধ লৌহব্যবসায়ী দানবীর প্রয়াত গোপী দত্তের বদান্যতা ও বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ন মিশন কলেজের ফিলসফির পদত্যাগী অধ্যাপক অনিলবরণ রায়ের নেতৃত্বে বাঁকুড়ার নিকটবর্তী লালবাজারে গড়ে ওঠা জাতীয় বিদ্যালয়ের (National School) ছাত্রাবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান এবং লেখাপড়ায় ছেদ। রামকিঙ্করের কথায়—'ঠেলাঠেলি করে ম্যাট্রিক পর্যন্ত হয়েছিল[৭]।' কেউ কেউ রামকিঙ্করের সর্বোচ্চ শিক্ষা অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত বলে থাকেন। যাই হোক, পরবর্তী সময়ে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেন[৮]।

### শিল্পীজীবনের আদিপর্বে বাঁকুড়ার শিল্প পরিবেশ

রামকিঙ্করের শিল্পীজীবনের আদিপর্বে বাঁকুড়ায় মাটির প্রতিমা, পুতুল ইত্যাদি শিল্পকর্ম ছাড়াও আর যা ছিল তাহল প্রয়াত সাগর পেণ্টারের ফটোগ্রাফী, যা অবশ্যই তৎকালীন তে-পায়ার উপর বসানো ক্যামেরায় দীর্ঘপ্রস্তুতিসাপেক্ষ ফটো তোলা। এবং সাইনবোর্ড পেণ্টিং। ফটো কালারিং বা রঙীন ফটো বা ম্যুভি ক্যামেরা তখন ছিল অজ্ঞাত। মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বা অন্য কিছু সরকারী অফিসে প্ল্যান বা নকশার কাজে নিযুক্ত সামান্য কয়েকজনের আমিনী বা ওভার-সিয়ারী ছিল অংকনের পূর্তবিদ্যাগত এক বৃত্তি। ফাইন আর্টস ছিল অবসর বিনোদন আর বৃথাচর্চার একটি দিক। এব্যাপারে অর্থাগমের কোন ক্ষেত্র ছিল না। সাইনবোর্ড লেখা ছাড়াও অন্য আর একটি যে কাজে সামান্য অর্থ আসত তাহল শখের থিয়েটার ক্লাবের সিন-ড্রপসিন আঁকা।

### প্রাথমিক জীবিকা

বালক বেলায় ছবি আঁকার সুনাম হেতু ঐচ্ছিক পারিশ্রমিকে পাঠকপাড়ার ভট্টাচার্য পরিবারগুলির ঠিকুজীর নক্সা-ছক তৈরী এবং তাতে পুরুষ-মহিলার ছবি এঁকে দেওয়া ছাড়াও কৈশোরে রামকিঙ্কর তাঁর সহজাত ক্ষমতার সাহায্যে নাটকের সিন-ড্রপসিন আঁকতেন। তখনকার দিনে থিয়েটার হতো ছোট-বড় ফাঁকা জায়গায় বাঁশের মঞ্চে। ড্রপসিন ছাড়াও থাকত রাজপথ, রাজসভা, কক্ষ, বনপথ, দেবদেবী আশ্রিত বা নদীর

---

৭. ২ নং সাক্ষাৎকারের ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮. এই গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে রামকিঙ্করের নিজস্ব বক্তব্য দ্রষ্টব্য।

দৃশ্য প্রভৃতি নিয়ে গোটা দশ-বারো সিন এবং উপযুক্তভাবে মিল করা সাইড স্ক্রিন। মাঁকিন কাপড় জোড়া দিয়ে গোটানো সিনের জমিকে প্রথমে সাদা রঙ দিয়ে ভরাট করে বাজার থেকে কেনা গুঁড়ো রঙ গুলে সিন আঁকা হত। 'কালীতলা ড্রামাটিক ক্লাব'-এর জন্য রামকিঙ্করের আঁকা এইরকম একটি ড্রপসিন ছিল মহারাষ্ট্রের পার্বত্য পটভূমিকায় তরবারী হাতে প্রমাণ সাইজের অশ্বারোহী শিবাজী কেন্দ্রিক। তখনকার দিনে ড্রপসিন ওঠার আগে অনেকক্ষণ ধরে ক্লারিওনেটসহ জোরালো বাজনা চলত। প্রত্যক্ষদর্শী বসন্তকুমার বসু ঐ বাজনাসহ ড্রপসিন বা দৃশ্যপট দেখার প্রতিক্রিয়ার কথা আমাদের লিখিতভাবে জানিয়েছেন এইভাবে—'অধীর আগ্রহে ড্রপসিনের দিকে চেয়ে থাকতে গিয়ে মনে হয়েছিল তেজদৃপ্তভঙ্গীতে ধাবমান অশ্বে আরোহী শিবজীর জীবন্ত বিগ্রহ এই বুঝি এসে পড়ল।'

রামকিঙ্করের ১৬/১৭ বছর বয়সের ঐ একই ক্লাবের জন্য আঁকা আর একটি ড্রপসিন হল উড়ন্ত হাঁসের পিঠে বসা রামকৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। এই ড্রপসিনটি বহুদিন পর্যন্ত কালীতলার প্রয়াত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ছিল, বর্তমানে এটি আর দেখা যায় না[১]। এটিকেই রামকিঙ্করের আঁকা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রথম প্রামাণিক প্রতিকৃতি হিসাবে ধরা যায়। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে কৈশোরে রামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ রামকিঙ্করকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এক-সময়। রামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের বহু শিষ্যের সঙ্গে রামকিঙ্করের যোগাযোগ থাকলেও মাত্র দু'জনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের খোঁজ পাওয়া যায়। এঁরা হলেন বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠের স্বামিজী 'আশু মহারাজ' এবং দ্বিতীয়জন হলেন শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তশিষ্য বাঁকুড়ার লালবাজারের অধিবাসী বিভূতি ঘোষ। শোনা যায় চারের দশকের শেষ-দিকে আশু মহারাজের চোখ অপারেশনের খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থেকে বাঁকুড়ায় ছুটে আসেন রামকিঙ্কর। এছাড়াও বহুদিন পর্যন্ত বিভূতি ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর। একবার বিভূতিবাবুর অসুখের খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থেকে আসতে না পারায় উদ্বিগ্ন রামকিঙ্কর ভাইপো দিবাকরকে যে চিঠিটি লেখেন তার অংশ বিশেষ এইরকম—'একবার সময় করে লালবাজারে শ্রীবিভূতি ঘোষ মহাশয়ের ওখানে যেতে হবে। ২ খানা চিঠি লিখেছি তার উত্তর পাই নাই। যাই হোক ওঁকে বলিস আপনার যদি লেখার অসুবিধা হয় আপনি যা বলবেন আমি লেখব, আপনি পরে নাম স্বাক্ষর করে দিবেন।'

ড্রপসিন-সিন আঁকা ছাড়াও রামকিঙ্কর লিখতেন সাইনবোর্ড। শোনা যায় বাঁকুড়ার রাঠীদের ( মাড়োয়ারী ) সাইনবোর্ড লিখে প্রথম কিছু পারিশ্রমিক পান তিনি। এই পরিবারের চাঁদরতন রাঠী, শিবরতন রাঠী প্রমুখদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল পিতা চণ্ডীচরণের। এবং রামকিঙ্করের শিল্পপ্রতিভাকে উৎসাহিত

---

১. এই ড্রপসিনটি কেউ নিয়ে গেছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

করেছিলেন এই পরিবার। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মাচানতলার একরামের আস্তাবলের বড়ো বাক্সের মতো ঘোড়ায়টানা ছ্যাকড়াগাড়ীর প্যানেলের চিত্রকর্ম এবং নাম্বারও লিখতেন রামকিঙ্কর।

ভাদুপূজা এ অঞ্চলের একটি সেরা পূজা। তখনকার দিনে এই পূজা হত পতিতালয়েও। বাঁকুড়াতে এইরকম পতিতালয় রয়েছে। পুলিশ 'বি' ফাঁড়ির সামনের এলাকা থেকে কয়েকবছর আগে এই নিষিদ্ধপল্লী বর্তমানে পচার পাড়ে সরানো হয়। এখানে ভাদ্রমাসে এই পূজো হত মহাসমারোহে। ভাদ্রসংক্রান্তির দিন খুব ধুমধামের সঙ্গে বিসর্জনের শোভাযাত্রা বের হত। সারারাত ধরে শহরের বহু সম্ভ্রান্তবাবুরা এখানে রাত কাটাতেন। রামকিঙ্করের দাদা রামপদ ভাদু তৈরীর অর্ডার নিয়ে আসতেন। তৈরী করতেন রামকিঙ্কর। মূর্তির মান অনুযায়ী দাম হত তিন পয়সা থেকে ন'আনা। ৮০ বছরের বৃদ্ধা রাণী দাসীরও ভাদুমূর্তি রামকিঙ্কর তৈরী করে দিতেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

### নাটক

নাটকের সিন, ড্রপসিন আঁকা ছাড়াও বাঁকুড়ার প্রথম পর্বের জীবনে রামকিঙ্কর বেশ কয়েকটি নাটকে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা করেন। জানা যায় তাঁর অভিনীত প্রথম নাটক 'মালিনী'। পাঠকপাড়ার বাসিন্দা অমর ভট্টাচার্যের বাড়ীর সামনের মাঠে 'রিজিয়া' নাটকে এবং কুলুবেড়ে অঞ্চলের 'কারাগার' নাটকে অভিনয় করেন তিনি। প্রয়াত অভিনেতা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত 'কালীতলা ড্রামাটিক ক্লাব'-এর নাট্যাভিনয়েও রামকিঙ্কর অংশগ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। মোলডুবকা অঞ্চলের চট্টোপাধ্যায় ( অনাদি ) পরিবার কর্তৃক উপস্থাপিত একটি নাটকে নাটকের পাত্র-পাত্রীদের সাজসজ্জা, সীন আঁকা ছাড়াও জানা যায় যে সেইসময়ে যখন সাধারণ পরিবারের মেয়েরা নাটকে অংশগ্রহণ করতেন না ছেলেরাই করতেন মেয়েদের অভিনয় তখন পতিতা মেয়ে এনে নাটকের অভিনয় করান হয় এবং মেকআপের দায়িত্ব নেন রামকিঙ্কর। এছাড়াও তিনি একটি নাটক লিখেছিলেন বলে শোনা যায়।

### স্বদেশী, অসহযোগ আন্দোলন, তৎকালীন বাঁকুড়া ও রামকিঙ্কর

বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং ছোটনাগপুরের পাহাড়ী এলাকা নিয়ে গঠিত হয় 'জঙ্গলমহল'। ১৭৬৭—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঁকুড়া ছিল 'জঙ্গলমহল'-এর আওতায়। আর এই জঙ্গলমহলের সদর ঘাঁটি ছিল বাঁকুড়া। ১৭৬৭—৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে ছোটবড় নানা গণ-আন্দোলনের কথা জানা যায়। যার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত ইংরেজ প্রবর্তিত নাম 'চুয়াড় হাঙ্গামা'র। শাসনের সুবিধার জন্য ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জঙ্গলমহলকে ভেঙে 'সাউথ-ওয়েস্ট

ফ্রন্টিয়ার' নাম দিয়ে এই এলাকাকে সরাসরি গভর্নর জেনারেলের অধীনে নিয়ে আসা হয়। এই এলাকার পূর্ব সীমান্ত ছিল বর্তমান শহর বাঁকুড়ার কাছাকাছি। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলা বর্তমান আকার নেয়। যদিও তখনও পর্যন্ত এর নাম ছিল 'পশ্চিম বর্ধমান'। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জেলাটির নামকরণ হয় 'বাঁকুড়া' নামে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরও ঊনবিংশ শতাব্দীর পরাধীন ভারতবর্ষে নানা গণ-আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছে বাঁকুড়ার মাটিতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ১৯০১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গানের দল নিয়ে সর্বপ্রথম বাঁকুড়ায় এসে ওঠেন বর্তমান পুলিশ ক্লাবের কাছে কালীতলায়। এবং তাঁর প্রথম বক্তৃতা করেন যুগীপাড়ার নিকটবর্তী দোলতলায়। এইসময় থেকে বলা যেতে পারে ভারতবর্ষেব স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত এই দোলতলা হয়ে ওঠে নানা রাজনৈতিক নেতা এবং তাঁদের বক্তৃতার পীঠস্থান।

বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের পত্তন হয় ১৯২০ সালে। প্রথম সভা হয় দোলতলায়। ঐ সময়েই বাঁকুড়ার অন্যতম সুসন্তান বিপ্লবী অনিলবরণ রায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় জেলা কংগ্রেস কমিটি ও জেলা খিলাপৎ কমিটি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে রাজকুমার গোস্বামী, হেমচন্দ্র সেন, মৌলভী দেদার বক্স প্রমুখ বাঁকুড়ায় আসেন এবং দোলতলায় বক্তৃতা করেন। রামকিঙ্কর সেই বক্তৃতা শোনেন। এছাড়াও স্বদেশীযুগে বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে গান্ধীজি পর্যন্ত সেইসময়ের প্রায় সমস্তই বড় বড় স্বদেশী নেতারা বাঁকুড়ায় যান। এবং রামকিঙ্কর তাঁদের কাছাকাছি আসেন।

আগেই বলা হয়েছে অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথমদিকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনিলবরণ রায়ের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় স্কুলের ছাত্রাবস্থায় পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কাজকর্মে জড়িয়ে গিয়ে রামকিঙ্করের ছাত্রজীবনের অবসান হয়। এবং শিল্পকাজে দক্ষতার জন্য মিছিল, মিটিং, চরকা কাটা বা বিলি প্রভৃতির দায়িত্ব না দিয়ে অনিলবরণের একান্ত স্নেহভাজন রামকিঙ্করের উপর ভার পড়ে কোন উল্লেখযোগ্য উক্তি বড় বড় করে লিখে কংগ্রেস অফিসের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেবার কাজ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এইসময় থেকেই রামকিঙ্কর তেলরঙের ব্যবহার করেন। কারণ রামকিঙ্করের কথায় জানা যায় এগুলি তেলরঙ দিয়েই আঁকতেন তিনি[১০]। রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত এইসময়ে

---

১০. শান্তিনিকেতন আসার আগে বাঁকুড়ায় বসবাসকালীন রামকিঙ্কর একবার কলকাতা যান এবং সেখান থেকে তেলরঙেব ব্যবহার শিখে ফেরেন। তাঁর প্রথম তেলরঙ ব্যবহার করার কথা রামকিঙ্কর জানিয়েছেন এইভাবে—'একবার কলকাতা গেছি। এক রঙেব দোকানে গিয়ে বললাম—'অয়েল কালার, অয়েল কালার নাম শুনেছি দোকানে আছে?' সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো টিউব বের কবে দিলো। জিজ্ঞেস করলাম—'এ কেমন করে লাগায়?' দোকানী বলল—'টিউব টিপে রঙ বের কববেন, তেল নেবেন, লাগাবেন ব্যস।' সেই দোকানীই আমার অয়েল পেন্টিং-এর গুরু।' এই গ্রন্থের ৭০-৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রামকিঙ্করের করা অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকাজ হল পোস্টারচিত্র এবং হাতে লেখা পোস্টার। এই পোস্টার লেখার বা আঁকার কাজ চলত রাত্রিবেলায় দোলতলার গোলক কর্মকারের বাড়িতে। সঙ্গী হিসাবে থাকতেন নুনগোলা রোডের জয়রাম নন্দী এবং কামারপাড়ার শম্ভু কর্মকার। এইসময়ে আঁকা রামকিঙ্করের কয়েকটি বলিষ্ঠ পোস্টারচিত্র হল 'ভাবতমাতার অবস্থা' 'ঝড়', 'বুগ্নশিশু', 'বন্দী', প্রভৃতি। ১৯২১ সালে ইংলণ্ডের যুবরাজের কলকাতায় আগমনকে কেন্দ্র করে যে হরতালের ডাক দেওয়া হয় সেইসময়ে রামকিঙ্করের আঁকা তিনটি বলিষ্ঠ পোস্টারচিত্রের কথাও জানা যায়। রামকিঙ্করই হলেন বাঁকুড়ার এমন একজন ব্যক্তি যিনি বাঁকুড়ার মাটিতে হাতে লেখা পোস্টার ও পোস্টারচিত্রের প্রবর্তন করেন সর্বপ্রথম এবং তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। ১৯২৪ সালের ৭ই জানুয়ারী বাংলার লর্ড 'লিটন' বাঁকুড়া পরিদর্শনে এলে তাঁর আগমন উপলক্ষে অনিলবরণ রায়ের নেতৃত্বে বিপ্লবী গোপন সংস্থা যেসব কাজকর্ম করেন সেসব কাজেব সঙ্গেও ১৮ বছরের রামকিঙ্কর যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়াও বড়বাজারের শান্তিনিকেতন হোটেলের কিংবা ফিডাব বোডের অহীন্দ্রকুমাব ঘোষেব বাড়ীর গোপন আলোচনা সভায় যোগদানের এবং দলীয় কাজে নানান গোপন চিঠিপত্র আদান-প্রদানে তাঁর অংশগ্রহণেব কথাও জানা যায়। বলা যেতে পাবে যে পরাধীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর ভেতবে এমন একটি স্বাধীন মানসিকতার জন্ম হয় যা পরবর্তী সময়ে তাঁর দীর্ঘ ব্যক্তি ও শিল্পীজীবনে তাঁকে সাহায্য করেছে জীবন ও শিল্পের প্রচলিত বাঁধা-ধরা পথ ছেড়ে নিজেই নিজের পথ কেটে স্বাধীনভাবে অজানা সেই দুর্গম পথে চলার।

**প্রথম একক প্রদর্শনী**

১৯২২-২৩ সালে বাঁকুড়ায় সর্বপ্রথম একটি স্বদেশী মেলার আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তা 'বাঁকুড়া এগ্রিকালচার অ্যাসোসিয়েশন'। অনুষ্ঠিত হয় মাচানতলাব 'এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল'-এর সামনে। উদ্বোধন করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত থাকেন তৎকালীন বাঁকুড়ার জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত মহাশয়। মেলায় রামকিঙ্করের অনেকগুলি চিত্র ও পোস্টারচিত্রের প্রদর্শনী ছাড়াও ছিল দৃষ্টি আকর্ষণ করা একটি বিরাট মাপের, প্রমাণ সাইজের হাতির ছবি। নাম 'শৃঙ্খলিত হাতি'। যার নীচে রামকিঙ্কর লিখে দিয়েছিলেন 'ক্ষুদ্র এক তৃণ বলো কিবা শক্তি ধরে/একত্র হইলে পারে হস্তী বাঁধিবারে।' এটিকেই রামকিঙ্করের শিল্পী জীবনের সর্বপ্রথম 'একক প্রদর্শনী' বা 'ওয়ান ম্যান শো' বলা যেতে পারে।

**শান্তিনিকেতন যাত্রা**

রামকিঙ্করের শান্তিনিকেতন যাত্রার ব্যাপারে তিন/চার রকমের কথা শোনা যায়। রামকিঙ্করের নিজের কথায়—'কি করে শান্তিনিকেতনে এলাম সে এক কাহিনী। আমি তখন বাঁকুড়াতেই আছি, নিজেই মূর্তিটুর্তি করছি। ওখানে স্বদেশী মেলা হত

তখন, স্বদেশীবাবুরা যেতেন, তাঁদের ছবিও এঁকেছি। আর আঁকতাম যাত্রা, থিয়েটারের ড্রপসিন, সিনসিনারী। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেখানে গিয়েছিলেন নন-কোঅপারেশনের সময় ব্রাহ্মমন্দিরে বক্তৃতা দিতে। উনি যেখানে ছিলেন তার খুব কাছেই আমার বাড়ীটা। আমার বন্ধু ওঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি ছবি দেখালাম, উনিতো মহাখুশী। পরদিন আবার এসে হাজির—'কি করছো রামকিঙ্কর ?' ছবি দেখালাম আবার। উনি তখন বললেন, 'আমি এখান থেকে শান্তিনিকেতন যাচ্ছি, দেখি যদি ওখানে কিছু করা যায়। আমি চিঠি লিখবো, তুমি তৈরী থেকো। কিছুদিন পরেই রামানন্দবাবুর চিঠি এলো[১১]। আমি পরের ট্রেনে রওনা হলাম[১২]।'

(২) বাঁকুড়াবাসী প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকৃষ্ণ দাসের কথায়—কিঙ্কর যখন জাতীয় বিদ্যালয়ের ( National School ) উচ্চতর শ্রেণীতে পড়ছে তখন 'তিলক স্বরাজ ফাণ্ড'-এর জন্য অর্থ সংগ্রহে এসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্কুল পরিদর্শনে এলে কিঙ্কর তাঁর ছবি এঁকে ফেলে। দেশবন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ায় তিনি তা রামানন্দবাবুর গোচরে আনেন।

(৩) কেউ বলেন—নিজেদের পাঠকপাড়ার বাড়ী থেকে যুগীপাড়ার রাস্তা দিয়ে পথ চলার সময়ে শাঁখের চুনারীপাড়ার মাঠে সিন অঙ্কনরত রামকিঙ্কর রামানন্দবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(৪) ভাইপো দিবাকরের কথায়—পিতৃদেব চণ্ডীচরণ রামানন্দবাবুদের বাড়ীর ক্ষৌরকার হিসাবে প্রিয় ছিলেন। কলকাতা থেকে কখনও বাঁকুড়ার বাড়ীতে এসে ছেলের খোঁজখবরে তাঁর চিত্রাঙ্কনে আগ্রহের কথা শোনেন এবং কিছু নমুনা দেখে জহুরী জহর চিনে ফেলেন এবং পরে চিঠি লিখে শান্তিনিকেতনে পাঠান[১৩]।

যাই হোক, রামানন্দবাবুই যে রামকিঙ্করকে শান্তিনিকেতনে আনেন এতে কোনই দ্বিমত দেখছি না। কিন্তু কিভাবে তিনি রামানন্দবাবুর নজরে আসেন এ নিয়েই দেখা দিচ্ছে নানামত। তবুও দ্বিতীয় ও চতুর্থ মতের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায় না। কখনোবা দুইমত এক হয়ে রামকিঙ্করের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়।

একথা স্বীকার করতেই হয় যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর মধ্যস্থতায় রামকিঙ্কর শান্তিকেতনে শিল্প শিক্ষার সুযোগ পেলেও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী, সুহৃদ প্রতিবেশীদেরও কেউ কেউ তাঁর শিল্প প্রতিভা উন্মেষের পথে তাঁকে উৎসাহিত বা সাহায্য করেছিলেন। কারণ একথা মনে রাখা দরকার যে রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে যাবার আগেই বাঁকুড়ার

---

১১. রামানন্দবাবু শান্তিনিকেতনে যাবার ৩/৪ মাস পর চিঠি পান রামকিঙ্কর। ৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১২. শীত ১৩৭৯ সালের ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় 'অন্যমনে' পত্রিকায় দেওয়া রামকিঙ্করের সাক্ষাৎকার।

১৩. দিবাকর বেইজ-এর এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধের ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জীবনে তিনি অনেকখানিই শিল্পীখ্যাতি অর্জন করে গিয়েছিলেন। জানা যায় যে রামকিঙ্করের থেকে বছর দু'য়ের বড় সুহৃদ স্কুলডাঙ্গার ভুবন মিত্রের. এ'র সঙ্গে রাম-কিঙ্করের অন্তরঙ্গতার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নিকট আত্মীয়, সরকারী বেতনে গ্রাম ও কৃষি উন্নয়ণের কাজে নিয়োজিত রবীন্দ্রপ্রিয় কৃষিবিদ শ্রীযুক্ত সন্তোষ বিহারী বসু (১২৯৬—১৯৬২) তাঁর একক বসবাসের স্থান শ্রীনিকেতনে রাম-কিংকরকে প্রথম আশ্রয় দেন। এবং সন্তোষবিহারীর ছোট দাদা জার্ডিন স্কিনার কোম্পানীর কোলিয়ারীর হেড অফিস জিয়ালগড়া অফিসের ওভারসীয়ার ও প্রধান ড্রাফসম্যান প্রয়াত ননীমোহন বসু তাঁর সাহেব কোম্পানীর পরিত্যক্ত ভাণ্ডার থেকে যোগান দিতেন খুব ভালো কাগজ এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'উইনসর নিউটন'-এর উৎকৃষ্ট ওয়াটার কালার।

পদবী

একথা আগেই বলা হয়েছে যে রামকিংকরের পিতা চণ্ডীচরণ ছিলেন ক্ষৌরকার। নরসুন্দর। তাঁদের পারিপারিক পদবী ছিল পরামাণিক। বাঁকুড়ার কেউ এই পরিবারের পুরানো দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখেছেন যে এই পরিবারের পূর্বপুরুষদের পদবী ছিল 'লাই'[১৪]। একথার সততা কতটুকু জানি না। তবে রামকিংকরের পিতা চণ্ডীচরণ কিংবা চণ্ডীচরনের পিতা বিশ্বনাথ কিংবা রামকিংকরের দাদা রামপদ প্রমুখদের প্রত্যেকেই পদবী হিসাবে ব্যবহার করতেন পরামাণিক। রামকিঙ্করও যে একসময় পদবী হিসাবে এটিই ব্যবহার করতেন তারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে নিজের নাম ও পদবী লেখা তাঁর চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাসপাঠ্য বইটিতে (বইটির নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে)। এছাড়াও আরও উল্লেখ পাওয়া যায় স্কুলডাঙ্গার কাছাকাছি শিখরীপাড়ার অন্যতম বাল্যবন্ধু অশ্বিনী পালের বাড়ীতে সযত্নে রাখা তেলরঙে আঁকা দুটি ছবির একটিতে। যে ছবিটি/ছবিগুলি রামকিংকরের শান্তিনিকেতনে যাবার আগে ১৯২২ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে আঁকা বলে মনে হয়। যেখানে দেখা যায় দুটি ছবির মধ্যে 'পূজারী' নামের ছবিটিতে, নীচে, বাঁদিকের কোণে তুলি দিয়ে, কালোকালিতে শুধুমাত্র 'রামকিংকর' লেখা বর্তমান স্বাক্ষরটির একটু পাশেই রঙ চটে যাওয়ায় পরিষ্কার দেখা যায় উপরের এই স্বাক্ষরটির নীচেই খুব সুন্দরভাবে রয়েছে অন্য একটি দ্বিতীয় স্বাক্ষর। যেখানে রয়েছে তাঁর পদবীসহ পুরো নাম, যা এইরকম: R. K PORAMANIK. সংশোধনের জন্যই কি রঙের আস্তরণের নীচে ঘুমিয়ে থাকা পূর্বের সাক্ষরটি মুছে কালোরঙের উপরের টানা স্বাক্ষরটি করে দিয়েছিলেন রামকিংকর?

এছাড়াও বাঁকুড়ায় বসবাসকালীন শান্তিনিকেতন যাত্রার আগে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩৩২-এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত, ইংরাজী ১৯২৫ সাল, তাঁর 'নির্বাসিতা' নামের

---

১৭, দিবাকর বেইজ-এর এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধের ৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ছবিটিতে শিল্পীর নাম হিসাবে ছাপা হয় 'শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর প্রামানিক'[১৫]।

রামকিঙ্করের থেকে দু'বছরের কলাভবনের সিনিয়র ছাত্র প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে রামকিঙ্করের পিতৃদত্ত নাম ও পদবী নিয়ে সেইসময়ের কলাভবনের সহপাঠী বন্ধুদের রসিকতায় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত রঙীন ছবিটিতে শিল্পীর নাম ও পদবী হিসাবে তিনি ব্যবহার করেন 'রামপ্রসাদ দাস'[১৬]।

যাই হোক, পরবর্তী সময়ে রামকিঙ্কর 'পরামানিক' এবং 'দাস' পদবীর পরিবর্তে প্রথম ব্যবহার করেন 'বেজ'।[১৭] কারণ ভাইপো দিবাকরকে লেখা অনেক চিঠিতে রামকিঙ্কর কর্তৃক ব্যবহৃত এই 'বেজ' পদবীটির প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। আরো একটু পরে 'বেজ' পদবীর পরিবর্তে লেখেন 'বেইজ'। 'বেজ' পদবী সমগ্র বাঁকুড়া পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ এবং বীরভূমের দক্ষিণাংশে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু 'বেইজ' পদবীটি বিরল। বরাবর নিজস্ব ধরনধারণ বজায় রেখে স্বাধীনভাবে চলার মতোই পরবর্তী সময়ে 'বেজ' শব্দটি ডিসটরড করে দেন রামকিঙ্কর। পরিবর্তে লেখেন 'বেইজ'। যাকে রামকিঙ্করীয় স্টাইলই বলা যায় একপ্রকার। এ সম্পর্কে রামকিঙ্করের নিজের কথায়—'বেইজ' টাইটেল বেশ অদ্ভুত, এটা এসেছে 'বৈদ্য' থেকে, 'বৈজ' হয়ে পরে 'বেইজ' হয়েছে। আমি অবশ্য এতসব জানতাম না, পরে আমাকে ক্ষিতিমোহন সেন মশাই বলেছিলেন। তবে এ 'বৈদ্য' কিন্তু 'সেন' বৈদ্য নয়। আমাদের জাতিগত বৃত্তি ছিল অন্য।'[১৮]

১৫. 'পরামানিক' পদবীর পরিপূরক হিসাবেই কি ব্যবহৃত হয়েছে 'প্রামানিক'?

১৬. প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—এর এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধের ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৭. শ্রীমতী মালতী সেন এবং প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৩৩২ সালের, ইং ১৯২৫ সাল, 'বিশ্বভারতী' হাতে লেখা পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যার ৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'লক্ষ্ণৌ নিখিলভারত শিল্পপ্রদর্শনী' থেকে বিজয়ী রামকিঙ্করের রূপোর পদক প্রাপ্তির সংবাদে তার পদবী হিসাবে 'প্রামানিক' উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ একই পত্রিকায়, ঐ একই বছরের চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (?) প্রকাশিত 'সুরেন্দ্রনাথ' নামক রামকিঙ্করের আঁকা ছবিটিতেও ঐ একই পদবী ব্যবহার হতে দেখেছি। ঐ একই বছরে প্রকাশিত, ঐ একই পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যায় (?) প্রকাশিত 'শরৎশ্রী' নামক রামকিঙ্করের আঁকা ছবিটিতে 'প্রামানিক' পদবীর পরিবর্তে 'বেইজ' ব্যবহৃত হতে দেখি। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩২ সালের মুদ্রিত 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার ১৬১ পৃষ্ঠায় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখিত 'আশ্রম সংবাদ'-এ 'লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত শিল্পপ্রদর্শনী' থেকে রামকিঙ্করের পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষনায় তাঁর পদবী 'প্রামানিক' ব্যবহারের ত্রুটি সংশোধন করে ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩২ সালের ঐ একই পত্রিকার ১৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'আশ্রম সংবাদ'-এ লেখা হয়—'কলাভবনের (আগের) সংবাদের মধ্যে একটু ভুল ছিল। শ্রীরামকিঙ্কর প্রামানিকের স্থলে শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ হইবে।' সুতরাং অনুমান করা যায় যে ইংরাজী ১৯২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকের কোন একটা মাসে রামকিঙ্কর পাকাপাকিভাবে তাঁর পদবী হিসাবে 'বেইজ' ব্যবহার করেন।

১৮. এই গ্রন্থভুক্ত ২নং সাক্ষাৎকারের ৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

## শান্তিনিকেতন পর্ব

.........................

১৯২৫—৮০

১৯২৫ ঃ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক, প্রতিবেশী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ১৯ বছর বয়সে কলাভবনে ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। 'লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত শিল্পপ্রদর্শনী'তে অংশগ্রহণ এবং রুপোর পদক লাভ[১]। ঐ একই প্রদর্শনী থেকে অধ্যক্ষ নন্দলাল পাচ্ছেন সোনার পদক।

১৯২৭ ঃ নালন্দা, রাজগৃহ, জয়পুর, চিতোর, উদয়পুর প্রভৃতি ভ্রমণ। ভারতের প্রাচীনযুগের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। জয়পুরের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মালিরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯২৮ ঃ ছাত্রাবস্থায় এইসময়ে কয়েকজন বিদেশী ভাস্করের কাছে ভাস্কর্যের পাঠ নেবার সুযোগ পান।

কায়রোতে পরিচয়ের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে আসেন ভিয়েনার মহিলা ভাস্কর লিজা ভনপট। কিছুদিনের জন্য তাঁর ছাত্র হন। মিসেস পট বিদায় নেবার অল্প কিছুদিন পরই আসেন রঁদার বেলজিয়ান শিষ্য বুর্দেলের শিষ্যা মাদাম মিলওয়ার্ড। প্রকৃতপক্ষে এঁর কাছেই মূর্তিগড়া ও ছাঁচ নেবার কাজ শেখেন। মিলওয়ার্ড-এর সুদক্ষ সহযোগিতা এবং ইউরোপীয়ান ভাস্করদের উপর বিষদ আলোচনা তাঁকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে বিশেষ সাহায্য করে।

মিলওয়ার্ড চলে যাবার অল্প কিছুদিন পর আসেন ইংরেজ ভাস্কর বের্গম্যান। মাটির টালিতে শেখান রিলিফের কাজ।

১৯২৯ ঃ কলাভবনের পুরো শিক্ষা ( Full Course of Instruction ) শেষ করে শান্তিনিকেতনেই স্বাধীনভাবে শিল্পকাজ আরম্ভ করেন।

প্লাস্টারে করেন ৩০ সে.মি. উচ্চতার কচ ও দেবযানী।

---

১. শ্রীমতী মালতী সেন এবং প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 'বিশ্বভারতী' হাতে লেখা পত্রিকার ৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'সংবাদ'-এ 'কলাভবনের উদীয়-মান শিল্পী শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর-প্রামানিক'-এর 'রৌপ্য পদক' প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩২ সালের মুদ্রিত 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার ১৬১ পৃষ্ঠায় রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখিত 'আশ্রম সংবাদ'-এ ঐ প্রদর্শনী থেকে 'শ্রীযুক্ত *রামকিঙ্কর প্রামানিক*'-এর সুবর্ণপদক' প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯৩০ঃ কিছু সময়ের জন্য কলাভবনের শিক্ষকতার কাজে সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত থাকেন।

'কারুসংঘ' প্রতিষ্ঠা। আটজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের অন্যতম একজন। এই সংঘের পক্ষ থেকে ও. সি. গাঙ্গুলীর ফরমাসে ৫০ টাকা দক্ষিণায় করেন সিমেন্টের টালিতে অজন্তার আদলে দুটি রাজহাঁস। আঁকেন গুরুসদয় দত্তের ছড়ার বই 'চাঁদের বুড়ী'র জন্য ছবি।

কলকাতায় এক ইংরেজ মহিলার আহ্বানে 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' নামের এক প্রাচীর প্রতিযোগিতায় পাঠান একসঙ্গে আটজন বলিষ্ঠ লোকের নৌকায় দাঁড় বাওয়ার ছবি।

১৯২৫—'৩০-এর মধ্যে আঁকা তাঁর বেশীরভাগ জলরঙ এবং কালির ড্রইংগুলি হল ভাস্কর্যের জন্য করা প্রাথমিক খসড়া। এখান থেকেই তাঁর বিমূর্ত পর্যায়ের শুরুর সময়সীমা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৩১ঃ অল্প কিছুদিনের জন্য আসানসোলের ঊষাগ্রাম মিশনারী স্কুলে শিল্প-শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন।

এই বছরে করেন তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট ভাস্কর্যমালা 'মিথুন'।

১৯৩২—৩৩ঃ '৩২ এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে দিল্লীর মডার্ন স্কুলে শিল্পশিক্ষক হিসাবে যোগদান। ৬ মাস পর পুনরায় শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন। চুন-সুরকি দিয়ে দিল্লীতে করেন ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার একটি সরস্বতীর প্যানেল। মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য হিসাবে এটিকেই তাঁর প্রথম কাজ বলা যায়।

১৯৩৪ঃ কলাভবনে স্থায়ী শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন।

১৯৩৫ঃ 'শ্যামলী'র মাটির দেয়ালে করেন হাই-রিলিফের কাজ। এখানে নন্দলাল ও অন্যান্যদের কাজ ছাড়াও তাঁর কাজ আছে ঘরের প্রধান প্রবেশ-দ্বারের দুপাশে পোড়ামাটির (?) 'সাঁওতাল ও মেঝেন'-এর দ্বারপাল রিলিফ, পূর্বকোণে 'সাঁওতাল দম্পতি' এবং পেছনের দেয়ালে বাঁকুড়ার টেরাকোটা ছাঁচে 'কৃষ্ণগোপিনী' (কপি) প্রভৃতি। শান্তিনিকেতনে করা মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য হিসাবে এগুলিকেই তাঁর একেবারে প্রথম পর্বের কাজ বলা যায়। ডাইরেক্ট কংক্রীটে করেন তাঁর সর্বপ্রথম পরিবেশীয় ভাস্কর্য 'সুজাতা'। মাইহার রাজদরবার থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। থাকেন ১৫ দিন। এইসময়ে করেন তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট ভাস্কর্য 'আলাউদ্দিন খাঁ'র হেড পোর্ট্রেট।

১৯৩৬ঃ সিনিয়র ছাত্রদের নিয়ে আরম্ভ করেন ব্ল্যাক হাউস বা কালোবাড়ীর মাটির দেয়ালে রিলিফের কাজ।

এই বছরে কাস্ট সিমেন্টে করেন যথাক্রমে ৫২ সে.মি উচ্চতার 'শ্রীমতী জয়া' এবং ৭৬ সে.মি. উচ্চতার 'গাঙ্গুলীমশাই'।

১৯৩৭ ঃ  মডেলিং শেখানোর দায়িত্ব নেন।

শেষ করেন কালোবাড়ির কাজ। অন্যান্যদের কাজ ছাড়াও তাঁর কাজ আছে বাড়ীর সম্মুখভাগে কোচিনের মুর‍্যাল পেণ্টিং থেকে নেওয়া ড্রইং-এর সাহায্যে করা শিববিবাহের প্যানেল। এবং 'বাদনরত সাঁওতাল' প্রভৃতি। এই বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে তেলরঙ নিয়ে ঐকান্তিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এই সময়ে করা তাঁর প্রথম 'গুরুত্বপূর্ণ' তেলরঙের ছবিটি হল 'সোমা যোশী'র প্রতিকৃতি বা 'লেডি উইথ ডগ'।

১৯৩৮ ঃ  এই বছরের শেষের দিকে ডাইরেক্ট কংক্রীটে করেন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত পরিবেশীয় ভাস্কর্য 'সাঁওতাল পরিবার'।

৪৬ সে.মি. উচ্চতার প্লাস্টারে করেন রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত প্রতিকৃতি ভাস্কর্য 'পোয়েটস হেড' এবং বিশিষ্ট তৈলচিত্র 'পিকনিক'।

১৯৩৯ ঃ  ফেব্রুয়ারীতে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কলাভবনের যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

৫২ সে.মি. উচ্চতার কাস্ট সিমেণ্টে করেন বিশিষ্ট ভাস্কর্য 'হেড অফ এ ওম্যান'।

১৯৪০ ঃ  পুরানো গেস্ট হাউসের সামনে করেন পরিবেশীয় ভাস্কর্য 'ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড' বা 'বাতিদান'। এই কাজটিকেই ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম বিমূর্ত ভাস্কর্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৩৫—'৪০ সাল হল তাঁর শিল্পীজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। অধিকাংশই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকাজ এই সময়সীমায় করা।

১৯৪১ ঃ  জুলাই মাসে উদয়ন-এর উপরতলার ঘর থেকে চিকিৎসার জন্য অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের কলকাতা যাত্রা। অসুখে পড়ার অল্প কিছুদিন আগে তাঁকে দেখে করেন রবীন্দ্রনাথের মূর্ত আবক্ষ প্রতিকৃতি ভাস্কর্য।

'৪১-এ গুরুদেবের মৃত্যু। এর অল্প কিছুদিন পর অবনীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীর আচার্যরূপে যোগদান।

১৯৪২ ঃ  কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপকেরা দল বেঁধে করেন চীনাভবনের ফ্রেস্কো ও রিলিফের কাজ। বলা যায় শান্তিনিকেতনে দল বেঁধে কাজ করার এটাই ছিল শেষ বড় কর্ম উৎসব। শঙ্খ চৌধুরী, প্রভাস সেন প্রমুখ ছাত্রদের নিয়ে করেন বাইরের দেয়ালে রিলিফের কাজ।

'৪২-এর যুদ্ধ, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন। যুদ্ধবিরোধী ছবি আঁকেন।

জুন মাসের শেষদিকে বীরভূম জেলায় ঘণ্টায় ৫০ মাইলেরও বেশী বেগে ঝড় বয়ে যায়। শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন কিছু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আঁকেন বিশিষ্ট তৈলচিত্র 'আফটার দ্যা স্টর্ম' বা 'ঝড়ের পরে'। দিল্লীতে প্রথম একক প্রদর্শনী।

১৯৪৩ : '৪৩-এর মন্বন্তর। মন্বন্তরের প্রভাব তাঁর ছবি ও ভাস্কর্যে প্রতি-ফলিত হয়।

ডাইরেক্ট কংক্রীটে করেন অন্যতম বিশিষ্ট মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য 'ধানঝাড়া' এবং ৪৮ সে মি উচ্চতার কাস্ট সিমেণ্টে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ভাস্কর্য।

১৯৪৪ : ১৮ থেকে ২১শে অক্টোবর দিল্লীর ম্যাসে হলে ( Massey Hall ) তাঁর ও বিনোদবিহারীর যুক্ত প্রদর্শনী।

শান্তিনিকেতনের হ্যাভেল হলে দিল্লী থেকে ফিরে আসা ঐ একই ছবির যুক্ত প্রদর্শনী।

১৯৪৫ : 'নেপাল ওয়ার মেমোরিয়াল'-এর জন্য কয়েকটি ভাস্কর্য তৈরীর কাজে নেপাল সরকারের আমন্ত্রণে এই বছরেই প্রথম যান দেশের বাইরে, নেপালে। কোন পৃষ্ঠপোষকের পৃষ্ঠপোষণায় করা এটাই ছিল তাঁর প্রথম কাজ।

আরম্ভ করেন বর্তমান লেডিজ হোস্টেলের সামনে ডাইরেক্ট কংক্রীটের 'বুদ্ধমূর্তি'র কাজ।

১৯৪৬ : ২১শে সেপ্টেম্বর বলরাজ সাহানীর পরিচালনায় সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত হিন্দী নাটক 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ী'র মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব নেন। 'সিংহসদন-'এ অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশরী' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মেকআপের দায়িত্ব নেন। ১৮ই নভেম্বর প্যারিসের 'প্রেসিডেণ্ট উইলসন এ্যাভিন্যু'র 'মডার্ন আর্ট ম্যুজিয়াম'-এ অনুষ্ঠিত আধুনিক শিল্প প্রদর্শনীতে ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, সুইডেন, হল্যাণ্ড, তুর্কী, কানাডা, চীন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দেশসহ বিশ্বের ৩৫টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ভারত সরকারের তৎকালীন শিক্ষাবিভাগ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্থানীয় উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর কয়েকটি ছবি প্যারিসের ঐ প্রদর্শনীতে পাঠায়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল তাঁর করা 'কোপাই' নামের তৈলচিত্রটি। দেশের বাইরে বিদেশে এটিই ছিল তাঁর সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ।

১৯৪৭ : বিশ্বভারতীর সাধারণ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।

সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত রাজশেখর বসুর 'ভুষুণ্ডির মাঠে' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মেকআপের দায়িত্ব নেন। পরে নাটকটি কলকাতার 'রঙমহল' নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। উপস্থিত থাকেন লেখক স্বয়ং রাজশেখর বসু। নাটকটি কলকাতায় বহুল প্রশংসিত হয়।

১৯৪৮ : শান্তিনিকেতনে 'দ্বারিক' গৃহে মঞ্চস্থিত ইংরাজী 'ওথেলো' নাটকের মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব নেন।

তেলরঙ এবং জলরঙে করেন অন্যতম বিশিষ্ট কাজ, মণিপুর রাজকন্যা, কলাভবনের ছাত্রী 'বিনোদিনী'র প্রতিকৃতি[২]। বুদ্ধগয়া, রাজগীর প্রভৃতি ভ্রমণ।

---

২. ১৯৪৫-এ প্রথমবার আসেন বিনোদিনী। থাকেন সম্ভবতঃ একবছর। ১৯৪৭-এর

১৯৪৯ঃ ২রা জানুয়ারী কলকাতায় অনুষ্ঠিত সারাভারত ভ্রাম্যমান চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

২০শে মার্চ কলকাতার 'নিউ এম্পায়ার বোর্ড'-এ বিশ্বভারতীর ছাত্রদের দ্বারা মঞ্চস্থিত সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' নাটকে মেকআপ ও মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব নেন। নাটকটি কলকাতায় বহুল প্রশংসিত হয়।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত নেপালের অরণ্য-পর্বত ও তার জীবনযাত্রার উপর চারশিল্পীর চিত্র ও ভাস্কর্যের যৌথ প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্র প্রদর্শন।

এই বছরের শেষের দিকে অল্পকালের জন্য 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর সভ্য হিসাবে যোগদান[৩]।

১৯৫০ঃ শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

জুলাই-এ প্যারিসের 'সেলোন দ্য রিয়েলিটি ন্যুভেলি'র ( Salon de Realite Nouvelle ) ৫ম আন্তর্জাতিক বিমূর্ত শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁর তিনটি ছবি দেখান হয়।

এই বছরে করেন তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট তৈলচিত্র 'কৃষ্ণের জন্ম'।

১৯৪০—'৫০-এর মধ্যে বিমূর্ততার সমস্যা, সুররিয়ালিস্টিক আকার, কিউবিজম এবং রিয়ালিজমের দিকে নতুন পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার জন্য নানাভাবে ব্যস্ত থাকেন।

আগস্টে আসেন দ্বিতীয়বার এবং ১৯৪৯-এর এপ্রিল পর্যন্ত থাকেন। পরবর্তী সময়ে রামকিঙ্করকে নায়ক করে তিনি মনিপুরী ভাষায় একটি নাটক লিখেছিলেন বলে জানা যায়।

৩. 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এ রামকিঙ্করের যোগদানের কথা দাবী করেন এই গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রদোষ দাশগুপ্ত। তাঁর লেখা 'স্মৃতিকথা শিল্পকথা' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রামকিঙ্করের উপর লেখা এই গ্রন্থভুক্ত নাতিদীর্ঘ নিবন্ধের কথা উল্লেখ করে এই গ্রুপেরই আর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পরিতোষ সেন '৮৮ সালের ৩ই জুন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখেন—'এই কথাটি কখনও কখনও এই সমালোচকের কানে এসেছে যে, রামকিঙ্কর নাকি আনুষ্ঠানিকভাবে কখনই এই গ্রুপের ( ক্যালকাটা ) সদস্য হননি। গ্রুপের আগ্রহেই নাকি তিনি দু'একবার মাত্র প্রদর্শনীতে কাজ পাঠিয়েছিলেন।' প্রদোষ দাশগুপ্ত এই লেখা পড়ে '৮৮ সালের ১১ জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক সমীপেষু কলমে একটি চিঠির মাধ্যমে রামকিঙ্করের এই গ্রুপে যোগদান বিষয়ে তাঁকে লেখা রামকিঙ্করের একটি চিঠির কথা উল্লেখ করে ( স্মৃতি থেকে ) তিনি আবার লেখেন—'১৯৪৯ সালের শেষের দিকে রামকিঙ্কর ক্যালকাটা গ্রুপে যোগ দিয়েছিলেন।' এবং ক্যালকাটা গ্রুপের যৌথ প্রদর্শনীতে একবার এবং বোম্বের 'প্রগ্রেসিভগ্রুপ'-এ একবার তাঁর ছবি দেখানো হয়। এছাড়াও কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১৯৭৬ সালের 'কবিপত্র' পত্রিকার বিশেষ শিল্পসংখ্যার ৩৪নং সংকলনের ৩২ পৃষ্ঠায় 'ক্যালকাটা গ্রুপ' নামক প্রবন্ধে পরিতোষ সেন লিখেছিলেন—'তিনি ( রামকিঙ্কর ) সরাসরি আমাদের দলের সদস্য না থাকলেও তাঁর কাজ আমাদের গ্রুপ শো-তে ( ক্যালকাটা ) কয়েকবারই দেখানো হয়েছিল।'

১৯৫১ ঃ প্যারিসের 'সেলোন দ্য ম্যে'র ( Salon de Mai ) আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনীতে ভারতসরকারের আমন্ত্রণে দুটি ছবি পাঠান।

১৯শে সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতীর ছাত্রদের দ্বারা গঠিত 'সাহিত্যিকা' নামের সাহিত্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত রবীন্দ্রনাথের 'অরূপরতন' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মেকআপের দায়িত্ব নেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'দ্বারিক' গৃহে শিক্ষা-ভবনের ছাত্রছাত্রী কর্তৃক মঞ্চস্থিত 'ওথেলো' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মেকআপের দায়িত্ব নেন।

সহকারী লেকচারার থেকে লেকচারার পদে উন্নয়ন।

১৯৫২ ঃ 'Monument of Unknown Political Prisoner' নামে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক বিশ্বব্যাপী ভাস্কর্য প্রতিযোগিতার জন্য বোম্বাই-এ গঠিত কমিটিতে 'ধানঝাড়া'র ( Harvester ) একটি ছোট মডেল পাঠান। কাজটি পরিত্যক্ত হয়। নির্বাচিত হয় আর এক অংশগ্রহণকারী প্রদোষ দাশগুপ্তের 'Bondage' নামের কাজটি।

১৯৫৩ ঃ ২৮ থেকে ৩০শে জানুয়ারী ভাস্কর্যের উপর কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় ( Faculty of art ) কর্তৃক আমন্ত্রিত হন।

'সাহিত্যিকা' নামক সাহিত্যগোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের মঞ্চসজ্জা, মেকআপ ও পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া ছাড়াও 'ধনঞ্জয়'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

বোম্বাই, ঔরাঙ্গবাদ, ইলোরা, কোণারক, গোপালপুর প্রভৃতি ভ্রমণ।

১৯৫৪ ঃ ভারত সরকার কর্তৃক 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ আর্ট'-এর ( Lalit Kala Akademi ) সদস্য নির্বাচিত হন।

এই বছরে করেন ১৫২ সে.মি. উচ্চতার প্ল্যাস্টারের অন্যতম বিশিষ্ট ভাস্কর্য 'স্পীড' বা 'গতি'।

১৯৫৫ ঃ দিল্লীর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'যক্ষ-যক্ষী' ভাস্কর্য তৈরীর জন্য ভারতসরকারের আমন্ত্রণ পান[৪]।

১৯৫৬ ঃ বিশ্বভারতীর শিক্ষকদের দ্বারা গঠিত 'শিল্পকথা' নামের শিল্পকলা অধ্যয়ন সঙ্ঘের ( Study circle on art ) সহ সভাপতি নির্বাচিত হন।

৯ই অক্টোবর তাঁর করা রবীন্দ্রনাথের মূর্ত আবক্ষ মূর্তির ব্রোঞ্জের প্রতিলিপি

---

৪. ১৯৫৮ জুলাই সংখ্যার 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এ এই ভাস্কর্যটি তৈরীর জন্য আমন্ত্রণ-পত্র পাওয়ার সন ১৯৫৮ ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু ভাস্কর্যটির খাদানের কাজ চলাকালীন বৈজনাথ থেকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে রামকিঙ্করের লেখা যেকয়েকটি চিঠি দেখেছি তাঁর সন ১৯৫৭, সুতরাং '৫৮-র আগেই তিনি আমন্ত্রণ পান। এছাড়াও আমন্ত্রণ পাওয়ার সন '৫৮ না হয়ে '৫৪ হবে বলে জানিয়েছেন সহকারী প্রণব দেববর্মণ।

( Casting ) ভারতসরকার কর্তৃক হাঙ্গেরীর বালাতন হ্রদের তীরে স্থাপন করা হয়।

ডাইরেক্ট কংক্রীটে করেন অন্যতম বিশিষ্ট পরিবেশীয় ভাস্কর্য 'কলের বাঁশী'। শুরু করেন 'যক্ষ-যক্ষী' ভাস্কর্যের জন্য খাদান-এর ( Quarry ) কাজ।

১৯৫৭ ঃ গ্রীষ্মের ছুটির ঠিক আগেই কলাভবনের ছাত্র-শিক্ষক কর্তৃক সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মেকআপের দায়িত্ব নেওয়া ছাড়াও 'বিশুপাগল'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

২৬শে অক্টোবর দিল্লীর যুব উৎসবের জন্য সঙ্গীতভবন মঞ্চে 'আন্তিগোনে' নাটকের মহড়ায় সহযোগিতাকালে বিশ্বভারতীর ইংরাজীর অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ডঃ সুধীন ঘোষ কর্তৃক দারুণভাবে প্রহৃত হন[৫]।

১৯৫৮ ঃ মন্দিরের টেরাকোটার ছাঁচ নেবার জন্য ৩০শে জুলাই মডেলিং-এর ছাত্রদের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী ইলাম-বাজার সংলগ্ন গ্রাম 'ঘুরিষা'য় গমন।

'যক্ষ-যক্ষী'র খাদানের কাজে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি। অভিযুক্ত সহযোগী রাজকুমার জেঠলির বিদায়। আগস্টে ঐ ভাস্কর্যের সহযোগী হিসাবে প্রণব দেববর্মণ-এর যোগদান।

২—৭ই অক্টোবর বিশ্বভারতী আয়োজিত বিশ্বভারতী সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী হলে গান্ধীজির উপর এক বিশেষ যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

৮ই ডিসেম্বর নন্দলালের ৭৬তম জন্মবার্ষিকীতে কলাভবন আয়োজিত সভায় গুরু নন্দলালের উপর বক্তৃতা প্রদান।

ভারতসরকার আয়োজিত দিল্লীর বর্তমান প্রগতি ময়দানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ইউ. জি. সি-র বিজ্ঞানমণ্ড অলংকরণের দায়িত্ব নেন। পরবর্তী সময়ে করা নাট্যঘরের অসমাপ্ত কাজ 'বার্থ অফ ফায়ার' বা 'আগুনের জন্ম'র প্রাথমিক পরিকল্পনা এখানেই।

১৯৫৯ ঃ কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুদিত পাষাণ' নাটকে মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব নেন।

এই বছরের শেষের দিকে শেষ করেন 'যক্ষ-যক্ষী'র খাদানের কাজ।

১৯৫৪—৫৯ পর্যন্ত 'যক্ষ-যক্ষী' নিয়ে তাঁকে একটি ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা যায়।

---

৫. চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে পঞ্চাশ দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত নাটক নিয়ে রামকিঙ্কর গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করেন। বহু বাংলা ও ইংরাজী নাটক পরিচালনা কিংবা মঞ্চসজ্জা কিংবা মেকআপের দায়িত্ব নেন। এগুলির মধ্যে প্রেমচন্দের 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী', সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল', রাজশেখর বসুর 'ভুষুণ্ডির মাঠে', রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকে কোনটির মঞ্চসজ্জা বা মেকআপ বা পরিচালনায় অসামান্য সৃষ্টিশীলতার পরিচয় রাখেন।

১৯৬০ ঃ নভেম্বরের শেষদিকে 'ছাত্র সম্মিলনী'র উদ্যোগে শান্তিনিকেতনের সিংহ-সদনে ৬ দিন ব্যাপী তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী। প্রদর্শনী উপলক্ষে তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের উপর সুধীরঞ্জন দাস এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লিখিত ভাষ্য পাঠ।

কলকাতার শ্যামবাজারের প্রস্তাবিত নেতাজী মূর্তির জন্য তাঁর করা নেতাজীর ম্যাকেট ( খসড়া ) কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিত্যক্ত হয় এবছর।

১৯৬১ ঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর—১লা অক্টোবর 'কলকাতা আর্ট কাউন্সিল'-এর উদ্যোগে 'আর্টিস্ট হাউস'-এ কলকাতায় প্রথম তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের একক প্রদর্শনী।

১৯৬২ ঃ রেল কর্তৃপক্ষ 'যক্ষ-যক্ষী' ভাস্বর্যের জন্য ব্যবহৃত পাথর বহনের খরচ বাড়িয়ে দিলে '৬০—'৬২-র সময়সীমায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর সংশোধিত রেলভাড়ার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছালে '৬২ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ রেল বিশাল ওজনের আটখণ্ড পাথর বৈজনাথ থেকে দিল্লীতে পৌঁছে দেয়। ভাস্কর্যটি তৈরীর জন্য পূর্বনির্ধারিত আর্থিক মূল্যেরও সংশোধন ( Revision of Estimate ) করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

১৯৬০—'৬২ চিত্র ও ভাস্কর্যে 'নেতাজী'কে বিষয় করে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা যায়।

১৯৬৩ ঃ লেডিজ হোস্টেলের সামনে করেন 'মোষ ও ফোয়ারা' ভাস্কর্য।

অক্টোবর নাগাদ শুরু করেন 'যক্ষ-যক্ষী' ভাস্বর্যের খোদাই-এর কাজ।

১৯৬৪ ঃ নভেম্বর—ডিসেম্বর নাগাদ শেষ করেন 'যক্ষ-যক্ষী'র খোদাই-এর কাজ।

১৯৬৫ ঃ ছাত্রদের সহযোগিতায় করেন উত্তরায়ণের 'পম্পা'র ভাস্কর্য তিমিমাছ। এরপর ছাত্রদের সহযোগিতায়'নাট্যঘর' মঞ্চের বাঁদিকে প্রথমে করেন নটমল্লার রাগের উপর বীণা হাতে নৃত্যরতা নারী এবং পরে ঐ মঞ্চেরই ডানদিকে করেন 'লালন ফকির' নামের রিলিফ।

অক্টোবর—নভেম্বর নাগাদ 'যক্ষ-যক্ষী'র প্যাডেস্টালে বসানোর কাজ শুরু করেন।

টাইফায়েডে আক্রান্ত রামকিঙ্করকে কয়েকদিনের জন্য বিশ্বভারতীর হাস-পাতালে ভর্তি করা হয়।

১৯৬৬ ঃ নাট্যঘর মঞ্চের উপরে আরম্ভ করেন 'বার্থ অফ ফায়ার' বা 'আগুনের জন্ম' নামের রিলিফ। কিছুদূর করার পর প্রতিকূল অবস্থার মুখে কাজটি মধ্যপথে বন্ধ করে দিতে হয়[৬]।

---

৬. কাজ চলাকালীন রবীন্দ্রসপ্তাহ, ফিলসফি সেমিনার প্রভৃতির কারণ দর্শিয়ে নাট্যঘর ব্যবহারের জন্য ঐ কাজের উদ্দেশ্যে বাঁধা ভারা খুলে দিতে ২৫/৭/৬৬ তারিখে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ রামকিঙ্করকে একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেয়। এরপর কাজ আর এগোয়নি। সহকারীদের মতে 'নগ্নমূর্তি'র মন্তব্যে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কুণাল সাহার 'কিঙ্করদার কিছুটা সময়' নামক এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধের ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফটো দেখে করেন ত্রিপুরার মহারাজার প্রতিকৃতি ভাস্কর্য। পৃষ্ঠপোষকের মনোমত না হওয়ায় কাজটি গৃহীত হয়নি।

কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত অবনীন্দ্রনাথের 'লম্বকর্ণ পালা' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মেকআপের দায়িত্ব নেন।

'যক্ষ-যক্ষী'র প্যাডেস্টালে বসানোর কাজ শেষ করেন। ১১ ফুট কংক্রীটের প্যাডেস্টাল বাদ দিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ২১ ফুট উচ্চতার এই পরিবেশীয় ভাস্কর্য দুটিতে সহযোগী হিসাবে ছিলেন প্রণব দেববর্মণ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্থুর জেলার শেখ ইমাম এবং তাঁর দলের লোকজন। পরিবেশীয় ভাস্কর্য হিসাবে 'যক্ষ-যক্ষী'ই হল তাঁর শেষ বড় কাজ।

১৯৬৭ঃ ২৪—৩০ জুলাই 'নন্দনে' তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের একক প্রদর্শনী।

গগনেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নন্দনে অনুষ্ঠিত যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার কমিটির জন্য প্লাস্টারে করেন 'বাগদেবী'। কর্তৃপক্ষের মনোমত না হওয়ায় কাজটি গৃহীত হয়নি।

কলাভবনের ৬৫ জন ছাত্রসহ বাঁকুড়ার, বিষ্ণুপুর ভ্রমণ।

১৯৬৮ঃ এপ্রিলে ছ-মাসের জন্য অস্থায়ী প্রফেসর পদে উন্নয়ন।

১লা মে থেকে ১লা জুলাই কলাভবনে অনুষ্ঠিত গ্রাফিকস্ আর্ট ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণ।

আসাম সরকারের জন্য ডাইরেক্ট কংক্রীটে করেন কলাভবনের মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য 'মহাত্মা গান্ধী'। পৃষ্ঠপোষকের পৃষ্ঠপোষণার আতিরিক্ততায় কাজটি শেষপর্যন্ত সহকারীদের হাতে ছেড়ে দেন।

২৬শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর 'নন্দন'-এ ইউনেস্কোর তরফ থেকে ইউরোপীয় শিল্পকলার ( ১৯০০—'২৫ ) প্রদর্শনী। প্রদর্শনী উপলক্ষে ৩রা নভেম্বর 'শান্তিনিকেতন ও আধুনিক শিল্প আন্দোলন' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক শান্তিনিকেতনে ইংরেজী নাটক 'পোয়েটেস্টার্স অফ ইস্পাহান'এর মঞ্চসজ্জা, মেকআপ ও পরিচালনার দায়িত্ব নেন[৭]।

১৯৬৯ঃ কলাভবনের মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য 'মহাত্মা গান্ধী'র ব্রোঞ্জ কাস্টিং আসাম সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

এই বছরের গোড়ায় স্থায়ী প্রফেসর পদে উন্নয়ন। এইসময় থেকে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত থাকেন।

এই বছরে করেন বিশিষ্ট তৈলচিত্র 'নেতাজী সুভাষ'।

হরিসাধন দাশগুপ্ত তাঁকে নিয়ে করেন তথ্যচিত্র।

৭. রামকিঙ্করের সহযোগিতায় নাটকটি এর আগেও শান্তিনিকেতনে কয়েকবার মঞ্চস্থ হয়।

১৯৭০ ঃ ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ৫ই ফেব্রুয়ারী এই উপলক্ষে বিশ্বভারতী ছাত্র সম্মিলনী কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত থাকেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। 'শ্যামলী' গৃহের সামনে বিশ্বভারতী কর্মীমণ্ডলী কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১২ই মার্চ 'নন্দন'-এ তাঁর ও বিনোদবিহারীর যুক্ত প্রদর্শনী।

গুরুতর অসুস্থ রামকিঙ্করকে কয়েকমাসের জন্য কলকাতার মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন। তাঁর সেই বলিষ্ঠ শরীর এই সময় থেকেই ভেঙে পড়ে। এই সময়েই কলাভবন অধ্যক্ষের তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর কাজগুলিকে এক জায়গায় এনে তাঁর সমস্ত শিল্পকাজের একটি চিত্রপঞ্জী তৈরীতে সাহায্য করার জন্য সমস্ত রামকিঙ্কর অনুরাগীদের কাছে এক বিশেষ আবেদন রাখা হয়।

১৯৭১ ঃ ২৫শে মে কলাভবনের অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ।

১৯৭২ ঃ ২৫শে মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিল কলকাতার 'বিড়লা এ্যাকাডেমী অফ আর্ট এণ্ড কালচার'-এর উদ্যোগে কলকাতায় তাঁর দ্বিতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের একক প্রদর্শনী।

২৫শে জুন 'রবীন্দ্রমেলা' সংগঠনের তরফ থেকে শান্তিনিকেতনে তাঁর সম্বর্ধনা। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের উপর বক্তব্য রাখেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

'নন্দন'-এ তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের একক প্রদর্শনী।

৬ই ডিসেম্বর কলাভবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'নন্দন-এ অনুষ্ঠিত যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

১৯৭৩ ঃ ৫ই জুন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে তাঁর চিত্র, ভাস্কর্য ও এচিং-এর ফটোপ্রিন্ট প্রদর্শনী।

৬৭তম জন্মদিনে কলাভবনে তাঁর সম্বর্ধনা।

কলকাতার রণজি স্টেডিয়ামে সারাবাংলা যুব উৎসবের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

এই বছরের জুলাই মাসে দেবব্রত রায়-এর পরিচালনায় ভারত সরকারের সিনেমা বিভাগ তাঁকে নিয়ে করেন ৪০ মিনিটের তথ্যচিত্র 'রামকিঙ্কর'।

১৯৭৪ ঃ ১০—১৫ই আগস্ট রবীন্দ্রসপ্তাহ উপলক্ষে বিশ্বভারতী কর্মীমণ্ডলী এবং কলাভবনের যৌথ উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে তাঁর চিত্র, ভাস্কর্য ও স্কেচ-এর একক প্রদর্শনী।

১৯৭৫ ঃ ৩রা জানুয়ারী 'চলমান শিল্পগোষ্ঠী'র বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কলকাতার

সাউথ-ইস্ট গম্বুজ-মনোহর দাস তড়াগ-এ তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনী।

মে মাসের শেষদিকে কলকাতার বিভিন্ন খোলা জায়গায় স্থাপিত মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যগুলি সম্পর্কে মতামত দানের জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কর্তৃক আমন্ত্রিত হন।

জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য ও চারুকলা একাডেমীর পক্ষ থেকে চারুকলায় '৭৪—'৭৫ সালের বাৎসরিক পুরস্কার পান।

১৭ই আগস্ট বিশ্বভারতীর প্রফেসর এমিরেটার্স পদে উন্নয়ন।

১৯৭৬ ঃ ললিতকলা একাডেমির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ৬ই আগস্ট ললিতকলা একাডেমির পক্ষ থেকে শান্তিনিকেতনে তাঁর সম্বর্ধনা।

কলাভবন আয়োজিত 'নন্দন'-এ তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের একক প্রদর্শনী।

'বলিদান' নামেব খসড়া ভাস্কর্য ( ক্লে-ম্যাকেট ) করেন এ বছরের মে-মাসে। ভাস্কর্যটিকে প্যাডেস্টালসহ ১৪ ফুট উচ্চতায় এনে শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীব খোলা মাঠের উত্তবে পরিবেশীয় ভাস্কর্য হিসাবে শেষ বড় কাজ করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। খসড়াটি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মনঃপূত না হওয়ায় কাজটি অনুমোদন পায়নি[৮]।

১৯৭৭ ঃ ১৯শে ফেব্রুয়বী বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন। সি.এম.ডি.এ. আয়োজিত কলকাতায় এ্যাসেম্বলির বাগানে ৫০ জন ভাস্করের যৌথ প্রদর্শনীতে 'রাজপথ' নামের একটি ভাস্কর্য পাঠান। প্রদর্শনী চলে একমাস[৯]।

ছাত্র শঙ্খ চৌধুরীর দেওয়া রতনপল্লীর মাটির বাড়ীর দীর্ঘ আবাসন ছেড়ে বিশ্বভারতীর দেওয়া এন্ড্রুজপল্লীর ২০নং কোয়াটার্সে উঠে আসেন।

গুরুতর শারীরিক অবনতির শুরু।

১৯৭৮ ঃ শারীরিক অসুস্থতা জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। হাতের কাঁপুনি শুরু হয়। মুখের কথা জড়িয়ে আসে, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়, প্রচণ্ড বাতের আক্রমণে পঙ্গু, অন্ধপ্রায় তিনি শয্যাবন্দী হয়ে পড়েন। এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টির চিকিৎসার জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৩০০০ টাকা অনুমোদন করেন।

১৯৭৯ ঃ ২২শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত হন।

---

৮. মাসখানেক পর প্রায় ৩'ফুট উচ্চতায় এটিকে প্লাস্টারে করেন। এই ভাস্কর্যের মাটিব মূল খসডাটি শান্তিনিকেতনে সৌমেন অধিকারী'র ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে।

৯. এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল প্রদর্শিত কাজগুলি থেকে বিশিষ্ট কাজ বেছে নিয়ে কলকাতার খোলা জায়গায় বড় করে করা। বলা বাহুল্য পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পায়নি।

৩রা নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর জাপানের 'ফুকুওকা' শহরে অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান শিল্প প্রদর্শনী'তে ভারত সরকারের উদ্যোগে তাঁর একটি ছবি ও ভাস্কর্য পাঠানো হয়।

মস্কোয় অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলার প্রদর্শনী সাজাবার জন্য তাঁর করা ব্রোঞ্জের রবীন্দ্রনাথের মূর্ত আবক্ষ ভাস্কর্যটি ভারত সরকারের উদ্যোগে পাঠানো হয়।

দিল্লীর ললিতকলা একাডেমির সিলভার জুবলী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

নভেম্বরে পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী হাঙ্গেরীর বালাতন হ্রদের তীরে রামকিঙ্করের করা রবীন্দ্রনাথের ব্রোঞ্জের মূর্ত আবক্ষ প্রতিকৃতি ভাস্কর্যটি সরিয়ে অন্য ভাস্করের করা 'উপযুক্ত' রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বসাতে চাইলে ভাস্কর্যটির অপসারণ রোধে এই রাজ্যের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী এবং সাধারণের পক্ষ থেকে তুমুল প্রতিবাদ ও বিতর্কের সৃষ্টি। মন্ত্রী মহোদয় মূর্তিটি অপসারণে বিরতি দেন[১০]।

অসুস্থ রামকিঙ্করের যথাযথ চিকিৎসা ও পরিচর্যায় তৎপর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'লোকচিত্রকলা' পত্রিকা, 'পেণ্টার্স ফোরাম' নামের শিল্পীগোষ্ঠী এবং কলকাতা শহরের কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পীর তরফ থেকে বামফ্রণ্ট সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে এক বিশেষ আবেদন রাখা হয়।

১৯৮০ : ২৩শে মার্চ দু'জন ডাক্তার ও ছাত্র প্রভাস সেনের সঙ্গে 'নিউরোপেথিক রুগী' রামকিঙ্করকে বিশ্বভারতীর গাড়ীতে করে চিকিৎসার জন্য কলকাতার শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালের উডবার্ণ ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়। কলকাতায় নিয়ে আসা হলে রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে সপ্তাহব্যাপী শিল্পমেলায় 'গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্প-কুশলী'র তরফ থেকে তাঁকে শেষ সম্বর্ধনা জানানো হয়।

প্রস্টেটগ্ল্যাণ্ডের অসুখে মলমূত্র ত্যাগ এবং খিদে-অখিদের সমস্ত বোধ হারিয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত নেন সাণ্ট অপারেশনের ( Shunt Operation ) মাধ্যমে মস্তিষ্কে জমে যাওয়া জল বার করে, মস্তিষ্কে সাণ্ট বসিয়ে, মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারলে সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি।

তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় খরচখরচার দায়িত্ব নেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিশ্বভারতীর উপাচার্যের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কিছু অর্থ মঞ্জুর করা হয়।

২৫শে জুলাই হাসপাতালে বসে তিনি করেন তাঁর জীবনের শেষ ছোট্ট মাটির কাজ 'দুর্গামূর্তি'।

---

১০. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

২৬শে জুলাই অস্ত্রপচার করা হয়। ঐ সময় বিশ্বভারতীর তরফ থেকে উপস্থিত থাকেন কলাভবনের একজন অধ্যাপক।

অস্ত্রপচারের পর দু'একদিন সুস্থ থাকেন। এরপর মস্তিষ্কে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ শুরু হয়।

৩১শে জুলাই তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে ঘোষণা করা হয়।

২রা আগস্ট, শনিবার, মধ্যরাত্রি সাড়ে বারোটায়, ৭৪ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ও চিত্রী রামকিঙ্কর বেইজ। মৃত্যুশয্যায় তাঁর পাশে ছিলেন ভাইপো দিবাকর। ৫৫ বছরের একটানা বসবাসের প্রিয় ভূমি শান্তিনিকেতনেই দাহ করা হয় তাঁকে। মুখাগ্নি করেন একমাত্র ভাইপো দিবাকর বেইজ।

সংকলন : **প্রকাশ দাস**

১. The art of Ramkinkar Baij. Nirmal kr. Bose. Hindusthan Standard, Puja No. Oct. 1940.

২. শিল্পী রামকিঙ্কর[১]। শুভময় ঘোষ। শারদীয়া 'দেশ', ১৯৫৫

৩. Ramkinkar Baij. S. A. Krishnan. Lalitkala, No. 1—2, April '55—March '56.

৪. All over Rehearsal of a drama—Conflicting Version of Santiniketan incident. By a Staff Reporter. The Statesman, 30 Oct. 1957.

৫. শান্তিনিকেতনের সাম্প্রতিক অবাঞ্ছিত ঘটনা—দায়িত্বশীল আশ্রমিকগণের মধ্যে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ নভেম্বর ১৯৫৭

৬. Santiniketan Fracas. Ramkinkar. The Statesman, 4 Nov. 1957.

৭. বিশ্বভারতী ছাত্রগণ কর্তৃক সভাসমিতির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ—উপাচার্য কর্তৃক সার্কুলার জারী। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ নভেম্বর ১৯৫৭

৮. বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়—১০ই নভেম্বর কর্মসমিতির জরুরী বৈঠক—শান্তিনিকেতনে সদ্য অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ নভেম্বর ১৯৫৭

৯. বিশ্বভারতী হইতে ডঃ সুধীন ঘোষের বিদায় গ্রহণ—শান্তিনিকেতনে অপ্রীতিকর ঘটনার জের। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ নভেম্বর ১৯৫৭

১০. জাপানে। জনৈক শান্তিনিকেতনবাসী। দেশ, ২৫ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

১১. জাপানে। বিশ্বজিৎ রায়। তদেব

১২. জাপানে লেখকের কৈফিয়ৎ। অন্নদাশঙ্কর রায়। দেশ, ২৫ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১লা মার্চ ১৯৫৮


১. 'দেশ' বিনোদন, ১৯৭৫ সংখ্যা এবং 'বিশ্বভারতী নিউজ' Sept.-Nov. 1980 সংখ্যায় লেখাটি পুনর্মুদ্রিত।

১৩. শান্তিনিকেতনের উত্তরকাণ্ড। প্রবোধচন্দ্র সেন। তদেব

১৪ Ramkinkar[১]. Binod Behari Mukhopadaya. Catalogue of an exhibition organised by Visva-Bharati Chhatra Sammilani, Santiniketan, Nov. 1960.

১৫. রামকিঙ্কর। ধর্মযুগ, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

১৬. Ramkinkar. Dinkar Koushik. Exhibition of Sculpture, Paintings & Sketches by Ramkinkar organised by Birla Academy of Art & Culture, Calcutta, 6 April 1972.

১৭. The Artist Crazy with his art. K. G. Subramanyan. তদেব

১৮. A Radical Artist Ramkinkar. Ahi Bhusan Malik. তদেব

১৯. Glimpses from the memory. Probhas Sen. তদেব

২০. Reflection from the art of Ramkinkar. Pronab Ranjan Roy. তদেব

২১. Ramkinkar. Jaya Appasamy. তদেব

২২. Ramkinkar Baij. Shuddasil Bose. Hindusthan Standard, Diwali 1972.

২৩. রামকিঙ্করবাবুর কথা*। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। অনামনে, ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, শীত ১৩৭৯

২৪. ভাস্কর রামকিঙ্কর: দু-একটি কথা। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। তদেব

২৫. রামকিঙ্করের ছবি। গণেশ পাইন। তদেব

২৬. রামকিঙ্কর। শর্বরী রায়চৌধুরী। তদেব

২৭ রামকিঙ্কর। শঙ্খ চৌধুরী। তদেব

২৮. নাটুকে রামকিঙ্কর*। অমিতাভ চৌধুরী। তদেব

২৯. প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদে। প্রভাস সেন। তদেব

৩০. রামকিঙ্কর: প্রসঙ্গ শিক্ষকতা। কাঞ্চন চক্রবর্তী। তদেব

৩১. ভারতে আধুনিক ভাস্কর্যের প্রথম শিল্পী। পরিতোষ সেন। তদেব

৩২. Ramkinkar as a painter and sculptor. Dr. Ratan Parimoo. তদেব

৩৩. Ramkinkar. Dinkar Koushik. তদেব

৩৪. শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ। শিল্প ও সংস্কৃতি। যুগান্তর, ১১ এপ্রিল ১৯৭৩

---

১. ১৯৬১ সালে 'ক্যালকাটা আর্ট কাউন্সিল'-এর ক্যাটালগে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত। সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত হয়ে লেখাটি এই গ্রন্থের ১৭২ পৃষ্ঠায় 'সংযোজন' হিসাবে অন্তর্ভুক্ত।

৩৫. Ramkinkar. Dinkar Koushik. Catalogue of an exhibition organised by Karmimandali and Kala-Bhavan, Visva-Bharati, Santiniketan, Aug 1974.

৩৬. 3000 Sanctioned For Ramkinkar. Amrita Bazar Patrika, 5 February 1975.

৩৭ Ramkinkar is his own Atmosphere. S. L. Bhattacharjee. Sunday. 6 April 1975.

৩৮. Akademi, Award for Ramkinkar. Hindusthan Standard, 11 Jun 1975

৩৯. আকাদেমি তিনজনকে পুরস্কার দেবেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ জুন ১৯৭৫

৪০. One must do some solid work. Interview. Sunday, 15 Jun 1975

৪১. মূর্তিমান কলকাতা। অসিত পাল। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ই জুন ১৯৭৫

৪২. মূর্তিমান কলকাতা। তারক চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিব্রত চক্রবর্তী, অমিয়রঞ্জন সিংহ, সুনীল মুখোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮ জুন ১৯৭৫

৪৩. আমি চাক্ষিক[৩]। যুসাস, কলকাতা, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা জুলাই ১৯৭৭

৪৪. Ramkinkar—His contribution to contemporary art. Jaya Appasamy. Lalit-Kala contempory. No 22.

৪৫. জীবন ও শিল্প বিষয়ে কিছু কথা। অনুলেখন ঃ বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচয়, শারদীয় ১৯৭৮

৪৬ শিল্পবিষয়ক আলোচনা। সাক্ষাৎকার। গাঙ্গেয়পত্র, সংকলন-৭, মাঘ ১৩৮৫

৪৭ প্রভাতকুমার, রামকিঙ্কর রবীন্দ্রভারতীর ডি লিট। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ সেপ্টেঃ ১৯৭৯

৪৮. রামকিঙ্কর বেইজ। লোকচিত্রকলা, নবপর্যায়, ১ম বর্ষ. ৩য় সংখ্যা. কার্তিক —পৌষ ১৩৮৬

৪৯. রবীন্দ্রনাথের যোগ্য মূর্তি চাই। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ নভেম্বর ১৯৭৯

৫০. বুদাপেস্ট-এ রবীন্দ্রনাথের মূর্তি। শুভাপ্রসন্ন, অহিভূষণ মালিক। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ নভেম্বর ১৯৭৯

৫১. রবীন্দ্রমূর্তি প্রসঙ্গে রামকিঙ্কর। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ নভেম্বর ১৯৭৯

৫২. রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ঃ কিছু মতামত। মৈত্রেয়ী দেবী, অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভাপ্রসন্ন, সন্দীপ সরকার। তদেব

৩. 'পট', আগস্ট ১৯৮৩, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় লেখাটি পুনর্মুদ্রিত

৫৩. রামকিঙ্করকৃত রবীন্দ্রনাথের মূর্তি। সত্যজিৎ রায়, নবনীতা দেবসেন, সত্যকাম সেনগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, সুরেন দে। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ নভেম্বর ১৯৭৯
৫৪ রামকিঙ্করের রবীন্দ্রনাথ। প্রভাস সেন। দেশ, ৪৭ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭৯
৫৫. শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ অসুস্থ। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ মার্চ ১৯৮০
৫৬ রামকিঙ্করের ব্রেন অপারেশন হবে। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ জুলাই ১৯৮০
৫৭. রামকিঙ্করকে নিয়ে উদ্বেগ। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ জুলাই ১৯৮০
৫৮. পরলোকে রামকিঙ্কর। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ আগস্ট ১৯৮০
৫৯. রামকিঙ্কর অরূপলোকে। যুগান্তর, ২ আগস্ট ১৯৮০
৬০. আমার ছবি, আমার মূর্তি[৪]। তদেব
৬১. Ramkinkar Dead. Amrita Bazar Patrika, 2 Aug 1980
৬২. Ramkinkar Dead. The Statesman, 2 Aug 1980
৬৩. Beij's Body taken to Santiniketan. The Statesman, 3 Aug 1980
৬৪. Ramkinkar Beij. তদেব
৬৫. Ramkinkar, noted artist dead. Times of India, 3 Aug 1980
৬৬. শেষ প্রণাম সত্যজিৎ রায়*, ইন্দ্র দুগার, রথীন মৈত্র, পুলিনবিহারী সেন, লেডি রাণু মুখার্জী, পরিতোষ সেন, অম্লান দত্ত, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, শর্বরী রায়চৌধুরী, সোমনাথ হোর, বিশ্বরূপ বসু। যুগান্তর, ৩ আগস্ট ১৯৮০
৬৭. ঘরে ফেরা। তদেব
৬৮ Ramkinkar Cremaed at Santiniketan. Amrita Bazar Patrika, 3 Aug 1980
৬৯. Ramkinkar, an artist life and nature. তদেব
৭০. রামকিঙ্করের অন্ত্যেষ্টি। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ আগস্ট ১৯৮০
৭১. Works of Beij : P.M Responds to appeal. The Statesman, 3 Aug 1980
৭২. রামকিঙ্কর স্মরণে। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ আগস্ট ১৯৮০

---

৪. 'অমৃত', স্বাধীনতা সংখ্যা ১৯৭৯ থেকে আংশিক পুনর্মুদ্রিত। এছাড়াও কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নতুন সময়', ১২৮০ সংখ্যায়, বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত 'কলস্বাস' ২১শে আশ্বিন ১৯৮৭, ৩য় সংখ্যা, 'ত্রিবেণী', আগস্ট ১৯৮০, বাঘা-যতীন সংখ্যায় এবং চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'চর্যা' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৯২ ৫ম সংখ্যায় লেখাটি আংশিক পুনর্মুদ্রিত।

৭৩. শিল্পী। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ আগস্ট ১৯৮০

৭৪. Ramkinkar Virtusity. Economic Times, 9 Aug 1980

৭৫. Ramkinkar impact monumental. Krishna Chaitanya. Hindusthan Times, 11 August 1980.

৭৬. Tribute to Ramkinkar and Gopal Ghosh. The Statesman, 11 August 1980.

৭৭. Tribute to Ramkinkar and Gopal Ghosh. Indian Express, 11 August 1980.

৭৮. Death of our Greatest Sculptor. Anil Sarri. Financial Express, 29 August 1980.

৭৯. কিঙ্করদা। প্রভাস সেন। দেশ; ৪৭ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ৩১শে শ্রাবণ ১৩৮৭.

৮০. রামকিঙ্করের ভূমণ্ডল। পূর্ণেন্দু পত্রী। তদেব

৮১. রামকিঙ্কর ও গোপাল ঘোষ। শোভন সোম। শিল্প ও সাহিত্য, কলকাতা, অতুল বসু সংখ্যা, জুলাই—আগস্ট ১৯৮০

৮২. কিঙ্করদা। বিশ্বজিৎ রায়। বিভাব, জুলাই—সেপ্টেম্বর ১৯৮০

৮৩. কিঙ্করদা। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধনধান্যে, দ্বাদশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৬—৩০, ১৯৮০

৮৪. Ramkinkar Smarana. Visva-Bharati News, Visva-Bharati, Santiniketan, Sept—Oct 1980.

৮৫ Ashes to Ashes : Dust to Dust. তদেব

৮৬. Smarana : Santiniketan. তদেব

৮৭. Ramkinkar and The Destkottama. তদেব

৮৮. Homage to Ramkinkar. তদেব

৮৯. রামকিঙ্কর বেইজ। ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণ। তদেব

৯০. সাধক শিল্পী রামকিঙ্কর*। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। তদেব

৯১ রামকিঙ্কর‡। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তদেব

৯২. কিঙ্কদাকে যেমন দেখেছি‡। শঙ্খ চৌধুরী। তদেব

৯৩. শেষ নাহি যে। সোমনাথ হোর। তদেব

৯৪. আমার প্রতিবেশী রামকিঙ্কর। হৃষিকেশ চন্দ। তদেব

৯৫ Ramkinkar and his work[৫]. K.G. Subramanyan. তদেব

---

৫. **Latit Kala Contemporary—No. 30**-তে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত। 'পরিচয়' পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯৮০ সংখ্যায় লেখাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত। সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত এবং লেখক কর্তৃক সংশোধিত হয়ে লেখাটি এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

৯৬. Artist-Baul. Dinkar Koushik. তদেব

৯৭. Ramkinkar[৬]. Jaya Appasamy. তদেব

৯৮. Ramkinkar—Santiniketan : A Myth. Kanchan Chakrabarty. তদেব

৯৯. Some Aspects of Ramkinkar's Sculpture. Sushen Ghosh. তদেব।

১০০. Ramkinkar Baij at work. Janak Jhankr Narzary. তদেব

১০১. Ramkinkar as a Painter and Sculptor. Jaya Appasamy. Lalitkala Contemporary. No. 30.

১০২ Individualist Approach. Prodosh Dasgupta. তদেব

১০৩. Ramkinkar's Uniqueness. A Letter form B. C. Sanyal. তদেব

১০৪. More of the Sculptor. Pronabendu Dasgupta. তদেব

১০৫. Ramkinkar—The man and artist. Arun Pal. Nandan. Visva-Bharati. Santiniketan. 1980.

১০৬. A History of environmental Sculpture and Ramkinkar. J. J. Narzary. তদেব

১০৭. A Room between two Room. R. Sivakumar. তদেব

১০৮. রামকিঙ্কর। কে. জি. সুব্রহ্মানিয়ম, দিনকর কৌশিক, কাঞ্চন চক্রবর্তী, সুশেন ঘোষ, অমিত চক্রবর্তী, জয়ন্ত চক্রবর্তী, সোমনাথ হোর। কলস্বাস, বাঁকুড়া, ৩য় সংখ্যা, শরৎ সংকলন, ২১শে আশ্বিন, ১৩৮৭

১০৯ রামকিঙ্কর প্রসঙ্গে। ঈশ্বর ত্রিপাঠী। কবির চিঠি, বাঁকুড়া, ৩য় বর্ষ, অক্টোবর—ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৩৮৭

১১০. সূর্যের উপমেয়। উৎপল চক্রবর্তী। তদেব

১১১. রামকিঙ্কর। দেবকুমার বসু। তদেব

১১২. কিঙ্করদা : একটি দিনের স্মৃতি। সৌমেন অধিকারী। তদেব

১১৩. কিঙ্করদাকে যা দেখেছি : যা ভেবেছি। রবি পাল। তদেব

১১৪. শিল্পের দুই আশ্চর্য দিগন্ত : রামকিঙ্কর ও গোপাল ঘোষ[৭]। অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী। উত্তরসূরি, ২৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৩৮০

---

৬. ৬ আগস্ট, ১৯৭৬ সালে রামকিঙ্করের সম্বর্ধনা উপলক্ষে দিল্লীর ললিতকলা একাডেমী এবং কলাভবন 'লিফলেট' আকারে লেখাটি যুগ্মভাবে প্রকাশ করে। সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত হয়ে লেখাটি এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

৭. ১৯৮৬ সালে 'সুবর্ণরেখা' কর্তৃক প্রকাশিত এই লেখকের 'একালের শিল্পচিন্তা' নামক গ্রন্থে লেখাটি অন্তর্ভুক্ত।

১১৫. ডঃ রামকিঙ্কর বেইজ। গোপীবল্লভ দাস। সবিতা, কলকাতা, বার্ষিক সংখ্যা—২, ১৯৮০
১১৬. স্বগত। রূপসা, কলকাতা, শারদীয় ১৩৮৭
১১৭. রামকিঙ্কর বেইজের বিতর্কিত সেই রবীন্দ্রভাস্কর্য। প্রদীপ সরকার। জনচিন্তা, দুর্গাপুর, পূজা ১৩৮৭
১১৮. আচার্য রামকিঙ্কর বেইজ—সংক্ষিপ্ত জীবনী। দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়। আলিঙ্গন, হুগলী, রামকিঙ্কর স্মারক সংখ্যা, ৭ই পৌষ ১৩৮৭
১১৯. রামকিঙ্কর ঃ শিল্পী ও মানুষ। সৌমেন অধিকারী। তদেব
১২০. ভাস্কর রামকিঙ্কর। সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তদেব
১২১ ভবঘুরে লোকটা। সতীন্দ্র ভৌমিক। তদেব
১২২ রামকিঙ্করের শিল্পচিন্তা ও সেই নিঃস্ব সত্তার আন্তরিক জীবনশিল্প। নীলোৎপল ভট্টাচার্য। তদেব
১২৩. আত্মভোলা রামকিঙ্কর। বিভাংশু দত্ত। তদেব
১২৪. সবার আপনার রামকিঙ্কর বেইজ। তারক পাল। তদেব
১২৫. প্রসঙ্গ—অপ্রসঙ্গ এবং রামকিঙ্কর বেইজ। কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। তদেব
১২৬. Ramkinkar Baij. Information Release, Lalitkala Akademi, Delhi, Feb 1981.
১২৭. রামকিঙ্কর। শঙ্খ চৌধুরী। বারোমাস, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১
১২৮. বাঁকুড়ায় রামকিঙ্কর ভবন। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ, ১৯৮১
১২৯. রাম কাবুর কিঙ্কর নয়। অজিতকুমার দত্ত। এখন যেরকম, ১৬ জুলাই ১৯৮১
১৩০. জীবন সায়াহ্নে রামকিঙ্কর বেইজ ঃ শান্তিনিকেতনের ছায়ায় নির্জন একাকী[৮]। প্রকাশ দাস। স্বকাল, বর্ধমান, শরৎকালীন সংখ্যা, ১৯৮১
১৩১. বর্ধমানে রামকিঙ্কর। নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্মীকি, বর্ধমান, শরৎ-কালীন সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৮৮
১৩২. Ramkinkar to be cast in Bronze. The Statesman, 16 November 1981.
১৩৩ Centre to acquire Baij's works. Business Standard, 13 Dec 1981.
১৩৪. Centre to acquire Baij's works. Hindusthan Standard. 13 December 1981.
১৩৫. রামকিঙ্করের শিল্প দৃষ্টান্ত দিল্লীতে রাখার সিদ্ধান্ত। আজকাল, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮১

৮. আসানসোল থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ'-এ পরবর্তী সময়ে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত।

১৩৬. রামকিঙ্করের ৩৫০টি ছবি দিল্লীতে স্থান পেয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৮১

১৩৭. Centre to acquire Ramkinkar's Paintings. Amrita Bazar Patrika, 23 December 1981.

১৩৮. রামকিঙ্কর বেইজ ও তাঁর সাথে কিছুক্ষণ। কিরণ সেন। রূপকলা, কলকাতা সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৮১—৮২

১৩৯. রামকিঙ্কর পরিচিতি। রামচন্দ্র রায়। পল্লব, কলকাতা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৯৮১

১৪০. Ramkinkar and His art. Dinkar Koushik. তদেব

১৪১. রামকিঙ্কর। রবি পাল। তদেব

১৪২. মুখোমুখি। শ্রীমতী মীরা মুখার্জী। তদেব

১৪৩. শিল্পী-ভাস্কর রামকিঙ্করের সঙ্গে কিছুক্ষণ। সুব্রত চন্দ্র। সাপ্তাহিক বঙ্গদূত, বাঁকুড়া, ৭ম বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ৩ জানুয়ারী ১৯৮২

১৪৪. Centre buys works of Ramkinkar. The statesman, 15 March 1982

১৪৫ রামকিঙ্করের শিল্পসৃষ্টি দিল্লীর পথে। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ মার্চ ১৯৮২

১৪৬. একটি প্রতিকৃতি ও রামকিঙ্কর বেইজ। রবি পাল। দেশ, ৪৯ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা ২৪ এপ্রিল ১৯৮২

১৪৭. নন্দনের রামকিঙ্কর। ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। সোপান, বাঁকুড়া, ১০ম বর্ষ, সংকলন—২৫, ২৫শে বৈশাখ ১৩৮৯

১৪৮. Ramkinkar and Santiniketan. Jaya Appasamy. The Visva-Bharati Quaterly. Vol-46, No. 1—4, May 1980—April 1981, Published in 1982.

১৪৯. Kinkarda a Legend. Dinkar Koushik, তদেব

১৫০. রামকিঙ্করের কাজ নষ্ট হচ্ছে। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ জুলাই ১৯৮২

১৫১. বাঁকুড়ায় রামকিঙ্কর বেইজ স্মারক সমিতি গঠিত। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ জুলাই ১৯৮২

১৫২. যামিনী রায় ও রামকিঙ্কর। তুলসী চট্টোপাধ্যায়। বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি, শারদ সংখ্যা ১৩৮৯

১৫৩ রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে রামকিঙ্করের ভাবনাক্রম। রবি পাল। দেশ, ৫০ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৭ মে ১৯৮৩

১৫৪. বাঁকুড়ায় রামকিঙ্কর সরণী। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ আগষ্ট ১৯৮৩

১৫৫ স্বদেশ আমার। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। যুগান্তর সাময়িকী, ৩০

অক্টোবর ১৯৮৩

১৫৬. Ramkinkar as a path finder. Jaya Appasamy. Bivab, Special Number of Indian Sculpture, Oct—Dec. 1983

১৫৭. ব্রোঞ্জে রূপান্তরের পথে সাঁওতাল পরিবার। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ ডিসেম্বর ১৯৮৩

১৫৮. রামকিঙ্করের শিল্পভাবনা।[৯] মোহন সিংহ। বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি, রামকিঙ্কর স্মরণে, মে ১৯৮৪

১৫৯. শিল্প ও ভাস্কর রামকিঙ্কর। নমিতা মণ্ডল। তদেব

১৬০. রামকিঙ্কর প্রসঙ্গে। উৎপল চক্রবর্তী। তদেব

১৬১. রামকিঙ্করের সঙ্গে কিছুক্ষণ। অসিত বিশ্বাস। তদেব

১৬২ বাল্য ও কৈশোর জীবনে রামকিঙ্কর।[১০] শৈলেন দাস। তদেব

১৬৩. শিল্পের মানুষ রামকিঙ্কর—১। বাসুদেব চন্দ্র। প্রতিক্ষণ, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৭ আগস্ট ১৯৮৪

১৬৪. শিল্পের মানুষ রামকিঙ্কর—২। বাসুদেব চন্দ্র। প্রতিক্ষণ, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

১৬৫. বাঁকুড়া দরদী রামকিঙ্কর। মণ্টু দাস। রাঢ় বাঁকুড়া, ১৯৮৪

১৬৬. প্রসঙ্গ রামকিঙ্কর। সৌমেন অধিকারী। বোবাযুদ্ধ, আসানসোল, ৮ম বর্ষ পূর্তি সংখ্যা ১৯৮৪

১৬৭. রামকিঙ্কর।[১১] প্রদোষ দাশগুপ্ত। যুগান্তর সাময়িকী, ৩ মার্চ ১৯৮৫

১৬৮. লোহকাঠামোর আচ্ছাদন। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ জুলাই ১৯৮৫

১৬৯. সাঁওতাল পরিবারকে ব্রোঞ্জে ঢালাই ঃ টাকা দিতে টালবাহানা। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ জুলাই ১৯৮৫

১৭০ রামকিঙ্করের ভাস্কর্য রক্ষায় রাজীবের কাছে আবেদন। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ জুলাই ১৯৮৫

১৭১. কিঙ্করদা ঃ স্মৃতি ও সান্নিধ্য। আদিত্য মুখোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ, আসানসোল, ২১ জুলাই ১৯৮৫

১৭২ রামকিঙ্করের কীর্তি স্থায়ী করতে। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ আগস্ট ১৯৮৫

১৭৩. জাতীয় সংগ্রহশালায় রামকিঙ্করের ভাস্কর্য। বর্তমান, ২ আগস্ট ১৯৮৫

---

৯. বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত 'তরঙ্গ' পত্রিকার কার্তিক ১৩৯২, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যায় লেখাটি পুনর্মুদ্রিত। ১০. বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ় ১৩৯৫ সংখ্যায় লেখাটি পুনর্মুদ্রিত।

১১. ৩রা আগস্ট ১৯৮৩ 'প্রতিক্ষণ' পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত এই লেখকের 'স্মৃতিকথা শিল্পকথা' নামক গ্রন্থে ১২৪—১২৯ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটি গ্রন্থভুক্ত।

১৭৪. Lack of funds his work in Bronze cast. The statesman, 7 August 1985

১৭৫. ছবি আর কবিতা। আজকাল, ৮ অক্টোবর ১৯৮৫

১৭৬. অন্য এক রামকিংকর। যুগান্তর, ১১ অক্টোবর ১৯৮৫

১৭৭ মহাশিল্পী রামকিংকর। নীলিমা রায়। বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি, ৪র্থ বর্ষ, শারদ সংখ্যা ১৯৮৫

১৭৮. রাজধানী দিল্লী যাবার জন্য তৈরী রামকিংকরের সাঁওতাল পরিবার। মতি নন্দী। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৫

১৭৯. Ramkinkar's outdoor marvels caged in. The Telegraph, 5 Dec. 1985

১৮০. রামকিংকরের ছবি। বর্তমান, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৫

১৮১. A genius, yes, but hardly intutive or untulored. Asoke Mitra. The Telegraph, 18 Feb. 1986

১৮২. প্রদর্শনী থেকে রামকিংকরের দুষ্প্রাপ্য তৈলচিত্র নিখোঁজ। বর্তমান, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬

১৮৩. রামকিঙ্করের সাঁওতাল পরিবার শান্তিনিকেতনে থাকছে। ভারতকথা, ২২ মার্চ ১৯৮৬

১৮৪ সাঁওতাল পরিবার ব্রোঞ্জে ঢালাই হয়ে দিল্লী চলল। যুগান্তর, ৯ জুন ১৯৮৬

১৮৫. সাঁওতাল পরিবার। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ জুন ১৯৮৬

১৮৬. Baij's works on display. The Telegraph, 4 August 1986

১৮৭. রামকিংকরের শেষ পর্যায়ের কিছু ছবি। রবি পাল। প্রতিক্ষণ, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

১৮৮. প্রদর্শনীতে অদেখা রামকিংকর। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

১৮৯. ভাস্কর রামকিঙ্কর। রুচিরা মুখোপাধ্যায়। সুচেতনা, বাঁকুড়া, শারদ সংখ্যা ১৯৮৬

১৯০. আমি ও আমার সময়। শর্বরী রায়চৌধুরী। প্রতিক্ষণ, সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৩

১৯১. রামকিংকরের ভাস্কর্য। শঙ্খ চৌধুরী। দেশ, ৫৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ৩ জানুয়ারী ১৯৮৭

১৯২. মানুষ রামকিংকর। প্রভাস সেন। তদেব

১৯৩. কিংকরদা ও বিমূর্ত শিল্প। দিনকর কৌশিক। তদেব

১৯৪. রামকিংকরের ভাস্কর্য। চিঠিপত্র, শোভন সোম। দেশ, ৫৪ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭

১৯৫. মানুষ রামকিংকর। চিঠিপত্র, সুখময় মিত্র। দেশ, ৫৪ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা,

১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭

১৯৬. রামকিঙ্কর। চিঠিপত্র, উৎপল চক্রবর্তী। দেশ, ৫৪ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭

১৯৭ রামকিঙ্কর। চিঠিপত্র, বিপুলকান্তি সাহা। দেশ, ৫৪ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২৮ মার্চ ১৯৮৭

১৯৮. তরুণ বয়সে শিল্পীর প্রতিকৃতি। সন্দীপ সরকার। দেশ, ৫৪ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ৪ এপ্রিল ১৯৮৭

১৯৯. একটি দুর্লভ তথ্যচিত্রের সন্ধানে। কিশলয় ঠাকুর। দেশ, ৫৪ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ১৮ এপ্রিল ১৯৮৭

২০০. রামকিঙ্কর ও ১২ জ্যৈষ্ঠ। রবি পাল। বর্তমান সাপ্তাহিকী, ২৪ মে ১৯৮৭

২০১. ঋত্বিক ঘটকের রামকিঙ্কর বেইজের খোঁজে—১। সুপ্রিয় হালদার। আজকাল, ২৭ জুলাই ১৯৮৭

২০২ ঋত্বিক ঘটকের রামকিঙ্কর বেইজের খোঁজে—২। সুপ্রিয় হালদার। আজকাল, ২৯ জুলাই ১৯৮৭

২০৩ ফাটল ধরছে রামকিঙ্করের কলের ডাকে মূর্তিতে। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ জুলাই ১৯৮৭

২০৪ অন্য দৃষ্টিতে রামকিঙ্কর। অমিত মুখোপাধ্যায়। প্রথমতঃ, কলকাতা, ৮/৯ যুগ্ম সংখ্যা, ডিসেম্বর—জানুয়ারী ১৯৮৭—'৮৮

২০৫. রামকিঙ্করের জন্মসাল। চিঠিপত্র, রজত ঘোষ। দেশ, ৫৫ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা ৫ মার্চ ১৯৮৮

২০৬ শিল্পী ও মডেল ঃ রামকিঙ্করের রাধারাণী—১। পিনাথ সেন। পুনরুত্থান, রাণাঘাট, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮

২০৭ শিল্পী ও মডেল ঃ রামকিঙ্করের রাধারাণী—২। পিনাথ সেন। পুনরুত্থান, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৮৮

২০৮. অপ্রতুল সম্পাদকীয়'র পরিবর্তে। তদেব

২০৯. গুস্তাফ ভিগেল্যাণ্ড, রবীন্দ্রনাথ আর রামকিঙ্কর। পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রতিক্ষণ, ৫ম বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ২—১৬ মে ১৯৮৮

২১০. অযত্ন অবহেলায় রামকিঙ্করের ভাস্কর্য। দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। আজকাল, ১৯ জুন ১৯৮৮

২১১. রামকিঙ্করের 'কালের বাঁশি' বাঁশের উপর ভর দিয়েই থাকবে। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ জুন ১৯৮৮

২১২. রামকিঙ্কর ক্যালকাটা গ্রুপের সদস্য হয়েছিলেন। প্রদোষ দাশগুপ্ত আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ জুলাই ১৯৮৮

২১৩. সাই মাটির গন্ধ। বিপিন গোস্বামী। আজকাল রবিবাসর, ৩১ জুলাই ১৯৮৮

২১৪. বিপরীত রামকিঙ্কর। বিজন চৌধুরী। তদেব
২১৫. এবার প্রশ্নকর্তা তিনিই। পূর্ণেন্দু পত্রী। তদেব
২১৬. তিনি ছিলেন শিল্পীদের শিল্পী। প্রভাস সেন। তদেব
২১৭. খররৌদ্রে একা। রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়। তদেব
২১৮. ইতি রামকিঙ্কর। প্রকাশ দাস। তদেব
২১৯. পিছন ফিরে না তাকানো শিল্পী। রবি পাল। দেশ, শারদীয় ১৩৯৫
২২০. রামকিঙ্কর স্মরণে। অসিত দাশগুপ্ত। আভাতি, শারদীয় ১৩৯৫
২২১. তিনটি চিঠি : মানুষ রামকিঙ্কর ও শিল্প। সমর ভৌমিক। কোরক, শারদীয় ১৯৮৮

### গ্রন্থভুক্ত রচনা*

১. চিত্রদর্শন। কানাই সামন্ত। শিল্পিত নেপাল (পৃঃ ১৬০—১৬৩)। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিঃ, কল-৯, মহালয়া ১৮৮১ শকাব্দ
২. Abanindranath Tagore and the art of his time. Jaya Appasamy, Ramkinkar (p. 75—77). Lalit Kala Akademi, New Dalhi, 1968
৩. An Introduction to Modern Indian Sculpture. Jaya Appasamy. Sculpture of the period of transition (P. 12—14). Indian Council for Cultural Vikas Publication, Delhi-6, 1970
৪. Art and Change. K. G. Subramanyan. Modern art in India and West (P. 36—37), Visva-Bharati, March 1972
৫. Moving Focus. K. G. Subramanyan. Ramkinkar (P. 78—80), Lalit-Kala Akademi, Delhi 1978
৬. আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ। ডঃ দিলীপ মালাকার। শিল্পী-অনুরাগীদের চোখে রবীন্দ্র চিত্রকলা ( পৃঃ ১০৭—৮ )। অনন্য প্রকাশন, কলকাতা, মে ১৯৭৯
৭. বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনের দেওয়াল ভাস্কর্য ( পৃঃ ১২—১৭ )। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৮৬
৮. Bloossoms of Light. Dinkar Koushik. Ramkinkar (P. 58—64). Visva Bharati, May 1980

৯. শিল্পী শিল্প ও সমাজ। শোভন সোম। রামকিংকর ঃ ভাস্কর্য ও শিল্প ( পৃঃ ১৯৫—২১২ )। অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা-৯, মার্চ ১৯৮২
১০. বাঁকুড়ার স্মরণীয় যাঁরা। নমিতা মণ্ডল। ভাস্কর রামকিঙ্কর ( পৃঃ ৪৯ )। ডি বি. পাবিলিশিং কোম্পানী, কলকাতা—৯. ডিসেম্বর ১৯৮৩
১১. ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী। কমল সরকার। রামকিঙ্কর বেইজ ( পৃঃ ১৮৯—১৯০ )। যোগমায়া প্রকাশনী, কলকাতা-১১, জুলাই ১৯৮৪
১২. তিনশিল্পী। শোভন সোম। রামকিঙ্কর বেইজ ( পৃঃ ১৩৯—১৬৫ )। বাণীশিল্প, কলকাতা-৯, ডিসেম্বর ১৯৮৫
১৩. জার্নাল। শঙ্খ ঘোষ। ভাস্কর—৩ ( পৃঃ ২৮—৩১ )। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, বৈশাখ ১৩৯২
১৪. টপ্পা ঠুংরী। পূর্ণেন্দু পত্রী। উত্তরে রামকিঙ্কর দক্ষিণে রামকিঙ্কর ( পৃঃ ৩৬—৩৭ )। এ. মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-৭৩, ১৯৮৬
১৫. Studies in Modern Indian Art. Dr. Ratan Parimoo. Modern movement in Indian Sculpture. Kanak Publication, Delhi, 1975

(*গ্রন্থ, গ্রন্থাকার, গ্রন্থভুক্ত বিষয়, প্রকাশক এবং প্রকাশকাল এই অনুক্রম মানা হয়েছে )

### গ্রন্থ

১. Ramkinkar. Editor : Jaya Appasamy. Ramkinkar ( p. 16 ), Reproduction of 25 Paintings & Sculptures. Biographical Notes ( p. 36 ), Lalit-Kala Akademi, Delhi, 1961
২. রামকিঙ্কর ও তাঁর শিল্পচিন্তা ( পৃঃ ১—১৪ )। বাসুদেব চন্দ্র। এ. টু. জেড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বাঁকুড়া ১৯৮৪

### কবিতা

১. রামকিঙ্কর। পূর্ণেন্দু পত্রী। তুমি এলে সূর্যোদয় হয় ( কাব্যগ্রন্থ )। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬
২. শেষ যাওয়া। রবীন আদক। আলিঙ্গন, রামকিঙ্কর স্মারক সংখ্যা, ১৩৮৭
৩. রামকিঙ্কর। বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তদেব

৪. কলের বাঁশি। চন্দন আশিস সাহা। তদেব
৫. আচার্য রামকিঙ্কর। সাধন বারিক। তদেব
৬. শতচ্ছিন্ন সন্ন্যাস শিল্পী রামকিঙ্কর। রাজকুমার রায়চৌধুরী। নগ্নশাদা হাড় ( কাব্যগ্রন্থ ), বাল্মীকি, বর্ধমান, পৌষ ১৩৮৭
৭. রামকিঙ্কর। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গাঙ্গেয় পত্র, ১৯৮২
৮. রামকিঙ্কর বেইজ। বিনয় মজুমদার। তদেব
৯. রামকিঙ্কর। অমিতাভ গুপ্ত। তদেব
১০. কচ ও দেবযানী। গৌতম বসু। তদেব
১১. শ্রীরামকিঙ্করকে। অঞ্জন সেন। তদেব
১২. রামকিঙ্কর স্মরণে। বাদন দাস। রূপকলা ১৯৮১—৮২
১৩. শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ। সঞ্জয় কর্মকার। বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি, ১৩৯১
১৪. কিঙ্করদা। রবি গঙ্গোপাধ্যায়। ত্রিবেণী ১৯৮৪
১৫. ভাস্কর রামকিঙ্কর। গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী। বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি ১৯৮৪
১৬. রামকিঙ্কর স্মরণে। অদ্বৈত কুণ্ডু। তদেব
১৭. রামকিঙ্কর বেইজ স্মরণে। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তদেব
১৮. রামকিঙ্কর। বিশ্বনাথ নন্দী। তদেব
১৯. সূর্যমুখীকে। শ্রাবণী দাস। তদেব
২০. রামকিঙ্করের গল্প। রণজিৎ সিংহ। নিজের মাটিতে আপনজনের মধ্যে ( কাব্যগ্রন্থ )। সুবর্ণরেখা, কলকাতা—৯, ১৯৮৫

### জীবনীমূলক উপন্যাস

৫৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ৩রা জানুয়ারী ১৯৮৭ থেকে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে সমরেশ বসুর লেখা রামকিঙ্করের জীবনীমূলক উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে'। লেখকের আকস্মিক মৃত্যুতে উপন্যাসটি শেষ হয়নি। ২৬শে মার্চ, ১৯৮৮, ৫৫ বর্ষ, ২১ সংখ্যায় এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসের শেষ কিস্তি প্রকাশিত হয়। ২রা এপ্রিল, ১৯৮৮, ৫৫ বর্ষ, ২২ সংখ্যায় উপন্যাসটির সম্পাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশকালে 'দেশ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় যেসব চিঠিপত্র বেরিয়েছে :

১. দেখি নাই ফিরে। রবি পাল। ৫৪ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ৭ই মার্চ ১৯৮৭
২. ন্যারো গেজ। বিমল চট্টোপাধ্যায়। তদেব

৩. দেখি নাই ফিরে। মিতালী সেনগুপ্ত। ৫৪ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ২১ মার্চ ১৯৮৭
৪. দেখি নাই ফিরে। সুজাতা গুপ্ত। ৫৪ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২৮ মার্চ ১৯৮৭
৫. দেখি নাই ফিরে। চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়। তদেব
৬. দেখি নাই ফিরে। অলোক হালদার। ৫৪ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২৩ মে ১৯৮৭
৭ গুরুদেব। সুজাতা চট্টোপাধ্যায়। ৫৪ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১১ জুলাই ১৯৮৭
৮. দেখি নাই ফিরে। দীপ্তা চৌধুরী। ৫৪ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ৮ আগস্ট ১৯৮৭
৯. গন্ধেশ্বরী। অশোককুমার পালিত। ৫৪ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ১৫ আগস্ট ১৯৮৭
১০. দেখি নাই ফিরে। নীরা বসু ( ঠাকুর )। ৫৪ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭
১১. বাগেশ্বরী বক্তৃতা। অমরেশ বিশ্বাস। ৫৪ বর্ষ, ৫২ সংখ্যা, ২৪ অক্টোবর ১৯৮৭
১২. দেখি নাই ফিরে। সত্যজিৎ চৌধুরী। ৫৫ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ২৮ নভেম্বর ১৯৮৭
১৩. দেখি নাই ফিরে। সুশীল সামন্ত। ৫৫ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৬ জানুয়ারী ১৯৮৮
১৪. দেখি নাই ফিরে। অশোক কুমার পালিত। তদেব
১৫. দেখি নাই ফিরে। কল্যাণকুমার দত্ত। ৫৫ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮
১৬. রাধারাণী প্রসঙ্গে। সমরেশ বসু। ৫৫ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১৯ মার্চ ১৯৮৮
১৭ দেখি নাই ফিরে। সাগরিকা মুখোপাধ্যায়। ৫৫ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ৩০ এপ্রিল ১৯৮৮

উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখক যেসব সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন :

১. মানুষ ও শিল্পী আমার কাছে একাকার। আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ৩ মে ১৯৮৭
২. সমরেশ বসু সম্পর্কে সমরেশ বসু। আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ২০ মার্চ ১৯৮৮

## সংযোজন


১. সাম্প্রতিক মূর্তিকলা। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। দেশ, শারদীয় ১৩৫১
২. Contemporary Indian Sculpture. Mulkraj Anand. Marg, Vol. IXVI, No. I, Dec. 1962, Marg Publication, Bombay
৩. Introduction to Indian Contemporary Sculpture. Mulkraj

Anand. Marg, Vol. XXI, No. 1, 1968 Marg Publication, Bombay

৪. The Art of Ramkinkar. Jaya Appasamy. Hindusthan Times, Delhi, 3 July 1976

৫. Some New trends in Modern Indian Sculpture. J J. Narzary. Marg, Vol-31, No. 2, 1978, Marg Publication, Bombay

৬. Contemporary Indian Sculpture. Jaya Appasamy. Lalit-Kala Contemporary, No. 6, Delhi

৭. Contemporary Indian Sculpture. Jaya Appasamy. Lalit-Kala Contemporary. No. 10, Delhi

৮. Trends in Recent Sculpture. Jaya Appasamy. Lalit-Kala Contemporary, No. 16, Delhi

৯. Lyrical Rhythm in Ramkinkar Sculpture. Balbirsing Katt. Rup-Lekha, Vol-38, No. 1 & 2, Delhi

* চিহ্নিত লেখাগুলি এই গ্রন্থভুক্ত। ‡ চিহ্নিত লেখা দুটি লেখক কর্তৃক সংশোধিত ও ও সম্পাদিত হয়ে এই গ্রন্থভুক্ত।

সংকলন : প্রকাশ দাস

## ভাস্কর্য

১. মা ও ছেলে (১৯২৮), প্লাস্টার, ২৫ সে মি
২. ড্রাফট (১৯২৮), প্লাস্টার, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৩. দ্য'বনডেজ (১৯২৯), প্লাস্টার, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৪. কচ ও দেবযানী (১৯২৯), প্লাস্টার, ৩০ সে মি. সংগ্রহ (?)
৫. ইউনিয়ন (১৯২৯), প্লাস্টার, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৬. খরগোশ (১৯২৯), সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৭. সাঁতার (১৯২৯ ?), প্লাস্টার, ৩২ সে.মি
৮. মিঃ ব্যানার্জী (১৯৩০—'৩১), সিমেণ্ট, ৩০ সে.মি. সংগ্রহ : প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া
৯. প্রসট্রেশন (১৯৩১), সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১০. মিথুন—১ (১৯৩১), সিমেণ্ট, ৩৫ সে.মি
১১. মিথুন—২ (১৯৩১), সিমেণ্ট, ৪৩ সে.মি
১২. মিথুন—৩ (১৯৩১), সিমেণ্ট, ৫১ সে মি
১৩. সরস্বতী ১৯৩৩, সিমেণ্ট রিলিফ, ১৮০ সে মি. সংগ্রহ : মডার্ন স্কুল, দিল্লী
১৪. মাসোজী (১৯৩৩) সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৫. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০—'৩৩ ), আয়তন (?)। প্রয়াত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (শান্তিনিকেতন) সংগ্রহে থাকতে পারে
১৬. সাঁওতাল-সাঁওতালী (১৯৩৫), ক্লে-রিলিফ, আয়তন (?), সংগ্রহ : শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
১৭. সাঁওতাল-দম্পতি (১৯৩৫), ক্লে-রিলিফ, আয়তন (?), সংগ্রহ : ঐ
১৮. সুজাতা (১৯৩৫), ডাইরেক্ট কংক্রীট, আয়তন (?), সংগ্রহ : কলাভবন মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন
১৯. আলাউদ্দিন খাঁ (১৯৩৫), আয়তন (?), সংগ্রহ : সঙ্গীত একাডেমী, দিল্লী
২০. শ্রীমতী জয়া (১৯৩৬), সিমেণ্ট, ৫৮ সে.মি
২১. গাঙ্গুলীমশাই (১৯৩৬), সিমেণ্ট, ৭৬ সে.মি
২২. শিববিবাহ (১৯৩৭), ক্লে-রিলিফ, আয়তন (?) সংগ্রহ : কালোবাড়ী, শান্তিনিকেতন

২৩. বাদনরত সাঁওতাল (১৯৩৭), ক্লে-রিলিফ, আয়তন (?) ,সংগ্রহ : ঐ

২৪. মেঘ, বৃষ্টি ও গাছ (১৯৩৭), সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

২৫. প্যারাম্বুলেটর ( ১৯৩৮ ), প্লাস্টার, আয়তন (?) সংগ্রহ ঃ প্লাস্টার—বিশ্বরূপ বসু, ব্রোঞ্জ : ললিতকলা একাডেমী, দিল্লী

২৬. সাঁওতাল পরিবার ( ১৯৩৮ ), ডাইরেক্ট কংক্রীট, ৩৬০ সে.মি. সংগ্রহ : কলাভবন মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন

২৭. রবীন্দ্রনাথ—বিমূর্ত (১৯৩৮), প্লাস্টার, আয়তন (?)। প্লাস্টারের মূল ভাস্কর্যটি শঙ্খ চৌধুরীর সংগ্রহে থাকতে পারে। ব্রোঞ্জ : সাহিত্য একাডেমী, দিল্লী

২৮. স্টাডি (১৯৩৯). প্লাস্টার, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

২৯. মধুরা সিং (১৯৪০), সিমেণ্ট, ৫৩ সে.মি

৩০. ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড ( ১৯৪৯ ), সিমেণ্ট, ৩৬০ সে.মি. সংগ্রহ : ব্রাহ্মমন্দির মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন

৩১. রবীন্দ্রনাথ—মূর্ত (১৯৪১), সিমেণ্ট, ৬৮ সে.মি. সংগ্রহ : সিমেণ্ট—বোলপুর ডাকবাংলো, ব্রোঞ্জ : রবীন্দ্রভবন ( শান্তিনিকেতন ), বিড়লা একাডেমী ( কলকাতা ), বুদাপেস্ট ( হাঙ্গেরী )

৩২. ফিগার উইথ ড্রপারি (১৯৪২), ক্লে-ম্যাকেট, ২৪ সে.মি

৩৩. হার্ভেস্টার (১৯৪২), প্লাস্টার, সংগ্রহ (?), আয়তন (?)

৩৪. ফেমিন (১৯৪৩), সিমেণ্ট, ৬১ সে.মি

৩৫. সাঁওতাল নাচ (১৯৪৩), সিমেণ্ট রিলিফ, আয়তন (?), সংগ্রহ : চীনাভবন, শান্তিনিকেতন

৩৬. ফেমিন (১৯৪৩), স্টোন, আয়তন (?)

৩৭. আবরণী—১ (১৯৪৩), সিমেণ্ট, ৬১ সে মি

৩৮. আবরণী—২ (১৯৪৩), সিমেণ্ট, ৫২ সে মি

৩৯. অবনীন্দ্রনাথ (১৯৪৩), সিমেণ্ট, ৪৮ সে মি। মূল ভাস্কর্যটি রবীন্দ্রভারতীতে থাকতে পারে। ব্রোঞ্জ : ন্যাশনাল গ্যালারি, দিল্লী

৪০. ফেমিন (১৯৪৩—'৪৪), সিমেণ্ট, ৯২ সে.মি

৪১. কুলি মাদার (১৯৪৩—'৪৪), সিমেণ্ট, ৭৯ সে.মি

৪২. ফেমিন (১৯৪৩—'৪৪), ক্লে-ম্যাকেট, ২০ সে.মি

৪৩ হার্ভেস্টার ( ১৯৪৫ ), ডাইরেক্ট কংক্রীট, ৩১৫ সে.মি. সংগ্রহ : কলাভবন মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন

৪৪. বিনোদিনী ( ১৯৪৫ ), সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ : কলাভবন, শান্তিনিকেতন

৪৫. বুদ্ধ ( ৪০-এর দ্বিতীয়ার্ধ ), ডাইরেক্ট সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ : কলাভবন মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন

৪৬. দ্য মার্চ (১৯৪৮), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৪৭. ডাণ্ডী মার্চ (১৯৪৮), সিমেন্ট, ৪৮ সে মি. সংগ্রহ : ন্যাশনাল গ্যালারি, দিল্লী

৪৮. ডাণ্ডী মার্চ (১৯৪৮), প্লাস্টার, ৪৮ সে মি.। '৭২ সালে এটিকে ব্রোঞ্জে করা হয়। সংগ্রহ : ব্রোঞ্জ—ন্যাশনাল গ্যালারি ( দিল্লী ), বিড়লা একাডেমী ( কলকাতা ), ব্যক্তিগত সংগ্রহ : প্রভাস সেন, কৃষ্ণকৃপালনী

৪৯. লেবার মেমরী (১৯৪৮), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৫০. কম্পোজিশন—১ (১৯৪৮), সিমেন্ট, ৫১ সে.মি

৫১. কম্পোজিশন—২ (১৯৪৮), প্লাস্টার, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৫২. মা ও ছেলে (১৯৪৯), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৫৩ স্পীড এ্যাণ্ড গ্রাভিটি (১৯৪৯), প্লাস্টার, আয়তন (?), সংগ্রহ : প্লাস্টার—ন্যাশনাল গ্যালারি, ব্রোঞ্জ : কলাভবন, শান্তিনিকেতন

৫৪. মাদার অফ এ স্কাপটার (৪০-এর মধ্যে), সিমেন্ট, ৫১·৫×৬০ সে মি. সংগ্রহ : কলাভবন, শান্তিনিকেতন

৫৫. ফল সংগ্রাহক (১৯৫০), সিমেন্ট, ৭৯ সে.মি

৫৬ শুয়োর ( ১৯৫২ ), সিমেন্ট রিলিফ, আয়তন (?), সংগ্রহ : কলাভবন, শান্তিনিকেতন

৫৭. পিতা-পুত্র (১৯৫২), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৫৮. স্পীড এ্যাণ্ড গ্রাভিটি (১৯৫৩), ডাইরেক্ট কংক্রীট, ১৫২ সে মি. সংগ্রহ : রতনপল্লী মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন। অবহেলায় কাজটি বর্তমানে ভেঙে গেছে।

৫৯. মিলকল—১ (১৯৫৩), ক্লে-ম্যাকেট, ৩০·৫ সে মি

৬০. মিলকল—২ (১৯৫১—'৫৩), ক্লে-ম্যাকেট, ১৬ সে.মি

৬১ যক্ষী—১ (১৯৫৩—'৫৬), প্লাস্টার, ৬১ সে.মি

৬২. যক্ষী—২ (১৯৫৩—'৫৬), প্লাস্টার, ৬২ সে.মি

৬৩. যক্ষী—৩ (১৯৫৩—'৫৬), প্লাস্টার, ৬৩ সে.মি

৬৪ যক্ষী—৪ (১৯৫৩—'৫৬), সিমেন্ট, ৬১ সে.মি

৬৫ যক্ষ—৫ (১৯৫৩—'৫৬), প্লাস্টার, ৯৪ সে মি

৬৬ যক্ষী—৬ (১৯৫৩—'৫৬), প্লাস্টার, ৬১ সে.মি

৬৭. যক্ষ—৭ (১৯৫৩—'৫৬), প্লাস্টার, ৪৮ সে মি

৬৮. যক্ষ—৮ (১৯৫৩—'৫৬), প্লাস্টার, ৪৫ সে মি

৬৯. যক্ষ—৯ (১৯৫৩—'৫৬), প্লাস্টার, ৯৬ সে.মি

৭০. যক্ষী—১০ (১৯৫৩—'৫৬), প্লাস্টার, ৯৫ সে.মি

৭১. মিলকল (১৯৫৬), ডাইরেক্ট কংক্রীট, ৩৬০ সে মি. সংগ্রহ : কলাভবন-মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন

৭২. মিঃ গান্ধী (১৯৫৭), প্লাস্টার, ৩২ সে.মি
৭৩. শার্পেনার (১৯৫৮ ?), প্লাস্টার, ৫২ সে.মি
৭৪. ম্যান এণ্ড হর্স (১৯৬০), ৩৩ সে.মি
৭৫. সুভাষচন্দ্র বসু (১৯৬০—'৬১), প্লাস্টার, ৪৯ সে.মি
৭৬. হর্স হেড (১৯৬২), সিমেণ্ট, ৭১ সে.মি
৭৭. মহিষ—১ (১৯৬২), সিমেণ্ট, ৩০·৫ সে.মি
৭৮. মহিষ—২ (১৯৬২), ক্লে-ম্যাকেট, ৭ সে.মি
৭৯. কাক ও কোয়েল (১৯৬২), সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৮০. আগুনের জন্ম (১৯৬৩), প্লাস্টার রিলিফ, ১৮৩×৪৮ সে.মি
৮১. যক্ষী—১১ (১৯৬৩ ?), প্লাস্টার, ৯৫ সে.মি সংগ্রহ : জয়া আপ্পাস্বামী
৮২. মহিষ ও ফোয়ারা (১৯৬৩), সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ : লেডিজ হোস্টেল, শান্তিনিকেতন
৮৩. মাছ (১৯৬৪), ক্লে-ম্যাকেট, ১০ সে মি
৮৪. তিমি মাছ ( ১৯৬৫ ), সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ : উত্তরায়ণ ( পম্পা ), শান্তিনিকেতন
৮৫. নৃত্যরতা নারী (১৯৬৫), সিমেণ্ট রিলিফ, আয়তন (?), সংগ্রহ : নাট্যঘর, শান্তিনিকেতন
৮৬. লালন ফকির (১৯৬৫), সিমেণ্ট রিলিফ, আয়তন (?), সংগ্রহ : নাট্যঘর, শান্তিনিকেতন
৮৭. যক্ষ-যক্ষী (১৯৬৬), স্টোন, ৬৩০ সে.মি. সংগ্রহ : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, দিল্লী
৮৮. শীলা বর্মা (১৯৬৭—'৬৯), সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৮৯. চৈতালী দে (১৯৬৭—'৬৯), সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৯০. কিরণ থাপা (১৯৬৭—'৬৯), সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৯১. কুমকুম ভট্টাচার্য ( ১৯৬৭—'৬৯ ), সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ : কুণাল-কান্তি সাহা
৯২. প্রেগন্যাণ্ট লেডি ( ১৯৬৭—'৬৯ ), সিমেণ্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ : ঐ। কাজটি বর্তমানে ভেঙে গেছে।
৯৩. বলিদান ( কঙ্কালীতলার পথে )—১৯৭৬, ক্লে-ম্যাকেট, আয়তন (?), সংগ্রহ : সৌমেন অধিকারী
৯৪. রাজপথ (১৯৭৭), সিমেণ্ট ব্লক, ১২৫×৭০ সে.মি. সংগ্রহ : কলাভবন
৯৫. রেখা (?), সিমেণ্ট, ৩০ সে.মি
৯৬. কলেজ গার্ল (?), সিমেণ্ট, ৩৩ সে.মি
৯৭. কিরণ বড়ুয়া (?), প্লাস্টার, ৩০ সে.মি
৯৮. নীলিমা বড়ুয়া (?), সিমেণ্ট, ২৮ সে.মি

৯৯. গণেশ (?) স্টোন, আয়তন (?)
১০০. গণেশ (?), ক্লে-ম্যাকেট, ১৭ সে.মি
১০১. সিটেড লেডি (?), ক্লে-ম্যাকেট, ২৩ সে মি
১০২. মা ও শিশু (?), ক্লে-ম্যাকেট, ৯ সে.মি
১০৩. মিথুন—৫ (?), ক্লে-ম্যাকেট, ২১ সে মি
১০৪. মিথুন—৬ (?), সিমেণ্ট, ৬৮ সে.মি
১০৫. ফেমিন (?), ক্লে ম্যাকেট, ১৬ সে.মি
১০৬. কুকুর (?), ক্লে-ম্যাকেট, ১৬ সে মি
১০৭. সুচিত্রা মিত্র (?), সিমেণ্ট, আয়তন (?)। সুচিত্রা মিত্রের সংগ্রহে থাকতে পারে
১০৮. মীরা চ্যাটার্জী (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১০৯. ইরা ভাকিল (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১০. গোপীনাথ (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১১. ওয়ালার (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১২. মা (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১৩. সেপারেশন (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১৪. রাহুপ্রেম (?) আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১৫. প্যাশন (?),আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১৬. ত্রিভুজ (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১৭. দ্য ফ্রুট অফ হেভেন (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১৮. হাসি (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১৯. দ্য পাপ (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১২০. বন্ধু (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

**তৈলচিত্র**

১. রাধাকৃষ্ণ (১৯২২—'২৩), কাগজ, আয়তন (?)। কাজটি রবি পালের সংগ্রহে ছিল, বর্তমানে হাত বদল হয়েছে।
২. পূজারিণী ( ১৯২২—'২৩ ) কাগজ, ৫০×২৮.৫ সে.মি. সংগ্রহ : অশ্বিনী পাল, বাঁকুড়া
৩. ল্যাণ্ডস্কেপ (১৯২২—'২৩), কাগজ, ২০×৩৫ সে.মি. সংগ্রহ : ঐ
৪. প্রতিকৃতি ( ১৯২৩—'২৪ ), কাগজ, ২৪×১৯ সে মি. সংগ্রহ : নিরঞ্জন বরাট, বাঁকুড়া
৫. শ্বেতবরণী নন্দী (১৯২৯), কাগজ, ৮০.৫×৫১ সে.মি. সংগ্রহ : বিশ্বনাথ নন্দী, বাঁকুড়া

৬. প্রতিকৃতি (১৯৩০), কাগজ, আয়তন (?), সংগ্রহ : অতুল কুচল্যান, বাঁকুড়া
৭. সোমা যোশী ( '৩৭-এর মাঝামাঝি ), ক্যানভাস, ১২৫×৮১ সে.মি
৮. ধানকাটা ( ৩০-এর মাঝামাঝি ), ক্যানভাস, ৮৭.৫×১১৬.৫ সে.মি
৯. পিকনিক (১৯৩৮ ?), ক্যানভাস, ৮৬.৫×৬১.৫ সে.মি
১০ প্রসাধন (১৯৩৮), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১. চাষ (১৯৪০ ?), ক্যানভাস, ৭৬×১২০ সে.মি
১২. মা (১৯৪০), ক্যানভাস, ৬৩×৪৭ সে.মি
১৩. পুকুর (১৯৪০), ক্যানভাস, ৬৩×৭৩ ৫ সে.মি
১৪. বিল্ডার্স (১৯৪১), ক্যানভাস, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৫. ফিস্ পণ্ড (১৯৪১), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৬. কোপাই নদী (১৯৪১), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৭. মা ও ছেলে (১৯৪১), ক্যানভাস, ৮৫×৫৬.৫ সে.মি. সংগ্রহ : কলাভবন
১৮. সাঁওতাল মা (১৯৪৩), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৯. যোগীনের মৃত্যু ( ১৯৪৩ ), ক্যানভাস, ৮৭.৫×৬২.৫ সে.মি. সংগ্রহ কলাভবন
২০. সাইক্লোন (১৯৪৩), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
২১. লেডি উইথ গোট (১৯৪৪), ক্যানভাস, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
২২. স্প্রিং (১৯৪৪), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
২৩. স্বপ্নময়ী (১৯৪৪) আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
২৪ ফিডিং দ্য ইয়ং ওয়ান (১৯৪৫), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
২৫. সামার নুন (১৯৪৫—'৪৮), ক্যানভাস, ১০৭×১১২ সে.মি
২৬. মেঘময় সন্ধ্যা (১৯৪৬), ক্যানভাস, ১২২×৯২ সে মি
২৭. শিফটিং জেনারেশন (১৯৪৭), ক্যানভাস, ১৪৪.৫×৮৫.৫ সে মি
২৮. বয় উইথ ডগ (১৯৪৭), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
২৯. বিনোদিনী (১৯৪৭—'৪৮), ক্যানভ্যাস, ১০৭×১৬৫ সে.মি
৩০. শ্রমিক (১৯৪৮), ক্যানভাস, ১২২.৫×১০৮ সে.মি
৩১. ঘোড়া (১৯৪৯), ক্যানভাস, ৬৫×৮৭ সে.মি
৩২. নিউ শিফট্ (১৯৪৯), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৩৩. হার্ভেস্টার—১ (১৯৫০), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৩৪. কৃষ্ণের জন্ম—১ ( ১৯৫০ ? ), ক্যানভাস, ৬৮×১১০ ৫ সে.মি সংগ্রহ কলাভবন
৩৫. নিউ সীডলিং (১৯৫২), ক্যানভাস, ৭৯.৫×৬৬.৫ সে.মি
৩৬. ফেস্টিভ ঈভ (১৯৫২ ?), ক্যানভাস, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৩৭. হার্ভেস্টার—২ (১৯৫৭), ক্যানভাস, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৩৮. মিলকল ( ৫0-এর মাঝামাঝি ), ক্যানভাস, ৭৫·৫×৬১·৫ সে·মি
৩৯. হিন্দু উইডো (১৯৫৮), ক্যানভাস, ৮৪×৭১ সে.মি
৪০. কক অন দ্য প্লেট (১৯৫৯), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৪১. লেডি উইথ এ কাপ (১৯৬০ ?), ক্যানভাস, ৭৬×৬৫ সে.মি
৪২. তালবন (১৯৬০ ?), ক্যানভাস, ৮৭·৫×৮৭·৫ সে মি
৪৩. ঘরের পথে ( ৫0-এর পর ), ক্যানভাস, ৭৭·৫×৯৫ সে.মি
৪৪. মা ও ছেলে ( ৫0-এর পর ), ক্যানভাস, ৮২·৫×৮৬ সে.মি
৪৫. আরাকান পর্বত (১৯৬৯), ক্যানভাস, ১৩১ ৫×১৭৮ সে·মি
৪৬. অ্যাটোমিকা (১৯৬৯), ক্যানভাস, ১৩১ ৫×১৭৮ সে মি
৪৭. কৃষ্ণের জন্ম—২ (১৯৭৪), ক্যানভাস, ৫৮·৫×৮১ ৫ সে.মি
৪৮. ল্যাম্পপোস্ট (১৯৭৬), ক্যানভাস, ১১০×৭৯ সে.মি
৪৯. আশ্রয় (?), ক্যানভাস, ১৩৮×১১ সে মি· সংগ্রহ (?)
৫০. নাইট ফার্মিং (?), ক্যানভাস, ৮৭×৭১ সে মি· সংগ্রহ (?)
৫১. স্প্রিং—১ (?), ক্যানভাস, ৭৫ ৫×৬২ সে মি· সংগ্রহ (?)
৫২. শরৎ (?), ক্যানভাস, ৮৬×৬৬ সে·মি· সংগ্রহ (?)
৫৩. প্রজাপতি (?), ক্যানভাস, ৭৫·৫×৬৩ সে মি· সংগ্রহ (?)
৫৪. মিথুন (?), ক্যানভাস, ৮৬ ৫×৬১ সে·মি সংগ্রহ (?)
৫৫. মধ্যাহ্নভোজন (?), ক্যানভাস, ৯১×৭৯ সে মি· সংগ্রহ ?)
৫৬. স্প্রিং—২ (?), ক্যানভাস, ৮৭×৮৬ ২ সে মি· সংগ্রহ (?)
৫৭. হার্ভেস্টার (?), ক্যানভাস, ১২১·৫×৮৯ সে মি· সংগ্রহ (?)
৫৮. ইন দ্য কাস্‌ল (?), ক্যানভাস, ৯৬·৫×১৫৯ সে মি· সংগ্রহ (?)
৫৯. মন্‌সুন (?), ক্যানভাস, ৯০×৮২ সে মি· সংগ্রহ : কলাভবন
৬০. ফেস্টিভ আই (?), ক্যানভাস, ৭০·৫×৬১ ৫ সে মি· সংগ্রহ : ঐ

**জলরঙের ছবি**

১. সম্পূর্ণা বেইজ (১৯২৬—'২৮), ২৫ ৫×৩৭·৫ সে মি· সংগ্রহ ·
২. শ্রীমতী বসন্ত বেইজ (১৯২৬—'২৮), ২৯×৪৫ ৫ সে.মি· সংগ্রহ ঐ
৩. ওমেন ফেচিং ওয়াটার—১ (২০-র পর), ৪১×২৬ সে·মি
৪. ওমেন ফেচিং ওয়াটার—২ (ঐ), ৪১×২৭ সে.মি
৫. কালী (১৯৩০), টেম্পারা (কাপড়), ১০০·৫×৬৫ ৬ সে·মি
৬· চেস্টার অফ ট্রিস (১৯৩০), ১৮×২৬ সে·মি
· ক্রসিং দ্য ব্রীজ (১৯৩০ ?), টেম্পারা (কাগজ), ৩৮×২৬ সে·মি

৮. গাছ, অট্টালিকা ও ইলেকট্রিক লাইন (৩০-এর মাঝামাঝি), ২৫'৫×১৬'৫ সে.মি

৯. কোনার্কের পথে (১৯৩৬), টেম্পারা, আয়তন (?), সংগ্রহ : প্রতাপদয়াল দাস

১০. দুই ভাই (১৯৩৮), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

১১. ল্যাণ্ডস্কেপ (৩০-এর পর), টেম্পারা (কাগজ), ৩৮×২৬ সে মি

১২. ট্রি উইথ ব্লুম (১৯৪০ ?), ১৭'৫×২৬'৫ সে.মি

১৩. টি আণ্ডার ট্রি (১৯৪১ ? ), আয়তন (?)। দিল্লী কলেজ অব আর্টের সংগ্রহে থাকতে পারে

১৪. ফিগার (১৯৪১), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

১৫. বৃক্ষসারি ( ৪০-এর গোড়ায় ), ২৬×৩৬ সে.মি

১৬. ল্যাণ্ডস্কেপ (৪০-এর গোড়ায়), ১৬'৫×২৪'৫ সে মি

১৭. নিজস্ব প্রতিকৃতি (৪০-এর গোড়ায়), ২৫×৩৪'৫ সে.মি

১৮. পলাশ (১৯৪৪), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

১৯. খড়্গপুর লেক (১৯৪৪), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

২০. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—১ (১৯৪৫), ২৬'৫×৩০ সে.মি

২১. ঐ ঐ —২ (ঐ) ১৮×২৬ সে.মি

২২. ঐ ঐ —৩ (ঐ) ১৭'৫×২৬ সে মি

২৩. ঐ ঐ —৪ (ঐ) ১৭'৫×২৬'৫ সে মি

২৪. ঐ ঐ —৫ (ঐ) ১৬'৫×২৬ সে মি

২৫. ঐ ঐ —৬ (ঐ) ১৭'৫×২৬ সে মি

২৬. ঐ ঐ —৭ (ঐ) ১৮×২৫ ৫ সে মি

২৭. ঐ ঐ —৮ (ঐ) ১৭'৫×২৬ সে মি

২৮. ঐ ঐ —৯ (ঐ) ১৭'৫×২৬ সে.মি

২৯. ঐ ঐ —১০ (ঐ) ১৭'৫×২৬ ৫ সে মি

৩০. ঐ ঐ —১১ (ঐ) ১৭'৫×২৬ সে.মি

৩১. ঐ ঐ —১২ (ঐ) ১৭'৫×২৬ সে মি

৩২. ঐ ঐ —১৩ (ঐ) ১৮×২৬ সে.মি

৩৩. ঐ ঐ —১৪ (ঐ) ১৪'৫×২৫ ৫ সে মি

৩৪. পাহাড় দৃশ্য ঐ —১৫ (ঐ) ১৮'৫×২৮ সে.মি

৩৫. ল্যাণ্ডস্কেপ ঐ —১৬ (ঐ) ১৭'৫×২৬ ৫ সে মি

৩৬. লেডি এণ্ড দ্য ফ্রুটস্ (১৯৪৫ , আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৩৭. মা ও ছেলে (৪০-এর মাঝামাঝি), ৩৬×২৫'৫ সে মি

৩৮. ঢালুপাড় ও বৃক্ষসারি (৪০-এর মাঝামাঝি), ১৬×১১ সে মি

৩৯. ল্যাণ্ডস্কেপ (১৯৪৬ ?), ১৮'৫×২৬'৫ সে মি

৪০. ফিগার (১৯৪৭), টেম্পারা, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৪১. ল্যাণ্ডস্কেপ ( শিলং )—১ (১৯৪৮), ১৭×২৪ সে.মি
৪২. ল্যাণ্ডস্কেপ ( শিলং )—২ (১৯৪৮), ২৪×৩৫·৫ সে মি
৪৩. ল্যাণ্ডস্কেপ ( শিলং )—৩ (১৯৪৮), ৩০×২২ সে.মি
৪৪. হর্স ফ্রম বুদ্ধগয়া (১৯৪৮), ১৭×২৩ ৫ সে মি
৪৫. মহিষ—১ (১৯৪৮), ২৩×৩৩ সে মি
৪৬. মহিষ—২ (১৯৪৮), ১৭×২৪ সে.মি
৪৭. ঘোড়া—১ (১৯৪৮), ২৫ ৫×৩৫ সে মি
৪৮. ঘোড়া—২ (১৯৪৮), ১৭·৫×২৪ সে মি
৪৯. ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার (১৯৪৮), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৫০. ল্যাণ্ডস্কেপ—১ (১৯৪৮), ১৭·৫×২৪ সে মি
৫১. ল্যাণ্ডস্কেপ ( চেরাপঞ্জী )—২ (১৯৪৮ ?), ২৬×৩৬ ৫ সে মি
৫২. ল্যাণ্ডস্কেপ ( বুদ্ধগয়া )—৩ (১৯৪৮), ১৭×২৪ ৫ সে.মি
৫৩ ল্যাণ্ডস্কেপ ( রাজগীর )—৪ (১৯৪৮), ১৭ ৫×২৬ সে.মি
৫৪ পাহাড় দৃশ্য ( রাজগীর )—৫ (১৯৪৮), ১৮×২৬ সে মি
৫৫ ল্যাণ্ডস্কেপ ( রাজগীর )—৬ (১৯৪৮), ১৫·৫×২৪ সে মি
৫৬. ল্যাণ্ডস্কেপ ( রাজগীর )—৭ (১৯৪৮), ২৩×৩১ সে মি
৫৭. ল্যাণ্ডস্কেপ ( রাজগীর )—৮ (১৯৪৮), ১৮×১৭ সে মি
৫৮. বিনোদিনী (১৯৪৮ ?), ২৭×১৮ সে মি
৫৯. ঘাটের ধারে (১৯৪৮—'৪৯), ২৪×১৬ সে.মি
৬০. ঘোড়া—১ (১৯৪৯), ২৬×২৮ ৫ সে.মি
৬১. ঘোড়া—২ (ঐ) ২৬·৫×৩৪ সে.মি
৬২ ঘোড়া—৩ (ঐ) ১৭·৫×২৬ সে মি
৬৩. ঘোড়া—৪ (ঐ) ২৫ ৫×৩৫ সে মি
৬৪ হাতী—১ (ঐ) ২৩ ৫×৩৩ সে মি
৬৫ হাতি—২ (ঐ) ২৪×৩৩ সে মি
৬৬. এলিফেন্ট এণ্ড এ নেলীং ম্যান (১৯৪৯), ১৬ ৫×২৩·৫ সে.মি
৬৭ বাথিং এলিফেন্ট (১৯৪৯), ১৮×২৬ ৫ সে.মি
৬৮. তিনটি ঘোড়া (১৯৪৯) ২৫ ৫×৩৬·৫ সে.মি
৬৯ মহিষ (১৯৪৯), ১৬ ৫×২৩ সে মি
৭০. ল্যাণ্ডস্কেপ—১ (১৯৪৯), ১৮×২৭ সে মি
৭১. ল্যাণ্ডস্কেপ—২ (১৯৪৯) ১৮×২৬ সে.মি
৭২. রোড বিল্ডার্স—১ ঐ) ২৬·৫×৩৬ সে·মি
৭৩. রোড বিল্ডার্স—২ (ঐ) ২৬·৫×৩৭ সে.মি

৭৪. স্ট্যাণ্ডিং ওমেন (১৯৪৯) ৩৩ ৫×২৩·৫ সে·মি
৭৫. বীণা—১ (১৯৪৯), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৭৬. বীণা—১ (ঐ) আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৭৭. পশুপাল (ঐ) আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৭৮. কুলি (ঐ) আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৭৯. ল্যাণ্ডস্কেপ ( নেপাল )—('৪৫-এর পর), ১৭·৫×২৬·৫ সে·মি
৮০. কার্টিং দ্য হার্ভেস্ট ('৪০-এর পর), ২৪×৩৪ সে·মি
৮১. বৃক্ষসারি—১ (ঐ) ১৮×২৬ সে·মি
৮২. গাছ ও মানুষ—১ (৪০-এর পর ?), ২৩×৩১ সে·মি
৮৩. গাছ ও মানুষ—২ (ঐ) ১৬×২৪ সে·মি
৮৪. বৃক্ষসারি—২ (ঐ) ২৪·৫×১৭ সে মি
৮৫. ঘাটের ধারে (ঐ) ২৭×২৪ সে·মি
৮৬. গ্রামের রাস্তা (ঐ) ২৭×৩৯·৫ সে·মি
৮৭. গ্রামের কুঁড়েঘর (ঐ) ১৮×২৭ সে·মি
৮৮. টু ফিগার (ঐ) জলরং ও ড্রাইপ্যাস্টেল, ১৩ ৫×২৪· সে·মি
৮৯. ল্যাণ্ডস্কেপ (৪০-এর পর), ১৭×৩২ সে·মি
৯০. গার্ল ফেচিং ক্রিয়েচার (১৯৪৯—'৫০ ?), ১৪×১৮·৫ সে মি
৯১. সাঁওতাল নাচ (১৯৫০), ২৫×৩৮ সে·মি
৯২. বর্ষার দিন (ঐ) ১৯×২৭ সে·মি
৯৩. বনভোজনের দৃশ্য (ঐ) ২৪×৩৩ সে·মি
৯৪. দিনের শেষে (ঐ) ২৭·৫×৩০·৫ সে·মি
৯৫. গ্রামের দৃশ্য (১৯৫০?), ১৭·৫×২৭ সে মি
৯৬. মিথুন—১ (ঐ) ২৪·৫×৩৩ সে মি
৯৭. মিথুন—২ (ঐ) সাদাকালো, ২৪·৫×৩৩ সে·মি
৯৮. পুরাতন কোপাই ব্রীজ (১৯৫০—'৫১), ২১×১৩১ সে·মি
৯৯. গার্ল উইথ পিচার—১ (১৯৫১ ?), ২৮১×১৮·৫ সে·মি
১০০. গার্ল উইথ পিচার—২ (১৯৫১ ?), ২৭·৫১×১৪ ৫ সে·মি
১০১. গার্ল উইথ পিচার—৩ (ঐ) ২৭·৫×১১·৮ সে·মি
১০২. গার্ল উইথ পিচার—৪ (ঐ) ২৮·১×১৮·৫ সে·মি
১০৩. গার্ল উইথ পিচার—৫ (ঐ) ২৮·১×১৮ সে·মি
১০৪. হার্ভেস্টার—১ (১৯৫১), ২৬ ৫×১১·৬ সে·মি
১০৫. হার্ভেস্টার—২ (ঐ) ২৫·১×৩৬·৫ সে·মি
১০৬. হার্ভেস্টার—৩ (ঐ) ২৮.১×২৭ সে·মি

১০৭. হার্ভেস্টারস্—৪ (১৯৫১ ?), ১৯১×২৭·৫ সে.মি
১০৮. সমুদ্র দৃশ্য ( কোনারক )—১ (১৯৫১), ১৮·৫×২৬ সে.মি
১০৯. সমুদ্র দৃশ্য ( কোনারক )—২ ( ১৯৫১), ২৭×১৮·৫ সে.মি
১১০. সমুদ্র দৃশ্য ( কোনারক )—৩ (১৯৫১), ১৮·৫×২৭ সে.মি
১১১. সিটেড ওমেন (১৯৫১), ২৬×৩১ সে মি
১১২. স্প্রেট ড্রাফ্‌কার্ড (১৯৫১), সাদাকালো, ২৭×৩২ সে.মি
১১৩. নৌকা ও ঢেউ—১ ( ১৯৫১), সাদাকালো, ২৭·৫×৩২ সে.মি
১১৪. নৌকা ও ঢেউ—(১৯৫১), সাদাকালো, ১৮×২৭·৫ সে.মি
১১৫. ল্যাণ্ডস্কেপ (১৯৫২ ? ), ৩৪×২৪·৫ সে.মি
১১৬. ল্যাণ্ডস্কেপ ( শিলং )—১ (১৯৫২), ২৭·৫×৩৭ সে.মি
১১৭. ল্যাণ্ডস্কেপ (শিলং)—২ (১৯৫২), জলরং ও কালিকলম, ২৪×৩৫ সে.মি
১১৮. ল্যাণ্ডস্কেপ ( শিলং )—৩ (১৯৫২), ২৭×৩৮ সে.মি
১১৯. ল্যাণ্ডস্কেপ ( শিলং)—৪ (১৯৫২), ১৮×২৬ সে.মি
১২০. ল্যাণ্ডস্কেপ ( শিলং )—৫ (১৯৫২), ১৬·৫×১৪ সে·মি
১২১. ল্যাণ্ডস্কেপ ( শিলং )—৬ (১৯৫২), সাদাকালো, ২৬×৩৪ ৫ সে.মি
১২২. গ্রামের দৃশ্য—১ (১৯৫২ ? ), সাদাকালো, ৩২×২৬.৫ সে.মি
১২৩. গ্রামের দৃশ্য—২ (১৯৫২), ১৮·৫×২৭ সে.মি
১২৪. সিটেড ওমেন (১৯৫২), ২৮×১৭৫ সে·মি
১২৫. ওমেন উইথ পিচার (১৯৫২), ২৭·৫×১৭·৫ সে.মি
১২৬. ইলোরা (১৯৫৩), সাদাকালো, ২৭×৩৫ সে.মি
১২৭. নটরাজ ( ইলোরা )—১৯৫৩, ২৬ ৫×৩০ সে.মি
১২৮. ল্যাণ্ডস্কেপ ( ১৯৫৩ ? ), ১৯×২৭·৫ সে.মি
১২৯. ফুটন্ত পলাশবৃক্ষ (১৯৫৩), ৩৪×২৩ সে.মি
১৩০ শান্তিনিকেতনের বসন্ত (১৯৫৩ ? ), ১৮·৫×২৭·৫ সে.মি
১৩১. স্প্রিং—১ (১৯৫৩), ২৪ ৫×৩৩ সে.মি
১৩২. স্প্রিং—২ (১৯৫৩), ১৬×২৭ ৫ সে.মি
১৩৩. স্প্রিং—৩ (১৯৫৩), ১৭×২৫·৫ সে.মি
১৩৪. শান্তিনিকেতনের বনভোজন (৪০-এর শেষ বা ৫০-এর প্রথম), ১৮·৫×২৭·৫ সে.মি
১৩৫. পাহাড় ও ঘর (১৯৫৪ ?), ১৮×২৭ সে.মি
১৩৬. পাতাকুড়ানি (১৯৫৪), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৩৭. শান্তিনিকেতন ল্যাণ্ডস্কেপ—(৫০-এর গোড়ায়),১৮·৫×২৭ সে.মি
১৩৮. থ্রি ওমেন (ঐ), ২৭×১৮ সে.মি
১৩৯. হাঁস (ঐ), ১৮·৫×২৭ ৫ সে. মি

১৪০. সিটেড গার্ল (ঐ), সাদাকালো, ৩১'৫×২৫'৫ সে.মি
১৪১. টু ওমেন স্ট্যানডিং (ঐ), ১৮.৫×২৭ সে.মি
১৪২. বর্ষা (ঐ', ১৮×২৫'৫ সে'মি
১৪৩. গাছ ও কুঁড়েঘর (ঐ), ১৯×২৭ ৫ সে.মি
১৪৪. স্প্রিং (ঐ), ১৯×২৪ সে মি
১৪৫. সিটেড ওমেন (ঐ), ৩২×২৮ সে.মি
১৪৬. ফুটন্ত শিমূল বৃক্ষ—১ (ঐ), ১৬'৫×২ সে মি
১৪৭. ফুটন্ত শিমূল বৃক্ষ—২ (ঐ) ১৬'৫×২৬ সে.মি
১৪৮. ফুটন্ত শিমূল বৃক্ষ—৩ (ঐ) ১৬×২৬ সে মি
১৪৯. ফুটন্ত শিমূল বৃক্ষ—৪ (ঐ), ১৬ ৫×২৬ সে.মি
১৫০. হার্ভেস্টার (৫০-এর মাঝামাঝি), ১৯×২৭ সে মি
১৫১. নদীর দৃশ্য (ঐ', ১৮'৫×২৭'৫ সে.মি
১৫২. নদী ও গাছ (ঐ), ১৯×২৭'৫ সে মি
১৫৩. ওমেন (ঐ), ১৬'৫×২৭ সে'মি
১৫৪. রাস্তার দৃশ্য (ঐ), ১৯×২৭ সে.মি
১৫৫. স্ট্যাণ্ডিং ফিগার (ঐ), ১৮'৫×১৩ সে মি
১৫৬. দিনের শেষে (ঐ', ২৫ ৫×৩১'৫ সে মি
১৫৭. গ্রীষ্মের গ্রাম (ঐ), ১৮ ৫×২৪ ৫ সে.মি
১৫৮. কুলু ভেলি (১৯৫৬), ২৭×১৯ সে মি
১৫৯. বাকড়া নাঙ্গাল বাঁধ (১৯৫৬), জলরং ও পেনকালি, ১৬×২৪ সে.মি
১৬০. পাহাড় দৃশ্য ( বৈজনাথ)—১৯৫৬, ২৭×৩৮'৫ সে.মি
১৬১. ল্যাণ্ডস্কেপ ( কুলু )—১৯৫৬, ২৮×৩৮'৫ সে.মি
১৬২. স্নান (৫০-এর মধ্যে ), ১৬'৫×২৫ সে.মি
১৬৩. ওমেন স্ট্যাণ্ডিং (ঐ), ২৫'৫×১৪'৫ সে মি
১৬৪. আর্টিস্ট উইথ ন্যুড (ঐ), ১৭'৫×২৪'৫ সে মি
১৬৫. শুকনো মাঠ, কুকুর ও পরিবার (ঐ), ৩২×৩৮ ৫ সে.মি
১৬৬. গাছ ও বাতাস (ঐ), ২৫×৮৪ সে.মি
১৬৭. স্নানরতা মেয়ে (ঐ), ১৭.৫×২৭ সে.মি
১৬৮. পাখী (ঐ), ১৮.৫×২৭ সে.মি
১৬৯. বিনোদিনী (ঐ), ২৭×১৮.৫ সে মি
১৭০. শান্তিনিকেতনের বনভোজন ( ৪০-এর পর বা ৫০-এর মধ্যে ), ১৮.৫× ২৭.৫ সে মি
১৭১. অট্টালিকা ও মানুষ ( ৫০-এর পর ), ১৬.৫×২৫ সে.মি
১৭২. ন্যুড বাই এ টেবিল (ঐ), সাদাকালো, ৩৩×১৯ সে.মি

১৭৩. ন্যুড নীলিং (ঐ), সাদাকালো, ২৮'৫ × ৩১'৫ সে.মি
১৭৪. লিফটিং দ্য ওয়ার্ল্ড (ঐ), ১৯'৫ × ২৩'৫ সে.মি
১৭৫. ঝর্না (ঐ), ৩৮.৫ × ২৭ সে.মি
১৭৬. স্প্রিং ( ৫০-এর পর বা ৬০-এর গোড়ায় ), ১৮ × ২৭'৫ সে.মি
১৭৭. বর্ষা (১৯৫০—'৬০), ২৭ × ৩৭ সে.মি
১৭৮. বাণী (১৯৫০'—৬০), ৩১'৫ × ২৫ সে.মি
১৭৯. চাষ (১৯৬০), ২৬ × ৩২ সে.মি
১৮০. লিফটিং দ্য ওয়ার্ল্ড ( ৬০-এর মাঝামাঝি ), সাদাকালো, ১৮'৫ × ২৪ সে.মি
১৮১. কম্পোজিশন (ঐ), ১৮ × ২৬'৫ সে.মি
১৮২. স্প্রিং (ঐ), ২৪ × ২৪ সে.মি
১৮৩. বিড়াল (১৯৬৮), ২৭ × ২৭ সে.মি
১৮৪. তিনটি বিড়াল (১৯৬৮), ২৮ × ২৬ সে.মি
১৮৫. গ্রামের পথে কলসী কাঁখে মেয়ে (?), ১৮ × ২৭ সে.মি
১৮৬. গ্রামের দৃশ্য (?), ২৭ × ৩৯'৫ সে.মি
১৮৭. এ বয় ওয়াশিং বাফেলো (?), ১৮'৫ × ২৭ সে মি
১৮৮. ফ্যামেলি (?), ১৮ × ২৬'৫ সে.মি
১৮৯. ল্যাণ্ডস্কেপ ( গোয়ালপাড়া )—(?), ২৬×১৭'৫ সে.মি. সংগ্রহ : অশোক মিত্র
১৯০. ল্যাণ্ডস্কেপ ( বল্লভপুর )—(?), ২৭×১৯ সে.মি. সংগ্রহ : অশোক মিত্র
১৯১. ল্যাণ্ডস্কেপ (?), ১৮×২৬'৫ সে.মি
১৯২. ধ্বংসাবশেষ (?), ১৮×২৭ সে.মি
১৯৩. গ্রামের দৃশ্য (?), ১৮×২৮ সে.মি
১৯৪. ল্যাণ্ডস্কেপ—১ (?), ১৬×২৪'৫ সে.মি
১৯৫. ল্যাণ্ডস্কেপ—২ (?), ১৯×২৭'৫ সে.মি
১৯৬. ল্যাণ্ডস্কেপ—৩ (?), ২৭×৩৭ সে.মি
১৯৭. ল্যাণ্ডস্কেপ—৪ (?), ১৮'৫×২৭'৫ সে.মি
১৯৮ গাছ ও ঘর (?), ২৪×১৯ সে.মি
১৯৯. খোয়াই (?), ২৩×৩১ সে.মি
২০০. পলাশ (?), ২৪×১৫ সে.মি
২০১. ল্যাণ্ডস্কেপ ( খড়্গপুর )—(?), ২৩×৩১ সে.মি
২০২. ল্যাণ্ডস্কেপ ( কোপাই )—(?), ১৫×২৩'৫ সে.মি
২০৩. বর্ষা (?), ২৬×৩১ সে.মি
২০৪. পাহাড় দৃশ্য (?), ১৬'৫×২৬ সে.মি
২০৫. পাহাড় ( চেরাপঞ্জী )—(?), ২৭×৩৭ সে.মি
২০৬. স্প্রিং (?), ১৫×২৪ সে.মি

২০৭. কনস্ট্রাকশন (?), ৫৬×৩৯'৫ সে.মি
২০৮. পদ্মপুকুর (?), ২৭×৩৭'৫ সে.মি
২০৯. বর্ষা (?), ১৮×২৫'৫ সে.মি
২১০. গ্রামের দৃশ্য (?), ১৯×২৫ সে.মি
২১১. পিকনিক (?), ২৫'৫×৩৪'৫ সে.মি
২১২. নদী ও গাছ—১(?), ৩৭'৫×২৬'৫ সে.মি
২১৩. নদী ও গাছ—২(?), ২৫×৩২'৫ সে.মি
২১৪. সাঁওতাল দল (?), ১৪×২৩ সে.মি
২১৫. বিনোদিনী (?), ২৭'৫×১৮ সে.মি

### সাদাকালো রেখাচিত্র

১. সাঁওতাল মা ও ছেলে ( ৩০-এর গোড়ায় ), তুলি-কালি, ৩৭×২৪ সে.মি
২. ল্যাণ্ডস্কেপ ( ৩০-এর পর ), তুলি-কালি, ২৭×৩৭ ৫ সে মি
৩. স্নান ( ৩০-এর পর ), তুলি-কালি, ৩৮'৫×২৪ সে মি
৪. রাতের দৃশ্য ( ৪০-এর গোড়ায় ), কালি, ২৬'৫×৩২ সে মি
৫. ফেমিন—১ ( ১৯৪৩ ? ), তুলি ও কালি, ৪৩×২৮ সে মি
৬. ফেমিন—২ ( ১৯৪৩ ? ), তুলি ও কালি, ৪৩×২৮ সে.মি
৭. পাহাড় ও গাছ ( ৪০-এর মাঝামাঝি ), কালি, ২৬'৫×৪১'৫ সে.মি
৮. গাছ ও অট্টালিকা—১ ( ৪০-এর মাঝামাঝি ) কালি, ২৬'৫×৪১'৫ সে মি
৯. গাছ ও অট্টালিকা—২ ( ৪০-এর মাঝামাঝি ), কালি, ২৬'৫×৪১'৫ সে.মি
১০. স্টাডি—১ ( ৪০-এর মাঝামাঝি ), কালি, ২৮'৫×২৩ সে মি
১১. স্টাডি—২ ( ৪০-এর মাঝামাঝি ) কালি, ৩২'৫×২৩ সে.মি
১২. কুঁড়েঘর ও গাছ—১ ( ৪০-এর মাঝামাঝি ), কালি, ৪০'৫×২৬'৫ সে.মি
১৩. কুঁড়েঘর ও গাছ—২ ( ৪০-এর মাঝামাঝি ), কালি, ৩২'৫×১৯'৫ সে.মি
১৪. ল্যাণ্ডস্কেপ—( ৪০-এর মাঝামাঝি ) কালি, ২৫'৫×৩৫ সে মি
১৫. কুঁড়েঘর ও গাছ—৩ ( ৪০-এর মাঝামাঝি ), কালি, ৩২'৫×১৯'৫ সে.মি
১৬. কলসি কাঁখে মেয়ে ( ৪০-এর মাঝামাঝি ), কালি, ৩৩'৫×২৪ সে.মি
১৭. কুঁড়েঘর ও গাছ—৪ (৪০-এর মাঝামাঝি), কালি ও তুলি, ২০×৩২ সে.মি
১৮. সিটেড ওমেন—১ ( ৪০-এর পর ), পেন ও কালি, ৩১'৫×১৮ সে মি
১৯. বৃক্ষরোপন ( '৫০ ? ), তুলি-কালি, ২৪×৩৭ সে.মি
২০. নিউ সীডলিং ( '৫১ ? ), কালি, ২৫×২৩'৫ সে.মি
২১. সিটেড ওমেন—২ (৫০-এর মাঝামাঝি?), তুলি-কালি, ২৮×১৮ সে.মি
২২. ন্যুড স্টাডি—১ ( ৫০-এর পর), পেন-কালি, ৩১×১৭'৫ সে মি

২৩. ন্যুড স্টাডি—২ ('৫৯ অথবা পরে), স্কেচ পেন, ১১'৫×৩১'৫ সে.মি
২৪. হর্স হেড—১ (১৯৬০), কালি ও পেন, ৩২'৫×১৮ সে.মি
২৫. হর্স হেড—২ (১৯৬০), কালি ও পেন, ১৯×২৯ সে.মি
২৬. হর্স হেড—৩ (১৯৬০), কালি ও পেন, ১৯×৩০ সে.মি
২৭. অশ্বারোহী নেতাজী (১৯৬০), কালি ও পেন, আয়তন (?)
২৮. সিলেসটিয়াল ভেনম (১৯৬৯), তুলি ও পেন, ২৩×৩২'৫ সে.মি
২৯. মেয়ের প্রতিকৃতি (?), কালি, ৩৩×২০ সে.মি
৩০. ঢেউ (?), কালি, ২৫×৩৫ সে.মি
৩১. দ্য ক্যাম্প (?), কালি, ২১'৫×২৮ সে মি
৩২. ফিগার স্টাডি (?), তুলি-কালি, ২৫×১৮ সে মি
৩৩. ল্যাণ্ডস্কেপ ( শিলং )—(?) খাগড়া ও কালি, ১৭×২৩'৫ সে.মি
৩৪. মজুর ও মজুরাণী (?), কালি ও ওয়াশ, ১৯×১১'৫ সে.মি
৩৫. ফিগার (?), কালি ও ওয়াশ, ৩২×১৪ সে.মি
৩৬. ফার্মিং (?), কালি ও ওয়াশ, ১৯×২৫ সে.মি
৩৭. গাছ ও কুঁড়েঘর (?), কালি, ১৯×২৬ সে.মি
৩৮. হেড (?), উডকাট, ২৫×২০ সে.মি

ছাপাই ছবি

## লিথোগ্রাফ

১. তিনটি বিড়াল—১ (১৯৬৮), সাদাকালো ৪০ ৫×৩০ সে.মি
২. তিনটি বিড়াল—২ (১৯৬৮), ঐ, ২৯'৫×৩৯ সে.মি
৩. শিল্পী ও বিড়াল (১৯৬৮), ঐ, ২৮'৫×৩৯ সে.মি
৪. ক্রীপার অন এ ফেন্স (১৯৬৮), ঐ, ২৯×৩৯'৬ সে.মি
৫. স্প্রিং (১৯৭১), রঙীন, ২২×২৬ সে.মি
৬ ল্যাণ্ডস্কেপ (?) সাদাকালো, ১৮×২৩ ৫ সে.মি

## এচিং

১. ওমেন উইথ গ্রেইন (৩০-এর আগে ?), ১৬'৫×৯'৫ সে.মি
২. মা ও ছেলে (১৯৩৯), এচিং ও ড্রাইপয়েন্ট, ১৭×১৩'৫ সে.মি
৩. গার্ল আণ্ডার এ ট্রি (১৯৩৯), ৭×৭ সে.মি
৪. ওমেন উইথ চিল্ড্রেন (১৯৩৯ ? ), ১১×১৪'৫ সে.মি

৫. কুকুর (৩০-এর পর), ৭×১১ সে.মি
৬. স্নান (৩০-এর পর ), ২০×১২'৫ সে.মি
৭. মিথুন ( ৪০-এর আগে ), ১৬×১০ সে.মি
৮. মাছধরা ( ৪০-এর আগে ), ১০ ৫×১৫ সে.মি
৯. রিম্যুভিং দ্য থ্রর্নস্ ( ১৯৪১ ? ), ২০×১২'৫ সে.মি
১০. রাস্তার দৃশ্য ( নেপাল )—১ (১৯৪৫), এচিং ও ড্রাইপয়েণ্ট, ১৩×৯'৫ সে.মি
১১. রাস্তার দৃশ্য ( নেপাল )—২ (১৯৪৫), ১৮'৫×১০ সে.মি
১২. কম্‌রেড (১৯৪৬—'৪৮ ), ১০ ৫×১৬ সে.মি
১৩. রীপার ( ৫০-এর আগে ), ১৯'৫×১২'৫ সে.মি
১৪. মা ও ছেলে (১৯৪০ অথবা '৫০), ড্রাইপয়েণ্ট, ১২'৫×১৮'৫ সে মি
১৫. লাঞ্চ ইন্ দ্য ফিল্ডস্ ( ৫০-এর মাঝামাঝি ), ১০×১৪'৫ সে.মি
১৬. দিনের শেষে ( ৫০-এর পর অথবা ৬০-এর আগে ), ১৬'৫×২৩ সে.মি
১৭ কম্যাণ্ড (১৯৬৭), ২০×১৮ সে.মি

[ ১৯৭৯ সালের শেষভাগে রামকিঙ্করের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যগুলি যখন কলাভবনের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হয় সেইসময়ে, তাঁর জীবনের প্রান্তসীমায় শুরু করা হয় এই তালিকাপঞ্জী তৈরির কাজ। মূলতঃ দু'জন সংকলক, আর. শিবকুমার এবং জনক ঝঙ্কার নারজারি তালিকাপঞ্জীটি তৈরী করলেও এইগ্রন্থের কাজ চলাকালীন এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরও বেশ কিছু গোড়ার দিককার কাজ বর্তমান সম্পাদকের নজরে আসে। সেইসব কাজও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তালিকাভুক্ত শিল্পকাজগুলি নির্মাণের সময়সীমা যতদূর সম্ভব যথাযথ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটি যে ঘটতে পারে না এমন দাবী যায় না। কেউ যদি সেটি আমাদের নজরে নিয়ে আসেন পরবর্তী সময়ে আমরা সেগুলি সংশোধনে সচেষ্ট থাকব। এই তালিকা সম্পূর্ণ বলেও দাবী করা যায় না। তাঁর প্রধান-প্রধান তৈলচিত্র বা ভাস্কর্যগুলি তালিকাভুক্ত হলেও এখানে বলা প্রয়োজন, তালিকাভুক্তজলরঙ ও স্কেচগুলি হল তাঁর ঐ সৃষ্টি কাজের একদশমাংশ মাত্র। বাকী বিপুল নির্মাণের কোন খোঁজখবর পাওয়া যায় না আজ। তবুও আশা করা যায় এই তালিকাপঞ্জীটি থেকে রামকিঙ্করের সমগ্র সৃষ্টিপর্বের সঙ্গে পাঠকেরা একঝলক পরিচিত হতে পারবেন। এই তালিকায় শিল্পকাজগুলি সংগ্রহের স্থান যেক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে সেক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন-কোন ক্ষেত্রে সংগ্রহের স্থান কোনভাবেই উল্লেখ করা হয়নি। কারণ সেইসব কাজগুলির প্রায় সবই দিল্লীর ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্ট-এর সংগ্রহে আছে। সম্পাদক ]

**সংকলন : আর. শিবকুমার ও জনক ঝঙ্কার নারজারি**

# পরিশিষ্ট

**আমার কথা ( পৃষ্ঠা—১৭ )** ঃ 'সীতার ছবিখানা একজন বন্ধু ভারতবর্ষে ছাপিয়েছিলেন।' সীতার ছবিটি 'নির্বাসিতা' নামে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৩২ সংখ্যায় ছাপা হয়।

'এই সময়ে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু বাঁকুড়ায় গেছলেন। আমার একজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রামকিঙ্করের পরিচয় সংক্রান্ত আরো বিস্তৃত তথ্যের জন্য ২৯৯ পৃষ্ঠায় 'রামকিঙ্কর' অধ্যায়ের 'বাঁকুড়া পর্ব' পর্যায়ের ৩০৮ পৃষ্ঠায় 'শান্তিনিকেতন যাত্রা' অংশ দ্রষ্টব্য।

'তখন আচার্য অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে আর্ট সোসাইটি নামে একটি কলেজ হয়েছিল।' ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে 'প্রাচ্য শিল্পসভা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৭ সালে। এই সভারই পরবর্তী নাম হয় 'দি সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট'। ১৯১৯ সালে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী আওতায় নিয়ে আসা হয়। ঐ বছরের ডিসেম্বরে সোসাইটির আর্ট স্কুলের উদ্বোধন হয়। ১৯১২ সালে কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের শিক্ষকতার কাজে ইস্তফা দিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায় বিচিত্রা সভার শিল্প শিক্ষকতার কাজে এবং সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর তত্ত্বাবধানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন অবনীন্দ্রনাথ। ১৯২৯ সালের মধ্যে নানান বিশৃঙ্খলতায় শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সোসাইটির অবসান ঘটে।

'সেখানে গভঃ আর্ট একাডেমির মত বিলাতী ফ্যাশানের শিক্ষা হত না।' গভঃ আর্ট একাডেমি অর্থাৎ গভঃ স্কুল অফ আর্ট।

'হ্যাভেলের অধ্যক্ষতার সময় নন্দবাবু ছিলেন। থার্ড ইয়ারে পড়তেন।' ই. বি. হ্যাভেল মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী। এখানে আট বছর অধ্যক্ষতা শেষে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের কর্মভার গ্রহণ করেন। নন্দলালকে কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র হিসাবে দেখতে পাই ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত। এবং নন্দলাল আর্ট স্কুলে ছাত্র হিসাবে যোগদানের একবছর পর ১৯০৬ সালে হ্যাভেল অসুস্থতার কারণে কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষতার কাজ অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে গেলে এদেশে আর প্রত্যাবর্তন করেননি। হ্যাভেল-এর অনুপস্থিতিতে সহকারী অধ্যক্ষ থেকে অস্থায়ী অধ্যক্ষের কর্মভার গ্রহণ করেন অবনীন্দ্রনাথ। সুতরাং হ্যাভেলের অধ্যক্ষতার সময় নন্দলালকে আর্ট স্কুলে থার্ড ইয়ারে পড়তে দেখি না। দেখি ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে।

'আচার্য নন্দলাল বসু মহাশয় কলকাতার আর্ট সোসাইটিতে ছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে একরকম অনুরোধ করেই শান্তিনিকেতনে আনার ব্যবস্থা করেন।' ১৯১৪ সালে নন্দলাল সর্বপ্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। ১৯১৬ সালে বিচিত্রাসভায় শিল্পশিক্ষক হিসাবে যোগদানের পর মাত্র দেড়বছরের মধ্যে ঐ সভা বন্ধ হয়ে গেলে ১৯১৯ সালে সোসাইটির আর্ট স্কুলের শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন নন্দলাল। ঐ বছরেই অল্প কিছুদিনের মধ্যে সোসাইটির শিক্ষকতার কাজে ইস্তফা দিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে যোগ দিতে আহ্বান জানান। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের অনুরোধে পুনরায় সোসাইটির শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন এবং একই সঙ্গে সপ্তাহ শেষে একবার শান্তিনিকেতনে নবনির্মিত কলাভবনে শিল্পশিক্ষক হিসাবে আসতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে সোসাইটির অধিকতর বেতনের কাজে ইস্তফা দিয়ে ১৯২০ সালে পাকাপাকিভাবে কলাভবনের শিল্পশিক্ষকের কাজে যোগ দেন নন্দলাল। ১৯২১ সালে তিনি, অসিতকুমার হালদার এবং সুরেন্দ্রনাথ কর গোয়ালিয়র দরবারের আমন্ত্রণে বাঘগুহার ভিত্তিচিত্র নকল করতে যান। ১৯২২ সালে কলাভবনের অধ্যক্ষের কর্মভার গ্রহণ করেন নন্দলাল।

'২/৩ বছর পর পুরানো অভ্যাসটি ফিরে এলো ; তেলরংয়ের কাজ এখনো চলেছে।' বাঁকুড়ার শিল্পীজীবনে রামকিঙ্কর যে তেলরঙের কাজ করতেন, পুরানো অভ্যাস বলতে তিনি এখানে সে কথাই বলতে চেয়েছেন।

'এই সময়টাতে সোমা যোশী, স্বপ্নময়ী এবং অন্যান্য প্রতিকৃতি জাতীয় Model.' রামকিঙ্করের করা তেলরঙের বিশিষ্ট প্রতিকৃতি চিত্রগুলির অন্যতম হল সোমা যোশী এবং স্বপ্নময়ী। ১৯৪৪(?) এ করেন স্বপ্নময়ী। ১৯৩৭-এর মাঝামাঝি করেন সোমা যোশী।

'আবার একটা পুরানো অভ্যাসের অবতারণা—মাটির কাজ শুরু—প্রথমে বিনোদবাবুর প্রতিকৃতি, তারপর সৈয়দ মুজতবা, কৃষ্ণকৃপালনী, ওস্তাদ আলাউদ্দিন…।' ১৯৩৭—'৪১ এর মধ্যে করেন বিনোদবাবু অর্থাৎ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলি এবং কৃষ্ণকৃপালনীর প্রতিকৃতি ভাস্কর্য। বর্তমানে এই কাজগুলির কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। ১৯৩৫-এ করেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র হেড পোর্ট্রেট। এই কাজটি দিল্লীর সঙ্গীত একাডেমীতে রক্ষিত।

'কালো হোস্টেলের ভিতরের বারাণ্ডায় শিবের বিয়ের প্যানেলগুলি গরমের ছুটিতে মূর্তি শিল্পের ছাত্র যারা তাদের দিয়ে করা হয়েছিল।' কালো হোস্টেল ঃ ব্ল্যাক হাউস। ১৯৩৭ সালে শেষ হয় ব্ল্যাক হাউস-এর কাজ।

'জয়া নামে একটি সুন্দরীর Model নিয়ে ৮/৯ ফুট একটি ছাত্রী—হাতে আসন। পরে আচার্যদের মাথায় একটি বাটি বসিয়ে সুজাতা নাম দেওয়া হল।' জয়া ঃ জয়া আপ্পাস্বামী। কলাভবনের ছাত্রী। আচার্যদেব ঃ নন্দলাল বসু। ডাইরেক্ট কংক্রীটে

রামকিঙ্করের করা সর্বপ্রথম মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য হল সুজাতা। ১৯৩৫-এ করেন এটি।
'একটা খবর পেলাম দিল্লীতে Modern School-এ, বন্ধু বনবিহারীর নামে।' বনবিহারী : বনবিহারী ঘোষ। কলাভবনের ছাত্র। ১৯৩২ সালে দিল্লীর বারাখাম্বা রোডের 'মডার্ন স্কুল'-এ ৬ মাসের জন্য শিল্পশিক্ষক হিসাবে যোগ দেন রামকিঙ্কর।
'সামনে তাঁবু খাটানো হয়েছিল—কাশীনাথ আর বাগাল দুজন মসলার কাজে থাকতো।' কাশীনাথ : বিশ্বভারতীর তৎকালীন কর্মী। বাগাল : বাগাল রায়। ভাস্কর্যের সহকারী হিসাবে আজীবন সঙ্গী ছিলেন রামকিঙ্করের। গ্রন্থভুক্ত বাগাল রায়ের সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য।
'এই সময়টাতে রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ নাটকটির প্রথম মহড়া চলছিল।' তাসের দেশ নাটক রচনা এবং প্রথম মহড়া হয় ১৯৩৩ সালে। রামকিঙ্কর সাঁওতাল পরিবার করেন ১৯৩৮ সালে। এই বছরেই রবীন্দ্রনাথের ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে 'তাসের দেশ' নাটকটি শান্তিনিকেতনে তৃতীয়বার মঞ্চস্থ হয়। সম্ভবতঃ এখানে ঐ সময়ের কথাই বলতে চেয়েছেন রামকিঙ্কর।
'preface সহ parents and children.' মিস অ্যালিয়েন্স (১৯৩০) হল বার্নার্ড শ-র লেখা একটি নাটক। এই নাটকের ভূমিকার শিরোনামই হল Parents and Children.
**মাস্টার মশাই ( পৃষ্ঠা—২২ )** : 'একজন আমার সহপাঠী বললেন, 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এসেছেন—চলো দেখা করে আসি।' আমার কথা—প্রবন্ধের পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।
'এর দু-একদিন পরেই চিঠি পেলাম—কোন রাস্তা এবং কী ট্রেন, ঠিকানা ইত্যাদি। চলে এলাম।' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রামকিঙ্করের পরিচয় হবার ৩/৪ মাস পর চিঠি পান রামকিঙ্কর।
'তখন তিনি বরোদার কীর্তিমন্দিরের জন্য একটি ম্যুরাল পেইনটিঙের খসড়া করছিলেন।' ১৯৩৯—'৪৫ এই সময়সীমায় বরোদার কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র আঁকেন নন্দলাল। ১৯৩৯ সালে মন্দিরের দক্ষিণদিকের দেয়ালে আঁকেন 'গঙ্গাবতরণ'। ১৯৪০-এ উল্টোদিকের দেয়ালে করেন মীরাবাঈ-এর জীবন ও গান নিয়ে ছবি। ১৯৪৩-এ পূর্বদিকের দেয়ালে করেন নটীর পূজা এবং ১৯৪৫-এ পশ্চিমদিকের দেয়ালে করেন মহাভারতের চারটি দৃশ্য নিয়ে ছবি।
**আমার শিল্পের প্রথম ইস্কুল বাড়ীর পাশের কুমোরপাড়া (পৃষ্ঠা—২৭)** : 'আমি শান্তিনিকেতনে আসার বছর চারেক আগে নন্দলাল মশাই কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন।' আমার কথা—প্রবন্ধের পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।
'আমি যখন রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে প্রতিকৃতি করার প্রস্তাব দিই…।' ১৯৪১-এর জুলাই মাসে 'উদয়ন'-এর উপরতলার ঘর থেকে চিকিৎসার জন্য অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। এর কিছুদিন আগে তাঁর শেষ জন্ম-

দিনে 'উদয়ন'এর বারান্দায় পড়া হয় কবির শেষ ঐতিহাসিক ভাষণ 'সভ্যতার সঙ্কট'। রবীন্দ্রনাথের অসুখে পড়ার কিছু আগে তাঁকে দেখে রামকিঙ্কর করেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবক্ষ মূর্ত প্রতিকৃতি ভাস্কর্য 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। এই প্রতিকৃতি করার পর ১৯৪১-ই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু। এই গ্রন্থভুক্ত ১নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

**জীবনের সবক্ষেত্রেই আর্ট রয়েছে (পৃষ্ঠা—৩২)**ঃ 'বাঁকুড়াতে ঠেলাঠেলি করে ম্যাট্রিক পর্যন্ত হয়েছিল।' ২৯৯ পৃষ্ঠায় 'রামকিঙ্কর' অধ্যায়ের 'বাঁকুড়াপর্ব' পর্যায়ের ৩০৩ পৃষ্ঠায় 'শিক্ষা' অংশ দ্রষ্টব্য।

শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম ১৯২৫ সালে। বছর দুয়েক নিজে নিজে কাজ করবার পরে আমিই শেখাতে শুরু করি।' ১৯২৫ সালে কলাভবনে ছাত্র হিসাবে যোগ দিয়ে ১৯২৯ সালে কলাভবনের শিক্ষা শেষ করে স্বাধীনভাবে কিছুদিন শিল্পকাজ করার পর ১৯৩০ সালে অস্থায়ীভাবে কিছুদিনের জন্য কলাভবনের শিল্পশিক্ষকতায় সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত থাকতে দেখা যায় রামকিঙ্করকে। এরপর ১৯৩১, '৩২, '৩৩ সাল পর্যন্ত কলাভবনের কোন কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখা যায় না তাঁকে। ১৯৩৪ সালে তাঁকে কলাভবনে স্থায়ী শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হতে দেখা যায়।

'আমি আর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় একই দিনে কাজ শেখাতে শুরু করি।' শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় থেকে ১৯১৯ সালে নবনির্মিত কলাভবনে প্রথম-পর্বের ছাত্র হিসাবে যোগ দেন বিনোদবিহারী। শিক্ষা শেষে ১৯২৫ সালে কলা-ভবনে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। এবং একই সঙ্গে কলাভবন লাইব্রেরী এবং নতুন গড়ে তোলা ম্যুজিয়ামের কিউরেটর-এর যৌথ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই যৌথ দায়িত্ব পালনের পর ১৯৩১ সালে কলাভবনের শিক্ষকতার দায়িত্ব ছেড়ে পুরোপুরি কলাভবন লাইব্রেরীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এবং ১৯৩৪ সালে লাইব্রেরীর দায়িত্ব ছেড়ে কলাভবনে স্থায়ী শিক্ষকতার কজে যোগ দেন। পরিবর্তে ঐ জায়গায় আসেন হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। সুতরাং 'একই দিনে' বা 'একই বছরে' কলাভবনে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হতে যায় না বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্করকে।

'অয়েল পেন্টিং তখন শান্তিনিকেতনে কেউ করতেন না। আমি প্রথম শুরু করি।' কলাভবনে ছাত্রহিসাবে রামকিঙ্করের যোগদানের দু'বছর আগে, কলাভবন গড়ে ওঠার মুহূর্তে, ১৯২৩ সালে আসেন ফরাসী মহিলা শিল্পী আঁদ্রে কারপেলে। কারপেলের সহযোগীতায় এই সময়ে কলাভবনে অয়েল পেন্টিং চর্চা শুরু হয়। দু'জন ছাত্র, একজন ছাত্রী অয়েল পেন্টিং শুরু করেন। কিন্তু তা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। এ সম্পর্কে এই গ্রন্থভুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'রামকিঙ্করবাবুর কথা' প্রবন্ধের ১৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

'অয়েল পেন্টিং কিভাবে শিখলাম জানেন তো ? দোকানে গিয়ে বললাম, 'অয়েল পেন্টিং করবো, কি রঙ আছে, কিভাবে করতে হয় দেখান ?' তা দোকানদার

দেখালো, 'এই তুলি, এই টিউবে রঙ আর এই পাত্রে তেল আছে, এবার ডুবিয়ে নিয়ে রঙ করুন।' ব্যস, অয়েল পেণ্টিং শেখা হয়ে গেল।' বাঁকুড়ায় থাকাকালীন কলা-ভবনে ছাত্রহিসাবে যোগদানের আগে, রামকিঙ্কর একবার কলকাতা যান। এবং সেখান থেকে এইভাবে তেলরঙের ব্যবহার শিখে আসেন। এখানে সেইসময়ের কথাই বলতে চেয়েছেন রামকিঙ্কর।

'ভালো কাজ করেছিলাম অয়েলে যতদূর মনে হচ্ছে 'গার্ল' এ্যাণ্ড দি ডগ।' গার্ল এ্যাণ্ড দি ডগ বা 'সোমী যোশী' নামে পরিচিত এই তৈলচিত্রটি আঁকার সময়সীমা সম্বন্ধে কলাভবন তথা রামকিঙ্করের অন্যতম ছাত্র প্রভাস সেন ৪৭ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৮৭ সালের 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর লেখা 'কিঙ্করদা' নামক প্রবন্ধে বলছেন ঃ '১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি রামকিঙ্কর তেলরং-এর অঙ্কন পদ্ধতি নিয়ে ঐকান্তিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন এবং একটি অবয়ব চিত্রকে আধার করে তেলরং-এর ইউরোপীয় শৈলীগুলির অন্ততঃ দশটি আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তেলরং ব্যবহারের নিজস্ব অঙ্কনরীতি খুঁজে পান। তাঁর এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ তেলরং-এর ছবিটি হল শিল্পমোদী মহলে পরিচিত 'সোমা যোশী'র অবয়ব চিত্র (পৃঃ ১২)।'

'ছেলেও তো খুব কম আসতো। আমরা ছিলাম ১০/১২ জন। হবো কিনা সন্দেহ। ধরুন ৮/৯ জন ছিলাম। তার মধ্যে ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মাসোজী, হরিহরণ।। মেয়েদের মধ্যে সুকুমারী দেবী, নন্দবাবুর মেয়ে গৌরী—এ'রা সব ছিলেন। আরো কিছু নাম মনে পড়ছে না এখুনি।' ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মাসোজী, পি. হরিহরণ, সুকুমারী দেবী প্রমুখ রামকিঙ্করের সহপাঠী ছিলেন না। এ'রা ছিলেন কলাভবনের একেবারে গোড়ার দিককার অর্থাৎ প্রথম পর্বের ছাত্র। রামকিঙ্কর হলেন কলাভবনের দ্বিতীয় পর্বের ছাত্র। সুকুমার দেউস্কর, সুধীররঞ্জন খাস্তগীর, সোভাগমল গেহলট, গোষ্ঠবিহারী সিংহরায় প্রমুখকে রামকিঙ্করের সহপাঠী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

'রবীন্দ্রনাথের একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মূর্তিও করেছিলাম। এটা সিটিং নিয়ে নয়। মন থেকে করা।' রামকিঙ্করের করা রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিকৃতি ভাস্কর্যটির নাম 'কবির মাথা' বা 'পোয়েট্স হেড'। ১৯৩৮ সালে করেন এটি। এই গ্রন্থে ছাপা ৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

'একজন খ্যাতনামা ভাস্কর বলেছেন যে শান্তিনিকেতনে ন্যুড স্টাডি করা হয় না...?' শান্তিনিকেতনে বর্তমানে এই প্রথার পরিবর্তন হয়েছে।

**আমি বিশ্বাস করি আর্ট বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয় ( পৃষ্ঠা ৫৮ )** ঃ 'আমি যখন শান্তিনিকেতনে নেহাত বালক মাত্র রবীন্দ্রনাথ তখনো বেঁচে।' ১৯ বছর বয়সে রামকিঙ্করের কলাভবনে ছাত্র হিসাবে যোগদান করার ১৫ বছর পর মারা যান রবীন্দ্রনাথ।

'আমরা যখন ছাত্র হয়ে আঁকা শিখছি নন্দবাবুর কাছে তখন তো গুরুদেবও আঁকছেন।' ১৯২৫ সালে কলাভবনে ছাত্র হিসাবে যোগ দিয়ে ১৯২৯ সালে কলাভবনের শিক্ষা শেষ করেন রামকিঙ্কর। ১৯৩০ সাল থেকে গুরুত্বের সঙ্গে চিত্রচর্চা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। এবং চিত্রচর্চায় গভীর থেকে গভীরতর সাধনায় এরপর কাটিয়ে দেন জীবনের বাকী ১১টা বছর।

'কলাভবনের বাগানে একটা খুব বড়সড়ো কালো কংক্রীটের গান্ধী মূর্তি আছে।... ...ঠিক কমপ্লিট কাজ নয়।' ১৯৬৮ সালে আসাম সরকারের আমন্ত্রণে কলাভবনের এই গান্ধী মূর্তিটির কাজ আরম্ভ করেন রামকিঙ্কর। ভাস্কর্যটির কাজ কিছুদূর এগোবার পর রামকিঙ্করের করা গান্ধী প্রতিকৃতিতে সন্তুষ্ট হননি আসাম সরকারের লোকজন। তাঁরা তাঁদের মনোমত গান্ধী মূর্তি তৈরীর কথা বলতে থাকেন রামকিঙ্করকে। রামকিঙ্কর তাই সহকারীদের হাতে ছেড়ে দেন গান্ধী ভাস্কর্যের পরবর্তী কাজ। এই অর্থে গান্ধী ভাস্কর্যটিকে অসম্পূর্ণ বলতে চেয়েছেন রামকিঙ্কর। এই গান্ধী ভাস্কর্যটি সম্পর্কে কুণালকান্তি সাহার লেখা এই গ্রন্থভুক্ত 'কিঙ্করদার কিছুটা সময়' প্রবন্ধের ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

'বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় আমার সহপাঠী।' বিনোদবিহারী-রামকিঙ্কর সহকর্মী হয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে। কিন্তু তাঁরা যে সহপাঠী ছিলেন না সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

'শুনেছি, সত্যজিৎ রায় ওঁকে নিয়ে একটা ছবি করেছেন।' বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে ১৯৭৪ সালে ইনার আই' নামে একটি তথ্যচিত্র করেন সত্যজিৎ রায়।

'সত্যজিৎ তো এখনকার সত্যজিৎ নয়। কমার্শিয়াল আর্টের ছাত্র হয়ে এখানে এসেছিলেন। খুব অল্পদিনের জন্য।' ১৯৪০ সালে কলাভবনের ছাত্র হিসাবে যোগ দিয়ে ১৯৪২ সালে কলাভবন ছেড়ে যান সত্যজিৎ রায়।

'ওঁর সঙ্গে আমার একটা আলোচনার সুটিং ছিলো, তাও তুললো। ছবিটা কমপ্লিট হয়েছে। নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু ছবিটা আজ পর্যন্ত বেরুলো না। কি জানি কেন?' ঋত্বিক ঘটক রামকিঙ্করের উপর তথ্যচিত্রটি আরম্ভ করেন ১৯৭৫ সালের ২৮শে আগস্ট। ঐ বছরের ১৯শে নভেম্বর ঋত্বিকের লেখা একটি চিঠি থেকে জানতে পারা যায় যে ছবিটির অবশিষ্ট কাজ আর চার-পাঁচদিনের এবং ঐ বছরের শেষ নাগাদ কলকাতায় তথ্যচিত্রটির যাবতীয় কাজ শেষ করে ছবিটির রঙীন প্রিন্টের জন্য তিনি বোম্বে যাবেন। সম্ভবতঃ ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ ৩৫ মিলি-মিটার রঙীন ফিল্মে তোলা এই তথ্যচিত্রটি সাদা-কালোতে ব্লো-আপ করে দেখানো হয় কলকাতায়। সময় নেয় ১৫ মিনিটেরও বেশী। যোজনা কমিশনের ডেপুটী চেয়ারম্যান, ফিল্ম ডিভিসনের কন্ট্রোলার এবং অরুণ আসিফ আলিকে, যিনি সম্ভবতঃ সেন্সর বোর্ডে ছিলেন, ১৯৭৬ সালের ৩১শে জানুয়ারীতে লেখা একটি চিঠিতে

**ঋত্বিক ঘটক বলছেন :** 'For your information I have completed a film on Kinkarda, I want to show it to you and if possible sell it to you. I am coming down within fortnight to Bombay and arrange for showing.' চিঠিটিতে ১৫ দিনের মধ্যেই বোম্বে যাবার যে প্রতিশ্রুতির কথা দেখতে পাই তার আগেই ১৯৭৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী মারা যান ঋত্বিক ঘটক। সুতরাং ছবিটির বোম্বের কাজ অসম্পূর্ণই থেকে যায়। তাহলে ছবিটির বর্তমান অবস্থা কি? ১৯৮৭-র ২৯শে জুলাই 'আজকাল' সংবাদপত্রে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক পত্নী সুরমা ঘটক ছবিটির সর্বশেষ খবর যা জানিয়েছেন তা এইরকম : 'রামকিঙ্কর' ডকুমেন্টারিটা আমার কাছেই ছিল। ট্রাস্ট হবার পর ওখানে দিয়ে দিয়েছি। ওটারও কিছু কাজ বাকী রয়েছে। এডিটিং করা নেই। আমি নিজে ওটার সাদাকালো ৩৫ ব্লো-আপ করে এডিট করছি।......যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ করে ফেলতে চাই।' ঐ সাক্ষাৎকারেই শ্রীমতী ঘটক আশ্বাস দেন ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে ঋত্বিকের জন্মদিন ( ৪ঠা নভেম্বর ) উপলক্ষে কলকাতার নন্দনে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে ঋত্বিকের তোলা অন্যান্য চলচ্চিত্রের সঙ্গেই দেখানো হবে বিতর্কিত তথ্যচিত্র 'রামকিঙ্কর'। কিন্তু তা দেখানো হয়নি।

**আমার কাকা রামকিংকর ( পৃষ্ঠা ৭৭ ) :** 'কিছুদিন ওখানে পড়ার পর দত্তবাঁধের পাড়ে একটা স্কুল হয়, নামটা বলতে পারবো না, সেখানেও পড়েন কিছুদিন। এই দত্তবাঁধের পড়াটাই শেষ পড়া বলে মনে হয় আমার।' দত্তবাঁধের পাড়ে গড়ে ওঠা ন্যাশনাল স্কুলের কথাই এখানে বলতে চেয়েছেন দিবাকর। এছাড়াও রামকিঙ্করের শিক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য এই গ্রন্থের ৩০৩ পৃষ্ঠায় 'শিক্ষা' অংশ দ্রষ্টব্য।

**আমার সহপাঠী রামকিংকর (পৃষ্ঠা ৯৪) :** 'কলাভবনও তখন উঠে এসেছে দ্বারিক ছেড়ে গ্রন্থভবনের দোতলায়, বর্তমান পঠভবনের, হল ঘরটাতে। তার দেয়ালে অলংকরণের কাজ চলছে জয়পুরী কারিগরের সাহায্যে শিল্পাচার্যের পরিকল্পনা অনুমায়ী।' জয়পুরী কারিগব বলতে নরসিংহলাল-এর কথাই এখানে বলেছেন প্রবন্ধকার। জয়পুরের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কারিগর নরসিংহলাল ১৯২৭ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন প্রথমবার। এই সময়ে নরসিংহলাল-এর সুদক্ষ কারিগরী সহযোগিতায় শিল্পাচার্য নন্দলাল এবং কলাভবনের তৎকালীন ছাত্ররা লাইব্রেরীর দোতলার দেয়ালে করেন ভিত্তিচিত্র অলংকরণের কাজ। এই ভিত্তিচিত্রের তিনটি মূল ডিজাইনের একটি ছিল কপি। অন্য দুটি চিত্রের মধ্যে একটি করেন নন্দলাল এবং অন্যটি সুরেন্দ্রনাথ কর। প্রায় ৫০০ টাকা ব্যয়ে ২৬০ স্কয়ার ফুট জায়গা অলংকরণে সময় লাগে ৪ মাস। ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে আসেন নরসিংহলাল। এই সময়ে তাঁর কারিগরী সহায়তায় লাইব্রেরীর নীচতলায় করা হয় অলংকরণের কাজ।

**শিল্পী বাউল (পৃষ্ঠা ১০৫) :** 'কিন্তু ইংরাজীর সেই অধ্যাপক এটিকে একটি

বিদ্রুপ বা উপহাস মনে করেছিলেন। জানা যায়, তিনি কিঙ্করদাকে তাঁর বেত দিয়ে প্রহার করে বলেন, 'একজন মাতাল লোকের ভালোভাবে ব্যবহার করতে শেখা উচিত।' ১৯৫৭ সালের নভেম্বরের প্রথম দিকে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত যুব উৎসবে বিশ্বভারতীর যোগদানের উদ্দেশ্যে সঙ্গীতভবন মঞ্চে 'আন্তিগোনে' গ্রীক নাটকের ইংরাজী অনুবাদের মহড়া শুরু করেন বিদেশ প্রত্যাগত, বিশ্বভারতীর তৎকালীন ইংরাজীর অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ডঃ সুধীন ঘোষ। ঐ নাটক পরিচালনায় সাহায্য করবার জন্য ডঃ ঘোষের লিখিত আমন্ত্রণে স্বাভাবিক সহৃয়তায় এগিয়ে আসেন রামকিঙ্কর। এবং নাটকের দু'একটি দৃশ্য পরিচালনা সম্পর্কে ডঃ ঘোষকে পরামর্শ দেন। কিন্তু রামকিঙ্করের থেকে নিজেকে অনেক উঁচুস্তরের পরিচালক ভাবায় ঐ পরামর্শ ডঃ ঘোষকে খুশী করতে পারেনি আদৌ। এরপর ঐ নাটকের স্ক্রিপ্ট যথাস্থানে রেখে গাত্রোত্থান করেন রামকিঙ্কর। ডঃ ঘোষের অভিযোগ ঃ ঐ নাটকের স্ক্রিপ্ট তাঁর মুখের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে যান রামকিঙ্কর। যাই হোক এইভাবেই শুরু হয় মনান্তর। মনান্তর থেকে ২৬শে অক্টোবর সন্ধ্যায় ডঃ ঘোষ কর্তৃক রামকিঙ্করের প্রহৃত হবার মতো অবাঞ্ছিত ঘটনার সৃষ্টি। এই ঘটনার দু'একদিনের মধ্যেই ছাত্রদের তুমুল রোষের মুখে ডঃ ঘোষ শান্তিনিকেতন ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহন করলেও ১৯৫৭ সালের ১০ই নভেম্বর বিশ্বভারতীয় ছাত্র-শিক্ষকদের প্রবল প্রতিবাদে তাঁকে লিখিতভাবে বিশ্বভারতীর কর্মভার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। শান্তি-নিকেতনের ঐতিহ্যবিরোধী ডঃ ঘোষের আচরণ এবং বিশ্বভারতী সম্পর্কে নানান কটূক্তি ইতিপূর্বেই তাঁর সম্পর্কে ছাত্রশিক্ষকদের মনে ক্রোধ ও নানান অভিযোগের জন্ম দেয়। রামকিঙ্করকে মারার ঘটনা সেই চাপা আগুনে ঘৃতাহুতি বলা যায়। এ সম্পর্কে আরো বিস্তৃত তথ্যের জন্য 'নাটকপ্রেমী রামকিঙ্কর' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

'তিনি বন্যময় নৈসর্গিক জায়গা পছন্দ করে তার মধ্যে স্কেচখাতা এবং রঙ নিয়ে ঘোরাফেরা করতেন এবং শ্রীদাশগুপ্ত স্যুটিং করতেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই স্যুটিং চলে। পেণ্টিংস-এর সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন মেজাজে তাঁকে ধরে রাখবার জন সেই ফিল্মের বেশীরভাগটাই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই ফিল্মের পুরোটাই যথাযথ সম্পাদনার অভাবে আর সম্পূর্ণ হয়নি।' রামকিঙ্করকে নিয়ে করা শ্রী হরিসাধন দাশগুপ্তের তথ্যচিত্রটি সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু রামকিঙ্করকে নিয়ে ঋত্বিক ঘটকের করা তথ্যচিত্রটি যে সম্পূর্ণ হয়নি সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

'ওঃ! অসিতদার জায়গা।' অসিতদা ঃ অসিত হালদার।

**কিংকরদার কিছুটা সময় ( পৃষ্ঠা ১১৪ ) ঃ** 'কিঙ্করদাকে দুটো নাটক করতে দেখেছি। একটি অবনীন্দ্রনাথের 'লম্বকর্ণ পালা', অন্যটি ইংরাজী নাটক 'পোয়েটে-স্টার্স অফ ইস্পাহান'। দ্বিতীয় এই নাটকটি...Government of India ফিল্ম ডিভিসনকে তুলতে দেখেছিলাম।' ১৯৬৯ সালে হরিসাধন দাশগুপ্তের পরিচালনায়

ভারতসরকারের সিনেমা বিভাগ (?) রামকিঙ্করকে নিয়ে যে তথ্যচিত্রটি করেন, এখানে সেই তথ্যচিত্রটির কথাই বলতে চেয়েছেন প্রবন্ধকার।

**আমার প্রতিবেশী রামকিংকর** ( পৃষ্ঠা ১২০ ) ঃ 'পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে কোন একসময় দিল্লীতে একটা প্রদর্শনী হচ্ছিল। তাতে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর জন্য একটা বিশেষ প্যাভেলিয়ন নির্দিষ্ট হয়েছিল। যা প্রায় দু'তলা বাড়ীর সমান উঁচু। সামনের দেওয়ালের উপরের দিকের খানিকটা জায়গা রাখা ছিল রামকিঙ্করের ছবি আঁকার জন্য।' পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে ১৯৫৮ সালে দিল্লীর বর্তমান প্রগতি ময়দানে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মেলা বা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীতে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির (U.G C) .জন্য একটি প্যাভেলিয়ন নির্দিষ্ট করা হয়। রামকিঙ্করকে ঐ প্যাভেলিয়ন অলংকরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

**রামকিংকরবাবুর কথা** ( পৃষ্ঠা ১৬৭ ) ঃ 'বাঁকুড়ায় প্রতিমা গড়তো এক কারিগর, ওঁকে ভালোবাসতো খুব। সেই কারিগরই মডেলিং-এর কাজ হাতে ধরে শেখায়।' কারিগরের নাম অনন্ত পাল বা সূত্রধর। অনন্ত পাল রামকিঙ্করকে মডেলিং-এর কাজ হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন কিনা নির্দিষ্ট করে তা বলা যায় না কিছু।

'ফরাসী মহিলা আঁন্দ্রে কারপেলে কলাভবনে ট্রেনিং দিয়েছিলেন, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় রীতিমতো অয়েল পেন্টিং শিখেছেন। এটা ১৯২১—২২ সালের ঘটনা হবে, রামকিঙ্করবাবু তখনো আসেননি।' ১৯২১—২২ সাল নয়, ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে ফরাসীমহিলা শিল্পী আঁন্দ্রে কারপেলে কলাভবনে আসেন।

'মনে রাখবেন ১৯২১-এ স্টেলা ক্রামরিশ আপ টু ডাডাইজম লেকচার দিয়েছিলেন।' ১৯২১ সালে ইউরোপ ভ্রমণকালে ক্রামরিশ-এর সঙ্গে পরিচিত হন রবীন্দ্রনাথ। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শিল্পইতিহাসের অধ্যাপিকা হিসাবে কলাভবনে আসেন ক্রামরিশ।

'তারপরেতে 'বুল', সেটা তো আমি চোখে দেখিনি, মোটামুটি শুনেছি।' লেডিজ হোস্টেলের সামনে রামকিঙ্করের করা 'মোষ ও ফোয়ারা' ভাস্কর্যটির কথাই এখানে সম্ভবতঃ বলতে চেয়েছেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৩ সালে করেন এটি।

'শান্তিনিকেতনের কাজগুলোর মধ্যে প্রথম করেছেন 'সুজাতা', তারপর মাটির বুদ্ধ ভেঙে যাওয়ায় বর্তমান মূর্তি অনেক পরে তৈরী হয়, তারপর সাঁওতাল দম্পতি, গেস্ট-হাউসের সামনে অ্যাবস্ট্রাক্ট, ধানঝাড়া, মিলকল এবং তার ফাঁকে ফাঁকে কলাভবনের কালোবাড়ীর কাজ।' সুজাতা, বুদ্ধ, সাঁওতাল দম্পতি, গেস্টহাউসের সামনের অ্যাব-স্ট্রাক্ট অর্থাৎ ল্যাম্পস্টাণ্ড বা বাতিদান, ধানঝাড়া, মিলকল প্রভৃতি ভাস্কর্যগুলি তৈরীর সময়সীমা এই গ্রন্থের ৩১২ পৃষ্ঠায় 'শান্তিনিকেতন পর্ব' পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে কালোবাড়ী বা ব্ল্যাক হাউসের মাটির দেয়ালে করা ভাস্কর্যের সময়সীমা। সেখানে ১৯৩৬ সালে ব্ল্যাক হাউসের কাজ আরম্ভ করে ১৯৩৭ সালে

শেষ করতে দেখা যায়। এবং উপরোক্ত ভাস্কর্যগুলি করার ফাঁকে ফাঁকে ব্ল্যাক-হাউসের কাজ করতে দেখা যায় না রামকিঙ্করকে।

**কিঙ্করদাকে যেমন দেখেছি ( পৃষ্ঠা ১৭৪ ) :** 'বহুদিন পর যোগীনের মৃত্যু নিয়ে কিঙ্করদা একটা অয়েল পেণ্টিং করেছিলেন। প্রত্যক্ষ দেখা ঘটনা নিয়ে এ ধরনের ছবি বোধ হয় আর নেই।' রামকিঙ্করের আঁকা এই ছবিটির নাম 'ডেথ অফ এ চা-ওয়ালা' বা 'যোগীনের মৃত্যু'। ছবিটি করেন ১৯৪৩ সালে।

'মাটি দিয়ে প্রথম মানুষের চেহারা করা দেখি গাঙ্গুলী মহাশয়ের।' রামকিঙ্করের করা এই ভাস্কর্যটির নাম 'গাঙ্গুলী মশায়'। ভাস্কর্যটি করেন ১৯৩৬ সালে।

'আমার বিশেষ মনে আছে গুরুদেব-গান্ধীজির সংবর্ধনা করার মাটির ছোট স্কেচ।' ১৯৪০ সালে গান্ধীজি প্রথম আসেন শান্তিনিকেতনে।

'পরে ঐ প্রথমে করা স্কেচটাই কাস্ট করলেন। সেই মূর্তি নিয়েই বঙ্গসরকারের মন্ত্রীর আক্ষেপ থেকেই বোঝা যায় দেশের রুচিবোধ।' রামকিঙ্কর রবীন্দ্রনাথের এই মূর্ত আবক্ষ প্রতিকৃতিটি করেন ১৯৪১ সালে। ১৯৫৫ সালে এই প্রতিকৃতির ব্রোঞ্জের প্রতিলিপি ভারত সরকার কর্তৃক হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ট-এর কাছে বালাতন হ্রদের তীরে স্থাপন করা হয়। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এই আবক্ষ প্রতিকৃতিটি দেখে ক্ষুব্ধ হন। সফর-শেষে ঐ বছরের নভেম্বরের গোড়ার দিকে কলকাতায় ফিরে পূর্তমন্ত্রী শ্রীচক্রবর্তী বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের যোগ্য মূর্তি চাই'। কারণ তাঁর মতে 'ঐ মূর্তি রবীন্দ্রনাথের অবমাননা ছাড়া কিছু নয়'। এবং ঐ মূর্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন মিল খুঁজে না পাওয়ায় ঐ ভাস্কর্যটি সরিয়ে রাজ্য সরকারের খরচে নামকরা কোন ভাস্করকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'উপযুক্ত' মূর্তি তৈরী করে বুদাপোস্ট-এ পাঠানোর জন্য পূর্তমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করলে তিনি রাজী হয়ে যান। রামকিঙ্করের করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই প্রতিকৃতি ভাস্কর্যটির অপসারনরোধে এই রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী, বুদ্ধি-জীবীদের মধ্যে অহিভূষণ মালিক, সত্যজিৎ রায়, নীহাররঞ্জন রায়, সুরেন দে প্রমুখ ১৯৭৯ সালের ১লা এবং ১৪ই নভেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানান। শিল্পী, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণের প্রবল প্রতিবাদের মুখে এই বিশিষ্ট ভাস্কর্যটি অপসারণে ক্ষান্ত দেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। অপরপক্ষে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মৈত্রেয়ী দেবী, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ মন্ত্রীর অভিমতের সমর্থনে ঐ বছরের ১০ই এবং ১৪ই নভেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তাঁদের লিখিত মতামত জানান।

**রামকিঙ্কর ও তাঁর শিল্পকাজ ( পৃষ্ঠা ১৯২ ) :** 'প্রাপ্ত নথিপত্র থেকে জানা যায় যে বিশ-এর গোড়ার দিকে ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ শান্তিনিকেতনে আসেন এবং গড়ে তোলা নতুন ছাত্রদের সঙ্গে ইউরোপীয় শিল্পধারার একটা আত্মীয়তা ঘটান। প্রায় সেই সময়েই কলকাতায় আধুনিক জার্মান শিল্পের একটি

প্রদর্শনী হয়, যার থেকে শিল্পীর স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্রতার একটা স্বচ্ছ ধারণা করতে পেরেছিলেন সেই সময়ের শান্তিনিকেতনের শিল্পের ছাত্ররা।' আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ডঃ ক্রামরিশ শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২২ সালে। ১৯২২—'২৩ সালে ক্রামরিশ এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় কানডিনেস্কি প্রমুখ জার্মান শিল্পীদের ড্রইং-এর একটি প্রদর্শনী হয় কলকাতার দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এ। প্রদর্শনীতে কোন তৈলচিত্র ছিল না। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমেই কলকাতার শহরবাসীরাও আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ পান।

'প্রবেশদ্বারের কাছে মহিলা ও উড়ন্ত পাখীর আদলে করা ভাস্কর্যটিকে মনে হয় যেন আঁকাবাঁকা তরঙ্গে উড়ে আসা নব্যপ্রস্তুর যুগের ভেনাস।' প্রবেশদ্বারের কাছে অর্থাৎ পুরানো গেস্ট হাউস বা শান্তিনিকেতন গৃহের সামনে রামকিঙ্করের করা 'ল্যাম্প স্ট্যাণ্ড' বা 'বাতিদান' নামের ভাস্কর্যটির কথাই এখানে বলতে চেয়েছেন প্রবন্ধকার।

**নাটকপ্রেমী রামকিংকর ( পৃষ্ঠা ২৩৭ )ঃ** '১৯৫৮ সালে একটি গ্রীক নাটকও অভিনয় করাতে উদ্যোগী হন। তার মহড়াও শুরু হয় সঙ্গীতভবনে।' ১৯৫৮ সালে নয়, ১৯৫৭ সালে 'আন্তিগোনে' গ্রীক নাটকের ইংরাজী অনুবাদের মহড়ায় পরিচালককে সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রামকিঙ্কর।

**নাটকপ্রেমী রামকিংকর (পৃষ্ঠা ২৩৯)ঃ** '১৯৫৮ সালে 'আন্তিগোনে' নাটকের শেষ মহড়ার দিন স্বাভাবিক সহৃদয়তায় পরিচালককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কিঙ্করদা।' ১৯৫৮ সালে নয়, ১৯৫৭ সালেই যে 'আন্তিগোনে' নাটকের মহড়া হয় সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

'সম্পূর্ণ সত্যকথার পরিবর্তে এক বাংলা কাগজে ছেপে বেরল কেবল কিঙ্করদার ওপর আক্রমণের বিবরণ আর তাঁর উপর আক্রমণের সাফাই গাইতে গিয়ে আর এক বিকৃত সংবাদ প্রকাশ করল একটি ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র।' 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার ১৯৫৭ সালের ৩০শে অক্টোবর, বুধবার, ৭ পাতায় ঐ ঘটনার একটি বিকৃত সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটির শিরোনাম ছিল All over rehearsal of drama : Conflicting version of Santiniketan. ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ সংবাদের আপত্তিজনক কিছু অংশের প্রতিবাদ করে রামকিঙ্কর ঐ পত্রিকায় একটি চিঠি লেখেন। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর, সোমবার, 'Santiniketan Fracas' শিরোনামে ঐ পত্রিকার ৪ পৃষ্ঠায় চিঠিটি প্রকাশিত হয়। রামকিঙ্করের লেখা ঐ চিঠিটি এখানে হুবহু তুলে দেওয়া হল ঃ Sir—I was shocked to read the report you published on October 30 about the incident at Santiniketan on October 26. The facts are that on October 23 Dr. Ghosh requested me in a Letter to assist him in connexion with the Drama 'Antigone'

for the youth vestival. After the incident, in order to prove his request, I had shown his letter to the staff at a staff metting and to the Registrar also. I had no intention at all of taking the party to Delhi as you have reported.
The same evening, at the rehearsal, Dr. Ghosh offended me and I wanted to leave the place at once. I placed the script on the floor infront of him. I did not throw it at his face. While I was going away Dr. Ghosh gave some blows and beat me with a stick several times and injured me. I did not retaliate. There were many eye-witnesses to the assault from different departments of Visva-Bharati—yours, etc.
Santiniketan, October 31 Ramkinkar.

এরপর 'শান্তিনিকেতনের সাম্প্রতিক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঃ দায়িত্বশীল আশ্রমিকগণের মধ্যে গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি'—এই শিরোনামে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ১ম পৃষ্ঠায়, ১৯৫৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর সংখ্যায় ঐ ঘটনার বিস্তৃত সংবাদ ছাপা হয়। ঐ সংবাদের সঙ্গে শ্রী ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এবং ছাত্র প্রতিনিধি দলের বক্তব্য ছাপা হয়। সেই বক্তব্যে তাঁরা প্রত্যেকেই এই ঘটনার নায়ক অধ্যাপক ডঃ সুধীন ঘোষকে দোষারোপ করেন এবং সত্য ঘটনার বিবরণ দেন।
'তারপর ঐ পরিচালকের পক্ষ নিয়ে এক হাস্যকর উকিলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এক সাহিত্যিক যিনি পরবর্তীকালে রবীন্দ্র পুরস্কার বাছাই-এর ব্যাপারেও অনুরূপ নীতিবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।' পরিচালক, অধ্যাপক ডঃ সুধীন ঘোষের পক্ষ নিয়ে সেই সময়ে ঐ ঘটনায় সোচ্চার হয়েছিলেন ডঃ ঘোষের গুণগ্রাহী, সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। সেই সময়ে 'জাপানে' নামে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে 'দেশ' পত্রিকায়। ঐ পত্রিকার ১৩৬৫ সালের, ইং ১৯৫৮, ১৮ই মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'জাপানে' প্রবন্ধের একটি কিস্তির কিছুটা অংশ জুড়ে বিশ্বভারতীর অধ্যাপনা থেকে কর্মচ্যুত ডঃ সুধীন ঘোষের বিদেশে বাঙালী সাহিত্যিক হিসাবে চূড়ান্ত খ্যাতির কিছুটা নমুনা হাজির করে বিশ্বভারতী তথা শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে অপভাষণ করলে ঐ লেখার প্রতিবাদ করে 'দেশ' পত্রিকার ১৯৫৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় একটি চিঠি লেখেন এই গ্রন্থভুক্ত নাটকপ্রেমী প্রবন্ধের লেখক বিশ্বজিৎ রায় এবং অন্যটি জনৈক শান্তিনিকেতন-বাসী ( এই নামেই চিঠিটি প্রকাশিত হয় )। এরপর ১৯৫৮ সালের 'দেশ' পত্রিকার ১লা মার্চ সংখ্যায় 'জাপানে লেখকের কৈফিয়ৎ' নামে অন্নদাশঙ্করের অগ্নিগর্ভ চিঠিটি প্রকাশিত হয়। এবং ঐ ঘটনার প্রতিবাদে 'জাপানে' নামে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধটি লেখাও বন্ধ করে দেন অন্নদাশঙ্কর।

সংকলন : **প্রকাশ দাস**